বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে
ঘিরে কিছু ঘটনা ও
বাংলাদেশ
এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা
ও
বাংলাদেশ

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

উৎসর্গ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুণ্য স্মৃতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, বাঙ্গালী সশস্ত্র বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্য ও নাম-না-জানা লাখ লাখ বাঙ্গালী নর-নারী আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ এ বইটি উৎসর্গ করা হলো। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ-তা'লার নিকট তাঁদের সবার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি।

ভূমিকা

আমি ভাগ্যচক্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাই। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনা আমার স্ত্রী। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে হাসিনাকে দলের প্রধান (সভাপতি) নির্বাচিত করে এবং সেই থেকে এখন পর্যন্ত তিনি উক্ত দলের সভানেত্রী হিসেবে দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে, নানান বিষয়ে আমাকে বিদেশী নাগরিকসহ দেশের বিভিন্ন মহল ও পেশাজীবী, নানান ব্যক্তির, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে, তরুণ সমাজের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনও হতে হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই তরুণ সমাজের অধিকাংশই হলো তারা, যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ছিল অবুঝ শিশু ও কিশোর-কিশোরী এবং যাদের জন্ম হয়েছে ১৯৭১ সালের পর। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালীন সময়ে অবশ্য আমাকে এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু ঐ সময়ে পেশাগত, সামাজিক অথবা অন্য যে কোন অনুষ্ঠানে, সভায় কিংবা ব্যক্তিগত অথবা দাপ্তরিক কার্যোপলক্ষে কোন অফিসে গেলে যখন কোন উৎসুক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আমার পরিচয় পেয়েছেন তখন তিনি আগ্রহভরে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন। তবে আমার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জানার তরুণ সমাজের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ বলে মনে করি।

আমার পেশাগত ও পারিবারিক বিষয় ছাড়াও, দেশের অতীত ও সমকালীন অনেক রাজনৈতিক ঘটনা এবং দেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমার মতামত চাওয়া হয়েছে। সবাই সর্বপ্রথম আমার কাছ থেকে যে বিষয়টি জানতে চান তা হলো, ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কি-না, সে সময় তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল কি-না এবং সর্বোপরি, বিয়ের আগে হাসিনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কি-না, কিভাবে ও কোন্ পরিস্থিতিতে হাসিনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, ইত্যাদি। এ ছাড়াও, ১৯৬৬ সালে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফার রাজনৈতিক দাবির প্রতি এ দেশের জনগণ অভূতপূর্বভাবে সমর্থন জানালে তা দমন করার জন্যে তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী, বিশেষ করে তাঁর নিজের ও পরিবারের ওপর যে অবর্ণনীয় হয়রানি, নিবর্তন ও নির্যাতনমূলক তৎপরতা চালায়, সে সম্পর্কেও আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাওয়া হয়েছে। তরুণ সমাজ বিশেষ করে জানতে চেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার সংগ্রাম, ১৯৬৯ সালে সংঘটিত ৬-দফা ও ছাত্র সমাজের ১১-দফার সমর্থনে গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর

নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথমে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এবং তৎপরবর্তীতে নয় মাসের মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধের নেপথ্য কাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবার-পরিজন কোথায় এবং কি অবস্থায় ছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদিও আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। আরও পরিলক্ষিত হয় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে দেশী ও বিদেশী কতিপয় ব্যক্তি, মহল ও শক্তির জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রশাসনিক, সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় অবকাঠামো গঠনসহ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-মূল্যবোধ বাস্তবায়নে যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে তিনি কি ধরনের বাধাবিপত্তি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সমস্ত বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি ও বিবরণ বর্তমান প্রজন্ম জানতে চায়।

আরও পরিলক্ষিত হয় যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে সংঘটিত জাতির ইতিহাসে জঘন্যতম ও কলংকজনক ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় কন্যা রেহানা এবং হাসিনা ও আমাদের দুই শিশু সন্তানসহ আমি কোথায় ছিলাম, তৎপরবর্তী সময়ে আমরা কোথায় আশ্রয় নিই, সেখানে সুদীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর আমরা কিভাবে ছিলাম, কেমন ছিলাম, কি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সময় কাটিয়েছি, ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য দেশবাসী সঙ্গত কারণেই উৎসুক। এতদ্ব্যতীত, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর জাতির ইতিহাসে আরও যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে এবং মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থপরিপন্থী পদক্ষেপ গৃহীত হয় সে সম্পর্কে আমার কি ধারণা ও মতামত তা জানার জন্য দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করেন। একজন অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে আমার ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে আমি এ সমস্ত বিষয়ে আমার জানা কিছু কিছু তথ্য ও আমার মতামত ব্যক্ত করেছি।

পরবর্তীতে, দেশের কতিপয় ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক আমাকে পরামর্শ দেন যে, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত ও মহান রাজনৈতিক নেতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রথমে একজন স্নেহভাজন ছাত্রনেতা এবং পরবর্তীকালে তাঁর জামাতা হিসেবে অতি কাছে থেকে আমি তাঁর পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখেছি এবং যে সমস্ত ঘটনার সাথে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, জাতির, বিশেষ করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবগতির জন্য তা যেন আমি একটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। এই দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে ১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে প্রথম পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী এবং দেশের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক সিদ্দিকুর রহমান। আমি তখন তাঁর প্রস্তাবে সম্মতও হয়েছিলাম। কিন্তু তখন অফিসের কাজকর্ম ছাড়াও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের পদার্থ, ফলিত পদার্থ, রসায়ন ও প্রকৌশল বিষয়ের ছাত্রদের জন্য লিখিত "Fundamentals of Thermodynamics" শিরোনামে ছয়শত পৃষ্ঠার একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে প্রস্তাবিত পুস্তক রচনায় হাত দেয়া সম্ভব হয়নি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব পরবর্তীতে প্রস্তাব দেন যে, আমার বক্তব্য ও তথ্য টেপ করে নিয়ে তিনি নিজেই সে বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন। কিন্তু আমার উল্লেখিত ব্যস্ততার জন্য তখন তাও সম্ভব হয়নি। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে আমার উপরোল্লিখিত পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনার কাজ যখন শেষ হয়, তিনি তখন তাঁর চাকুরীর নতুন কর্মস্থান রাজশাহীতে বদলি হয়ে যান। ফলে, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়।

এ সকল ঘটনার পর আরও দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু নানান পেশাগত, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার দরুন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইত্যবসরে, দেশে, হত্যা ও ক্যু'র রাজনীতির পথ চিরতরে বন্ধ করে প্রকৃত গণতন্ত্র, জনপ্রতিনিধিত্ব ও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার ও শাসন ব্যবস্থা, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সুদীর্ঘ প্রায় আট বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে স্বৈরশাসনের পতন হলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকার গঠিত হয়। সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় সরকারের অধীনে ১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের অধীনে দেশে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচিত হবে, মানুষের মৌলিক অধিকার সুরক্ষণ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে, দেশের ইতিহাস সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে রচিত হবে ও তা নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং সর্বোপরি, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এই আশা নিয়ে আমি ১৯৯১-এর মার্চ মাসের মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত গ্রন্থ রচনা শুরু করি। অতঃপর, মে মাসের মধ্যেই এর প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ লেখা সম্পন্ন হয়। আমার বর্ণনা শুনে সেগুলো লেখায় তখন সাহায্য করে হাসিনার অতি পরিচিত ও অনুরাগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী সামসুন্নাহার ফেরদৌস শিখা। এরপর, তার পরীক্ষা এবং আমার পেশাগত ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে বইটির লেখার কাজ চার-পাঁচ মাস স্থগিত রেখে এটির পরবর্তী অংশ আমি নিজেই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যাহোক, এই গ্রন্থটি লেখার সূচনা ও গোড়াতে আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়া ও সাহায্য করার জন্য আমি শিখার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। পরবর্তীতে, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-এর জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ আমার লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের আগাম আগ্রহ প্রকাশ করলে এ ব্যাপারে আমি আরও অনুপ্রাণিত হই।

এ কথা বলা বোধ করি অত্যুক্তি হবে না যে, ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের গোটা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং পরবর্তীকালের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ও তাঁর জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাই, জাতির ইতিহাস, তথা জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় রেখে, বিশেষ করে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অব-গতির জন্য ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া ও তাঁর সংস্পর্শে আসার সময় থেকে জাতির ইতিহাসে জঘন্যতম ও কলংকময় ঘটনার মধ্যদিয়ে তিনি সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত তাঁর পরিবারে ঘটা অনেক ঘটনা, তাঁর জীবনের বহু রাজনৈতিক ঘটনা ও কর্মকাণ্ড এবং তাঁর পরবর্তীকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকেও তাঁর জীবনের রাজ-নৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ এই গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে আরও অনেক ঘটনার বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতএব, এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি পাঠকের কিছু উপকার হয়, তাহলে আমি আমার এই প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো এবং নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এই লেখাটি ১৯৯২ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে একদিন অন্তর করে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত দৈনিক 'আজকের কাগজে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রকাশনার সম্মতি প্রদানের

জন্য 'আজকের কাগজের' সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ এবং সে সময়কালে প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহভরে তদারকি করার জন্য পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক কাজী শওকত হাসানকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়াও, পত্রিকাটির অন্য যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকায় প্রকাশনাকালে অনেক সহৃদয় পাঠক আমার লেখাটির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং লেখায় উল্লেখিত কিছুকিছু ব্যক্তির সঠিক নাম, কিছু ঘটনার সঠিক তারিখ ও স্থান সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। এরজন্য আমি তাদের সবাইকে সর্বান্তকরণে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পাঠকের মতামত বিবেচনায় রেখে 'আজকের কাগজে' প্রকাশিত লেখাটির প্রয়োজনীয় সংশোধন, কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। এর পরেও যদি এই গ্রন্থে কোন তথ্যগত ভ্রম বা ত্রুটি কোন পাঠকের নজরে আসে, তাহলে সে ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলে আমি তার জন্য বাধিত হবো। এ জাতীয় ভ্রম বা ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

এই গ্রন্থে উল্লেখিত অনেক ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 'দৈনিক ইত্তেফাক', বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কয়েকটি পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা এবং এই গ্রন্থের 'সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিতে' উল্লেখিত গ্রন্থগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রয়োজনীয় পুরোনো সংখ্যাগুলোর কপি আমাকে সরবরাহ করার জন্য পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সৈয়দ তোশাররফ আলী ও রেফারেন্স এডিটর জনাব নোমানুল হককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করার অনুমতি এবং উক্ত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকার সংশ্লিষ্ট অংশের ফটোকপি আমাকে সরবরাহ করার জন্য আমি একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর এম. হারুনুর রশীদ ও গ্রন্থাগারিক আমিরুল মোমেনীনকে ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থে প্রকাশনার জন্য বেশ কয়েকটি মূল্যবান আলোকচিত্রের কপি দেশের অন্যতম প্রখ্যাত শিল্পী জনাব কালাম মাহমুদ, সাপ্তাহিক 'বাংলাবার্তা' সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান, দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমস'-এর চীপ ফটোগ্রাফার আলহাজ্ব মোহাম্মদ জহিরুল হক, দৈনিক 'ইত্তেফাকের' সিনিয়র ফটোজার্ণালিস্ট রশীদ তালুকদার এবং প্রখ্যাত কলামিস্ট ও লেখক এম. আর. আখতার মুকুল তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে সরবরাহ করেছেন। এর জন্য তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থের প্রকাশনার জন্য আমাকে কয়েকটি মূল্যবান আলোকচিত্রের কপি সরবরাহ করার জন্যে দৈনিক 'বাংলার বাণীর' সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও চীফ ফটোগ্রাফার স্বপন সরকারকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যত্ন সহকারে টাইপ করে দেয়ার জন্য আমি আমার অফিসের গ্রন্থাগার শাখার তত্ত্বাবধায়ক আবু ফয়েজ ভূঁইয়া ও আমার দফতরের স্টেনোগ্রাফার মোহাম্মদ হাসান শহীদকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯২ ড: এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯৬১–১৯৬২ সাল

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম আমি বিশেষভাবে জেনেছি ১৯৫২ সালে। তখন আমি রংপুর সরকারী বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করে পীরগঞ্জ উপজেলায় (তৎকালীন থানা) অবস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রথম তাঁর সম্পর্কে কিছু কিছু জানতে পারি। পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেখানকার দুই যুবক যাঁরা তখন কলেজে পড়তেন, তাঁরা মাঝে মাঝে পীরগঞ্জ বেড়াতে এলে শেখ মুজিব সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেন। ঐ দু'জনের একজন কাজী আব্দুল হালিম ও অপরজন এম. মতিউর রহমান। পরবর্তীতে কাজী আব্দুল হালিম পীরগঞ্জ উপজেলার বহু বছর ন্যাপের সভাপতি ছিলেন এবং মতিউর রহমান পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িত হন ও জুলাই ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হন।

২। আমি ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে রংপুর জিলা স্কুলে ভর্তি হই। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকতাম। রংপুর জেলায় জিলা স্কুল (Zilla School) ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ ভবন দু'টি অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ভবন ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। আমাদের বিদ্যালয়টি প্রায় ষাট–সত্তর একর জমির মাঝখানে অবস্থিত। এর সামনে বাগান, তারপর দু'টি ফুটবল ও একটি হকি খেলার মাঠ। এরপর প্রধান প্রবেশ পথ। মাঠটি চওড়া প্রায় আধা কিলোমিটার। আমাদের স্কুল গ্রাউন্ডের পূর্ব পাশে অবস্থিত সরকারী ট্রেজারী, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের দফতর, জেলা প্রশাসকের দফতর ও ফৌজদারী কোর্ট ভবন। ১৯৫২ সাল ছিল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বছর। কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররাই বেশীর ভাগ ঐ সময় আন্দোলনে জড়িত ছিলো। স্কুলগুলোতে, বিশেষ করে রংপুর (Zilla School)-এর ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ জড়িত ছিলো না। কোনদিন হরতালও হয়নি। তবে দু'একদিন কিছু যুবককে দেখতাম বিদ্যালয়ের প্রধান গেটে হরতালের সময় দাঁড়িয়ে থাকতে, কিন্তু তাঁরা স্কুলে প্রবেশ করতেন না বলে লেখাপড়া বিঘ্নিত হতো না।

৩। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরের দিকে একদিন লক্ষ্য করি ফৌজদারী কোর্ট থেকে পুলিশ একটি যুবককে হাতকড়া লাগিয়ে আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণের পায়ে হাঁটার পথে জেলখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রংপুর জেলখানা আমাদের বিদ্যালয় থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। কাছে গিয়ে দেখি এই যুবক পীরগঞ্জের সেই কাজী আব্দুল হালিম। দেখে আমার কান্না পেলো এই ভেবে যে, স্বাধীন দেশে একটি কলেজের ছাত্রকে হাতকড়া লাগিয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, পুলিশ কি তাঁকে অন্তত রিক্সায় নিয়ে যেতে পারতো না? স্বাধীন দেশের একটি কলেজের ছাত্রের প্রতি এই অশোভন আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হই। পরবর্তীতে তাঁর পীরগঞ্জের বাড়ীতে গেলে আমি এই ঘটনা তাঁকে প্রায়ই বলতাম। তিনি সে ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতেন, "ছোট ভাই, এই অপমান তো কিছুই নয়। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণের বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বাংলার মানুষের ওপর আরও কত অপমান ও নির্যাতন নেমে আসবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।" তিনি ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শেখ মুজিবের অবদান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছু বলতেন।

৪। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পাস করার পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করিনি। ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর রাজশাহী সরকারী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই এবং দু'বছর পড়াশুনা করি। আমি ক্লাসে প্রথম হতাম বলে আমার সহপাঠীরা আমাকে ভীষণ ভালবাসতো ও শিক্ষকরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কলেজে রাজনীতি নিয়ে কোন কথাবার্তা শুনিনি এবং হরতালও হতে দেখিনি। তবে স্নাতক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতো এবং কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনে গ্রুপ অথবা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হতো। আমরা ইন্টারমিডিয়েট স্তরের ছেলেমেয়েরা একটি ডিবেটিং ক্লাব পরিচালনা করতাম এবং মাসে অন্তত দু'টি বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। একবারের নির্বাচনের কথা মনে পড়ে। ঐ সময় স্নাতক স্তরের যুবক আনোয়ার জাহিদ কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি পদের প্রার্থী হিসেবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল রক্তমাখা ব্যান্ডেজ এবং তিনি তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক বিষয় প্রসঙ্গে অনেক কথাবার্তা বললেন এবং শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ নেতাদের জাতীয় আন্দোলন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করলেন। এই আনোয়ার জাহিদ পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

৫। ১৯৫৮ সালে Intermediate Science কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে Physics- এর অনার্স ক্লাশে ভর্তি হই এবং তৎকালীন

ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে স্থান পাই। তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির কর্মকান্ড সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ ছিলো না এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্র বা অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম না। স্মর্তব্য যে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। শেখ মুজিবসহ অনেক রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছিলো। কাজেই ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্তিমিত ছিলো। ১৯৬০-এর শেষের দিকে শোনা যায় যে, জেনারেল আইয়ুব খান Basic Democracy নামে রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঐ Basic Democracy-এর আওতায় কেবল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। আইয়ুব খানের ঐ অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তুতির খবর শুনে আমার বিবেক প্রতিবাদ করে ওঠে এবং তার ফলে আমি ছাত্র রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। অতঃপর ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমি ছাত্রলীগে যোগদান করি।

৬। তৎকালীন আইয়ুব খানের সামরিক সরকার ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসের দিকে ছাত্র রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে। যুগপৎ বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোর ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়। তখন ফজলুল হক হলটি ছিলো ছাত্র ইউনিয়নের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক) ছিলো ছাত্র ইউনিয়নের ঘাঁটি। এস এম হলটি ছিলো জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। তখন বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের বেশ সমর্থক থাকলেও কোন হলেই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো না। ১৯৬০-এর অক্টোবর মাসের দিকে ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথভাবে নির্বাচন করার জল্পনা-কল্পনা চলছিলো। ঢাকা হল ও ইকবাল হলেও অনুরূপ চেষ্টা চালানো হয়েছিলো বলে আমি শুনেছিলাম। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন ফজলুল হক হলের একটি রুমে হলের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের একটি যৌথ সভা আয়োজন করা হয়। ফজলুল হক মুসলিম হলের আমার বিশিষ্ট ও অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আবদুর রব উক্ত সভায় আমাকে উপস্থিত থাকতে বলে। আমি যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হই এবং দেখি ছাত্রলীগের কিংবা ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতারা অনুপস্থিত। ফজলুল হক হলের ছাত্রলীগের একজন বিশিষ্ট সমর্থক ও অর্থনীতির এম. এ. ক্লাসের শেষ বর্ষের ছাত্র জনাব মীর্জা আজিজকে সভাপতি করে সভার কার্য যথাসময়ে শুরু হয়। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এম. এ. শেষ বর্ষের ও এবং মীর্জা আজিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব এরশাদুল হক মোল্লা এবং ইংরেজী ৩য় বর্ষের ছাত্র ও আমার সমসাময়িক জনাব আনোয়ার আনসারী খান উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। ছাত্র ফেডারেশনের বক্তারা সবাই জনাব হোসেন সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দর্শন ও আদর্শের প্রতি সমর্থন জানায়। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমার সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবদুর রব, জনাব ইসহাক তালুকদার ও সিরাজুল আলম খান এবং প্রথম বর্ষের আবদুর রাজ্জাক ও শহিদুল হক মুন্সী উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন। এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশন যৌথভাবে ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এতদুদ্দেশ্যে এরশাদুল হক মোল্লাকে সভাপতি, আমাকে কোষাধ্যক্ষ এবং আবদুর রবকে সেক্রেটারী করে একটি সাত-সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনী সাংগঠনিক ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে হলের নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়ন করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। নির্বাচনী কমিটি জনাব মীর্জা আজিজকে ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতির প্রার্থী এবং আরও দশ জনকে অন্যান্য পদের প্রার্থী মনোনীত করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্যানেল প্রস্তুত ও অনুমোদন করে। নির্বাচন প্রচার অভিযানে আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক বেসিক ডেমোক্রেসির বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। উক্ত ছাত্র নির্বাচনে একমাত্র ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্যানেল সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হয়।

৭। ১৯৬১ সালের জুলাই মাসের দিকে জেনারেল আইয়ুব খান বেসিক ডেমোক্রেটিক রাজনৈতিক পদ্ধতির রূপরেখা প্রকাশ করেন। তখন আমার সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আবদুর রব, জনাব ইসহাক তালুকদার, জনাব এনায়েতুর রহমান এবং আমি বিকেলে রমনা পার্কে বেড়াতে গিয়ে একান্ত জনশূন্য জায়গায় বসে আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির দোষত্রুটি, অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং স্বৈরাচারী দিকগুলো নিয়ে আলাপ করতাম। একদিন সাব্যস্ত করা হয় যে, ফজলুল হক মুসলিম হলের পরবর্তী ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ এককভাবে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এও সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাকে সহ-সভাপতির এবং জনাব আবদুর রবকে সাধারণ সম্পাদকের প্রার্থী হতে হবে। আমি প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করিনি। আমি পক্ষান্তরে ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের তৎকালীন সহ-সভাপতি মীর্জা আজিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে সহ-সভাপতির পদে মনোনয়ন দানের জন্য সুপারিশ করি। কিন্তু আমার উপরোল্লিখিত ছাত্রলীগের বন্ধুগণ আমার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। আমার প্রস্তাবের বিরোধিতার কারণ হিসেবে তারা আমাকে জানায় যে, জনাব এরশাদুল হক মোল্লা গোপনে তৎকালীন ইসলামিক ছাত্র সংসদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তারা আরও বলে যে, জনাব এরশাদুল হক মোল্লা আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির প্রতি সমর্থন জানাবে এবং জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের রাজনীতির বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করবে। সুতরাং জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে সহ-সভাপতির প্রার্থী হিসেবে

মনোনয়ন দিলে এবং সে ছাত্র নির্বাচনে জয়ী হলে ছাত্রলীগের বিশ্বাসযোগ্যতার চরম ক্ষতি হবে। এই বক্তব্য শোনার পর আমি আমার বন্ধুদের মতের সঙ্গে একমত হই।

৮। ইতোমধ্যে জনাব এরশাদুল হক মোল্লা এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন এবং ফজলুল হক মুসলিম হলের দোতলায় একটি সিংগেল কক্ষ তার নামে বরাদ্দ করা হয়। এ ছাড়াও মীর্জা আজিজ এরশাদুল হক মোল্লাকে ছাত্রাবাসের ১৯৬০-৬১ সালের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ছাত্রাবাসের নির্বাচনী অনুষ্ঠানের কয়েক মাস পূর্বেই জনাব এরশাদুল হক মোল্লা হলের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে সমর্থ হন এবং হলের নতুন ছাত্রদের ও তাঁর বিশিষ্ট সমর্থকদের উক্ত ম্যাগাজিন বিতরণ করাও শুরু করেন। ফজলুল হক হলের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করার পর হলের ছাত্রলীগের একটি সভায় জনাব আবদুর রবকে সভাপতি এবং জনাব ইসহাক তালুকদারকে সেক্রেটারী করে একটি সাত সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনী সাংগঠনিক ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় এও সিদ্ধান্ত হয় যে, আসন্ন ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতির প্রার্থী হতে হবে। অন্য দশজন ছাত্রলীগ প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে নির্বাচনী কমিটি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার দেখা বা আলাপ হয়নি। উক্ত নির্বাচনে ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়ন তিনটি পৃথক প্যানেল প্রদান করে। আল্লাহর রহমতে ছাত্রলীগ থেকে আমি সহ-সভাপতি, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব নূরুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক ও আরো পাঁচজন ছাত্র সংসদের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জনাব আবদুর রাজ্জাক ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মাত্র একজন ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্র ফেডারেশন এ্যাথলেটিক ও সহ-এ্যাথলেটিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে জনাব ইকবাল বাহার চৌধুরীসহ মোট তিনটি আসনে বিজয়ী হয়। DUCSU-এর প্রতিনিধি হিসেবে ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্রলীগের তিন জন বিজয়ী হন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রসায়ন বিভাগের এম. এসসি. ক্লাশের জনাব এনায়েতুর রহমান। অপরপক্ষে ছাত্র ফেডারেশনের মাত্র একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই আমি জানতে পারি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জনাব এরশাদুল হক মোল্লা তাঁর হল কক্ষে চলে গেছেন এবং তাঁর সঙ্গে আনোয়ার আনসারী খান রয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি জনাব এরশাদুল হক মোল্লার কক্ষে চলে যাই এবং তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখি। আমি তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ করে ছাত্রদের সামনে নিয়ে আসি এবং আমার পাশে রেখে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিই। ভাষণে আমি বলি যে, ছাত্র নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন ও ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হওয়ার জন্য হলের ছাত্রদের ধন্যবাদ জানাই এবং হল সংসদের

দায়িত্ব পালনে দল-শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা কামনা করি এবং নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য হল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাই। আমি আরও বলি যে, জনাব এরশাদুল হক মোল্লাকে আমি চিরদিন আমার শুভাকাংক্ষী হিসেবে দেখেছি এবং বড় ভাই বলে সম্বোধন করেছি। তিনি ভবিষ্যতেও আমার বড় ভাই হিসেবে থাকবেন এবং শ্রদ্ধা পাবেন। তিনি যে আমার দায়িত্ব পালনে বড় ভাই হিসেবে আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। উক্ত সভার দুই তিন ঘণ্টা পর তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি এবং ঢাকা হলে ছাত্রলীগের বিজয়ী সহ-সভাপতি জনাব নাসিমুদ্দিন আমাদের হলে এসে আমাকে ও ছাত্রলীগের বিজয়ী অন্যান্যকে অভিনন্দন জানান। এরপর সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ণ প্যানেল বিজয়ী ও অন্যান্য ছাত্রকে নিয়ে তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আবুল হাসনাত আমার হলে আসেন। আমি আমার হলের ছাত্রদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের নব নির্বাচিত সহ-সভাপতি জনাব খোরশেদ হামিদ ও তাঁর সহকর্মীদের এবং আমার হলের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাই ও সাফল্য কামনা করি। সেই যুগ বলে এই জাতীয় ঘটনা সম্ভব হয়েছিলো, বর্তমান যুগে যা অকল্পনীয়।

৯। উল্লেখ্য যে, সে যুগে ছাত্র সংগঠনগুলো কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক-অনুসারী হলেও তারা ছাত্র নির্বাচনের সময় ছাত্র সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা তুলে খরচ মেটাতো। ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্রলীগের নির্বাচনের সময় নির্বাচন প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়ন তাদের স্ব স্ব দলের নির্বাচনী ইশতেহার, প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্ত ছাপিয়ে হলের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ শুরু করে। অর্থের অভাবে আমরা ছাত্রলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ও প্রার্থীদের জীবন বৃত্তান্তের কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারিনি। বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে একদিন সকাল বেলা আমি আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে আমাদের হাউস টিউটর, রসায়নের সহকারী অধ্যাপক জনাব নূরুল হক ভূঞার নিকট যাই এবং আমাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করে তাঁর নিকট ৩০০ টাকা ধার চাই। বিষয়টি নাজুক বিধায় তিনি আমাদের ৩০০ টাকা ব্যক্তিগত ধার দিয়ে বলেন যেন আমরা বিষয়টি গোপন রাখি। এ সাহায্যের জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হতো তখনই তা উল্লেখ করতাম। পরবর্তীতে আমি আমার ব্যক্তিগত বৃত্তির টাকা থেকে ঐ ঋণ পরিশোধ করি।

১০। হলগুলোর নির্বাচন শেষে ডাকসুর কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিডিউল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, সে সময় ডাকসুর নির্বাচন হতো হলগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের ভিত্তিতে। ডাকসুর সংসদ পরিষদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন জোট পেয়েছিলো, একজন বাদে, সকল সদস্যের অর্ধেক এবং ছাত্র

ফেডারেশন পেয়েছিলো অনুরূপ সংখ্যক প্রতিনিধি। রোকেয়া হল থেকে ছাত্রশক্তির একজন মহিলা ডাকসুর ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডাকসুর নির্বাচন উপলক্ষে তখন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের, কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের, কেন্দ্রীয় ছাত্র ফেডারেশনের নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিলো। আমাকে ইতোপূর্বে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছিলো, কিন্তু আমি পড়াশুনা ও হলের কার্যক্রমে ব্যস্ততার কারণে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কোন সভাতে যোগদান করতে পারতাম না। আমার হলের পক্ষ থেকে জনাব আবদুর রব ও আবদুর রাজ্জাক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রায় সব সভায় যোগদান করতো এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে আমাকে সব সময় অবহিত করতো। ডাকসু নির্বাচনের তারিখের দু'দিন আগে আবদুর রব ও আবদুর রাজ্জাক আমাকে জানায় যে, শেখ মুজিবের পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে ডাকসু নির্বাচনে প্যানেল দেবে এবং আমার হলের জনাব এনায়েতুর রহমানকে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জনাব রফিকুল ইসলামকে ডাকসুর সহ-সভাপতি হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিলো যে, আমি যেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সমসাময়িক ও বন্ধু জনাব মাহবুবুর রহমানকে (পরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের মন্ত্রী) নিয়ে নির্বাচনের আগের দিন সকালে ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবুল হাসনাতের সঙ্গে আলাপ করতে যাই এবং তাঁদের সঙ্গে ছাত্রলীগের যৌথ প্যানেল দেয়া সম্ভব কি না তৎসম্পর্কে জনাব হাসনাতের সঠিক অবস্থান জেনে আসি। জনাব মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে এই প্রথম আমার পরিচয় হয়। পরের দিন সকাল দশটায় ভাইস চ্যান্সেলরের আবাসিক অফিসে ডাকসুর নির্বাচন আয়োজন করা হয়েছিলো। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জানতে পারি যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল এবং ফেডারেশনের প্যানেল নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড: মাহমুদ হোসেন সভাপতির (Casting) ভোট দিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেলের প্রার্থীদেরকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। রোকেয়া হলের ছাত্রশক্তি থেকে নির্বাচিত মহিলাটি সেদিন ভোট দিতে যাননি। তাই আজও কৌতূহল বোধ করি যে, যদি তিনি ঐ দিনে ভোট দিতেন তা হলে ফলাফলটা কেমন দাঁড়াতো!

১১। এরপর আমরা হলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এবং এটাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের গুরুত্বের ওপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করি। উক্ত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি তাঁর প্রধান অতিথির ভাষণে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে তাঁর নিজের এবং শেখ মুজিবসহ অন্যান্য ছাত্রনেতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর বাংলা ভাষার মান ও উৎকর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যেমন স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজীর তুলনা করে তিনি অনেক কথা বলেন। এর কিছুকাল পর

আমরা তৎকালীন ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করি। উক্ত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি অসুস্থতার কারণে সভায় সময় মতো উপস্থিত হতে পারেন নি। সভায় বিভিন্ন বক্তা ফজলুল হক মুসলিম হলের অতীতের অনেক ঐতিহ্য ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করেন এবং এই হলের নামকরণের কাহিনীও উল্লেখ করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ফজলুল হক মুসলিম হলের নাম শুধু ফজলুল হক হল রাখা হবে। সভার শেষের দিকে জনাব ফজলুল হক সাহেব আমাদের হলে এলে আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যাই এবং তাঁকে এই নতুন নামকরণের কথা জানাই। তিনি আমাদের নতুন নামকরণের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। জীবনে এই প্রথম শ্রদ্ধেয় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে।

১২। ইতোমধ্যে জেনারেল আইয়ুব খান বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ বছর একমাত্র ফজলুল হক মুসলিম হলে ছাত্রলীগ হল সংসদের দায়িত্বে নিয়োজিত। ঢাকা হলের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ প্যানেলের ছাত্র কর্মকর্তারা হল সংসদের কার্য পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলো। জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল এবং তৎকালীন ইকবাল হলে ছিলো ছাত্র ইউনিয়নের প্রবল আধিপত্য। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে ছিলো ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ণ আধিপত্য। জেনারেল আইয়ুব খান প্রদত্ত বেসিক ডেমোক্রেটিক পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন নেয়ার জন্য যে গণভোট নেয়ার আয়োজন করার প্রস্তুতি চলছিলো তার বিরোধিতা করার জন্য ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। আমাদের হলেও এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ঘন ঘন সভার আয়োজন চলছিলো। জনাব আবদুর রব, জনাব ইসহাক তালুকদার, জনাব এনায়েতুর রহমান, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব শহিদুল হক মুন্সী এবং আমি স্বয়ং এ সমস্ত সভায় জোরালো বক্তব্য রাখতাম। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মণির নেতৃত্বে আগামসি লেনে শাহ মোয়াজ্জেমের মেসে আলোচনা চলতো। আমিও মাঝে মধ্যে সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতাম। আমি প্রতি সভায় যেতে পারতাম না। কারণ ঐ সময় আমাকে ফজলুল হক হলের বার্ষিক ডিনার ও লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

১৩। আমার সময়ে ফজলুল হক হলের বার্ষিক ডিনারের তারিখ ধার্য করা ছিলো ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬২ সাল। ঐ সময় ঢাকায় পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন চলতে থাকার সুযোগে আমরা হলের প্রভোস্টের সম্মতিক্রমে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে উক্ত বার্ষিক ডিনার উৎসবে প্রধান অতিথি নির্বাচিত করেছিলাম। সেদিন রাত ৮টায় হলের প্রভোস্টের গাড়ী নিয়ে জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে হলে আনার জন্য আমি ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সার্কিট হাউসে যাই। হলে পৌঁছালে হলের প্রভোস্ট জনাব সফিউল্লা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। যখন জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে নিয়ে ডাইনিং হলের

দিকে যাচ্ছিলাম তখন ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান আমাকে ডেকে বলে, "আজ বিকালের খবরের কাগজে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে করাচী জেলে নিয়ে যাওয়ার খবর বেরিয়েছে। সুতরাং ডিনারোত্তর বক্তৃতায় তোমাকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র উত্তরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখতে হবে।" সে আমাকে এও বলে যে, ঐদিন রাত ১২টায় ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে ছাত্রলীগ হল ইউনিট-এর নেতৃস্থানীয় নেতাদের সভার আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মনি উপস্থিত থাকবেন। আমি ডিনারোত্তর বক্তৃতায় সামরিক শাসনের দোষত্রুটি এবং তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা ও সার্বজনীন. গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলনের কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখি এবং কর্নেলিয়াসের কাছে এতদসম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দেয়ার অনুরোধ জানাই। আমি শ্রদ্ধেয় জননেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তির দাবীও জানাই। কিন্তু প্রধান অতিথি জাস্টিস কর্নেলিয়াস এ বিষয়ে কোন বক্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। সেদিন জাস্টিস কর্নেলিয়াসকে সার্কিট হাউসে পৌঁছে দিয়ে হলে ফিরে এসে আমাকে ডিনারের কার্যাবলী শেষ করার জন্য সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। অতঃপর আমার হলের ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে রাত্রি ১২ টায় প্রস্তাবিত সভা আয়োজনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করি। সভা আয়োজনের ব্যাপারে সবাই একমত হয়।

১৪। ঐ দিন রাত সাড়ে বারটায় হল সংসদ সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে মিলিত হই। জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রস্তাব ও শেখ ফজলুল হক মনির সমর্থনে আমাকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে হয়। সভায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি ছাড়াও আবদুর রব, এনায়েতুর রহমান, ইসহাক তালুকদার, নূরুজ্জামান, আবদুর রাজ্জাক ও শহিদুল হক মুন্সী উপস্থিত ছিলেন। প্রথম শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও তারপর ফজলুল হক মণি বক্তব্য রাখেন। তাঁরা দুজনেই সভায় বলেন যে, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সামরিক শাসনের আওতায় গ্রেফতার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন থেকে সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন শুরু করার জন্য ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিব অনুরোধ জানিয়েছেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য ছাত্রনেতাও শেখ মুজিবের উক্ত প্রস্তাবের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করে। সভার সভাপতি হিসেবে সর্বশেষে আমি ছাত্র আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের অবস্থান ও মতামত সম্পর্কে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মনির কাছ থেকে জানতে চাই। তাঁরা দুজনেই বলেন যে, তৎবিষয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁদের ইতোপূর্বেই অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁদের ধারণা, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীবৃন্দ আমাদের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরা

আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন নাও জানাতে পারে। তবে আমাদের আন্দোলনে হয়তো বাধা দেবে না। অতঃপর পরদিন সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট শুরু করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান অনুষদ, ফজলুল হক হল ও ঢাকা হল এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয় আবদুর রব, এনায়েতুর রহমান, ইসহাক তালুকদার, সিরাজুল আলম খান, নাসিম আহমেদ ও আমাকে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, আতিয়ার রহমান, আবদুর রাজ্জাক ও শহিদুল হক মুন্সীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের দায়িত্ব দেয়া হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখার জন্য সভায় উপস্থিত সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

১৫। পরদিন সকাল থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট শুরু করি। ধর্মঘটটি হঠাৎ শুরু হওয়ায় কিছু কিছু ছাত্রকে আমরা অপ্রস্তুত দেখি, কিন্তু সকাল ১১টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। বিজ্ঞান অনুষদের দায়িত্বে যাঁদের থাকার কথা ছিলো তাঁদের মধ্য থেকে একমাত্র ইসহাক তালুকদার ছাড়া অন্য কাউকেই আশেপাশে দেখলাম না। ইতিমধ্যেই পুলিশ বাহিনী ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের লোকজন ট্রাকে ট্রাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসে এবং বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নেয়। বেলা প্রায় ১১টার দিকে E.P.R.T.C-এর একটি ফাঁকা বাস কার্জন হলের সম্মুখে আসে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র ঐ বাসটিকে থামিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাসের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, কিন্তু কার্জন হলের সামনের রাস্তার দুই কোণে অবস্থানরত E.P.R. বাহিনীর জোয়ানগণ ও পুলিশ বাহিনীর লোকজন বিপুল সংখ্যক ছাত্রের উপস্থিতি দেখে প্রজ্বলিত বাসটির নিকট আসতে ভয় পাচ্ছিলো বলে মনে হলো। প্রায় একটার দিকে দমকল বাহিনীর একটি গাড়ী অকুস্থলে উপস্থিত হয়। কিন্তু ইতোপূর্বেই বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিলো। এরপর ছাত্রদের উপস্থিতি আস্তে আস্তে কমতে থাকে। ঐ সুযোগে E.P.R. বাহিনীর কয়েকজন জোয়ান ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন ব্যক্তি আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তার দুই কোণ থেকে ভস্মীভূত বাসটির নিকট আসতে থাকে। উপস্থিত ছাত্ররা তাদের দিকে ইট–পাটকেল ছুঁড়তে থাকে এবং তাদেরকে গালিগালাজ করতে থাকে। এর অব্যবহিত পর ঠিক ঐ সময় পুলিশ বাহিনীর দিক থেকে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাস কার্জন হলের সম্মুখস্থ চত্বরে নিক্ষেপ করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা, ছাত্ররা, কার্জন হলের পেছনে অবস্থান নিই। এইভাবে ছাত্র এবং ইপিআরের জোয়ান ও পুলিশ বাহিনীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ইটপাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। বিকেল প্রায় পাঁচটার দিকে অবস্থা কিছুটা প্রশমিত হলে ছাত্ররা তাদের স্ব স্ব হলে ফিরে যায়।

১৬। পরদিন থেকে আন্দোলন আস্তে আস্তে জোরদার হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, জেনারেল আইয়ুব খান ঐ সময় কেবিনেট মিটিং পরিচালনা করার জন্য তাঁর মন্ত্রী পরিষদসহ ঢাকায়

উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল আজম খান। ছাত্র আন্দোলন আস্তে আস্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং জোরদার হতে থাকে। আন্দোলন শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বিকেল ৬টার দিকে আমার হলে এসে আমাকে বলেন, "ওয়াজেদ, তুমি তো জান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মধ্যে তুমিই একমাত্র ছাত্রলীগের নির্বাচিত সহ-সভাপতি এবং ফজলুল হক হলই হচ্ছে ছাত্রলীগের একমাত্র ঘাঁটি। মুজিব ভাই (ছাত্রলীগের সবাই ও আওয়ামী লীগের প্রায় সবাই শেখ মুজিবকে ভাই বলে সম্বোধন করতো) তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তুমি আমার সঙ্গে আজই চল।" অতঃপর আমরা দুজন রিক্সাযোগে ধানমন্ডি রওয়ানা হই। তখন ধানমন্ডির উত্তরাঞ্চলে বিশেষ কোন বাড়িঘর ছিলো না, সন্ধ্যায় শেয়াল ডাকতো। ধনিমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাড়ীতে মুজিব ভাই আমাদের একটা ছোট্ট বসার ঘরে নিয়ে বলেন, "ওয়াজেদ, তুমি ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। ছাত্র আন্দোলন এখন চরম পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মণি যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারে। সুতরাং এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখবে।" এরপর আমরা চলে আসি। শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার জীবনে এই প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ।

১৭। ঐ সময়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনে একটি পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষকদের সভায় ভাষণ দেয়ার জন্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আসেন। কিন্তু ছাত্ররা সেই সভা সম্পূর্ণভাবে পণ্ড করে দেয় এবং মঞ্জুর কাদেরকে চরমভাবে নাজেহাল করে। সরকারের শান্তি রক্ষাবাহিনী কোন প্রকারে মঞ্জুর কাদেরকে সভামঞ্চ থেকে বের করে নিচে নিতে থাকে। সিঁড়িতে নামার পথে জিয়া উদ্দিন মাহমুদ, কাজী জাফর আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মণি প্রমুখ ছাত্র-নেতৃবৃন্দ মঞ্জুর কাদেরের গায়ে থুথু দেন। যা হোক, সরকারের শান্তি রক্ষাবাহিনী কোন প্রকারে অপমানে রাগান্বিত মঞ্জুর কাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে নিয়ে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় জেনারেল আইয়ুব খানের নির্দেশে সারা ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে বলে পাকিস্তান রেডিওতে বার বার ঘোষণা দেয়া হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। এই ঘটনার পরের দিন সকাল বেলা পাকিস্তানের পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও বেলুচ রেজিমেন্ট বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা হল, ফজলুল হক হল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘর সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ঢাকাস্থ I. B-এর একজন কর্মকর্তা সকালে আমার হলে আসেন এবং হলের সহ-সভাপতি হিসেবে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে এলে তিনি বলেন যে, তাঁর নাম ইসরাইল। তিনি তাঁর পরিচয়পত্র আমাকে দেখান এবং বলেন যে, তিনি সরকারী নির্দেশে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। অতঃপর তিনি আমাকে হল সংসদের সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে নিয়ে যান

এবং আমার অনুমতিক্রমে আমার অফিস টেবিলের সমস্ত ডয়ার ও অফিস আলমারীতে রাখা সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষা করেন। কোন কিছু না পেয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি হলের যে সিঙ্গল রুমে আমি থাকতাম আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং চৌকি ও তোষকের নীচ ও আমার সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষা করেন। কোন আপত্তিকর কাগজপত্র না পেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, "বাঙ্গালী জাগো" শিরোনামে কোন প্রচারপত্র আমি দেখেছি কি–না। পরে জানতে পারি যে, উক্ত প্রচারপত্র শেখ মুজিবের বাড়ী থেকে প্রচার করা হয়েছিলো।

১৮। এখন ইতোপূর্বে উল্লিখিত হলগুলো ঘেরাওয়ের ঘটনায় ফিরে যাই। আমাদের ঢাকা হল, ফজলুল হক হল ও কার্জন হলের পুরা চত্বর বিপুল সংখ্যক পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জোয়ান সারাক্ষণ ঘিরে রাখে। প্রথম দু'দিন হলের বাজার করার জন্য কোন কর্মচারীকেও হলের বাইরে যেতে দেয়নি। বহু কষ্ট ও চাতুরী করে রাতের অন্ধকারে চত্বরের লোহার রেলিং ডিঙ্গিয়ে হলের কর্মচারীরা কোন রকমে বাজার থেকে খাবার জিনিসপত্র কিনে আনে। হল বন্ধের কারণে ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র রাতের অন্ধকারে হল ছেড়ে চলে যাওয়ায় কোন রকমে তিনদিন কেটে যায়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও হল প্রভোস্টদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাগণ কেবল হলের বাবুর্চিদের বাজার করার অনুমতি দেন। ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলের অবরোধের পঞ্চম দিনে সামরিক বাহিনীর লোকজন ঢাকা হলে ঢুকে বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করে ট্রাকে করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুরও ছিলেন। অবরোধের ষষ্ঠ দিনে সকাল বেলা সামরিক বাহিনীর লোকজন আস্তে আস্তে ফজলুল হক হলে প্রবেশ করে। প্রথম সারিতে ছিলো বেলুচ রেজিমেন্টের লোকজন ও কর্মকর্তা এবং পেছনের সারিতে ছিলো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার ও জোয়ানরা। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বেই আবদুর রব, সিরাজুল আলম খান, ইসহাক তালুকদার, আতিয়ার রহমান, আবদুর রাজ্জাক ও শহিদুল হক মুন্সীসহ অনেক ছাত্র নেতৃবৃন্দ রাতের অন্ধকারে হল ছেড়ে চলে যান। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে এনায়েতুর রহমান অবরোধের পঞ্চম দিন পর্যন্ত হলে উপস্থিত ছিলো। ষষ্ঠ দিনে ভোর রাত্রে এনায়েতুর রহমান আমার কক্ষে এসে বলে, হলের সহ–সভাপতি হিসেবে আমার কোনক্রমেই হল ছাড়া যাবে না। সে রসায়ন বিভাগের ল্যাবোরেটরীতে লুকিয়ে থাকবে এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। অবরোধের ষষ্ঠ দিনে সামরিক বাহিনীর লোকজনেরা সকাল ৮/৯ টার দিকে আমাদের হলে ঢোকে। তাদের সঙ্গে অসামরিক লোকজনও ছিলো। তারা হল গেটে এসে মাইকের মাধ্যমে উচ্চ স্বরে হলের ছাত্রদের হলের ভেতরের চত্বরে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে আহ্বান জানায়। হলে তখন প্রায় ৬০/৭০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিলো। আমরা সবাই নীচে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াই এবং প্রথমে আমি সারির সম্মুখ ভাগে অবস্থান নিই। কিন্তু ছাত্রদের বিশেষ অনুরোধে আমাকে সারির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিতে হয়। এরপর

বেসামরিক বাহিনীর লোকজন প্রত্যেক ছাত্রের পরিচয়পত্র তাদের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। তারা আমার সামনে সমস্ত ছাত্রকে ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে এসে আমার পরিচয়পত্র দেখে আমাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দেয়। আমার পেছনের অন্য ছাত্রদের যখন নিরীক্ষা করা হচ্ছিলো তখন I.B. বিভাগের সেই ইসরাইল আমার কাছে এসে আমাকে কানে কানে বলে, "স্যার, আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনার শেষ নামটি তালিকায় ভুল করে লেখা আছে। সুতরাং আপনাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।" অন্য সমস্ত ছাত্রকে নিরীক্ষা করে ছেড়ে দিয়ে বেসামরিক বিভাগের একজন কর্মকর্তা আমার নিকটে আসে এবং আমার পরিচয়পত্র ও তার তালিকার দিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমাকে আমার কক্ষে চলে যেতে বলে। এরপর তারা হল ছেড়ে চলে যায়। এ সমস্ত ঘটনার পরও ঢাকা হল, কার্জন হল, বিজ্ঞান অনুষদ ও ফজলুল হক হল আরও তিনদিন অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের তৎপরতা ছিলো কিছুটা শিথিল। হল দুটোতে ছাত্র সংখ্যা বেশী কমে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতি অনেকাংশে শান্ত হওয়ায় অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এরপর আমরা জানতে পাই যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বহু নেতা এবং ছাত্রলীগের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মণিসহ অনেককে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

১৯। কলেজগুলো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র না থাকায় আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এম. এ./এম. এসসি.'র অনেক ছাত্রই হলে ফিরে আসে। আবদুর রব, ইসহাক তালুকদার, আবদুর রাজ্জাক ও শহিদুল হক মুন্সীও হলে ফিরে আসে। একদিন সন্ধ্যাবেলা ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট হলে এসে আমাকে ডেকে বললেন, "ওয়াজেদ, তুমি তো মেধাবী ছাত্র। কিছুক্ষণ আগে I.B. -এর একজন কর্মকর্তা আমাকে টেলিফোন করে তুমি হলে উপস্থিত আছ কিনা সে সম্পর্কে জানতে চায়। সুতরাং তুমি এখনই হলে না থেকে অন্যত্র চলে যাও।" আমি তৎক্ষণাৎ ইসহাক তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান শেরাটন হোটেলের পাশে একটি ছাত্র মেসে চলে যাই। সেখানে তিনদিন থাকার পর আমরা দুজন হলে ফিরে আসি। আবার পরদিন হলের প্রভোস্ট এসে আমাকে একই খবর দেন। আমি তখন বাধ্য হয়ে আমার কাপড়চোপড় ও কিছু বইপত্র নিয়ে কয়েক দিনের জন্য পুরনো ঢাকায় একটি ছাত্র মেসে আমার বন্ধু বাদলের কাছে আশ্রয় নিই। পরদিন সংবাদপত্রে দেখি,সরকার ছাত্রলীগের মীর আমির হোসেন চৌধুরী (মীরু ভাই), আমাকে এবং ছাত্র ইউনিয়নের দুই জনকে ঢাকার ডি.সি.- এর সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ করেছে। কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর আমি ১৯৫৫ সালের মুখ্য মন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য যাই। উল্লেখ্য, জনাব আবু হোসেন সরকার ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন প্রচারাভিযানের সময় আমাদের দেশের বাড়ী পীরগঞ্জের ফতেপুরে গিয়েছিলেন। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিলো। তিনি আমার বাবাকে জোতদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন এবং কোর্টে মামলায় উকিল হিসেবে থাকতেন। আমি তখন রংপুর জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম।

তখন বাবা আমাকে একদিন তাঁর বাসায় নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরেও আমি বাবার মামলার বিষয়ে কাগজপত্র দিতে কয়েকবার গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। জনাব আবু হোসেন সরকার আমাকে বলেন যে, আমি যদি ডি. সি.-এর সঙ্গে দেখা না করি তাহলে আমার Double offence হতে পারে। সুতরাং সামরিক শাসনের অধীনে আমার ডি. সি.-এর সঙ্গে দেখা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এর কয়েকদিন পর আমি গোপনে ফজলুল হক হলের প্রভোস্টের নিকট বাদলকে পাঠিয়ে জানতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড: মাহমুদ হোসেন আমাকে অতি সত্বর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, "I.B.-এর অফিস থেকে ঘন ঘন তোমার অবস্থান সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং আর দেরী না করে তুমি ডি. সি.-এর সঙ্গে দেখা করো।" উপায়ন্তর না দেখে আমি আমার প্রিয় শিক্ষক ড: আবদুল মতিন চৌধুরীর অফিসে যাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ছাত্র হিসেবে আমার ভূয়সী প্রশংসা করে একটি সুদীর্ঘ চিঠি টাইপ করে আমাকে দিয়ে বলেন, "তুমি কালকে সকালেই ডি. সি.-এর সঙ্গে দেখা করো এবং এই চিঠিটি তাঁকে দিও। এ চিঠি পড়ে তিনি তোমাকে গ্রেফতার নাও করতে পারেন।"

২০। আমি পরদিন ডি. সি.-এর অফিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর কক্ষে অবস্থান করতে বলেন। ঘন্টাখানেক পর তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠান। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি যে, ছাত্র ইউনিয়নের ওয়ালি আশরাফসহ আরো দুজন বেসামরিক কর্মকর্তা উক্ত কক্ষে বসে আছেন। ডি. সি. আমাকে ও ওয়ালি আশরাফকে বেসামরিক দুজন কর্মকর্তার সঙ্গে চলে যেতে বলেন। ঐ দুজন কর্মকর্তা আমাদের দুজনকে একটি জীপে বেলা ১টার দিকে পুরানা পল্টনে তাঁদের একটি অফিসে নিয়ে বলেন যে, আমাদের দুজনকে সরকারী আদেশ বলে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমাদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগারে যেতে হবে। এই কথা শুনে আমি তাঁদেরকে বললাম, "ভাই, আমাকে একটু ফজলুল হক হলে নিয়ে যান, যাতে আমি বইপত্র, কাপড়চোপড় নিয়ে জেলখানায় যেতে পারি।" তাঁদের একজন বলেন, "আপনাকে এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হক হলে নেয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ আপনি আপনার কোন বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে যান, তিনি আপনার বইপত্র কাপড়-চোপড় পৌঁছে দেবেন।" অতঃপর আমাদের দুজনকে বেলা ৪টার দিকে একটি জীপে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জেলখানার অফিসে আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমাদের দুজনকে জেলখানার একটি পৃথক এলাকা যেখানে অনেক ছাত্রনেতা ও কর্মীকে রাখা হয়েছে, সেখানে রেখে আসা হয়। ঐ জায়গায় প্রবেশ করতেই শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মণি আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

২১। জেলখানার যে অংশে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আটক রাখা হয়েছিলো সেটি জেল গেট সংলগ্ন। ওখানে দুটি একতলা বিল্ডিং। একটার ফ্লোর দুই ফুট উঁচু

এবং লম্বা ঘর। অপর দক্ষিণমুখী বিল্ডিংটির ফ্লোর মাত্র নয় ইঞ্চি থেকে বার ইঞ্চি উঁচু। এ বিল্ডিংটির দুটো রুম কিন্তু প্রবেশদ্বার মাত্র একটিই। ঢোকবার দরজাটি লোহার রডের গ্রীলে তৈরী এবং জানালাগুলো পাল্লাবিহীন, মোটা মোটা রডের গ্রীল দিয়ে তৈরী। ওখানে ছিলো একটি দেশীয় পায়খানা ও পেশাবখানা এবং গোসল করার জন্য খোলা আকাশের নীচে একটি খোলা চৌবাচ্চা। আমদের ফ্লোরে ম্যাট্রেসে থাকতে দেয়া হতো। কোন মশারি দেয়া হতো না। আমার বেডটি পড়েছিলো দরজার সঙ্গে। রাতে তালা বন্ধ করে দেয়ার পর বেয়নেটসহ রাইফেল নিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে পাহারা দিতো। রাত্রে পুলিশ বেয়নেটে আঘাত করতে পারে এই ভয়ে আমি দরজার দিকে মাথা না দিয়ে উল্টো দিকে মাথা রেখে শুতাম। ঐ চত্বরে একটু খোলা জায়গা ছিলো যেখানে আমাদের ভলিবল খেলার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দশ দিন কেটে যায়।এগার দিনের মাথায় আমাকে জেল গেট থেকে খবর দেয়া হয় যে, একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে জেল গেটে এসেছেন। আমি গিয়ে দেখি আমার হলের এম. এ. ক্লাশের ছাত্র শফিকুর রহমান (আঞ্জুমান), যার কাছে আমি গ্রেফতারের দিনে চিঠি দিয়ে এসেছিলাম, আমার কিছু বই, জামা-কাপড়, মশারি নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য যে, আঞ্জুমান আমার রংপুর জিলা স্কুলের সহপাঠী ছিলো এবং সে ছিলো ছাত্রলীগের একজন নীরব কর্মী। সে আমাকে বলে যে, আমার গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমার বাবা রংপুর থেকে হলে এসেছিলেন এবং আমার রুমে দু'দিন থেকেছেন। ঐ সময় আঞ্জুমান তাঁকে বহু কান্নাকাটি করতে দেখেছে। সাক্ষাৎ শেষে ফেরার পথে দেখি ইতোমধ্যেই শেখ মুজিব তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে জেল গেটে আলাপ আলোচনা করছেন। I.B-এর লোক আমাকে শেখ মুজিবের পাশ কাটিয়ে অন্য দিক দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেখ মুজিব ঐ কর্মকর্তাকে উপেক্ষা করে আমাকে বলেন, "ওয়াজেদ, এদিকে আস।'' তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, "এর নাম ওয়াজেদ, ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতি।" এরপর তিনি তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, "এই তোমার ভাবী, আমার বড় মেয়ে হাসিনা, ছেলে কামাল, জামাল ও ছোট মেয়ে রেহানা।" হাসিনার হাতে অনেকগুলো লিচু ছিল। তিনি বলেন, "মা হাসু, লিচুগুলো ওয়াজেদকে দিয়ে দাও।" এরপর তিনি শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ মণি, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মীর আমির হোসেন চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন ও অন্যদের সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। জেলের ভেতর ফিরে এসে সব কথা মোয়াজ্জেম ভাই, শেখ মণি ও অন্যদের কাছে বলি।

২২। এভাবে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ দিন কেটে যায় এবং লোক মারফত জানা যায় যে, ছাত্র আন্দোলন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো বন্ধ করে দেয়ায় প্রায় স্তিমিত হয়ে গেছে। এপ্রিল (১৯৬২)-এর গোড়ার দিকে একদিন সংবাদপত্রে দেখি যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে: জে: আজম খান পদত্যাগ করেছেন। এর পরের দিন থেকে আমাদের প্রতিদিন প্রায় চার পাঁচজনকে এক সঙ্গে জেল থেকে মুক্তি দেয়া শুরু হয়। প্রথম দলে ছিলো

রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো এবং আরো কয়েকজন। তৃতীয় দফায় আমি আরও চার পাঁচজনের সঙ্গে মুক্তি পাই। জেল গেটে দেখি আবদুর রব, ইসহাক তালুকদার, এনায়েতুর রহমান, আতিয়ার রহমান, আবদুর রাজ্জাক ও ফজলুল হক হলের কিছু ছেলে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেল গেট থেকে বেরিয়ে এলে সবাই আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় আলিঙ্গন করে। অতঃপর তাদের সঙ্গে আমরা হলে ফিরে আসি। সবার শেষে মুক্তি পান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ মণি, মীর আমির হোসেন চৌধুরী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও আরো দুজন। ফজলুল হক হলের আমরা অনেকে তাঁদেরকে জেল গেটে অভ্যর্থনা জানাই। কিন্তু তখনও শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

২৩। ১৮ই জুন(১৯৬২) সকাল বেলা আবদুর রাজ্জাক আমাকে বলে, "ওয়াজেদ ভাই, মুজিব ভাই আজ যে কোন সময় জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনাকে সময়মত জানাবো।" আমি সেদিন বিকেল পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরীতে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বিকেল পাঁচটার দিকে আমি হলের ক্যান্টিনে চা খেতে আসি। ক্যান্টিনে বসে যখন চা-নাস্তা খাচ্ছিলাম তখন দেখি একটি কালো গাড়ি এসে পুকুরের পাড়ে থামলো। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ঐ গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে ডেকে তিনি বললেন, "ওয়াজেদ, তুমি জানতে না, মুজিব ভাইয়ের আজকে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিলো?" আমি বললাম যে, রাজ্জাক এ ব্যাপারে আমাকে আভাস দিয়েছিলো কিন্তু সময় মত জানায় নি। শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, "মুজিব ভাই তোমাকে জেল গেটে না দেখে আমাদের ওপর ভীষণ রাগ করেছিলেন এবং বাসায় ফিরে তিনি বলেছেন তোমাকে তাঁর বাসায় না নেয়া পর্যন্ত তিনি বাড়ী থেকে বাইরে বেরুবেন না।" শেখ মুজিব যে মাত্র দুই দিনের দেখা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে এত স্মরণ রেখেছেন এবং তাকে (আমাকে) এত স্নেহ করেন, এই ভেবে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হই। অতঃপর আমরা শেখ সাহেবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসায় যাই। সেখানে শেখ সাহেব আমাকে স্নেহের সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। অতঃপর তিনি তখন পাশে দাঁড়ানো রংপুর জেলার পীরগঞ্জের (অর্থাৎ পীরগঞ্জ থানার) মতিউর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর শেখ মুজিবসহ সদলবলে আমরা প্রথমে যাই শেরে বাংলার কবর জেয়ারত করতে। শেষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে যে যার মত যার যার স্থানে চলে যাই। ১৯৬৭ সালে হাসিনার সঙ্গে বিয়ের পর এ ব্যাপারে জানতে চাইলে হাসিনা বলে, "ঐ দিন আব্বা ফজলুল হক হলের সহ-সভাপতিকে আমাদের বাসায় না নিয়ে আসা পর্যন্ত শহীদ মিনারে যাবেন না বলেছিলেন।"

২৪। ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়েছিলো এবং তখন রীতিমত ক্লাশ চলছিলো। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠীদের থিসিস গ্রুপের সবাই এম. এসসি.-এর থিসিসের কাজ শেষ করেছে। আমার সুপারভাইজার ড: হারুন-অর-রশীদ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার চাকুরী পেয়ে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের লাহোরস্থ গবেষণা

কেন্দ্রে যোগদান করেছেন। তিনি আমাকে একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছিলেন যে, আমি যেন আমার কাজটি আগের থিওরী ব্যবহার করে অথবা সম্প্রতি প্রকাশিত জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিকের ব্যবহৃত থিওরী অবলম্বন করে সম্পন্ন করি এবং ড: রফিক উল্লাহ আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। আমি ড: রফিক উল্লাহর সঙ্গে আলাপ করে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম যে, পূর্বের থিওরী ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করলে বিভাগের হাতে চালানো ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবো। উল্লিখিত জাপানী বৈজ্ঞানিকের থিওরী ব্যবহার করলে কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হবে। দূর্ভাগ্য যে, তখন ঢাকায় কোন কম্পিউটার ছিলো না। অতঃপর ড: রফিকুল্লাহ আমাকে পুরোনা থিওরী ব্যবহার করে কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত দেন।

২৫। ঐ সময় একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের আমতলায় পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে একটি মিটিং ডাকা হয়েছিলো। উক্ত সভায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান, আবদুর রব, সিরাজুল আলম খান, শহিদুল হক মুন্সী, আবুল হাসনাত, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ক্লাশের পরীক্ষা অন্তত তিন মাস পেছানোর দাবির পক্ষে সমর্থন জানান। উক্ত সভায় আমি ছিলাম শেষ বক্তা। আমি বললাম যে, যদিও আমি ভাল ছাত্র তবুও জেলে কারারুদ্ধ থাকার কারণে তখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে হয়তো আমার পরীক্ষার ফলাফল ভাল হবে না। কিন্তু পরীক্ষা তিন মাস পিছিয়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হবে ও ওলটপালট হবে। অধিকন্তু পরীক্ষা পেছানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছাত্রদের সাধারণ সভায় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরঞ্চ পরীক্ষা পেছানোর দাবি করতে হলে তা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পেছানোর দাবির সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করতে হবে। আমার বক্তব্যের পর উক্ত সভায় পরীক্ষা পেছানোর ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সপ্তাহখানেক পর জানতে পারি যে, পরীক্ষা পেছানোর দাবির সপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত দাবিনামায় আমার স্বাক্ষর নেয়া হয়নি। যা হোক, এর দুই দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা চার মাসের জন্য পিছিয়ে দেয়। পরীক্ষা পেছানোর পর থেকে আমি প্রায়ই বলতাম, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য যা করেন, তা তাদের মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন।"

২৬। ১৯৬২ সালের জুন মাসের শেষের দিকে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচীর জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা আসেন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সেদিন বিমান বন্দরে এত লোক সমাগম হয়েছিলো যে, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁকে সরাসরি বিমান থেকে একটি ট্রাকে করে নিয়ে

আসতে বাধ্য হয়। এরপর বিরাট মিছিল সহকারে তাঁকে দৈনিক ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার কাকরাইলস্থ বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকায় অবস্থানকালীন তিনি সেখানে ছিলেন। একদিন রাত্রিবেলা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ মণি আমার হলে এসে আমাকে জানান যে, পরদিন সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সকাল দশটায় আলাপ-আলোচনা করবেন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন আমাকে এও বলেন, "মুজিব ভাই বিশেষভাবে বলেছেন যে, তোমাকে অবশ্যই উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।" পরদিন সকাল দশটায় মানিক মিয়ার কাকরাইলস্থ বাসভবনে যাই। এই প্রথম সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আওয়ামী লীগের একমাত্র শেখ মুজিব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন ঘন্টা আলাপ আলোচনা চলে। সভায় বেশীর ভাগ বক্তব্য রাখেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ মণি, আবদুর রব, এনায়েতুর রহমান ও সিরাজুল আলম খান। আমিও কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। দুপুর দেড়টার দিকে আমরা ফিরে আসি।

২৭। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ শুরু করেন। এই আলাপ-আলোচনা প্রায় চার-পাঁচ দিন ধরে চলে। এই আলোচনার ফলশ্রুতিতে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালনার জন্য "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (NDF)" নামে একটি ঐক্যজোট গঠনের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ঐ ঐক্যজোটের মধ্যে তৎকালীন মুসলীম লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতা জনাব নূরুল আমিনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর চার দিন পর পল্টন ময়দানে উক্ত প্রস্তাবিত জোটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনগণের কাছে পেশ করার জন্য একটি রাজনৈতিক জনসভার আয়োজনের ঘোষণা দেয়া হয়। উক্ত সভার দুই দিন পূর্বে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ মণি, ওবায়দুর রহমান, আবদুর রব, এনায়েতুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, শহিদুল হক মুন্সী প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ আমাকে বলেন, "ওয়াজেদ তুমি কি জানো যে, NDF-এর উক্ত জনসভায় জনাব নূরুল আমিন সভাপতিত্ব করবেন বলে NDF-নেতৃবৃন্দ সাব্যস্ত করেছেন। তুমি তো জানোই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর আদেশ প্রদানকারী নূরুল আমিন উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করলে তিনি রাজনৈতিকভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। সুতরাং NDF-এর এই সিদ্ধান্তকে অবশ্যই বাতিল করাতে হবে।তুমি তো জানোই মুজিব ভাই তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কাজেই আমদের দৃঢ় বিশ্বাস তুমি এই কাজটি মুজিব ভাইকে দিয়ে করাতে পারবে।"

২৮। ঐ দিন বিকেল পাঁচটার দিকে ফজলুল হক হলের ছাত্রলীগ নেতা ইসহাক তালুকদাকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিবের বাসায় যাই। তিনি তখন বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায়। তিনি আমাদের তাঁর গাড়ীতে বসালেন। তিনি ইসহাক তালুকদারকে সামনের সীটে আর আমাকে পেছনের সীটে তাঁর পাশে বসালেন। নূরুল আমিনকে NDF-

এর সভায় সভাপতিত্ব করার ব্যাপারে ছাত্রলীগের আপত্তির কথা জানালে তিনি বলেন যে, উক্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্তটি সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী সাহেবদের। তাই তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে বলে তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। অতঃপর তিনি তৎকালীন আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানী ভবনটি দেখিয়ে বলেন যে, সেখানে তিনি বসেন এবং চাকুরী করেন। পল্টন ময়দানের দিকে দেখিয়ে তিনি জানালেন যে, প্রস্তাবিত জনসভায় মঞ্চ তৈরী, মাইক্রোফোন যোগাড়, সভার আয়োজন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্ম এবং সে ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচের দায়িত্ব তাঁর ওপর দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি গুলিস্তান সিনেমা হলের পাশে আমাদের নামিয়ে দিলেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমরা হলে ফিরে আসি। উক্ত জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। নূরুল আমিন সভাপতিত্ব করেছিলেন। চার পাঁচ জন নেতার বক্তৃতার পর বক্তব্য রাখলেন শেখ মুজিব। তারপর মওলানা ভাসানী, সবশেষে সোহরাওয়ার্দী সাহেব। সভাপতির বক্তব্যে নূরুল আমিন বলেন, "সূর্য্যাস্ত যাওয়ার শেষ প্রান্ত, আমারও জীবন সায়াহ্ন এসে গেছে।" অতঃপর উক্ত জনসভায় তাঁকে সভাপতিত্ব করার সম্মান ও জনগণের কাছে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি NDF নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই মুসলিম লীগের অতি পরিচিতি শীর্ষ স্থানীয় নেতা জনাব নূরুল আমিন রাজনীতিতে সসম্মানে পুনর্বাসিত হন।

২৯। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা আইয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে আর একদফা আন্দোলন করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে। ঐ আন্দোলন সংগঠিত করার পেছনেও শেখ মুজিবের সর্বাধিক ভূমিকা ছিলো। ছাত্ররা সারা প্রদেশব্যাপী হরতাল আহবান করে ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৬২) তারিখে। এদিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা সত্ত্বেও রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র–জনতার মিছিল বের হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোরসহ দেশের অন্যান্য শহরে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ছাত্র–জনতার সংঘটিত সংঘর্ষে অনেকে আহত ও কয়েকজন নিহত হবার খবর বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত আন্দোলনের সময়ও ছাত্রসহ বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত আন্দোলনেও আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৩০। ইতোমধ্যে আমার এম. এসসি. ডিগ্রীর জন্য থিসিসের কাজ শেষ করি। তখনও আমাদের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞাপন দেখে আমরা পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন চাকুরীর জন্য আবেদন করি। ১৯৬২ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ঐ সাক্ষাৎকার বোর্ডের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ইন্নাস আলী। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি যে, আমি

সাক্ষাৎকারের ফলাফলে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ডিসেম্বরের শেষের দিকে আমি চাকুরীর নিয়োগপত্র পাই এবং আমাকে উক্ত নিয়োগপত্রে ৩০শে এপ্রিল (১৯৬৩) তারিখের মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে যোগদান করতে বলা হয়। ঐ নিয়োগপত্র পেয়ে আমি দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাবা মার দোয়া নিয়ে ঢাকা ফিরে আসি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
১৯৬৩–১৯৬৮ সাল

১। ১৯৬৩-এর ফেব্রয়ারীর গোড়ার দিকে একদিন ঢাকা হল ক্যান্টিনে শেখ মণির সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে আমার চাকুরীর সংবাদটি জানাই। শেখ মণি বলে, "তুই তো লাহোর থেকে বিদেশে Ph.D করতে যাবি। আমার আত্মীয়ের বড় মেয়ে এখন নবম/দশম শ্রেণীতে পড়ে। তাকে বিয়ে করে সঙ্গে করে নিয়ে যা।" আমি বললাম, "মণি, Ph.D সম্পন্ন করার আগে আমি বিয়ে করবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সুতরাং আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত।"

২। সে সময় নিজের খরচে টিকেট কিনে লাহোরে যেতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু আমার কাছে প্রয়োজনের তিন শত টাকা কম ছিলো। আমি মতি ভাইয়ের বাসায় গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। আমার কথা শুনে মতিউর রহমান সাহেব আমাকে তিন শত টাকার চেক লিখে দেন। উক্ত ধার আমি ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ড হতে ফিরে পরিশোধ করতে চাইলে তিনি নেননি। আমি তাঁর কাছে এখন পর্যন্ত তিন শত টাকা ঋণী। আমি লাহোরে যাওয়ার পূর্বদিন মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনে চাকুরী পেয়েছি জেনে তিনি খুব খুশী হন এবং আমাকে মোবারকবাদ জানিয়ে জীবনে আমি যেন কামিয়াব হই তার জন্য সর্বান্তকরণে দোয়া করেন। এরপর তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলি। পরের দিন, ৮ই এপ্রিল (১৯৬৩) বিকেলে PIA করে লাহোরের পথে রওনা হই।

৩। ঐদিন একই ফ্লাইটে আমার আরও তিনজন সহপাঠী ফরহাদ হাসান মোহাম্মদ ফয়সাল, শামসুজ্জামান মজুমদার ও অমল কৃষ্ণ দাসসহ আমরা লাহোর পৌঁছাই রাত ৮টার দিকে। আমাদের জন্য লাহোরস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে লাহোরে নব-নির্মিত স্টেডিয়ামের নীচে আণবিক শক্তি কমিশন কর্তৃক ভাড়াকৃত তৎকালীন অস্থায়ী বাসস্থানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তখন স্টেডিয়ামের আশেপাশে কোনো দোকানপাট ও বাড়ীঘর ছিলো না। রাতে শেয়াল ডাকতো। শুধু মাঝে মধ্যে কয়েকজন এসে স্টেডিয়ামের

মাঠে পানি দিতো। পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের ষ্টেডিয়ামে ভাড়াকৃত আটটি ছোট ছোট কক্ষে আমরা চারজন বাঙ্গালী ছাড়া আর কেউ ছিলো না।। আণবিক শক্তি কমিশন লাহোরের মডেল টাউনে একটি বিরাট দোতলা বাড়ী ভাড়া করে আণবিক শক্তি কেন্দ্রের আমাদের মতো জুনিয়র কর্মকর্তাদের থাকতে দিয়েছিলো। ঐ গেষ্ট হাউজের চারজন বাঙ্গালী ছাড়া আর সবাই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানী। লাহোরের তরুণ পশ্চিম পাকিস্তানী বিজ্ঞানীদের সকলেরই পারিবারিক বাসস্থান ছিলো এবং প্রায় প্রতিদিনই তারা রাতে বাসা থেকে খেয়ে আসতো। পাঞ্জাবী তরুণ বিজ্ঞানীদের নিম্নস্তরের একাডেমিক কেরিয়ার থাকা সত্ত্বেও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। কিছু দিন পর মডেল টাউনের গেষ্ট হাউসের দু'টো রুম খালি হলে তা আমাদের চারজনের জন্য অবশেষে বরাদ্দ করা হয়। এভাবে কয়েক মাস কেটে যায়।

৪। একদিন অফিসে হঠাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলের আমার পরবর্তী ছাত্র সংসদের ছাত্রলীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানের কাছ থেকে টেলিফোন আসে। সে আমাকে জানায় যে, পাকিস্তান জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সভায় যোগদান করার জন্য সে লাহোরে এসেছে এবং কয়েকদিন থাকবে। তাকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিসে আসতে বলি। আতিয়ার আমাকে জানায় যে, জেনারেল আজম খানের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে এবং সে তাঁকে আমার লাহোরে অবস্থানের কথা জানিয়েছে। আতিয়ার আরো জানায় যে, পরদিন দুপুরে জেনারেল আজম খান আমাদের দুজনকে দাওয়াত দিয়েছেন।

৫। পরদিন আমরা দুজন দুপুর ১২টার দিকে লাহোরস্থ ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল আজম খানের বাসায় যাই। এক তরুণী সুন্দরী মেয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং তিনি নিজেকে আজম খানের মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন। কিছুক্ষণ পর জেনারেল আজম খান ও তাঁর স্ত্রী বৈঠকখানায় এলেন। উল্লেখ্য, আমাদের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নর হাউসের সকল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রাবাসের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতিদের দাওয়াত দেয়া হতো। ঐ সুযোগে জেনারেল আজম খানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিচয়ের প্রথম দিনের আলাপের সময় জেনারেল আজম খান বলেছিলেন যে, তিনি খবর পেয়েছিলেন যে, আমি মেধাবী একজন ছাত্র হিসেবেই ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম, ছাত্রনেতা বা একটিভিস্ট হিসেবে নয়। যা হোক, সেদিন খাওয়ার সময় আতিয়ার ও আমাকে উদ্দেশ্য করে আজম খান বলেন, "আইয়ুব খান আমাকে এই বাড়ীতে কড়া পাহারায় অন্তরীণ রেখেছেন। শেখ মুজিবকে অবশ্যই বলবে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই আইয়ুব খানের সঙ্গে আপোষ না করেন। তাঁকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি ও তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।" অতঃপর জেনারেল আজম খান তাঁর মেয়েকে আমাদের লাহোর শহর ঘুরে দেখাতে বলেন। এর কয়েক মাস পর

ফরহাদ হাসান মোহাম্মদ ফয়সাল, শামসুজ্জামান মজুমদার, অমল কৃষ্ণ দাস ও আমি একত্রে সেপ্টেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহের দিকে যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

৬। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে আমি পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর প্রাথমিক স্তর হিসেবে "ডিপ্লোমা অব ইম্পিরিয়াল কলেজ (D.I.C)" কোর্স শুরু করি। উক্ত কোর্সে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্র ছিলো। এক বছর পর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলে আমি প্রথম চারজনের মধ্যে ছিলাম। উল্লেখ্য, আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের অধ্যাপক আবদুস সালাম। D.I.C-তে যারা ন্যূনতম ৭০% নম্বর পায় কেবল তাদেরকেই পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য ভর্তির সুপারিশ করা হয়। অধ্যাপক সালাম ঐ বছর ইটালীর ট্রিয়েস্টে অবস্থিত "ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (I.C.T.P)"-এর পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে কলোম্বো প্ল্যান ফেলোশীপ দেয়ার নিয়ম না থাকায় আমাকে ইংল্যান্ডের ডারহামস্থ অতি প্রসিদ্ধ এবং অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রাচীন ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ই. জে. স্কয়ার্স-এর অধীনে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী করার জন্য সাব্যস্ত করা হয়। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ডারহাম কাউন্টির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করতো। এ ছাড়াও সেখানকার কিছু কলকারখানায় বহু সংখ্যক পাকিস্তানী কর্মরত ছিলো। তখন ডারহামে আমরা মাত্র পাঁচজন বাঙ্গালী ছিলাম। পরের বছর ফজলুল হক হলের আমার সহপাঠী আবদুস সোবহান ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আমার এক বছরের জুনিয়র একজন ছাত্র ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

৭। ঐ সময়টা ছিলো ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এ মাসের গোড়ার দিকে কাশ্মীরের শ্রীনগরস্থ প্রধান মসজিদে রক্ষিত রসূলুল্লাহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চুল হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হওয়ার খবর পাই। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ প্রায় সতেরো দিন স্থায়ী ছিলো। যুদ্ধ থামার পর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় শেখ মুজিবের দেয়া একটি ইশতেহার দেখতে পাই। তিনি কাশ্মীর সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন যে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা ও শক্তি দুর্বল রাখার কারণে যুদ্ধের সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলো। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এই সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সামরিক ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীদের নিয়োগ করার দাবিও তিনি জানিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি পরিহার করার দাবিও জানিয়েছিলেন উক্ত ইশতেহারে।

৮। এর সপ্তাহখানেক পরে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমান ডারহামে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তানী ছাত্রছাত্রী ও অন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ডারহামস্থ পাকিস্তানী সমিতি এই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় জনাব হাবিবুর রহমান ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মতামত জানতে চান। প্রায় সবাই উক্ত যুদ্ধ শুরু করার জন্য ভারতকে দায়ী করে নিন্দা জ্ঞাপন করে। এরপর জনাব হাবিবুর রহমান তৎমর্মে পাকিস্তানী সমিতির ডারহাম শাখার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করার পরামর্শ দিলে আমি বলি যে, ঐ মুহূর্তে আমাদের এখন কিছু করা সমীচীন হবে না যা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সহায়ক না হয়ে পাক-ভারতের মধ্যে বিরাজিত উত্তেজিত পরিস্থিতিকে আরও বেশি উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। আমার বক্তব্য শেষ না হতেই পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যরা মারমুখী হয়ে আমাকে ঘেরাও করে আমার কথা প্রত্যাহার করার দাবী জানায়। তখন জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের হস্তক্ষেপে তারা নিবৃত্ত হয় এবং আমি কোন রকমে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। যাহোক, পশ্চিম পাকিস্তানীরা, বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা যে একজন বাঙ্গালীর সামান্য মত পার্থক্যকেও সহ্য করতে পারতো না আমার অভিজ্ঞতার স্মৃতিপটে এই ঘটনা আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে সংযোজিত হলো।

৯। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) তারিখে শেখ মুজিব ৬দফা ঘোষণা করে তার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছে বলে ইংল্যান্ডের কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। শেখ মুজিবের ৬ দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপনের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দীর্ঘ দিনের বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণ যে মূলত দায়ী তৎমর্মেও পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়। শেখ মুজিবের ৬-দফা দাবি প্রদানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসন যে ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়েছিলো তৎসম্পর্কেও কিছু কিছু সংবাদ পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় পাকিস্তান সমিতির বিভিন্ন সভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। স্পষ্টতই বাঙ্গালীরা ৬-দফার সমর্থনে জোরালো যুক্তি পেশ করে। লক্ষণীয়, এই ঘটনার পর থেকে বাঙ্গালী ও পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবীদের সম্পর্কের দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তার অবনতি ঘটে।

১০। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৬-দফার দাবি ঘোষণার পর তার পক্ষে জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শেখ মুজিব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জেলায় রাজনৈতিক সফর ও সভাসমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ই মার্চ ঢাকায় "ইডেন হোটেল" প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে "আমাদের বাঁচার দাবি" শিরোনামে শেখ মুজিবের ৬-দফার দাবি পুস্তিকাকারে প্রচার করা হয়। এর ফলে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।

উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফার প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করে সমবেত কাউন্সিলরগণ শেখ মুজিবকে সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে আওয়ামী লীগের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেন। পক্ষান্তরে আইয়ুব খান বললেন, "অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফার জবাব দেয়া হবে।" আইয়ুব খান সরকারের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান বললেন, "আমি যতোদিন গভর্নর থাকবো ততোদিন শেখ মুজিবকে জেলেই পচতে হবে।"

১১। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের পর সাধারণ জনগণের কাছে তাঁর ৬দফা দাবির ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব সারা প্রদেশে রাজনৈতিক সফরে বের হন। একই সঙ্গে গভর্নর মোনেম খান শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে খুলনায় এক বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব তাঁর ৬দফা দাবির পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। উক্ত সভাশেষে ঢাকায় ফেরার পথে শেখ মুজিবকে "রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক" বক্তৃতা দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। যাহোক, তখন কোর্টে আপীল করলে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। এরপরও শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক সভাসমাবেশের কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তিনি যখন যে জেলায় জনসমাবেশে ভাষণ দেন তখন সে জেলায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করে হুলিয়া জারি করা হয়। শেখ মুজিবের ৬-দফার প্রতি জনগণের বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করে আইয়ুব খানের সরকার তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং অবশেষে তাঁকে 'পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে'র আওতায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে তারিখে। ঐ দিন বিকেলে শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জে স্মরণাতীতকালের এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আইয়ুব খানের সরকার বিভিন্ন অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দায়ের করেছিলো বারোটি মামলা। শেখ মুজিবকে 'পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে' অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করার পর আইয়ুব খানের সরকার আওয়ামী লীগের আট শতাধিক নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করে। এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, শ্রম সম্পাদক জহুর আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট এ. মোমিন, জুনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ, অন্যতম সহ-সভাপতি ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, সমাজসেবা সম্পাদক কে. এম. ওবায়দুর রহমান, দফতর সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদুল্লাহ, ওয়ার্কিং কমিটি সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের আট শতাধিক নেতা ও কর্মীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করেও আইয়ুব খানের সরকার ৬দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬দফা আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো ৭ই জুনের সফল হরতাল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬ দফা বাস্তবায়ন ও কারারুদ্ধ নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সারা দেশে

হরতাল আহ্বান করা হয়। ঐদিন দেশের বিভিন্ন শহরে ছাত্র, জনতা ও শ্রমিকের সঙ্গে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নারায়ণগঞ্জের শিল্প এলাকায়। এ সমস্ত সংঘর্ষে বহু লোক গ্রেফতার ও হতাহত হয়। একমাত্র নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকের সংঘটিত সংঘর্ষে ১০ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১২। আমার পিএইচ. ডি. ডিগ্রী পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৬৭ সনের আগস্ট মাসে। মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয় আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে। মৌখিক পরীক্ষা শেষে আমি বিভাগীয় কফি কক্ষে চলে যাই। এর কিছুক্ষণ পর বাইরের পরীক্ষকদ্বয়কে নিয়ে অধ্যাপক স্কয়ার্স কফি কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী দেয়া হয়েছে বলে অভিনন্দন জানান। পরীক্ষার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হবে তার জন্য আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। যা হোক, প্রফেসর স্কয়ার্সের অন্যান্য গুণের সঙ্গে এ ঘটনাটিও আমাকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। আগস্ট মাসে আমার স্কলারশীপ শেষ হওয়ায় সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে লন্ডনে চলে যাই। লন্ডনে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় লন্ডন ত্যাগ করি এবং ৯ই সেপ্টেম্বর করাচী পৌঁছাই। করাচীতে পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট করি। অতঃপর আমাকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পদ থেকে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পদে পদোন্নতি দিয়ে ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে পদস্থ করা হয়। আমি ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় পৌঁছাই এবং পরদিন ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে যোগদান করি। এরপর আমি ঢাকা কলেজের পাশে কলেজ স্ট্রীটের নীচ তলায় দুই কক্ষ-বিশিষ্ট একটি বাসা ভাড়া নিই।

১৩। একদিন আমি বিকেলে গুলিস্তান সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যাই। সিনেমা হল থেকে বের হয়ে একটি ছেলেকে সান্ধ্য পত্রিকা হাতে শেখ মুজিবের জেলখানার গেটে বিচার শুরু হয়েছে বলে চিৎকার করতে শুনি। আমি পত্রিকাটি কিনে উদ্‌গ্রীব হয়ে সমস্ত বিষয় গভীরভাবে পড়লাম। ঐ সংবাদে আওয়ামী লীগের ১৫ নম্বর পুরানা পল্টনস্থ অফিসের ঠিকানা ছিল। অতঃপর আমি আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পাই। এর কিছুক্ষণ পরেই ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান, সৈয়দ মজহারুল হক বাকী ও গোলাম রসুল ময়না সেখানে আসে। আমাকে দেখে তারা তিনজনই বিস্ময়ে হতভম্ব হয়। যা হোক, আমি পিএইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছি শুনে তারা ভীষণ খুশী হয়। তারা আমাকে বলে যে, আমি আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে মারাত্মক ভুল করেছি, কারণ ঐ সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ইঙ্গিতে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানের নির্দেশে শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোস্তাক আহমদ, জিল্লুর রহমান প্রমুখ নেতাসহ আওয়ামী লীগের প্রায় সকল নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তারা আমাকে আরও জানায় যে, আওয়ামী লীগের অন্যান্য

নেতা ও কর্মীর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। অতএব তারা বলে যে, আমার কোনোমতেই আওয়ামী লীগ অফিসে যাওয়া ঠিক হয়নি।

১৪। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন সাহেব কারারুদ্ধ থাকায় জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অফিসে কর্মরত ছিলেন। ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ আমাকে মিজানুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই তোপখানা রোডস্থ একটি রেঁস্তোরায় নিয়ে যায়। তারা আমাকে জানায় যে, শেখ মুজিব কর্তৃক ঘোষিত ছয় দফার পক্ষে বিপুল জনসমর্থন দেখে সরকার ভীত হয়ে শেখ মুজিবসহ প্রায় সকল আওয়ামী লীগ নেতাকে কারারুদ্ধ করে সমস্ত দেশে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। শেখ মুজিবের পরিবারবর্গের ওপরও বিভিন্ন প্রকারে হয়রানি ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তারা আরো জানায় যে, উক্ত পরিস্থিতির কারণে ছাত্রলীগ কিংবা আওয়ামী লীগ, এমন কি শেখ মুজিবের আত্মীয়স্বজনও সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে শেখ মুজিবের বাসায় প্রকাশ্যে যায় না। অতঃপর সিরাজুল আলম খান ও ময়নাকে নিয়ে আমি আমার বাসায় চলে আসি। বাসায় এলে সিরাজুল আলম খান আমাকে জানায় যে, ময়না ছোটখাট কন্ট্রাকটারী ও ইনডেন্টিং-এর কাজ করে। কিন্তু মোনেম খান সরকারের ইঙ্গিতে তার বিলগুলো কয়েক মাস ধরে আটকে রাখায় তারা তখন কপর্দকহীন। এ কথা শুনে আমি বেদনাহত হই এবং তৎক্ষণাৎ ময়নার নামে একটি তিন শত টাকার চেক সই করে দিই। সেদিন সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে ছয় দফার বিষয়ে বিস্তারিত ও সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ওদের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে, ৬ দফার প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানানো ও তৎমর্মে জোরালো ভাষায় নিবন্ধ লেখার জন্য দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ও রাজনৈতিক সাংবাদিকতার অঙ্গনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘ দিন যাবৎ কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওরা রাত প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে আমার বাসা ত্যাগ করে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়াকে (কাকাকে) অত্যন্ত সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে "মানিক ভাই" বলে সম্বোধন করতেন।

১৫। এর পরের দিন আকস্মিকভাবে জনাব মতিউর রহমান আমাকে টেলিফোন করেন। তিনি আমাকে সাফল্যজনকভাবে বিদেশে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী করে দেশে ফিরে আসার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে সেদিন দুপুরে তাঁর বাসায় খেতে বলেন। তিনি আমাকে তাঁর গুলশানস্থ বাসায় নিয়ে যান। তখন তাঁর বাসাটি ছিলো একতলা। খাওয়া দাওয়ার পর মতি ভাই ও ভাবী আমার কাছে জানতে চান বিদেশে আমি বিয়ে শাদী করেছি কিনা। তখনও আমি অবিবাহিত রয়েছি জেনে তাঁরা জানতে চাইলেন আমি অতি তাড়াতাড়ি বিয়ে করবো কিনা। আমি তাঁদেরকে জানাই যে, তিন মাসের মধ্যে আমি বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করতে চাই। আমি তাঁদের জানাই যে, আগামী দুই একদিনের মধ্যেই আমি গ্রামের বাড়িতে যাবো।

সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমাকে পাত্রী দেখাতে পারলে আমি খুশী হবো। তাঁরা জানতে চাইলেন, আমার কি ধরনের পাত্রী পছন্দ। আমি জানাই, "প্রথমত পাত্রীকে কোনক্রমেই কোটিপতির কন্যা কিংবা আপস্টার্ট মেয়ে হওয়া চলবে না। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হলে আমি খুশী হবো। মেয়েকে অবশ্যই সুরুচিসম্পন্না, অমায়িক ও সদাচার স্বভাবের হতে হবে।"

১৬। এর দু'দিন পর আমি রংপুরের পীরগঞ্জ থানার ফতেপুর গ্রামে মায়ের দোয়া নিতে যাই। সেখানে ছয় দিন অবস্থান করার পর আমি ঢাকায় ফিরে আসি। এর দুদিন পর মতি ভাইয়ের কাছ থেকে আবার টেলিফোন পাই। তিনি ঐ দিনেই দুপুরে আমাকে তাঁর বাসায় এক সঙ্গে খাওয়ার কথা বলেন এবং সেখানে আমার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হবে বলে জানান। তিনি সেখানে আমাকে বলেন যে, আমি পাত্রীর যে বিবরণ দিয়েছি তেমন পাত্রী তাঁরা কোথাও খুঁজে পাননি। তারপর তিনি বলেন, "তুমি মুজিব ভাইয়ের মেয়ে হাসিনাকে দেখেছো? ও কয়েক দিন আগে আমাদের বাসায় এসেছিলো। আমার মনে হয় ওর সঙ্গে তোমাকে খুব মানাবে।" আমি বললাম, "সে কি করে সম্ভব? কারণ শেখ সাহেবকে তো আমি ভাই বলে সম্বোধন করতাম।" মতি ভাই বললেন যে, সেটাতো রাজনৈতিক সম্পর্ক, নিকট আত্মীয় বা রক্তের সম্পর্ক নয়। তাছাড়া আওয়ামী লীগের প্রায় সকলেই তো তাঁকে ভাই বলেই সম্বোধন করে। আমি একটু চিন্তা করে হাসিনাকে দেখার সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করি। এর দু'দিন পর আবার মতি ভাই আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। খাওয়ার পর তিনি ও ভাবী আমাকে জানান যে, ঐদিন সন্ধ্যে সাতটার সময় হাসিনা ও তার পরিবারের সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক পরিচয় করার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর মতি ভাই বলেন, "চল এখন মার্কেটে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করে আসি।"

১৭। ভাবীসহ আমরা বায়তুল মোকাররম থেকে আমার পছন্দমত একটি আংটি নির্বাচন করি। আমার নিকট পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় ভাবী এ আংটির মূল্য পরিশোধ করেন। এরপর আমরা তাঁদের গুলশানস্থ বাসায় ফিরে আসি। সন্ধ্যে সাতটার দিকে হাসিনার আম্মা, শেখ কামাল, শেখ শহিদ, মরুব্বী ধরনের এক ভদ্রলোক মতি ভাইয়ের বাসায় আসেন। শেখ শহিদ আমাকে আগে থেকেই চিনতো। তাঁদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার পর বিয়ের ব্যাপারে কিছু আলোচনা হয়। তখনও হাসিনা সেখানে আসেনি।

১৮। হাসিনার আম্মাকে খাবার টেবিলের অগ্রভাগে বসানো হয়, আমাকে তাঁর বিপরীত স্থানে। এর অল্প কিছুক্ষণ পরে হাসিনা খাবার ঘরে প্রবেশ করে বলে, ''বা-বা, কিছুক্ষণ আগে কলেজের সংসদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করে আমি মুক্ত হলাম।'' এ কথাগুলো বলতে বলতে হাসিনা তার মার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আমার দিকে মুখোমুখি হওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি হাসিনা না?" হাসিনা বলে, "হ্যাঁ, আমি হাসিনা।" এ কথাটুকু বলেই খাবার ঘর ছেড়ে হাসিনা চলে যায়।

১৯। নাস্তার শেষে আমরা সবাই বসার ঘরে ফিরে যাই। এরপর আমাদের বিয়ে সম্পর্কে আবার আলাপ-আলোচনা হয়। বিয়ের প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করি। তবে আমি তাঁদের জানাই যে, আমার মা, একমাত্র জীবিত মামা ও বড় দুলাভাইয়ের মতামত নিয়ে বিয়ের তারিখ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে বলে মনে করি। হাসিনার আম্মা বলেন যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে জেলগেটে শেখ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, হাসিনার আব্বা এ বিয়ের ব্যাপারে ঐ দিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। অতঃপর কিছু এটাসেটা বলার পর তখনকার পরিস্থিতি এবং শেখ সাহেবের পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটি ঐদিন পাকাপাকি করতে সম্মত হই। এরপর আমি বলি যে, আমার বাবা বেঁচে নেই। ১৯৬৩ সালে লাহোরে কর্মরত থাকার সময় জুলাই মাসে হঠাৎ বাবার মৃত্যুর সংবাদ পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ঐ সংবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলেও বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর আগের দিন বাবাকে দাফন করা হয়েছিলো। অতএব বিয়েতে আমি বিশেষ কিছু দিতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, তাঁদের কাছ থেকে আমার কোন কিছু দাবি বা প্রত্যাশাও নেই।

২০। এরপর হাসিনাকে বসার ঘরে নিয়ে আসা হয়। আমি হাসিনার হাতে আংটি পরিয়ে দেয়ার সময় লক্ষ্য করি আংটিটি তার আঙ্গুলের মাপের চেয়ে বেশ বড়। এরপর হাসিনার আম্মা আমার হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করেন। এর কিছুক্ষণ পর আমরা সবাই চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ি। হাসিনার আম্মা তাঁদের গাড়ীতে আমি যাবো কিনা আমাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি কিছু ইতস্ততঃ করে তাঁদের সঙ্গে যেতে সম্মত হই। সেদিন শেখ কামাল গাড়ীটি চালাচ্ছিলো এবং তাদের বাসার নিকট পৌঁছার পূর্বে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাদের বাসায় যেতে আমার আপত্তি আছে কিনা। আমি তাদের বাসা দেখার আগ্রহ সম্বরণ করতে না পেরে প্রস্তাবে রাজী হই। গাড়ীটি তাদের বাসার সামনে থামার পরপরই হাসিনা দ্রুত গাড়ী থেকে বের হয়ে বাড়ীর ওপর তলায় চলে যায়। আমরা বসার ঘরে গিয়ে বসি। বসার ঘরটি প্রায় দৈর্ঘ্যে ২৫/৩০ ফুট, ডাইনিং-কাম ড্রয়িং রুম। ঘরটি অতি সাধারণ বসার ঘর। রাত প্রায় এগারটার দিকে ফজলুল হক মুন্সী নামের এক ড্রাইভারের মাধ্যমে আমাকে আমার কলেজ স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেয়া হয়।

২১। এর একদিন পর মতি ভাই দুপুরে আমাকে জানান যে, ঐদিন সন্ধ্যেয় আমার বিয়ের আক্‌ত (রুসমত) সম্পন্ন করার আয়োজন করা হয়েছে। সেদিন দুপুরে মতি ভাই আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যান এবং খাওয়া-দাওয়ার পর আক্‌ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু কেনাকাটা করার জন্য বাজারে নিয়ে যান। উল্লেখ্য, আক্‌ত অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি যে কি তখন সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিলো না। যাহোক, প্রথমে আমাকে স্টেডিয়াম মার্কেটে নিয়ে একটি শাড়ীর দোকান থেকে আক্‌ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি শাড়ী নির্বাচন করতে বলা হয়। আমি লাল গোলাপী রংয়ের একটি শাড়ী নির্বাচন করি। এরপর আরো কিছু

কাপড়-চোপড় ও প্রসাধনী দ্রব্য কিনি। দুর্ভাগ্যবশত আমার নিকট পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় ঐ সব দ্রব্যের মূল্য ভাবী পরিশোধ করেন। এরপর আমরা চলে যাই নিউ মার্কেটে। সেখানে একটি জুতোর দোকানে আমাকে একটি স্যুটকেস ও এক জোড়া স্যান্ডেল নির্বাচন করতে বলা হয়। আমি একটি মাঝারি আকারের ক্রিম রংয়ের নতুন ডিজাইনের স্যুটকেস নির্বাচন করি। হাসিনার পায়ের মাপ না জানা সত্ত্বেও আমাকে এক জোড়া স্যান্ডেলও নির্বাচন করতে হয়। এসবের মূল্যও ভাবী পরিশোধ করেন। এরপর তাঁরা আমাকে আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আক্‌ত অনুষ্ঠানে রাত ৮টার দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান। আমি তাড়াতাড়ি করে আমার বড় বোনের বড় ছেলের মামা শ্বশুর লতিফ ভাই (পরবর্তীতে আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়) এবং আমার ভাগ্নে বৌয়ের বড় ভাই আফজাল আহমেদ রানাকে টেলিফোনে এ সম্পর্কে জানিয়ে তাদেরকে রাত ৮টার আগে আমার বাসায় আসার জন্য অনুরোধ করি। রাত সাড়ে আটটার সময় মতি ভাই ও ভাবী এসে আমাদেরকে শেখ সাহেবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় নিয়ে যান।

২২। বসার ঘরে প্রবেশ করে দেখি আমাকে বসানোর জন্য আলাদা করে ডিভানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশের চেয়ারগুলোতে একজন মওলানাসহ মাত্র কয়েকজন মুরুব্বী গোছের ব্যক্তি বসেছিলেন। পরিচয় পর্বে জানতে পারি যে, তাঁদের একজন ছিলেন শেখ সাহেবের ছোট বোন জামাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সিনিয়র সেকশন অফিসার এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেন এবং আরেকজন হাসিনার সম্পর্কে নানা। হাসিনারা তাঁকে তানু নানা বলে ডাকে। সেদিনেই বিয়ে পড়ানো ও কাবিন নামায় স্বাক্ষর করা হবে বলে আমাকে জানানো হয়। সে রাতটি ছিলো ১৭ই নভেম্বর ১৯৬৭ সাল শবে বরাতের রাত। সত্যি বলতে কি, আমি এ ব্যাপারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। আর বিষয়টির মর্মার্থ জানতাম না বলে আমি স্যুট পরে গিয়েছিলাম। এজন্য বিয়ে পড়ানোর কথা শোনার পর কিছু বাকবিতণ্ডা হয়। শেষমেষ আমাকে একটি টুপী এনে দেয়ার অনুরোধ করি। এরপর কাবিননামায় স্বাক্ষর করি। উক্ত কাবিনপত্রে পঁচিশ হাজার টাকা বিয়ের দেন মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। অতঃপর দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে আক্‌ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এর প্রায় এক ঘন্টা পর বৌ দেখার জন্য আমাকে ওপর তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। হাসিনার ঘরে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে শেখ শহীদ আমার হাতে একটি তাজা বড় লাল গোলাপ দেয়। ঐ ঘরে খাটে বসেছিলো বৌ বেশে হাসিনা ও তার সমবয়সী এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেন সাহেবের বড় মেয়ে শেলী ও ছোট বোন রেহানা। রেহানা আমাকে দেখেই বলে, "দুলা ভাই, খালি হাতে বৌ দেখতে এসেছেন। বৌ দেখতে দেব না।"

২৩। এর কিছুক্ষণ পর আমি নীচে চলে আসি। ঐ দিন আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসার সময় জানানো হয় যে, পরদিন বিকেল সাড়ে চারটায় জেল গেটে শেখ সাহেবের কাছে দোয়া নেয়ার জন্য যেতে হবে। জেল গেটের কাছেই আমাদের একটি কক্ষে বসানো হয়।

তখন দেখি গোয়েন্দা বিভাগের সেই ইসরাইল সেখানে কর্তব্যরত। ইসরাইল আমাকে অভিনন্দন জানায়। এর একটু পর শেখ সাহেবকে উক্ত কক্ষে আনা হয়। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার জন্য দোয়া করেন। আমরা তাঁকে সালাম করি। আমাকে তিনি একটি রোলেক্স ঘড়ি পরিয়ে দেন। ঘড়ির গায়ে আটকে থাকা কাগজটি থেকে দেখতে পাই সেটির মূল্য ছিলো বার শত টাকা। উক্ত ঘড়িটি এবং আমাদের বিয়েতে হাসিনাকে দেয়া শাড়ী ও স্যুটকেস এখনো আমার কাছে রয়েছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ ঘড়িটি আমি ব্যবহার না করে সযত্নে রেখে দিয়েছি। এরপর মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এর একটু পর শেখ সাহেব আমাকে ইশারা দেন। ঐ ইঙ্গিতের মর্মার্থ বুঝতে পেরে আমি দরজার অতি কাছে দাঁড়ানো ইসরাইলের কাছে যাই এবং তাঁকে সামনের মাঠের এক কোণায় নিয়ে যাই। আমার ধারণা হয়েছিলো যে, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তার অনুপস্থিতির সুযোগে শেখ সাহেব আমার শাশুড়ীর সঙ্গে কিছু গোপন আলাপ করবেন। আমাদের সাক্ষাৎকার শেষে ৭টার দিকে আমরা সবাই শেখ সাহেবের বাসায় ফিরে আসি। বাসায় ফিরে শাশুড়ী আমাকে বলেন, "বাবা তুমি তো বুঝতেই পারছো, মুরুব্বী বলতে এ বাসায় কেউ নেই। কামাল এখনো ছোট। তাছাড়া কোন আত্মীয়-স্বজনও ভয়ে এ বাসায় বিশেষ একটা আসে না। তুমি আমার বড় ছেলের মতো। শেখ সাহেব অনুমতি দিয়েছেন যথাসম্ভব তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।"

২৪। যাহোক, সেদিন রাতের খাবার শেষে আমি আমার বাসায় চলে আসি। এরপর থেকে শাশুড়ী আমাকে প্রতিদিন বিকেলে গাড়ী পাঠিয়ে তাঁদের বাসায় নিয়ে যেতেন। আমিও সেই সুযোগে হাসিনা ও শ্যালিকাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় সময় কাটাতাম। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে এগারটার দিকে বাসায় ফিরতাম। এভাবে দিন দশেক কেটে যায়। একদিন হাসিনার সেই বান্ধবী ফুফাতো বোন শেলী আমাকে জোরপূর্বক ঐ রাতে ওদের বাসায় থাকতে বাধ্য করে। এরপর থেকে আমি প্রায় রাতেই শেখ সাহেবের বাসায় থাকতাম।

২৫। একদিন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের করাচীস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ছয় সপ্তাহব্যাপী একটি কর্মশালায় যোগদান করার অফিস আদেশ পাই। ঐ কর্মশালা ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহের মাঝামাঝিতে শুরু হওয়ার কথা। সেখানে মুখ্য বক্তা হিসেবে বিশেষ কোর্স দেয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিলো আমেরিকার রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী অধ্যাপক ওকুবকে। এই সংবাদে আমার শাশুড়ী ইসলামাবাদ যাওয়ার পূর্বে শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করেন। আমরা যথাসময়ে জেলখানায় যাই এবং পূর্বের সেই একই কক্ষে আমাদের বসানো হয়।গোয়েন্দা বিভাগের সেই একই ইসরাইল উপস্থিত ছিলো। সেদিন দেখলাম, শেখ সাহেবকে দু'জন লোক ধরে নিয়ে আসছে। তিনি জানান যে, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তিনি বাতের ব্যথায় ভুগছেন। আমাকে ইসলামাবাদে যেতে হবে শুনে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন। সাক্ষাৎকার শেষে জেলে ফিরিয়ে নেয়ার মুহূর্তে তিনি ঐ দু'

কর্মচারীকে বলেন যে, তিনি জামাইয়ের কাঁধে ভর করে গেট পর্যন্ত যাবেন। আমার কাঁধে ভর করে যাওয়ার এক পর্যায়ে তিনি আমার কানে ফিস ফিস করে বলেন, "ওয়াজেদ, তুমি ইসলামাবাদে গিয়ে তোমার সহকর্মীদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবী সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ছয়-দফা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জেনে নেবে। ব্যাটাদের এবার দেখিয়ে দেবো।" এরপর তাঁকে জেল গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমরা সবাই ফিরে এলাম।

২৬। আমি নির্ধারিত তারিখে ইসলামাবাদে পৌঁছাই। ইসলামাবাদ বিমান বন্দর থেকে আমাকে পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের একজন বাঙ্গালী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আমার বড় বোনের বড় ছেলে আবদুল কাইয়ুম সরকারের বাসায় নিয়ে যান। আমার ভাগ্নে বৌ তখন পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের আমার এম. এসসি. থিসিসের তৎকালীন সুপারভাইজার অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদও ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। আমার ভাগ্নে ও অধ্যাপক হারুন এই দুইজন মাত্র বাঙ্গালী ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পেয়েছিলেন। যথারীতি কর্মশালা শুরু হয়। এই সুযোগে আমার পাঞ্জাবী সহকর্মী এবং আমার লন্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল কলেজে থাকাকালীন পরিচিত পাঞ্জাবী শিক্ষকদের সঙ্গে মেলামেশা করি। তাঁরা সবাই শেখ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে জেনে বাহ্যত আমাকে অভিনন্দন জানায়। তারা চা বিরতি ও মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আলাপ-আলোচনার মাঝে কখনো কখনো ছয় দফার প্রসঙ্গ টেনে আনে। এভাবে আমি ছয় দফার দাবির ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানীদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করি।

২৭। ২০শে জানুয়ারী (১৯৬৮) রাতে ভাগ্নে আমাকে জানায় যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোক শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বিশেষ আইনের আওতায় গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে বলে গোপন সূত্র থেকে সে জানতে পেরেছে। এর পরদিন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের মাঝে বেশ গম্ভীর হয়ে চুপচাপ থাকা এবং আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করি।

২৮। আমি ২৫শে জানুয়ারী ঢাকায় ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। প্লেনে একটা ইংরেজী খবরের কাগজে শেখ সাহেব, তিনজন উর্ধ্বতন সি. এস. পি. কর্মকর্তাসহ মোট পঁয়ত্রিশ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানতে পারি। ঢাকায় ধানমন্ডির শ্বশুরের বাসায় দেখি যে, সবাই চুপচাপ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটু পরেই শাশুড়ী আমাকে নীচু স্বরে বলেন, "বাবা, গত ১৮ই জানুয়ারী গভীর রাতে তোমার শ্বশুরকে সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। গত সপ্তাহ থেকে বহু জায়গায় এবং বহু লোকের

সঙ্গে যোগাযোগ করেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে কোথায় নেয়া হয়েছে, তিনি কি অবস্থায় আছেন সে সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে পারিনি।" একথা বলার সময় শাশুড়ীকে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম এবং তিনি কোনক্রমেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলেন না। এর পর এপ্রিল মাস (১৯৬৮)-এর গোড়ার দিকে একদিন শাশুড়ী আমাকে জানান, "শেখ সাহেবসহ আরো ৩৪ জন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় জড়িয়ে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টের কোথায় কি অবস্থায় রাখা হয়েছে এখন পর্যন্তও কিছু জানতে পারিনি।"

২৯। এর মাস খানেক পর ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ ভবনে তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার" আনুষ্ঠানিক বিচারের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পাওয়া যায়। এর প্রায় দুই সপ্তাহ পর একদিন সকাল বেলা সাদা পোশাক পরিহিত দুজন কর্মকর্তা বাসায় এসে আমাদের জানায় যে, সেদিন বিকেল তিনটায় শাশুড়ী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সরকার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা বিকেলে শাশুড়ীকে বাসায় এসে নিয়ে যাবেন বলে জানান। উক্ত সাক্ষাৎকারের তালিকায় আমার নাম ছিলো না। শাশুড়ী, হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, রেহানা ও শিশু রাসেলকে যথাসময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ছিলো শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়" গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎ। এর দুই সপ্তাহ পর আবার সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়। ঐ সাক্ষাৎকারের তালিকায় শেখ সাহেবের পরিবারবর্গের সদস্যদের মধ্য আমাকেও প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর পরবর্তীতে প্রতি সপ্তাহের সাক্ষাতের অনুমতির তালিকায় কেবল দুই সপ্তাহ পর পর আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

৩০। ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন তারিখে তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়" শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব ফজলুর রহমান, শামসুর রহমান, রুহুল কুদ্দুসসহ আরো ৩০ জনকে অভিযুক্ত করে উক্ত মামলা শুরু করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হক উপরিউক্ত ৩৫ জনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে আইয়ুব খানের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদেরকে প্রধান কৌসুলী করে উক্ত মামলা পরিচালনা করার জন্য একটি কৌসুলী ও পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়। শেখ মুজিবের সম্পর্কে মামা শ্বশুর পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের এডভোকেট জনাব সালাম খানকে আসামীদের পক্ষ থেকে প্রধান কৌসুলী নিয়োগ করা হয় এবং জনাব আতাউর রহমান খান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এডভোকেট কে. এস. নবী, ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম, প্রমুখকে এডভোকেট আবদুস সালামের সহকারী নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও ড: কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, (তখনো তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না) প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় এডভোকেট আবদুস সালামকে সহায়তা করেন। যথাসময়ে

মামলা শুরু হয়। মামলার সময়ে পরিবার বা বাইরের কাউকে কোর্টে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। সরকার পক্ষ রাজসাক্ষী হিসেবে শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ বোনের একমাত্র কন্যার স্বামী মীর আশরাফ উদ্দিনসহ দুই শতাধিক জন সাক্ষীর নাম ঘোষণা করে।

৩১. ৬ই আগস্ট (১৯৬৮) তারিখ বিকেলে অফিস থেকে হাসিনাদের বাসায় ফিরে দেখি হাসিনা বিছানায় কাঁথা মুড়ে শুয়ে আছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে হাসিনা জানায় যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস শেষে বাসায় আসার পর তার পেটে ভীষণ ব্যথা ও যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাক্তার আনা হয়েছিলো, কিছু ওষুধপত্র খেতে দিয়েছেন যার ফলে ব্যথা একটু কমেছিলো। ডাক্তার বলেছেন যে, অ্যাপেনডিসাইটিস এমন ব্যথার কারণ হতে পারে। পরদিন এক্সরে করার পরামর্শ দিয়েছেন। এক্সরে রিপোর্ট দেখার পর ডাক্তার বলেন যে, অবিলম্বে অপারেশন করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই সংবাদে আমার শাশুড়ী ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আমি শাশুড়ীকে দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,"বাবা, কার সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি ও অপারেশন করাবো? গভর্নর মোনেম খান সরকারের চক্ষুশূল হওয়ার ভয়ে কেউ সম্মত হবে না বলে আমার ভয় করছে।"

৩২। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর ছাত্রলীগের আমিনুল হক বাদশা ডা: সার্জেন্ট আসিরুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এ দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। অতঃপর ৮ই আগস্টে হাসিনাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি পুরাতন কেবিনে ভর্তি করা হয়। আমার শাশুড়ী আমাকে আমার আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিস কাছাকাছি হওয়ায় দিনের বেলায় মাঝে মধ্যে হাসিনাকে দেখে আসতে এবং রাতে কেবিনে থাকতে বলেন। শাশুড়ী দুপুরে ও রাতে হাসিনার জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। আমি রোজ অফিস সময়ের পর হাসপাতালে চলে যেতাম। হাসিনা কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর ১৪ই আগস্ট অপারেশনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন সম্পন্ন হয়। অপারেশনের ঘন্টাখানেক পর শাশুড়ী ও আমাকে পোস্ট অপারেশন কক্ষে হাসিনাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তখন আমাদের বলা হয় যে, তাকে প্যাথিডিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, আমরা যেন তার সঙ্গে কথা না বলি। পানি থেকে সদ্য ধরা মাছ যেমন ছটফট করে, প্যাথিডিন ইনজেকশন দেয়া সত্ত্বেও হাসিনাকে বিছানায় তদ্রূপ ছটফট করতে দেখি। এ অবস্থা দেখে আমি কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম এবং শাশুড়ী অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলেন না। পরদিন হাসিনাকে কেবিনে ফিরিয়ে আনা হয়। আস্তে আস্তে হাসিনা সুস্থ হয়ে ওঠে। একদিন হাসিনা আমাকে বলে, "তুমি জান কি এই কেবিনের চারটা কেবিনের উত্তরে কবি জসীম উদ্‌দীন সাহেব ভর্তি হয়েছেন? তিনি প্রায়ই আমার কেবিনে আমার কুশলাদি জানার জন্য আসেন এবং অনেক মজার গল্প শুনিয়ে যান।" এ কথা শোনার পর আমি কবি জসীম উদ্‌দীনের কেবিনে যাই তাঁর কুশলাদি জানার জন্য। এর দু'দিন পর হাসিনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৩৩। এর কিছুদিন পর হাসিনাকে ১৯৬৭ সালের ১৭ই নভেম্বরে আমাদের বিয়ের "আক্‌ত" অনুষ্ঠান অত তড়িঘড়ি করে কেন সম্পন্ন করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে জানতে চাইলে সে আমাকে জানায়, "১৯৬৬ সালে আব্বা কর্তৃক ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রতি বিপুল জনসমর্থন দেখে গভর্নর মোনেম খাঁর সরকার তখন দেশের বিভিন্ন শহরগঞ্জে আয়োজিত জনসভায় তিনি যাতে ভাষণ দিতে না পারেন সেজন্য তাঁকে পর পর বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার করতে থাকে এবং পরিশেষে তাঁকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখে। এরপর পরিবারবর্গের ওপর শুরু করা হয় নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন। শেখ ফজলুল হক মণিকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে আব্বা-আম্মা চিন্তিত হয়ে আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে এক সি. এস. পি. (CSP)-এর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। ঐ সময় গভর্নর মোনেম খান সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন যে, আমাকে তাঁদের কেউ বিয়ে করলে তাঁকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা হতে পারে। এ কারণে ঐ ভদ্রলোকের পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনও একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। তাছাড়া ভদ্রলোকের দাড়ি ছিল, যে কারণে ঐ প্রস্তাবে আমি বেশী খুশী ছিলাম না। অতঃপর ঐ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। আমার বিয়ে সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রস্তাব আসে বিদেশ থেকে চার্টারড একাউন্টে ডিগ্রী নিয়ে সদ্য দেশে ফেরত আসা এক ভদ্রলোকের পরিবারের কাছ থেকে। ভদ্রলোকটি আমার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো হওয়ায় আমি ঐ বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হইনি। এরপর আসে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব। তোমার উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশী হওয়ায় আমি বেশ কিছু চিন্তা করে এতে রাজী হলাম। তাছাড়া তুমি একজন পরমাণু বিজ্ঞানী জেনে মনে মনে আমি বেশ খুশীও হয়েছিলাম।"

৩৪। এদিকে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার রাজসাক্ষীদের এক এক করে জেরা চলতে থাকে এবং কোর্টের ধারাবিবরণী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ হতে থাকে। আইনজীবীদের খরচ বহনের অর্থ যোগানের পুরো দায়িত্ব আমার শাশুড়ীর ওপর এসে পড়ে। কারণ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, যেমন আতাউর রহমান খান, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আমেনা বেগম, তাঁরা এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে গড়িমসি করেন।

৩৫। তখন শাশুড়ীর সংসারে অর্থ সংকট আমি লক্ষ্য করি। একদিন বিকেলে এককালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল আউয়াল শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। তখন জনাব আউয়াল আদমজী জুট মিলসের কেন্দ্রীয় অফিসে উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। আলাপের এক পর্যায়ে তিনি শাশুড়ীকে বলেন যে, শেখ কামালের জন্য আদমজী জুট মিলসের কেন্দ্রীয় অফিসে একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাঁকে

অফিসে বিশেষ কিছু করতে হবে না। প্রতি মাসের বেতন হিসেবে সে দু'হাজার টাকা পাবে। ঐ সময় প্রধান কৌসুলী সালাম সাহেব তাঁর বকেয়া ফি পরিশোধ না করায় কোর্টে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে শাশুড়ী ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার খরচের অর্থ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কুপন ছাপায়। ঐ বৎসরে শাশুড়ী তাঁর সম্পর্কে ছোট ভাই, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত শেখ আকরাম হোসেন ও শেখ সাহেবের আপন ফুফাত ভাই জনাব মোমিনুল হক খোকার মাধ্যমে অতি কষ্টে ও গোপনে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করেন। এরপর সালাম সাহেবের বকেয়া ফি আংশিকভাবে পরিশোধ করা হয়। তারপর থেকে এডভোকেট সালাম সাহেব পুনরায় কোর্টে যাওয়া শুরু করেন।

৩৬। রাজসাক্ষীদের জেরার প্রকাশিত বিবরণী থেকে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলাটি আইয়ুব খান সরকার কর্তৃক সাজানো ও ভিত্তিহীন। বাঙ্গালী জনসাধারণ আস্তে আস্তে বুঝতে পারে যে, শেখ মুজিবকে ফাঁসি দিয়ে তাঁর ৬-দফার আন্দোলন খতম করাই ছিলো আইয়ুব খান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের একদিন বিকেলে শেখ সাহেবের সঙ্গে শাশুড়ীসহ দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, "বাবা ওয়াজেদ, জানি না মামলা কতদিন চলবে এবং এর থেকে আমি আদৌ মুক্তি পাবো কিনা। তুমি আর অপেক্ষা না করে হাসুকে (হাসিনাকে) আনুষ্ঠানিকভাবে উঠিয়ে নাও।"

৩৭। এরপর তড়িঘড়ি করে কেবল আণবিক শক্তি কেন্দ্রের আমার সহকর্মীদের, আমার আত্মীয়-স্বজনদের এবং শেখ সাহেবের আত্মীয়-স্বজনদের মৌখিকভাবে দাওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ই নভেম্বর (১৯৬৮) অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ''আগরতলা ষড়াযন্ত্র'' মামলার আমাদের পক্ষের সব কৌসুলীদের মৌখিক-ভাবে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও একমাত্র এডভোকেট সালাম খান শেখ সাহেবের মামাশ্বশুর হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমার আত্মীয়দের পক্ষ থেকে আমার একমাত্র মামা, বড় দুলাভাই ও বড় ভাই উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে সমর্থ হন।

৩৮। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমার পক্ষ থেকে কাপড়-চোপড় ছাড়া কোন অলংকার দেয়া সম্ভব হয়নি। ঐ অনুষ্ঠানে কোন আলোকসজ্জারও ব্যবস্থা করা হয়নি। শেখ সাহেবের আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে কিছু অলঙ্কার ও সামান্য উপহার দেয়া হয়েছিলো। অনুষ্ঠানের খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষের এক পর্যায়ে এডভোকেট সাহেব আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে বলেন, "ভাই, আমি তোমাকে বিশেষ কিছু দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত।" এই বলে তিনি আমার পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দেন। অনুষ্ঠান শেষে দেখি সালাম সাহেব আমাকে দশটি দশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নোক্ত শিরোনামে সংবাদ পরিবেশিত হয়, "শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠা তনয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নিরানন্দ ও আলোকসজ্জাবিহীন পরিবেশে।"

৩৯। তখন গভর্নর মোনেম খান বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অকল্পনীয় ত্রাসের অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। যে সমস্ত ছাত্রাবাসে ছাত্র ফেডারেশনের প্রাধান্য ছিল সেগুলোতে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিলো। সে সব হলে ছাত্র ফেডারেশনের গুণ্ডাদের সর্দারেরা হলের প্রভোস্টের অফিস থেকে ভয় দেখিয়ে অফিস টেলিফোন নিজ কক্ষে নিয়ে রেখেছিলো। এই হলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ঢাকা হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। গুণ্ডার সর্দারদের কক্ষে রাতে মদ খাওয়া ও নারীদের নিয়ে অসামাজিক কর্মকাণ্ড চলতো। ঢাকা হলের ছাত্র গুন্ডাদের সর্দার ছিলো খোকা নামের এক ছাত্র এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্র গুণ্ডাদের সর্দার ছিলো "পাচপাত্তু" নামের একজন গুণ্ডা। ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র গুণ্ডাদের প্রধান ছিলো স্বয়ং গভর্নর মোনেম খানের দুই ছেলে। এদের ভয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চলাফেরা করতে ভয় পেতো। ঐ বছর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রংপুর জেলার আবদুর রউফ ও নোয়াখালী জেলার খালেদ মোহাম্মদ আলী। ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ছাত্রলীগের বরিশাল জেলার তোফায়েল আহমেদ এবং ছাত্র ফেডারেশনের নাজিম কামরান চৌধুরী। নভেম্বরের শেষের দিকে আমি হাসিনাকে নিয়ে ছাত্রলীগের আবদুর রউফ, খালেক মোহাম্মদ আলী ও তোফায়েল আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। প্রায় সাতদিন খোঁজাখুজির পর ঢাকা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফকে একজন বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় পাই। বিদেশী ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর আবদুর রউফকে জানাই যে, "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলাকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন সংগঠন করার জন্য আমার শাশুড়ী তাদেরকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। আবদুর রউফ আমাকে বলে, "ওয়াজেদ ভাই, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথেও এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে।"

৪০। তখন বিদেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন ও কর্মরত বাঙ্গালী ছাত্র ও জনগণ শেখ মুজিবের ৬-দফার বাস্তবায়ন ও তার বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনমূলক বিভিন্ন তৎপরতা চালায়। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন ও কর্মরত এবং শেখ সাহেবের অনুরাগী ও ৬-দফার সমর্থক ছাত্ররা ও বাঙ্গালী জনসাধারণ চাঁদা সংগ্রহ করে বৃটিশ লেবার পার্টির তৎকালীন পার্লামেন্টের সদস্য ও প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়ামস, কিউ. সি.-কে ঢাকায় পাঠান 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার বিবাদী পক্ষের কৌসুলীদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য। স্যার উইলিয়ামস কোর্টে উপস্থিত হয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার রাজসাক্ষী ও সরকারী কৌসুলীদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে শেখ মুজিব ও অন্যান্য আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অসারতা প্রমাণে অনেকাংশে সফল

হন। উল্লেখ্য, প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্যার টমাস ইউলিয়ামসের শুধু ফিসের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর ঢাকায় অবস্থানের ব্যয় শাশুড়ীকে অতি কষ্টে মেটাতে হয়েছিলো।

৪১। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন বিকেলে আমি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমদ ও আরও কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্র–শিক্ষক' কেন্দ্রের ক্যান্টিনে এক বৈঠকে মিলিত হই আওয়ামী লীগের ৬–দফা বাস্তবায়নের দাবি ও 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে আলাপ–আলোচনার জন্য। উক্ত বৈঠক প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে। তখন উপস্থিত ছাত্রনেতাদের মোটামুটি সবাই বলে যে, সফল ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনকে সঙ্গে নিতে হবে। অতঃপর সে সময়ের প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ ও পরামর্শপূর্বক শেখ মুজিবের ৬–দফার বাস্তবায়ন ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবি ছাড়াও শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ, কৃষক–শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়, আপামর জনসাধারণের কল্যাণকর আর্থ–সামাজিক নীতি প্রবর্তন এবং জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও যুক্তিযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের দাবি ব্যক্ত করে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। এর দিন দশেক পর ছাত্রলীগের উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ আমাকে জানায় যে, পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করে একটি ১১–দফাসম্বলিত দাবিনামা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবি তৎসম্পর্কিত গঠিত কোর্টের অবমাননা করার সামিল হতে পারে বলে পিকিং (বেইজিং)–পন্থী ছাত্র ইউনিয়নের কতিপয় নেতা মন্তব্য করেছে। অতএব এ বিষয়ে উল্লিখিত ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আরও বিশদ আলাপের প্রয়োজন রয়েছে বলে ছাত্রলীগের নেতারা আমাকে অবহিত করে। এ সমস্ত আলাপ–আলোচনায় সমাপ্ত হয় ১৯৬৮ সালে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
১৯৬৯–১৯৭০ সাল

১। ছাত্রলীগ এবং তৎকালীন মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী উভয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের ৬–দফার বাস্তবায়ন ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহার, শিক্ষা ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, কৃষক-শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়, জনকল্যাণমূলক আর্থ–সামাজিক নীতি প্রবর্তন, জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও যুক্তিযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ, ইত্যাদি বিষয়ের দাবি উল্লেখপূর্বক ছাত্র–জনতার আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে ১১–দফার দাবিনামা এক ইশতেহারের মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে। একই সঙ্গে তারা সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১১–দফার দাবিতে আন্দোলন করার আহ্বান জানায় ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও আপামর-জনসাধারণের প্রতি। উক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন 'ডাকসু'–এর সহ-সভাপতি ও ছাত্রলীগের তোফায়েল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্র ফেডারেশনের নাজিম কামরান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এবং পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও সহ–সম্পাদিকা দীপা দত্ত। উল্লেখ্য যে, ছাত্র ফেডারেশনের নাজিম কামরান চৌধুরী 'ডাকসু'–এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উক্ত যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর করলেও তখনও ছাত্র ফেডারেশন দলগতভাবে ছাত্রদের ১১–দফার প্রতি সমর্থন জানায় নি।

২। এদিকে ঢাকায় নেজামে ইসলামের বিশিষ্ট নেতা ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, এনডিএফ-এর বিশিষ্ট নেতা ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী নূরুল আমিন, জামাতে ইসলামীর মিয়া মোহাম্মদ তোফায়েল, পিডিপি–এর নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি ও পশ্চিম পাঞ্জাবের

প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন আইয়ুব খানের বেসিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসনের অবসানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করতে। অবশেষে ৮ই জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে উপরিউক্ত ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'—সংক্ষেপে (ডাক)-গঠন করা হয়। ১২ই জানুয়ারী (১৯৬৯) 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' 'ডাক'-এর নেতৃবৃন্দের আহ্বান জানায় ছাত্রদের ১১-দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য। কিন্তু 'ডাক'-এর অনেক নেতা 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র ১১-দফার প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। ঐ সময় একদিন সকালে অফিসে যাওয়ার পথে আমি তৎকালীন ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)-এর সামনে অনেক ছাত্রের সমাবেশ দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে সমবেত ছাত্রদের ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান, মোস্তফা মহসিন মন্টু, খায়রুল আলম খসরু প্রমুখ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মিজানুর রহমান চৌধুরীকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র ১১-দফার প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানানোর দাবি করতে দেখতে পাই। এক পর্যায়ে ছাত্ররা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হয়। আমি তখন ছাত্রদের শান্ত করে মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সেখান থেকে নিয়ে আসি।

৩। উপরিউক্ত ঘটনার পরদিন সকাল ৯টার দিকে আমি হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে ইকবাল হলে গিয়ে ছাত্রলীগের আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমদ ও সিরাজুল আলম খানকে একত্রে আলাপরত দেখতে পাই। তারা আমাদের জানায় যে, শেখ সাহেবের 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র ১১-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুনিশ্চিত হতে চায়। অতঃপর সাব্যস্ত হয় যে, ছাত্রলীগের আবদুর রউফ ও তোফায়েল আহমদ যৌথভাবে এক পত্রের মাধ্যমে উভয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের উল্লিখিত প্রশ্ন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার প্রতি ছাত্র-জনতা, বিশেষ করে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন, ৮ দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ১১-দফার প্রতি মনোভাব, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইত্যাদি বিষয়ে শেখ সাহেবকে অবহিত করবে। তখন উপরিউক্ত চিঠিটি লেখা হয় ইকবাল হলের পুকুরের পাড়ে বসে।

৪। সেদিন আবদুর রউফ ও তোফায়েল আহমদের যৌথ স্বাক্ষরিত চিঠিটি নিয়ে হাসিনা ও আমি ইকবাল হল থেকে সোজা ক্যান্টনমেন্টে শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই। শেখ সাহেব তখন তাঁর সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনেককে আটকে রাখা সামরিক মেসের তাঁর কক্ষের বারান্দায় বসেছিলেন। তাঁর থেকে কিছু দূরে এক সামরিক কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই শেখ সাহেব উচ্চ স্বরে কর্তব্যরত সামরিক

কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন, "আমার মেয়ে ও জামাই এসেছে আমাকে কিছু বলার জন্য। আমি গেটে গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।" উক্ত সামরিক কর্মকর্তা এ ব্যাপারে কোন কিছু বলার আগেই শেখ সাহেব দ্রুত মেসের গেটের কাছে চলে আসেন। তখন হাসিনা ও আমি গেটের একটু ভেতরে প্রবেশ করি। শেখ সাহেব 'মা হাসু' বলে হাসিনাকে জড়িয়ে ধরলে ঐ সুযোগে সে ছাত্র-নেতাদের চিঠিটি তাঁর গেঞ্জির নীচে গুঁজে দেয়। এ পরিস্থিতি দেখে ঐ সামরিক কর্মকর্তাও গেটের দিকে আসতে থাকেন। কিন্তু সেই সামরিক কর্মকর্তার গেটে পৌছার আগেই শেখ সাহেবকে ছাত্র-নেতাদের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করি। তখন শেখ সাহেব আমাদের পরদিন একইভাবে ছাত্রলীগের আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও তোফায়েল আহমদকে ঐ সামরিক মেসের গেটের কাছে আনতে বলেন। এরপর পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলে আমরা সেখান থেকে চলে আসি।

৫। পরদিন সকাল ১০টায় হাসিনা ও আমি ছাত্রলীগের আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও তোফায়েল আহমদকে আমার গাড়ীতে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টের ঐ সামরিক মেসের গেটের কাছে নিয়ে যাই। শেখ সাহেব সেদিনও একই কৌশলে গেটের কাছে চলে আসেন। সেদিনও একই সামরিক কর্মকর্তা উক্ত মেসের বারান্দায় কর্তব্যরত ছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বে আমাদেরকে দেখেছেন বলে তখন কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। এই সুযোগে শেখ সাহেব গেটের একটু বাইরে এসে তিন ছাত্র-নেতাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "তোমাদের ১১-দফার দাবিকে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন করি এবং তোমাদের নেতৃত্বের ওপর আমার গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের আন্দোলন ফলপ্রসূ হবে। তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।" ইত্যবসরে উক্ত সামরিক কর্মকর্তা সেখানে এসে পৌছায়। তখন শেখ সাহেব আগের মতোই পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথাবার্তা বলে আমাদের বিদায় দিয়ে ঐ সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে মেসের ভেতর চলে যান।

৬। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৬৯) ছিল 'ডাক' আহূত গণতন্ত্রের দাবিতে সারা দেশে মিছিল ও শোভাযাত্রা প্রদর্শনের কর্মসূচী। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরসহ বিশেষ বিশেষ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এদিন তৎকালীন ডাকসু-এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরের 'বটতলা'য় একটি ছাত্রসভা আয়োজন করা হয়। সভাশেষে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ওপর বেপরোয়াভাবে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে। এমন কি পুলিশ ছাত্রীদের কমনরুমে ঢুকেও মেয়েদের বেদম প্রহার করে। আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিস থেকে আমরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। পুলিশের সঙ্গে এহেন সংঘর্ষের এক পর্যায়ে হাসিনা কয়েকজন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পেছনের গেট দিয়ে আমাদের অফিসে প্রবেশ করে। তখন তাদের কারও পায়ে স্যান্ডেল ছিলো না। কারণ পুলিশের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালানোর সময় তারা তাদের পায়ের স্যান্ডেল ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিলো। যাহোক,

আমি তাড়াতাড়ি অতি কষ্টে গাড়ীতে অন্যান্য ছাত্রীকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে হাসিনাকে নিয়ে শেখ সাহেবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসায় যাই।

৭। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্মম হামলার ঘটনায় ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অতঃপর 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পরদিন অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬৯) থেকে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করে। একই সঙ্গে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' শেখ মুজিবের ৬–দফাসহ ছাত্রদের ১১ দফার দাবি আদায় এবং তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং তা সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ছাত্র–কৃষক–শ্রমিকসহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়।

৮। ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র আহবানে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এদিনও ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ছাত্র–মিছিলের ওপর বেপরোয়া কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে। রমনা ও গুলিস্তান এলাকায় পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একটি ইপিআরটিসির ডবল ডেকার বাস অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। সেদিন ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৫ জন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। সন্ধ্যায় সরকার ইপিআর বাহিনী তলব করে। রাতে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক) হল ও জিন্নাহ (বর্তমানে সূর্যসেন) হলে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ছাত্রদের মারধর করে এবং অনেককে গ্রেফতার করে।

৯। ২০শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র আহ্বানে প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এদিনও ঢাকায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে। শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো কলাভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগ) উল্টো দিকে অবস্থিত পেট্রোল পাম্পের নিকট জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টরের রিভলভারের গুলিতে প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হয়। উক্ত ঘটনার পর হাজার হাজার ছাত্র–জনতা আসাদুজ্জামানের লাশ দেখার জন্য ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে যায়। এক পর্যায়ে পুলিশের আইজির নেতৃত্বে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর লোকেরা ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে কয়েকবার হামলা চালায় আসাদুজ্জামানের লাশ দখলের জন্য। কিন্তু ছাত্র–জনতার প্রতিরোধের মুখে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এরপর তৎকালীন ডাকসুর সহ–সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল চত্বরে হাজার হাজার ছাত্র–জনতার এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভা শেষে আসাদুজ্জামানের লাশ নিয়ে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার শোক মিছিল ঢাকার কয়েকটি রাস্তা প্রদক্ষিণ করে।

১০। ২১শে জানুয়ারী (১৯৬৯) ছিল ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান হত্যার প্রতিবাদে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আহূত সারা প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। এদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো ঢাকায় লক্ষাধিক ছাত্র-জনতার শোক মিছিল। দেশের অন্যান্য শহরেও ছাত্ররা শোক মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকার কয়েকটি ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর লোকেরা লাঠি চার্জ ও গুলি বর্ষণ করে। সেদিন ঢাকায় পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-জনতার এ সমস্ত সংঘর্ষের ঘটনার ২৯ জন আহত ও ৬৯ জন গ্রেফতার হয়। এদিন শহীদ আসাদুজ্জামানের লাশ তার নিজ গ্রামে দাফন করার সময় দশ হাজারেরও বেশী লোকের সমাগম হয়।

১১। ইত্যবসরে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত ৬-দফার বাস্তবায়ন ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারসহ ১১-দফার দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ঢাকায় আহবান করা হয় জাতীয় পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন। ২২শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ঘোষণা করে ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে প্রদেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী। এরই প্রেক্ষাপটে গভর্নর মোনেম খানের নির্দেশে এদিন সারা ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার আশেপাশে শিল্প এলাকার শ্রমিক 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আহূত আন্দোলন কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করে ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। এদিন সকাল ১০টার দিকে কয়েক লাখ ছাত্র-শ্রমিক-জনতায় ভরে যায় ঢাকার সচিবালয় এলাকা, ডিআইটি এভিনিউ ও মতিঝিল এলাকায় কয়েকটি রাস্তা। এগারটার দিকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর বাধা অগ্রাহ্য করে তৎকালীন আইয়ুব-সমর্থক ট্রাস্টের পত্রিকা মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা) অফিসের লোহার গেট ও প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে এবং পত্রিকাদ্বয়ের বিভিন্ন কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান অফিস ছাড়াও ঐ সমস্ত এলাকায় পার্কিং করা বহু সংখ্যক গাড়ীও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। এ সমস্ত ঘটনার সময় পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করলে ঘটনাস্থলেই ৪ জন নিহত ও বহু আহত হয়। অন্যদিকে কয়েক হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা আবদুল গনি রোডে আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলীম লীগের দুজন এম. এন.-এর বাসভবন এবং রমনা গেটের নিকটবর্তী তৎকালীন পাকিস্তান স্টেট গেস্ট হাউসে অগ্নিসংযোগ করে। উভয় স্থানেই পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে জনাকয়েক নিহত ও বহু আহত হয়। এদিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরেও পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত

ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হয়। সেদিন পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর গুলিতে ময়মনসিংহে ২ জন, চট্টগ্রামে ১ জন এবং খুলনায় ৩ জন নিহত হয়। এ সমস্ত সরকারী নির্যাতনমূলক ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিরোধী দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করে। এদিন সন্ধ্যায় সরকার ঢাকায় সামরিক বাহিনী তলব এবং ৩৬ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন বলবৎ করে। এই দিনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আইয়ুব খানের সরকারবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। আইয়ুব-মোনেমবিরোধী গণআন্দোলনের এই পর্যায়ে ছাত্র ফেডারেশন দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং উক্ত ছাত্র সংগঠনের তৎকালীন সভাপতি ইব্রাহীম খলিল, সাধারণ সম্পাদক ফকরুল ইসলাম মুন্সী, বিশিষ্ট নেতা মাহবুবুল হক দোলনসহ বহু নেতা ও কর্মী ছাত্রদের ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন প্রদানপূর্বক 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে' যোগদান করে।

১২। ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল শহর, বন্দর, গ্রাম ও গঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে থাকে ৬-দফার বাস্তবায়ন ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবিসহ ১১-দফার দাবিতে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক জনতার আন্দোলন। সর্বত্রই আন্দোলনরত কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার মুখে উচ্চারিত হয়, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, মানি না, মানবো না' জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো', '৬-দফা, ১১-দফা, মানতে হবে', 'আইয়ুব-মোনেমের গদিতে, আগুন জ্বালো এক সাথে', ইত্যাদি শ্লোগান। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ঢাকায় সান্ধ্য আইন ভঙ্গের সময় সেনা বাহিনীর গুলিতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আবদুল লতিফসহ ২ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। এদিনে ময়মনসিংহে এক শোক মিছিলে পুলিশ লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। উক্ত ঘটনায় ৮৪ জন গ্রেফতার ও বহু আহত হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এদিন বিকেলে গভর্নর মোনেম খানের নির্দেশে নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ফতুল্লা এলাকাসমূহে বিকেল ৫টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য কারফিউ জারি করা হয়। প্রদেশের অন্যান্য শহরেও পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হয়। ২৫শে জানুয়ারী রাতে ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও ২৪ ঘন্টার জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

১৩। ২৬শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করতে শুরু করলে তখন টহলরত সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল তাদের ওপর গুলি বর্ষণ করে। উক্ত ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়। এদিন ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালিয়ে ৮৫ জনকে গ্রেফতার করে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করায় এদিন রাতে সরকার ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও ময়মনসিংহ শহরসমূহে সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরও ৩৬ ঘন্টার জন্য বৃদ্ধি করে। ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৯) প্রদেশের বিভিন্ন শহরে হরতাল, সান্ধ্য আইন ও সেনা বাহিনীর

টহল দান অব্যাহত থাকে। ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে বরিশালে এক গণমিছিলের ওপর পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী গুলি বর্ষণ করে। ২৯শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী যৌথভাবে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারে হামলা চালিয়ে ৪৫ জনকে গ্রেফতার করে। ইত্যবসরে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আহূত গণআন্দোলনের আরও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ ঘটে। ৩০শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে মাদারীপুরের জাজিরায় পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়। ভেদেরগঞ্জে বিক্ষুব্ধ ছাত্র–জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ৮টি রাজনৈতিক দল গঠিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক)'–এর পক্ষ থেকে ছাত্র–জনতার প্রতি আহ্বান জানানো হয় গণআন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য। একই সঙ্গে ৮ দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' ছাত্র–জনতার ওপর সরকারের নির্যাতনমূলক ও অমানবিক আচার–আচরণ ও কার্যকলাপের প্রতিবাদে এদিনটি পালন করে শোক দিবস হিসেবে।

১৪। ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে গোপালগঞ্জের জলির পাড়ে মারমুখী ছাত্র–জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে ১ জন নিহত ও বহু আহত হয়। একই দিনে বাগেরহাটে বিক্ষুব্ধ ছাত্র–জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এবং উক্ত ঘটনায় ২ জন নিহত ও বহু আহত হয়। এদিন রাতে প্রদেশের ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে পুলিশ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সরকারের এ সমস্ত নির্যাতন, দমন ও নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ সত্ত্বেও গণআন্দোলন ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ আকার ধারণ করে। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদেশের রংপুরসহ বিভিন্ন শহরে ছাত্র–জনতার মিছিলে মহিলারাও অংশ গ্রহণ করে সরকারের নির্যাতনমূলক ও অমানবিক নীতি ও পদক্ষেপের প্রতিবাদে। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) সাংবাদিকরাও ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করে আইয়ুব খান সরকারের এহেন নির্যাতনমূলক ও অমানবিক নীতির প্রতিবাদে। বিদেশে, বিশেষ করে লন্ডনে অধ্যয়ন ও কর্মরত বাঙ্গালীরাও ৬–দফার বাস্তবায়ন, তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহার এবং আইয়ুব খান সরকারের ছাত্র–জনতার প্রতি নির্যাতনমূলক ও অমানবিক নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে আইয়ুব খান জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসেবে পাকিস্তানের দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ–আলোচনার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোল টেবিল বৈঠকের (RTC) প্রস্তাব করেন। একই দিনে আইয়ুব খান তৎকালীন পিডিএফ নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের ওপর অর্পণ করেন দেশের যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে উক্ত বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্ব। এদিকে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' আইয়ুব খানের নির্যাতনমূলক ও অমানবিক নীতি বন্ধ করা, গ্রেফতারকৃত ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দেয়া

এবং সর্বোপরি ৬–দফা বাস্তবায়ন ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারসহ তাদের ১১ দফা দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান না করার জন্য ৮–দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'র নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানায়।

১৫। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন। ইতোপূর্বে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ছাত্র–জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলো এদিনটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালনের জন্য। সেদিন ঢাকায় বিশ হাজারেরও অধিক ছাত্র–জনতা আইয়ুব খানকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে। যাহোক, এদিন সরকার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে সেনাবাহিনী ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আইয়ুব খানের সরকার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রকাশনা ও প্রেস বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রত্যাহার করে।

১৬। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ছিল সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র পুরানো পল্টনে আয়োজিত জনসভা। উক্ত সভায় সভাপতির ভাষণে ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা ও ডাকসু–এর তৎকালীন সহ–সভাপতি তোফায়েল আহমদ বলেন, "তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি দান, আন্দোলনের সময় নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা এবং ছাত্র, রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে জারিকৃত হুলিয়া প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আইয়ুব খানের আহূত গোল টেবিল বৈঠকের প্রশ্নই বিবেচিত হতে পারে না।" ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে 'শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি দিবস' হিসেবে পালিত হয় সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র আহ্বানে। এদিনে ছাত্ররা ঢাকাসহ প্রদেশের সকল শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা–সমাবেশের আয়োজন করে।

১৭। ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ থেকে সরকার প্রদেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে ছাত্র, শ্রমিক এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দেয়া শুরু করে। ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান। সেদিন আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন এবং ছাত্রলীগ ও সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র অনেক নেতা ও কর্মী জেল গেটে গিয়ে জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। অন্যদের সঙ্গে আমিও সেদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে উপস্থিত ছিলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান আওয়ামী লীগের ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমদসহ ৬৫ জন ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। এদিনও আমি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে উপস্থিত ছিলাম উল্লিখিত নেতা ও কর্মীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

১৮। তখন আইয়ুব খান কিছু ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে জেল থেকে মুক্তি দিলেও 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নিঃশর্ত প্রত্যাহার করে শেখ সাহেবকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বিভিন্ন প্রকারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন শেখ সাহেবকে ছাড়াই রাওয়ালপিন্ডিতে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সদ্য কারামুক্ত তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দলের সভাপতি শেখ সাহেবকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ৮-দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'কে বাধ্য করেন 'শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি'তে ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে সারা প্রদেশে সর্বাত্মক অর্ধ দিবস হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করতে। 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' আহূত ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখের হরতালের কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা জানায় সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' শ্রমিক সমাজ ও অন্যান্য সংগঠন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে হরতাল শেষে তৎকালীন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল জনসভা। উক্ত জনসভায় ৮-দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান আহূত গোল টেবিল বৈঠক অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে না।

১৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র আহ্বানে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নিঃশর্ত প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ঢাকাসহ দেশের সকল শহরে হরতাল পালিত হয়। এদিন নারায়ণগঞ্জে গুলিতে একজন নিহত ও ছয় জন আহত হয়। রাতে লোকমুখে জানা যায় যে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহরুল হককে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আটক অবস্থায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদে সে রাতেই ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে এই নৃশংস হত্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে। এদিকে সার্জেন্ট জহরুল হকের হত্যার সংবাদে শাশুড়ী ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। ভীষণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণে শাশুড়ীসহ শেখ সাহেবের ধানমন্ডির বাড়ীতে সে রাতে আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি।

২০। পরদিন অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারী সার্জেন্ট জহরুল হকের হত্যার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে প্রদেশের সর্বত্র শ্রমিক-ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক বিশাল ছাত্র-জনতার সমাবেশে সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নেতৃবৃন্দ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সার্জেন্ট জহরুল হককে হত্যার জন্য আইয়ুব খান ও তাঁর সরকারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। আইয়ুব খান সরকারের এহেন অমানবিক নীতির প্রতিবাদ, সার্জেন্ট জহরুল হকের হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে

সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' চলমান আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য শ্রমিক, ছাত্র ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানায়। এদিন দুপুরে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সার্জেন্ট জহুরুল হকের জানাজায় শরিক হয়। বিকেলে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মোনেম সরকারের তিনজন মন্ত্রী এবং আইয়ুব খানের রাজনৈতিক দল কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধানের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার ওপর একটি অংশ কনভেনশন মুসলিম লীগের অফিসে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। এ সমস্ত স্থানে পুলিশ গুলি চালালে ১ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হয়। সন্ধ্যায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে এবং সারা ঢাকা শহরে ১২ ঘন্টার জন্য কারফিউ বলবৎ করে। রাতে তৎকালীন 'রেডিও পাকিস্তানে'র খবরে বলা হয় যে, শেখ মুজিব যাতে রাওয়ালপিন্ডিতে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২১। ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে ৮ দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'র তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রাওয়ালপিন্ডি পৌছান। আওয়ামী লীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, অন্যতম জুনিয়র সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ময়েজদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সে সময় রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দলের সভাপতি শেখ মুজিবকে ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জানান। এহেন পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠক ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেন। এদিন বিকালে খবর পাওয়া যায় যে, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার ট্রাইবুন্যালের বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হয়েছে উক্ত কোর্টের সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবকে প্যারোলে (সাময়িকভাবে মুক্তি দিয়ে) রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিল বৈঠকে নেয়ার জন্য। সেদিন সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আমি আমার গাড়ীতে শাশুড়ী, রেহানা, হাসিনা ও শেখ সাহেবের ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকা কাকাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ট্রাইবুন্যাল কোর্ট অফিসের নিকটে পৌছাই। ইতিপূর্বে কয়েক হাজার ছাত্র-জনতাও সেখানে সমবেত হয়েছিলো। এর একটু পর শেখ সাহেবকে আটক রাখা সামরিক মেস হতে বেরিয়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুলীর অন্যতম সহকারী ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলাম আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়ে কোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, শেখ সাহেব তাঁকে কোর্টে প্যারোল চেয়ে আবেদন পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। একথা শুনে শাশুড়ী মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। যাহোক, কিছুক্ষণ পর কয়েকটি সামরিক গাড়ীতে শেখ সাহেবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের কোর্টে আনা হয়। এর প্রায় এক ঘন্টা পর ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কোর্টের বাইরে এসে আমাদের অবহিত করেন যে, শেখ সাহেব

আদালতে বলেছেন যে, 'আগারতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নিঃশর্তে প্রত্যাহার করে সকলকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যাবেন না। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম আমাদের আরও জানান যে, শেখ সাহেবের উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কোর্টের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সংবাদ জানার পর শাশুড়ী কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেন। এরপরও সেখানে আরও পৌনে এক ঘন্টা অপেক্ষা করে আমরা ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করি। আস্তে আস্তে ছাত্র-জনতাও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, সেদিন সন্ধ্যায় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করলেও সেনাবাহিনী কোন বাড়াবাড়ি করেনি। ফলে সেদিন সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

২২। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতোপূর্বে আইয়ুব খানের এক উপদেষ্টা ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব রাখেন যে, রাওয়ালপিন্ডিতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হলে শেখ মুজিবকে প্যারোলে (সাময়িকভাবে) মুক্তি দেয়া হবে। এই প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা ও ৬-দফা সমর্থক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তৎকালীন দৈনিক সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের তৎকালীন অন্যতম সহ-সভাপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ, বিশিষ্ট নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ শেখ সাহেবের আইয়ুব খানের প্রস্তাব মতো 'প্যারোলে' মুক্ত হয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে আহূত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করা ছাড়াও এ ব্যাপারে জোর 'লবি' করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলোঃ "হিমালয়ের বরফ যখন গলতে শুরু করেছে, তখন প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে।" পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ও ময়েজদ্দিন আহমদসহ তরুণ নেতৃত্ব এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের শেখ সাহেবকে 'প্যারোলে' মুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

২৩। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক হেফাজতে সামরিক প্রহরীর গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনার পর আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার মুখ্য শ্লোগান ছিলঃ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, প্রত্যাহার করতে হবে', 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' একই সঙ্গে ছাত্র-জনতার আন্দোলন জঙ্গী রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে রাজশাহীতে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা লংঘন করে মিছিল বের করে এবং সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে টহলরত সেনাবাহিনীর একটি গাড়ী ঘেরাও করে তার ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সেনবাহিনী ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি বর্ষণ করে। এই ঘটনায় সে সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছে দন্ডায়মান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রোক্টর অধ্যাপক ড: শামসুজ্জোহাসহ দুইজন নিহত এবং

কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এরপর ছাত্র–জনতার বিক্ষোভ জঙ্গী আকার ধারণ করলে অপরাহ্ন ২–৩০ মিনিট হতে সরকার রাজশাহী শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করে। রাজশাহীর উক্ত ঘটনার সংবাদ রাতে ঢাকায় পৌঁছায়। এ সংবাদে হাজার হাজার ছাত্র–জনতা ঢাকা নগরীতে সান্ধ্য আইনের কঠিন নিষেধাজ্ঞা এবং টহলদার সেনাবাহিনীর সকল প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মতো রাস্তায় রাস্তায় বের হয় এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গগনবিদারী আওয়াজ তোলে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ঢাকায় পরদিন সকাল ৭টা হতে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের বিরতির যে ঘোষণা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছিলো তা অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা হয় এবং কোনরূপ বিরতি ছাড়াই তা পরবর্তী ২৪ ঘন্টার জন্য বলবৎ রাখা হয়। সে রাতে ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত ও ২৭ জন আহত হয়।

২৪। ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত ছাত্র–জনতার সংঘর্ষের ঘটনায় কয়েকজন প্রাণ হারায় এবং বহু আহত হয়। এদিন নোয়াখালীর সেনবাগে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়। এদিন কুষ্টিয়ায় ছাত্র–জনতার আন্দোলন দমনে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। এদিন এখানে সেনাবাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। এদিন দিনাজপুরে পুলিশের গুলিতে ৬ জন আহত হয়। এদিন ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র বাহিনী ছাত্র–জনতার মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে ৪ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক ড: শামসুজ্জোহার হত্যার প্রতিবাদে ও তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সারা প্রদেশের শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে। এদিন রাতে ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয় পরদিন ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবসের কারণে।

২৫। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের প্রথম প্রহর থেকেই ঢাকায় ছাত্র–জনতা দলে দলে শহীদ মিনারে যায় ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি ছাত্র–জনতার মিছিলে সেদিন মুখ্য শ্লোগান ছিলঃ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে হবে', 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো"। এদিনেও দেশের বিভিন্ন শহরে ছাত্র–জনতার বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত ছিলো। পাবনার সুজানগরে পুলিশ ছাত্র–জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করলে ২ জন নিহত ও বহু আহত হয়। বরিশালে ছাত্র–জনতা একটি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করলে পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত ও বহু আহত হয়। রংপুরে ইপিআর বাহিনীর গুলিতে ৩ জন আহত হয়। এদিন খুলনায় পুলিশ ছাত্র–জনতার মিছিলে গুলি চালালে ৮ জন নিহত ও বহু আহত হয়। এই ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র–জনতা সেখানে আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতা ও তৎকালীন মন্ত্রী সবুর খানের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর কর্তৃপক্ষ সেখানে সেনাবাহিনী তলব করে এবং ৪২ ঘন্টার জন্য কারফিউ বলবৎ করে।

২৬। ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন পাকিস্তান রেডিও থেকে ১টার সংবাদে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করেছেন এবং শেখ মুজিবসহ উক্ত মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের নিঃশর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছে। সে সময় আমি অফিসে ছিলাম। এ সংবাদ শুনে আমি তৎক্ষণাৎ শেখ সাহেবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর (বর্তমানে ১১ নম্বর) রোডস্থ বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ধানমন্ডির লেক সার্কাসের নিকট পৌছে দেখি যে, মিরপুর রোডের এই অংশসহ সারা ৩২ নম্বর রোড হাজার হাজার লোকে ভরে গেছে। তখন আমি আমার গাড়ীটি মিরপুর রোডের একটি বাড়ীতে রেখে অতি কষ্টে শেখ সাহেবের বাড়ীতে পৌছাই। বাড়ীর ভেতরেও কয়েক হাজার লোক সমবেত হয়েছিলো। যাহোক, আমি অতি কষ্টে বাড়ীর ওপর তলায় যাই। হাসিনা ইতোপূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানে পৌছেছিলো। শেখ সাহেবকে মুক্ত দেখে পরিবারের আমাদের সকলের চোখ আনন্দ-বেদনার অশ্রুতে ভরে ওঠে। ইত্যবসরে শেখ সাহেবের বোনেরা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সেখানে আসেন। তাঁরা সবাই শেখ সাহেবকে মুক্ত দেখে আনন্দ-বেদনার কান্নায় ফেটে পড়েন। এদিকে বাইরে লোকের সমাগম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে বাড়ীর সিঁড়ির দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এহেন অবস্থা দেখে আমি শাশুড়ীকে বলি, "শেখ সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য জনগণ ব্যাকুল হয়ে আছে। সুতরাং তাঁকে জনগণের মাঝে যেতে দেয়াই সমীচীন হবে।" অতঃপর শেখ সাহেবকে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার মিছিলের সঙ্গে একটি ট্রাকে শহীদ মিনারের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৭। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) রোববার বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিলো শেখ মুজিবের গণসম্বর্ধনা। সভার মঞ্চটি তৈরী করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের সামনের রাস্তা থেকে রেসকোর্স ময়দানের একটু ভেতরে। উক্ত গণসম্বর্ধনায় কয়েক লাখ লোকের সমাগম হয়েছিলো। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করে ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা ও তৎকালীন ডাকসু—এর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ। উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা, পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল্লাহ এবং ছাত্র ফেডারেশনের ১১ দফা সমর্থক গ্রুপের মাহবুবুল হক দোলন। এই গণসম্বর্ধনায় সভাপতির ভাষণে তোফায়েল আহমদ বিপুল করতালির মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে শেখ সাহেবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করে। উক্ত গণসম্বর্ধনা সভায় শেখ সাহেব প্রায় ৫০ মিনিট ভাষণ দেন। মুক্তি লাভের পর এটাই ছিলো শেখ সাহেবের প্রথম জনসভায় ভাষণ। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিভিন্ন দাবি দাওয়ায় প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সেদিন শেখ সাহেব

বলেন, "আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আমি যদি এদেশের মুক্তি আনতে ও জনগণের দাবি আদায় করতে না পারি, তবে আন্দোলন করে আবার কারাগারে চলে যাবো।... বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি আর বাংলার মাটিও আমাকে ভালোবাসে। ১১-দফা জিন্দাবাদ।"

২৮। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখের গণসম্বর্ধনার সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধু সোজা চলে যান ঢাকায় সে সময় অবস্থানরত মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর দোয়া নিতে। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়ীতে ফেরেন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে তখন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো। বাড়ীতে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন রাওয়ালপিণ্ডিতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে আলাপ-পরামর্শ করার জন্য। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, তোফায়েল আহমদ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা ও ছাত্রদের ১১-দফার দাবি আলোচনা করতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হবে না বলে ছাত্র নেতাদের সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। তখন বঙ্গবন্ধু বলেন যে, মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। যদিও মাওলানা ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের ঘোর বিরোধী তবে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস যে, ভাসানী সাহেব উক্ত বৈঠকে যোগদান না করলেও তিনি যে ঐ সময় রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত থাকবেন সে ব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদের আরও বলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে তিনি তাঁর ৬-দফা ও সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র ১১-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ের সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত বৈঠকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব রাখবেন। আইয়ুব খান এবং তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রস্তাব মেনে না নিলে তিনি উক্ত গোল টেবিল বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করবেন। বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্য রাখার পরেও ছাত্রনেতারা তাঁর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার তীব্র বিরোধিতা করে। এই পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু সে ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চান। তখন আমি সে ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে বলি যে, তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন তাতে ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলন বিঘ্নিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তৎক্ষণাৎ বঙ্গবন্ধু উপস্থিত ছাত্র-নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "Thats right । আমি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলাম।"

২৯। পরদিন অর্থাৎ ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে বঙ্গবন্ধু নয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সে সময় আওয়ামী শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে নেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড: মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, ড: সারওয়ার মোর্শেদ, ড: আবদুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ড: কামাল হোসেন প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের সভাপতিত্বে গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও ভাসানী ন্যাপ গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করে। এই দুটি রাজনৈতিক দল ছাড়া দেশের অন্যান্য দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান ও বিচারপতি মোর্শেদও গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখ সকালে গোল টেবিল বৈঠক ১০ই মার্চ (১৯৬৯) তারিখ পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু ঐ দিনই ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

৩০। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) রাতে বঙ্গবন্ধু হাসিনা ও আমাকেসহ পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি মাঝারি লঞ্চে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন সেখানে বসবাসরত তাঁর আব্বা-আম্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দোয়া নেয়ার জন্য। পরদিন সকালে লঞ্চটি গোপালগঞ্জ শহরে পৌছালে কয়েক হাজার লোক সেখানে সমবেত হয় বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্য। এর ঘন্টা খানেক পর আমরা টুঙ্গীপাড়ায় পৌছাই। সেখানেও কয়েক হাজার লোক বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিলো। হাসিনার সঙ্গে ১৯৬৭ সালে বিয়ের পর বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়ীতে এই আমার প্রথম গমন। সে সময় বঙ্গবন্ধুর আব্বার বসবাসের ঘরটি ছিলো চার কক্ষবিশিষ্ট মাঝারি আয়তনের ঢেউ টিনে তৈরী ঘর। বঙ্গবন্ধু আগে যে কক্ষে বসবাস করতেন সেই কক্ষে হাসিনা ও আমাকে থাকতে দেয়া হয়। ৩রা মার্চ (১৯৬৯) তারিখে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী শিল্পপতি ইউসুফ হারুন একটি হেলিকপ্টারে টুঙ্গী পাড়ায় আসেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করার জন্য। সেদিন ইউসুফ হারুন সাহেব প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ৬ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে একই লঞ্চে ঢাকায় ফেরেন।

৩১। ৯ই মার্চ (১৯৬৯) বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে ১০ই মার্চ (১৯৬৯) তারিখ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিতব্য গোল টেবিল বৈঠক যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সে সময় মাওলানা ভাসানীও রাওয়ালপিন্ডি গমন করেন। কিন্তু তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে পৃথক জোট গঠন করে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। ১০ই মার্চের গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু তেজদীপ্ত কণ্ঠে ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও

অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তির দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু আইয়ুব খান এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রস্তাব মেনে না নেয়ায় বঙ্গবন্ধু ১৩ই মার্চ তারিখে গোল টেবিল বৈঠক হতে ওয়াক আউট করেন। তিনি একই সঙ্গে ৮-দলীয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি'র সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের ফলে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবুও ১৩ই মার্চ আইয়ুব খান সভাপতির ভাষণ দেন এবং উক্ত ভাষণে তিনি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যাহোক, ১৪ই মার্চ (১৯৬৯) তারিখে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। গোল টেবিল বৈঠকে তিনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন তার সমর্থনে, বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস ও আশা প্রকাশের জন্য সেদিন বিপুল ছাত্র-জনতা বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

৩২। ১৫ই মার্চ আইয়ুব খান শিল্পপতি ইউসুফ হারুনকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২১শে মার্চ (১৯৬৯) তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খানকে সরিয়ে আইয়ুব খান তাঁর স্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড: এম. এন. হুদাকে নিয়োগ করেন। ড: এম. এন. হুদা নতুন গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ২৩শে মার্চ তারিখে। তিনি মাত্র তিন দিন গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। অতঃপর সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান একাধারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সামরিক আইন জারির সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে সর্বপ্রকার সভা, মিছিল, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ও কর্মকান্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রাতে জাতির উদ্দেশ্যে এক রেডিও ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, "প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করাই আমার লক্ষ্য।" অতঃপর ড: এম. এন. হুদার স্থলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান (GOC) মেজর জেনারেল মোজাফ্‌ফর উদ্দিনকে একই সঙ্গে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর নিয়োগ করা হয়।

৩৩। উল্লিখিত ঘটনার অনেক আগেই ইটালীর ট্রিয়েস্টে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক পাকিস্তানের প্রফেসর আবদুস সালাম (যিনি তখন পাকিস্তান সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন) আমাকে ছয় বছরের জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠানে এসোসিয়েটশীপ প্রদান করেন। উক্ত এসোসিয়েটশীপের অধীনে প্রতি বছর অন্তর ছয় বছরে তিন মাসের জন্য তিনবার উক্ত কেন্দ্রে কাজ করার ব্যবস্থা ছিলো। অধ্যাপক সালাম আমাকে সে বছরের মার্চ এপ্রিলের দিকে তিন মাসের জন্য ঐ কেন্দ্রে কাজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ২৫শে মার্চ সামরিক শাসন

জারি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু আমাকে হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এমন কি তিনি হাসিনার জন্য বিমান ভাড়া দেবেন বলেও আমাকে জানান। পরদিন আমি হাসিনার পাসপোর্টের কাগজপত্র সংগ্রহ করি। বঙ্গবন্ধু পরদিন আমাকে পাসপোর্ট বিভাগের তাঁর পরিচিত ডেপুটি ডাইরেক্টর জনাব বাহাউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে হাসিনার পাসপোর্ট ইস্যু করার ব্যাপারে গোপনে দেখা করতে বলেন। আমি যথাসময়ে জনাব বাহাউদ্দিনের অফিসে গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। তিনি পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে আমাকে পাসপোর্ট বিভাগের মহাপরিচালকের স্বাক্ষর নেয়ার জন্য তাঁর অফিস কক্ষে নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পাসপোর্টে স্বাক্ষর করেন। ব্যাপারটি বেশী জানাজানি হয়ে গেলে সামরিক কর্তৃপক্ষ হাসিনাকে পাসপোর্ট নাও দিতে পারে এই আশঙ্কায় কাজটি গোপনে এবং তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়ে নিতে হয়েছিলো।

৩৪। ১৯৬৯ সালের ১২ই এপ্রিল আমি হাসিনাকে নিয়ে ইটালী পৌছাই। পরদিন হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক আবদুস সালামের (F. R. S) সঙ্গে দেখা করি। অধ্যাপক সালাম হাসিনার কাছে বঙ্গবন্ধুর কুশলাদি জেনে নেন। এর মাস খানেক পর প্রফেসর সালাম একদিন তাঁর অফিসের পরিচালকের গাড়ীতে করে আমাদেরকে ইটালীর সীমান্ত থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে যুগোশ্লোভিয়ার বিখ্যাত ইস্তনিয়ার পর্বত-গুহা দেখিয়ে আনেন। জুন মাসে অধ্যাপক সালামের অনুমোদনক্রমে হাসিনাকে নিয়ে সুইডেনের লুন্ড-এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করি। কনফারেন্স লবিতে একদিন আমার ইম্পিরিয়াল কলেজের এককালীন শিক্ষক ও সেখানকার তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক P. T. Mathiews—এর সঙ্গে হাসিনার পরিচয় করিয়ে দিই। অধ্যাপক Mathiews বঙ্গবন্ধুর কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে জেনে ভীষণ খুশী হন এবং তিনি হাসিনার লম্বা ঘন চুল দেখে তার প্রশংসা করেন। কনফারেন্স শেষে ইটালীতে ফিরে যাই।

৩৫। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধুর টেলিগ্রামে আমরা জানতে পারি যে, তিনি লন্ডন যাওয়ার পথে ইটালীর ট্রিয়েস্টে আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন অবসর যাপন করবেন। সে মোতাবেক আমরা আমাদের বাসার পাশেই একটি কটেজে বঙ্গবন্ধুর থাকার ব্যবস্থা করে রাখি। এর দু'দিন পরে আবার টেলিগ্রামে আমাদের জানানো হয় যে, তিনি ট্রিয়েস্টে আসার প্রোগ্রাম বাতিল করেছেন। তিনি ২৬শে অক্টোবর লন্ডনে পৌছাবেন বলেও আমাদের জানানো হয় এবং আমাদেরকে লন্ডনে যেতে বলা হয়। আমরা তদনুসারে প্রস্তুত হই। আমি লন্ডনে আমার বন্ধু, এককালীন ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হাসনাতকে আমাদের লন্ডনে যাওয়া সম্পর্কে অবহিত করি। আমরা ১৮ই অক্টোবর লন্ডনে পৌছাই। হিথরো বিমানবন্দরে আমার বন্ধু আবুল হাসনাত আমাদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি আমাদের জন্য তাঁর বাসার কাছাকাছি একটি ছোট হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরদিন সকাল ৯টায় আমার

টেলিফোন আসে। টেলিফোন করেছিলেন সুলতান শরীফ। তিনি জানান যে, তিনি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক এবং ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলেন। সেদিনই সুলতান শরীফ হোটেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁকে দেখে আমার স্মরণ হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় তাঁকে আমি অনেকবার দেখেছি। পরদিন সুলতান শরীফ আমাদের তাঁর গাড়ীতে করে লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি গউস খান ও বিশিষ্ট কর্মী জনাব মিনহাজ উদ্দিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এছাড়াও সুলতান শরীফ লন্ডনস্থ আইন বিষয়ে অধ্যয়নরত বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের সময় লন্ডনে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক জাকারিয়া চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেন।

৩৬। ২৬শে অক্টোবর খুব সকালে সুলতান শরীফ আবুল হাসনাতসহ আমাদেরকে হিথরো বিমান বন্দরে নিয়ে যান। বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগের ও লন্ডনে অধ্যয়ন, কর্মরত ও অবস্থানরত কয়েক শত বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গওস খান, মহিবুর রহমান, তোসাদ্দক আহমেদ, মিনহাজ উদ্দিন, বি. এইচ. তালুকদার, তৈয়বুর রহমান, জাকারিয়া চৌধুরী, ন্যাপ (ভাসানী)–এর নেতা জনাব মশিউর রহমানের (যাদু মিয়া) ছেলে শফিকুল গণি স্বপন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর ছেলে আবুল হাসান চৌধুরী কায়সার প্রমুখ। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধু হিথরো বিমানবন্দরে পৌছান। ব্রিটিশ সরকারের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুকে সোজা অভ্যর্থনা স্থানে নিয়ে আসেন। উপস্থিত সবাই তাঁকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে অভ্যর্থনা জানান। তিনি হাসিনা ও আমাকে আদর করেন। অভ্যর্থনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও আমাদের জন্য লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীটে মাউন্ট রয়েল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর কক্ষে তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত সাংবাদিক নজমুল হকের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, নজমুল হককে ১৯৭১ সনের পশ্চিম পাকিস্তানে অজ্ঞাত স্থানে গোপনে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার সাক্ষী হিসেবে নেয়া হয়েছিলো। তৎকালীন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের লোক, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় "এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম" তা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু ঐ ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এই মর্মে এক ইশতেহারে স্বাক্ষর করতে নজমুল হকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলো। এ ঘটনা ঘটেছিলো ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। উক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তাঁকে হুশিঁয়ার করিয়ে তৎবিষয়ে চিন্তা করার জন্য এক মাস সময় দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলো। অত্যন্ত মর্মান্তিক যে, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিপক্ষের পাক হানাদার বাহিনীর দোসরদের এক দলের লোকেরা অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাকেও হাজারীবাগে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

৩৭। বঙ্গবন্ধু লন্ডনে পৌঁছার পর অধ্যাপক সালাম (যিনি তখন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন) আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাতের আয়োজন করতে অনুরোধ করেন। নির্ধারিত তারিখে অধ্যাপক সালাম আমাদের হোটেলে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রায় ঘন্টাখানেক আলাপ করেন। ইতিপূর্বে আমি ইংল্যান্ডের ওয়ারিংটনস্থ ডারেসবেরি নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে এক বছর পোস্ট-ডক্টরাল কাজ করার জন্য নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম। আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি ১৯৭০ সালের জন্য ওয়ারিংটন শহরের নিকট অবস্থিত নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে আমার পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রসঙ্গ ওঠালে অধ্যাপক সালাম তাতে সম্মতি জানান। বঙ্গবন্ধু একটু চিন্তা করে প্রস্তাবে রাজি হন।

৩৮। লন্ডনের এক বিশাল সিনেমা হলে বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণসম্বর্ধনা জানানো হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ম্যানচেষ্টার, লিভারপুলসহ কয়েকটি শহরে তাঁকে বাঙালীরা সম্বর্ধনা জানায়। বার্মিংহামে বঙ্গবন্ধুর জন্য শেষ গণসম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিলো। এর আগের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জস্থ আদমজী জুট মিলসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, রংপুর প্রভৃতি শহরে বাঙালী বিহারী দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাই বার্মিংহামে যাওয়া বাতিল করে তিনি হাসিনাকে সঙ্গে করে নভেম্বরের ৭ তারিখে ঢাকার পথে রওনা দেন। দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, পার্বতীপুর, সৈয়দপুর, রংপুর প্রভৃতি দাঙ্গা উপদ্রত শহর পরিদর্শন করেন। এরপর এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "পুরোনো খেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত। এ খেলা খেলবেন না। এর পরিণতি ভালো হবে না। বাঙ্গালী জাতির দাবি ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায় নস্যাৎ করতে চেষ্টা করবেন না। আমরা জানি শাসক-শোষকগোষ্ঠী কি চান। আইয়ুব খান এমনতর খেলার পরিণতিতে বিদায় নিয়েছেন। সুতরাং টালবাহানা না করে (সাধারণ) নির্বাচন দিয়ে দিন। আমরা নির্বাচন, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে চিরকাল অপেক্ষা করতেই থাকবো এমনতর ভাবা উচিত হবে না।"

৩৯। ২৮শে নভেম্বর (১৯৬৯) তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিলসহ প্রদেশগুলোর জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৫ই অক্টোবর (১৯৭০) তারিখে অনুষ্ঠিত এবং ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা, সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা প্রভৃতির অনুমতি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। উক্ত ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, "১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর 'এক মানুষ এক ভোট' এই নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের

ফলে যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে, চার মাসের মধ্যেই সেই পরিষদ পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।"

৪০। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অঞ্চলের নাম ছিলো "পূর্ব বাংলা"। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান"। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় তাঁর মাজার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম এ দেশের নাম "বাংলাদেশ" হবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "আর পূর্ব পাকিস্তান নয়, আর পূর্ব বাংলা নয়। শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে বাঙালী জাতির এই আবাসভূমির নাম হবে 'বাংলাদেশ'। ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৬৯) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' নামকরণের দাবিতে সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে'র নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল বের করা হয়।

৪১। ১৯৭০ সালের ৬ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৭ই মার্চ (১৯৭০) তারিখ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, "৬-দফা বাস্তবায়ন ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। 'ইসলাম বিপন্ন কথাটা' যাঁরা বলেন তাঁদের 'রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজ' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।" এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করেন 'জয় বাংলা' বলে। এই প্রথম উচ্চারিত হয় 'জয় বাংলা' শ্লোগান। উপস্থিত লক্ষ লক্ষ জনতা বিপুল উল্লাস ধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' শ্লোগানকে স্বাগত জানায়। সেদিন ছাত্র-জনতার মুখ্য শ্লোগান ছিল: 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', 'জেগেছে জেগেছে, বাঙ্গালী জেগেছে', ইত্যাদি। তখন আমি ওয়ারিংটন শহরের নিকট অবস্থিত নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ছিলাম। এরপর পাঁচ মাস কেটে যায়। হাসিনার চিঠিতে বঙ্গবন্ধু ও সবার কুশলাদি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতাম।

৪২। ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি লন্ডন থেকে সুলতান শরীফ আমাকে জানান যে, ঐ সময়ে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার ফলে লন্ডন থেকে ছাত্র ইউনিয়নের এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত "জনমত" পত্রিকায় আওয়ামী লীগে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে বলে বিরাট হেড লাইনে সংবাদ পরিবেশন করতে পারে এই আশঙ্কায় সুলতান শরীফ আমাকে অবিলম্বে লন্ডনে যেতে বলেন। আমি পরদিন লন্ডনে গিয়ে সুলতান শরীফের বাসায় উঠি।

আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের নেতা গউস খান ও মিনহাজ উদ্দিন সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করি। তাঁদের দু'জনকে সবিনয়ে যে কোনোভাবে নির্বাচন এড়ানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। দুঃখের বিষয়, মিনহাজ উদ্দিন সাহেব নমনীয় হলেও গউস খান সাহেব তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে আসার পর রাত ১০ টার দিকে একটা ভাল আইডিয়া মনে আসে। সুলতান শরীফকে সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বললাম। লন্ডন আওয়ামী লীগে ঐক্যের, বিশেষ করে ১৯৭০ সালের তৎকালীন পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমার প্রস্তাবের সঙ্গে সুলতান শরীফ ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। এরপর গউস খানের বিরোধী গ্রুপের নেতা মিনহাজ উদ্দিন ও বি. এইচ. তালুকদার সাহেবদেরকে ঐ বিষয়ে টেলিফোনে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। তাঁদেরকে পরদিন অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ ও নির্বাচনী সভায় এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করি।

৪৩. পরদিন যথাক্রমে সুলতান শরীফের সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত হই এবং সেখানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করি। আরও দেখি "জনমত"-এর সম্পাদক এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন। সাধারণ সভা গউস খানের সভাপতিত্বে যথাসময়ে শুরু হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে শেষ হয়। লাঞ্চের পর নির্বাচনী অনুষ্ঠানের জন্য নেতৃবৃন্দ সভাকক্ষে সমবেত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে বি. এইচ. তালুকদার উপস্থিত সকলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ জামাতা হিসেবে আমাকে যেন নির্বাচনী অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। গউস খান একটু বিব্রত হন। কারণ সভা তাঁর সভাপতিত্বে হওয়ার কথা ছিলো। আমার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমার সভাপতিত্বে নির্বাচনী সভা শুরু হয়। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমার ওপর আস্থা ও গুরু দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী অনুষ্ঠান শুরু করি। সর্বসম্মতিক্রমে এক ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ঘোষণা প্রদান করি। উপস্থিত আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিকট থেকে, আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির জন্য প্রার্থী মনোনয়ন নেয়ার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করি। এরপর এক এক করে যুগ্ম-সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সভাপতিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যের পদে নির্বাচনেচ্ছুক প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান করার প্রস্তাব করি। সমস্ত পদে মনোনয়ন প্রাপ্তির পর যেহেতু সদস্য পদের সংখ্যার চেয়ে বেশী প্রস্তাব এসেছে সেহেতু প্রস্তাবিত প্রার্থীদের মধ্য হতে কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাইলে তা করার জন্য প্রায় দশ মিনিট সময় দেয়া হয়। মজার ব্যাপার যে, এক এক করে অতিরিক্ত প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। একই পন্থায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের প্রস্তাবিত

প্রার্থীদের বাদে অন্যান্য সকল কর্মকর্তার নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পন্ন হয়। এ পর্যায়ে চা বিরতির জন্য সভা মুলতবি ঘোষণা করি। এরপর আবার সভা শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য দুই প্রার্থী ছিলেন, গউস খানের সমর্থক মহিবুর রহমান ও মিনহাজ উদ্দিনের সমর্থক জনাব তালুকদার নিজে। সভাপতি পদে প্রার্থী ছিলেন গউস খান ও মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ। তাঁরা চারজন পরামর্শ করে আমাকে বলেন যে, তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, গউস খান সাহেব ও বি. এইচ. তালুকদার যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হবেন। এভাবে সেদিন লন্ডন আওয়ামী লীগের নির্বাচন শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে সম্পন্ন হয়। আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে আন্তরিক অভিনন্দনসহ শুভেচ্ছা জানান। এর একদিন পর আমি ওয়ারিংটনে আমার কর্মস্থলে ফিরে যাই।

৪৪। সপ্তাহ দু'য়েক পর 'জনমতে'র একটি সংখ্যায় চিঠিপত্রের কলামে দেখতে পাই যে, লন্ডনস্থ জনৈক বাঙালী পত্রের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন, "সরকারী কর্মচারী হয়ে আমি কোন্ আইন ও ক্ষমতাবলে দুই সপ্তাহ পূর্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম?" সেদিন রাতে সুলতান শরীফ আমাকে টেলিফোনে জানান যে, 'জনমতে' সম্পাদক ওয়ালী আশরাফ নিজেই উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিমূলক কারণে ঐ চিঠি লিখে প্রকাশ করেছেন। সুলতান শরীফ আমাকে পরামর্শ দেন আমি যেন অনতিবিলম্বে 'জনমতে'র ঐ চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিই। আমি অতঃপর "দেশের একজন সাধারণ নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম, সরকারী কর্মচারী হিসেবে নয়" এই মর্মে 'জনমতে'র চিঠিপত্রের কলামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিই। আমার চিঠিটি 'জনমতে' যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিলো।

৪৫। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলকে নভেম্বরের নির্বাচন উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। অতঃপর এক এক করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বেতার ও টেলিভিশনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ দেয়ার জন্য নির্ধারিত ছিলো ২৮শে অক্টোবর (১৯৭০) তারিখ। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর লিখিত ভাষণের কপি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে 'বাংলাদেশ' নামসহ 'জয় বাংলা' শব্দগুলো লেখা ছিলো। এই দুটো শব্দ ব্যবহারে কর্তৃপক্ষ আপত্তি ওঠায়। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, এই শব্দগুলো সামরিক আইনের আওতায় ইতিপূর্বে জারিকৃত আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order)-এর সংশ্লিষ্ট বিধানের পরিপন্থী। উল্লেখ্য, উক্ত আইনগত কাঠামো আদেশে দেশের অখন্ডতা ও সংহতির বিরোধিতা, ক্ষতিকারক কিংবা পরিপন্থী যে কোন উক্তি, বক্তব্য, প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। যাহোক, অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে

'জয় বাংলা' বলতে পারবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে 'বাংলাদেশ' বলতে পারবেন না। শেষমেষ, উক্ত রেডিও টেলিভিশনের নির্বাচনী ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার দাবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করে 'জয় বাংলা' ও 'খোদা হাফেজ' বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

৪৬। ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ৩০ তারিখে ওয়ারিংটনস্থ নিউক্লিয়ার রিসার্চ ল্যাব-রেটরীতে আমার কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আমার প্রাপ্য ছুটি বেতনসহ ছুটি হিসেবে গণ্য করে আমাকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই কর্মস্থল ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই লন্ডনে গিয়ে সুলতান শরীফের বাসায় উঠি। কয়েকদিন ধরে আমার শাশুড়ী, শ্যালক, শ্যালিকা, বিশেষ করে হাসিনার প্রস্তাব অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর জন্য Knights Bridge—এর নিকটস্থ অভিজাত দোকান Harrods হতে একটি বিশেষ ধরনের উলেন কার্ডিগান ও একটি ইলেকট্রিক শেভিং মেশিন ক্রয় করি। ১৩ই নভেম্বর সকাল দশটায় দেশের পথে রওনা দেয়ার জন্য সুলতান শরীফ আমাকে হিথ্রো বিমানবন্দরে নিয়ে যান। সেদিন আমাদের সঙ্গে সুলতান শরীফের ব্রিটিশ স্ত্রী নোরা শরীফ এবং তাঁর দুই মেয়ে আমাদের সঙ্গে ছিলো। বিমানবন্দরের এক খবরের কাগজে জানতে পারি যে, ১২ই নভেম্বর তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চল এক ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ও ২০-৩০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাসে নিপতিত হয়েছে। সেখানে লাখো লাখো মানুষ ও প্রাণীর জীবনাবাসন হয়েছে।

৪৭। করাচী পৌঁছেই প্রচলিত রীতি মোতাবেক পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ১৫ই নভেম্বর রিপোর্ট করলে কমিশনের সচিব আমাকে জানান যে, ১৬ তারিখ সকাল দশটায় কমিশনের চেয়ারম্যান ড: আই. এইচ. উসমানী আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। এর আগেই আমি ঢাকার পথে রওনা হবো বলে টিকিট চূড়ান্ত করে নিয়েছিলাম। আমি ১৬ই তারিখ যথাসময়ে কমিশনের কার্যালয়ে যাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যস্ততার কারণে ড: উসমানী ১২টা পর্যন্ত আমার সঙ্গে দেখা করার সময় দিতে পারেন নি। তখন আমি সচিবকে জানাই যে, পরের দিন আমার বিবাহ বার্ষিকী হওয়ায় আমাকে অবশ্যই ঐ দিন ঢাকা ফিরতে হবে। এর আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পরেও আমাকে ড: উসমানী ডেকে না পাঠানোয় এবং আমার প্লেনের সময় ঘনিয়ে আসায় আমি করাচী বিমানবন্দরে চলে যাই। তেজগাঁ বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি হাসিনা ছাড়া আমার শ্যালক-শ্যালিকা ও Cousin শ্যালক-শ্যালিকারা বিমানবন্দরে উপস্থিত। হাসিনা বিমান বন্দরে না আসার কারণ জানতে চাইলে রেহানা বলে যে, ওর আপা অসুস্থ। রেহানা আরও বলে, "দিন দশেক আগে আপা তাঁর পেটের অপারেশনের জায়গায় ব্যথা শুরু হলে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বুঝতে না পেরে ভুল ওষুধ খাওয়ায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো এবং তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। এখন কিছুটা সুস্থ, তবে বিমানবন্দরে আসার মত সুস্থ হয়নি।"

৪৮। লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর জন্য যে কার্ডিগান ও ইলেকট্রিক শেভিং মেশিন এনেছিলাম সেগুলো তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়েছিলো। এই কার্ডিগান পরে বাড়ির ছাদে বসা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি তোলা হয়েছিলো। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর ঐ ছবির কয়েক শত বর্ধিত কপিও করা হয়েছিলো। হাসিনা বহু বছর ঐ ছবিগুলো সযত্নে রেখেছিলো। আরও উল্লেখ্য যে, ড: মাজহারুল ইসলাম ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর ওপর যে বই লিখেছিলেন সেই বইটিতে বঙ্গবন্ধুর ঐ ছবিটি বিশেষ স্থান পেয়েছিলো। বঙ্গবন্ধুর ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহারে ভয় পেতেন বলে তিনি আমাকে রিচার্জেবল শেভার আনতে বলেছিলেন। আমি রিচার্জেবল মেশিন এনেছিলাম বলে তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি শেভারটি বের করে অনেককে দেখাতেন।

৪৯। আমি ফিরে আসার একদিন পর বঙ্গবন্ধু একটি মাঝারি ধরনের স্টীমারে করে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা, বিশেষ করে উপকূল নিকটবর্তী দুর্গত দ্বীপগুলোয় পরিদর্শন ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে যান। তিনি উপকূল অঞ্চল থেকে বেশ দূরে অবস্থিত মনপুরা দ্বীপ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পাঁচ-ছয় দিন ছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ঢাকায় একদিন অবস্থান করেছিলেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তিনি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় যাননি, এমন কি এর পরেও কখনো ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত এলাকায় পরিদর্শনের প্রয়োজনবোধ করেন নি। এর সপ্তাহখানেক পর জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব ঢাকায় এসেছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর যে, তিনিও ঘূর্ণিঝড় এলাকায় নিরাশ্রয়, নিঃস্ব অনাহারক্লিষ্ট অসহায় মানুষদের দেখতে যাননি।

৫০। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন যে, পীরগঞ্জ-মিঠাপুকুর এলাকায় মতিউর রহমানের জয় লাভ করা মুশকিল হবে বলে তাঁর ধারণা। সেখানে আমার বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তাই সেখানে কাজ করার জন্য আমি যেন পরদিনই পীরগঞ্জ চলে যাই। আমি ২৭শে নভেম্বর পীরগঞ্জে চলে যাই। সেখানে আমার দুই বছরের বড় ভাই ওয়াহেদকে নিয়ে হোন্ডায় চড়ে বা কোন কোন দিন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলী সদস্যপদ প্রার্থী গাজীউর রহমানের হোন্ডার চড়ে সারা পীরগঞ্জ থানা অঞ্চল নির্বাচন উপলক্ষে ঘুরে বেড়াই। অনেক জায়গায় কৃষকদের ধান কাটার সময় উচ্চ স্বরে "জয় বাংলা" ধ্বনি দিতে দেখতে পাই। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পীরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের মতিউর রহমান (মতি ভাই) বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন। এর তিন চারদিন পর আমি ঢাকায় এসে শাশুড়ীর বাড়িতে উঠি। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে হাসিনা আমাকে আকার ইঙ্গিতে জানায় যে, সে মা হতে চলেছে।

৫১। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২
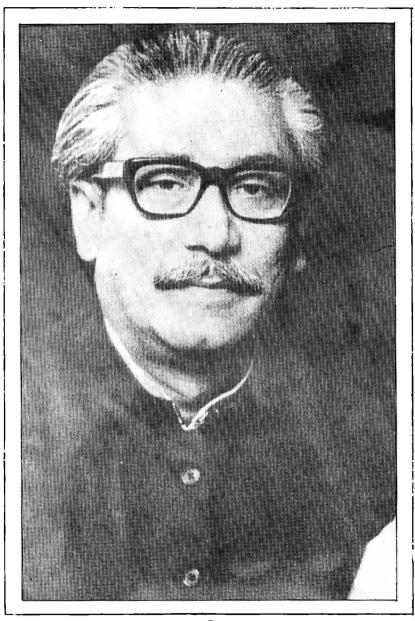
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
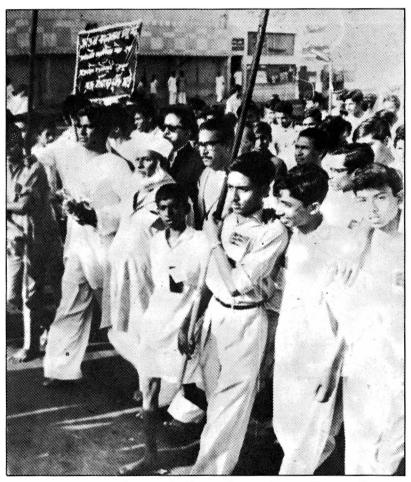
পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে প্রদক্ষিণরত মিছিলের অগ্রভাগে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিব।

১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" থেকে মুক্তি পাবার পর ধানমন্ডির বাড়ির প্রাঙ্গনে সমবেত জনতার অভিনন্দন গ্রহণরত অন্যান্যের সঙ্গে শেখ মুজিব ও বেগম মুজিব।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বরের শেষের দিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাড়িতেঃ বাম দিক থেকে শেখ কামাল, রেহানা, রাসেলকে কোলে নিয়ে বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, শেখ জামাল ও হাসিনা।

১৯৭০ সালে ডিসেম্বর শেষের দিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাড়ীতে: বাম দিক থেকে সামনের সারিতে বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফুর রহমান, শিশুপুত্র রাসেল, মাতা সায়রা খাতুন ও বেগম মুজিব। পেছনে বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারী আমিনুল হক বাদশা, বঙ্গবন্ধুর ভাগিনেয় বাবলু, লেখক, রেহানা ও হাসিনা।

আসনের ১৬০টি আসনে জয় লাভ করে একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট দু'টি আসনের জন্য নির্বাচিত হন যথাক্রমে মুসলিম লীগের জনাব নূরুল আমিন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একজন নির্দলীয় ব্যক্তি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর ৩০০ আসনের আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসনে জয় লাভ করে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের ৮৩টি আসনে জেনারেল আইয়ুব খানের সুদীর্ঘকালীন মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP) বিজয়ী হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
১৯৭১ সাল

১। ৩রা জানুয়ারী (১৯৭১) তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে একটি জনসভা আহ্বান করেন। ঐ জনসভায় নৌকা আকৃতির একটি বিশাল মঞ্চ বর্তমান শিশু পার্কের স্থানে তৈরী করা হয়েছিলো। জনসভার প্রারম্ভে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের আওয়ামী লীগের আদর্শ, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে ছয় দফার দাবীর ব্যাপারে আপোষহীন ও অটল থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করান। এর কিছুদিন পর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অডিটরিয়ামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের থানা, মহকুমা, জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দু'দিনব্যাপী একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার সমাপনী উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। অনুষ্ঠানের শেষাংশে সমবেত কণ্ঠে ডি. এল. রায়ের "ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" ও রবি ঠাকুরের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গান দু'টি পরিবেশন করা হয়। সেদিন রাতে খেতে বসে বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে গম্ভীর হয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "দেশটা যদি কোনদিন স্বাধীন হয়, তাহলে দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবিগুরুর–আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি—গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করো।" ঐ সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, জেনারেল পীরজাদাকে সঙ্গে করে ঢাকায় আসেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা হয়। ১৮ই জানুয়ারী ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি অচিরেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ত্যাগ করবেন বলে আভাস দেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাংবাদিকদের আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করুন। তিনিই তো ভাবী প্রধানমন্ত্রী।"

২। ইয়াহিয়া খান ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পর পশ্চিম পাকিস্তানের 'পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি'-এর চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং পর পর দু'দিন

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে চারটি বৈঠকে আলাপ–আলোচনা করেন। এরপর তিনি ৩০শে জানুয়ারী লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে ঢাকা তেজগাঁ বিমানবন্দরে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে শেখ সাহেবের সঙ্গে আমার চারটি বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। তাঁকে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে, ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করা হলে পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান করার চেষ্টা করা হলে আমার দল তার বিরোধিতা করবে। ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা হলে আমার দল যে কোন উপায়ে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করবে।" ভুট্টো সাহেব লাহোর বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখানেও সাংবাদিকদের একই কথা বলেন। ঐদিন একটা ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নেয়া হয়েছিলো। ভুট্টো ছিনতাইকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং তাদের খুব প্রশংসা করেন। এর এক–দুই দিন পরে ছিনতাই–কারীরা বিমানটি জ্বালিয়ে দেয়। ভারত সরকার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এবং প্রতিশোধ হিসেবে ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। ফলে পাকিস্তানী বিমানের জন্য শ্রীলংকার কলম্বো হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হয়।

৩। ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেন। ইয়াহিয়ার এ ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু জনাব ভুট্টো বললেন অন্য কথা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বললেন, "মুজিব ৬ দফার পক্ষে আপোষ না করলে তাঁর দল ৩রা মার্চের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করবে না।" ভুট্টোর সঙ্গে হাত মেলালেন কনভেনশন মুসলিম লীগের খান আবদুল কায়উম খান। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভুট্টো এক জনসভায় বলে বসলেন, "ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের জন্য কসাইখানা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সদস্য প্রস্তাবিত অধিবেশনে যোগদান করতে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার পা ভেঙে দেয়া হবে।" ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিকে পত্রিকায় নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ "জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনাব ভুট্টোর সঙ্গে সিন্ধু প্রদেশের লারকানায় তাঁর জমিদারী অঞ্চলের বনে পাখী শিকারে গেছেন।" ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভুট্টো ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার দাবী জানান। এরপর ১লা মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা দেন যে, অনিবার্য কারণবশত জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে ঢাকায় ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করা হয়েছে। ঐ ঘোষণার সপ্তাহ দুয়েক আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে ঢাকাস্থ হোটেল পূর্বাণীতে পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া তৈরীতে দিনরাত ব্যস্ত ছিলেন। ১লা মার্চ যথারীতি বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে সকাল

৯টায় হোটেল পূর্বাণীতে গিয়েছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের সংবাদ তাঁরা পান। এই ঘোষণা শোনা মাত্রই সারা ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা অধিবেশন বাতিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। ঐ সময়ের ঢাকা স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বিশাল খোলা মাঠটি ছাত্র-জনতায় ভরে যায়। জনতা বঙ্গবন্ধুকে তাদের সঙ্গে এসে যোগদান করার অনুরোধ জানালে তিনি হোটেল পূর্বাণীতে সমবেত সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে জনতার সামনে হাজির হন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি ও আমার দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে পেশ করার লক্ষ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সংহত রেখেও কি ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপায় আমরা নির্ধারণ করেছি। কিছুক্ষণ আগে প্রস্তাবিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণা আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকল বাঙালী এই ষড়যন্ত্রকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে।" তিনি ছাত্র-জনতাকে ইয়হিয়া খানের ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উপরন্তু বঙ্গবন্ধু ২রা মার্চ ঢাকাতে, পরদিন সারা দেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্সে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার কথা ঘোষণা করেন। ৩রা মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এডমিরাল আহসানকে পদচ্যুত করে তার স্থলে জেনারেল ইয়াকুব খানকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব দেন। এরপরেও মার্চের ৪ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত একনাগাড়ে তিনদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।

৪। ক্রমেই ছাত্র-জনতার আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইপিআর ও পুলিশের গুলিতে অনেক ছাত্র-জনতা মৃত্যুবরণ করেন। ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিয়োগ করে একই সঙ্গে তাঁর নিকট পূর্ব পাকিস্তানের Zonal Martial Law Administrator-এর ক্ষমতাও অর্পণ করেন। টিক্কা খান ঢাকায় পৌছেন ৫ই মার্চ। তাঁর শপথ গ্রহণ করার কথা ছিলো ৬ই মার্চ। কিন্তু গণআন্দোলনের তীব্রতা ও আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিক টিক্কা খানকে গভর্নর পদে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান। ৫ই মার্চ রেডিও-টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ বিকেল ৫টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। ঐদিন বিকেল পাঁচটার দিকে বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপটেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমেদ ও ড: কামাল হোসেন সাহেবদের সঙ্গে তাঁর বেডরুমে বসে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমিও সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। এমনি সময় ইয়াহিয়া খান টেলিফোনে কথা

বলবেন বলে তৎকালীন ঢাকাস্থ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াকুব খান বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। টেলিফোন পাবার পর বঙ্গবন্ধু "কিছু শুনতে পাচ্ছি না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না" বলে ইয়াহিয়া খানকে আবার টেলিফোন করতে বলেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন যে, পুনরায় টেলিফোন এলে আমি যেন জেনারেল ইয়াকুব খানকে এই বলে ব্যস্ত রাখি যে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। এর কিছুক্ষণ পর জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছ থেকে পুনরায় টেলিফোন আসলে আমি তা রিসিভ করে কিছুক্ষণ তাঁকে ব্যস্ত রেখে বঙ্গবন্ধুকে রিসিভারটি দিই। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়াকে বলেন যে, তিনি যেন বিগত কয়েকদিন আন্দোলন চলাকালে যে সমস্ত ছাত্র-জনতা ইপিআর ও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, তার জন্য তার আন্তরিক দুঃখ এবং শহীদদের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সে সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানকে আরো বলেন যে, তিনি যেন এই মর্মে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন যে, ঢাকায় এসে তিনি জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ দলের নেতৃবৃন্দের সংগে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যাদির সমাধানের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করবেন।

৫। সে সময়ে হাসিনা ও আমি বঙ্গবন্ধুর বাসাতেই থাকতাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের সবাইকে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন ৬ই মার্চে ইয়াহিয়া খানের ভাষণ টেপ করে রাখি। ৬ই মার্চ বিকেলে বঙ্গবন্ধু নিজেও একটি ট্র্যানজিস্টার নিয়ে শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকলেন। ভাষণে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের একগুঁয়েমীর জন্য ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, ১০ই মার্চ ঢাকায় গোল টেবিল সম্মেলন আয়োজন করে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তিনি পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবেন। উপরন্তু ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় ২৫শে মার্চ নির্ধারণ করেন। ভাষণ শোনার পর বাড়ীর সবাই নিশ্চুপ হয়ে যাই। ঘণ্টাখানেক পর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী মোহাম্মদ হানিফকে আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও ড: কামাল হোসেনকে জরুরী তাঁর বাসায় আসার জন্য সংবাদ দিতে বলেন। নেতৃবৃন্দের আসার পর বঙ্গবন্ধু তাদেরকে নিয়ে লাইব্রেরী রুমে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান ও আমি - এই তিনজন মিলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত তাঁদেরকে জানাই। আলোচনা শেষে, ইয়াহিয়া খানের ভাষণের সমালোচনা করে

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার প্রদান করা হয়। উক্ত ইশতেহারটি ছিল ইংরেজীতে এবং তাজউদ্দিন আহমেদ এটি ড: কামাল হোসেনের সহায়তায় তৈরী করেছিলেন। এর শেষাংশে বলা হয়েছিলো, "শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তার রক্ত এখনো শুকোয়নি। শহীদদের পবিত্র রক্ত পদদলিত করে ১০ই মার্চ তারিখে প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ যোগদান করতে পারে না।"

৬। ৭ই মার্চ সকালে ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর বাড়ী আওয়ামী লীগের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ছাত্র নেতৃবৃন্দে ভরে যায়। উপস্থিত সবার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন দেশে পরিণত করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন সাহেবদের সঙ্গে লাইব্রেরী রুমে দ্বার রুদ্ধ করে আলাপে বসেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর লাইব্রেরী কক্ষ থেকে বসার ঘরে অপেক্ষারত আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এবং ঐদিন বিকেল সাড়ে চার ঘটিকায় রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য সভায় দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করে একটি চার দফার ঘোষণা দেয়া হবে। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তৎমর্মে জনাব কামরুজ্জামান, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহ্‌মদ ও ড: কামাল হোসেনকে নির্দেশ দিয়ে গোসল ও দুপুরের আহারের জন্য বাড়ীর ওপর তলায় চলে যান। আহার শেষে বঙ্গবন্ধু যখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় এক ফাঁকে এসে ড: কামাল হোসেন তাঁকে প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের খসড়াটি দেখিয়ে নেন। ততক্ষণে আওয়ামী লীগের অপর পাঁচ নেতা নিজ নিজ বাসায় দুপুরের আহারের জন্য চলে গিয়েছিলেন। ড: কামাল হোসেন উপরোল্লিখিত ঘোষণাপত্রটি টাইপ করিয়ে নেয়ার জন্য নীচে চলে গেলে বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন আমি যেন ঐ ঘোষণাপত্রটির টাইপড় (চূড়ান্ত) কপিটি সেটির অনুমোদিত মূল খসড়াটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। ঘোষণাপত্রের খসড়াটি বঙ্গবন্ধুর একান্ত সহকারী মোহাম্মদ হানিফকে টাইপ করার নির্দেশ দিয়ে ড: কামাল হোসেন আহারের জন্য তাঁর বাসায় চলে যান।

৭। বিকেল তিনটার দিকে প্রথমে আসেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং এর একটু পরেই ড: কামাল হোসেন। আমি তখন ঘোষণাপত্রটির চূড়ান্ত কপিটি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া কপিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম। এক পর্যায়ে খন্দকার মোশতাক কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইশতেহারে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা। তিনি বলেন যে, সামরিক শাসনের ক্ষমতাবলে জারীকৃত আইনগত কাঠামো (Legal Framework Order-LFO)- এর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় বসে পাকিস্তানের অখন্ডতা লংঘন সংক্রান্ত বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ঘোষণা করার ব্যাপারটি খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং এই ব্যাপারটা এই ইশতেহারে লেখা হয়নি। আমি ঐ ইশতেহার পড়ে দেখলাম যে, তাতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর যে সমস্ত আলাপ হয়েছে এবং ১লা মার্চ হতে গণআন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে এবং বিরাজমান পরিস্থিতি ও ছাত্র-জনতার দাবি উল্লেখপূর্বক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতা হিসেবে চারটি দাবি উপস্থাপিত করেছেন। উক্ত ইশতেহারে ইয়াহিয়া খানের নিকট দাবি করা হয়ঃ (১) সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, (২) ১লা মার্চ হতে আন্দোলন যে সমস্ত ভাইবোনকে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করে সেব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে, (৩) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং (৪) অবিলম্বে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের নেতার কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৮। ঠিক এ সময়ই বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে আয়োজিত জনসভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে আরও দশ-পনেরজন ছাত্র ও আওয়ামী লীগ নেতা প্রবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি সভামঞ্চে পৌঁছার পূর্বেই তোমরা সভামঞ্চের চারদিকে উপস্থিত দেশী-বিদেশী সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে এই ইশতেহারের কপি বিতরণ করবে।" এ কথা বলে তিনি দোতলায় চলে যান। প্রায় আধ ঘন্টা পর সাড়ে চারটার দিকে বঙ্গবন্ধু সভায় যাওয়ার জন্য আয়োজন করতে বলেন। হাসিনা, রেহানা, এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেন সাহেবের বড় মেয়ে শেলী ও শেখ শহীদের বোন জেলী আমার গাড়ীতে উঠে বলে যে, তাদেরকেও রেসকোর্সের জনসভায় নিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি ট্রাকে ওঠেন। উক্ত ট্রাকে ছিলেন সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা, শেখ ফজলুল হক মণি, ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, ডাকসুর প্রাক্তন সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, সিরাজুল আলম খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মোস্তফা মহসীন মন্টু, কামরুল আলম খসরু, মহিউদ্দিন, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজসহ আরো কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা আর একটি ট্রাকে ছিলেন। নিরাপত্তার জন্য গাজী গোলাম মোস্তফা ড্রাইভারকে ৩২ নম্বর সড়কের পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে বলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুসারী অন্যান্য যানগুলো চলে যাওয়ার পর আমি হাসিনা ও শ্যালিকাদের নিয়ে মিরপুর রোড দিয়ে যাত্রা করি। সিএসআইআর-এর মোড়ে পৌঁছে সাইয়েন্স ল্যাবরেটরী রোড ও আশেপাশের রাস্তাগুলোয় রেসকোর্সে অভিগামী ছাত্র-জনতার মিছিলে পরিপূর্ণ থাকায় নিউ মার্কেট, ইডেন কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের

সামনের রাস্তা দিয়ে হাইকোর্ট এলাকা ঘুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কাছাকাছি যাই। সেখানে পৌছে দেখি রেসকোর্স লাখ লাখ লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রায় সবার হাতে লাঠিসোটা। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণ ছিলো রায়ট পুলিশে ভর্তি।

৯। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে নৌকা আকৃতির সভামঞ্চটি স্থাপন করা হয়েছিলো বর্তমান শিশুপার্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। হাসিনার অনুরোধে আমি বহু কষ্টে সভামঞ্চের কাছাকাছি গাড়ি নিয়ে যাই। বঙ্গবন্ধু তখনো সভামঞ্চে এসে পৌছাননি। এর প্রায় পনের মিনিট পর বঙ্গবন্ধু সদলবলে সেখানে পৌছান এবং মঞ্চে উঠে সবাইকে অভিবাদন জানান। হাসিনা আমাকে বলে, "বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখেছে, আব্বার আজকের সম্পূর্ণ বক্তৃতা রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।" সে আমাকে গাড়ীর রেডিও অন করতে বলে। রেডিওতে তখন বার বার এই মর্মে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেডিও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যা হোক, বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করেন এবং শেষ প্রান্তে বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ।" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা লাঠিসোটা ঠোকাঠুকি করে বিজয় উল্লাসে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা শ্লোগান দিলে উপস্থিত জনতা জয় বাংলা শ্লোগান তুলে প্রত্যুত্তর দেন। বঙ্গবন্ধু আবার জয় বাংলা বললে জনতা জয় বাংলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। "খোদা হাফেজ" বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। সভা শেষে আমি হাসিনা ও শ্যালিকাদের নিয়ে একই রাস্তায় ৩২ নম্বরে ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধু প্রায় আধ ঘণ্টা পর বহু লোকজনসহ বাসায় ফিরে আসেন।

১০। সেদিন রাত ৮টার দিকে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকাস্থ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৩২ নম্বরের বাসায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন জনপ্রিয় বাংলা সংবাদ পাঠক ও ছাত্র ফেডারেশনের ইকবাল বাহার চৌধুরী। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে জানান যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সত্ত্বেও ঢাকায় অবস্থিত সেনা বাহিনীর হাই কমান্ডের নির্দেশে সেদিন বক্তৃতা সম্প্রচার করতে না দেয়ায় তাঁরা প্রতিবাদস্বরূপ ৭ই মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণ পুনঃপ্রচার করার অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ঢাকাস্থ রেডিও পাকিস্তান কেন্দ্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ও অফিসে উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐ রাত থেকে পরদিন রাত পর্যন্ত ঢাকাস্থ রেডিও পাকিস্তানের সকল অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। ৮ই মার্চ সকাল ৮টায় হঠাৎ পাকিস্তান রেডিও ঢাকা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা হুবহু সকাল ৯টায় প্রচার করা হবে। আমি ৯ তারিখ সকালে অফিসে যাওয়ার পথে গাড়ীর রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সম্পূর্ণ শুনেছিলাম (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

১১। ৭ই মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু, হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, রেহানা, রাসেল, শেখ শহীদ, শাশুড়ী ও আমাকে নিয়ে খাওয়ার সময় গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার যা বলার ছিলো আজকের জনসভায় তা প্রকাশ্যে বলে ফেলেছি। সরকার এখন আমাকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার বা হত্যা করতে পারে। সেজন্য আজ থেকে তোমরা প্রতিদিন দু'বেলা আমার সঙ্গে একত্রে খাবে।" সেদিন থেকে এ নিয়ম আমরা ২৫শে মার্চ দুপুর পর্যন্ত পালন করেছি। কেবল ২৫শে মার্চ রাতে ব্যতিক্রম ঘটে। সে রাতে বঙ্গবন্ধু রাত এগারোটা পর্যন্ত বাড়ির নীচতলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, কৃষক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ফলে শাশুড়ী বাদে আমরা সবাই খেয়ে নিয়েছিলাম।

১২। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকে তাঁর নির্দেশে শুরু হয় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। তারপর থেকে তিনি কার্যত গোটা পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। ৮ই মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে সরকারী অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করে দেয়। কেবল অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, পানি-বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল ক্লিনিক খোলা রাখা হয়। লক্ষণীয় ছিলো যে, জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করায় সরকারের পুলিশ বাহিনী ও EPR-এর বাঙালী সদস্যবৃন্দের অনেকে পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোকজন, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র সংগঠন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে জয় বাংলা ধ্বনি তুলে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করতে থাকেন।

১৩। ৯ই মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেনঃ ". . . প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নেই। লা কুম দ্বীনুকুম ওয়ালইয়া দ্বীন (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার)- এর নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশমত আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবর রহমানের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালে ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব। খামাকা কেহ মুজিবকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভালো করিয়া চিনি। . . . ।"

১৪। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ সকালে তার উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় পৌছান এবং কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ঢাকাস্থ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হাউস (বর্তমানে সুগন্ধা)-এ অবস্থান করেন। ১৬ই মার্চ সকালে কোন পরামর্শদাতা ছাড়াই ইয়াহিয়া-মুজিব প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ও

তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সামরিক ও বেসামরিক পরামর্শদাতাদের সুদীর্ঘ বৈঠক হয়। আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন। ১৮ই মার্চ সকাল ও বিকেলে দুই দফা আলোচনা হয়। সেদিন উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আরো কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। ১৯শে মার্চ জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ হলে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকার সেখানে কারফিউ জারি করে। বঙ্গবন্ধু এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা এ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর তিনজন পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের পরামর্শদাতাদের পৃথক বৈঠক হয়। আওয়ামী লীগের এই তিনজন ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন। ২০শে মার্চ বঙ্গবন্ধু সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ড: কামাল হোসেনকে নিয়ে ইয়াহিয়া খান ও তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে চতুর্থ দফা বৈঠক করেন।

১৫। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত অন্যান্য দলের ৩৫ জন নেতা ঢাকায় এসে পৌঁছান। এঁদের অন্যতম ছিলেন ন্যাপের সভাপতি খান মোহাম্মদ ওয়ালী খান। ১১ই মার্চ বিকেলে ওয়ালী খান বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাড়ীতে আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বাড়ীর ওপরতলায় বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষের পাশে বসার মুক্ত স্থানে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। ওয়ালী খানকে জীবনে এই প্রথম দেখি। শাহ মোয়াজ্জেমের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ব্যারিস্টার এ. আর. ইউসুফের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন জেনে তিনি ১২ই মার্চ সকাল ৯টার দিকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "আপনাকে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে—হয় N.D.F-এর ৯ দফার ভিত্তিতে সমাধানে পৌঁছাতে হবে নতুবা বর্তমান আন্দোলন ও গণদাবির প্রেক্ষিতে এক দফার ঘোষণা দিতে হবে। এছাড়া আপনার আর কোন বিকল্প নাই।" ঐদিন মুসলিম লীগের নেতা খান আবদুস সবুর খানও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন সন্ধ্যে ৭টার দিকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপ-পরামর্শ করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু সবুর খানকে "ভাইজান" বলে সম্বোধন করতেন। মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথেও বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে আন্দোলন প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীকে "হুজুর" বলে ডাকতেন। বঙ্গবন্ধু কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি

কমরেড মনি সিং এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ সাহেবের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলত খানেরও সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আলাপ-আলোচনা করেছিলেন।

১৬। অসহযোগ আন্দোলন শুরুর পর একদিন রাতে খাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন, "ওয়াজেদ, যে কোন মুহূর্তে সামরিক বাহিনী আমার বাড়ী আক্রমণ করতে পারে। তুমি হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিরাপদে রাখার জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি বাসা ভাড়া করো এবং ওদের নিয়ে চলে যাও। প্রয়োজনবোধে আমি তোমার বাসায় গোপনে আশ্রয় নেবো। একটু বড় বাড়ী নিও, আমি ভাড়া দেবো।" এর দু'দিন পরও বঙ্গবন্ধু একই কথা পুনরায় বলেন। দ্বিতীয়বার একথা বলার পর আমি পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসিনাকে নিয়ে সুবিধাজনক বাসার খোঁজ করতে থাকি। প্রথমে ধানমন্ডির (পুরাতন) ২৮ নম্বর (নতুন ১৫ নম্বর) সড়কে একটি দোতলা বাড়ি দেখি। বাড়ীটি উন্নতমানের এবং প্রতি ফ্ল্যাট তিন হাজার টাকার কমে ভাড়া দেবে না বলে বাড়িওয়ালা আমাদের জানান। অত্যন্ত বেশী ভাড়া এবং বাড়ীটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর কাছাকাছি হওয়ায় হাসিনা ঐ বাড়ীটি নিতে সম্মত হলো না। এরপর হাতিরপুলে তৎকালীন ঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উত্তরে পুরাতন ফুলবাড়ীয়া ষ্টেশনে যাওয়ার রেল লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত ১২ নম্বর ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একই কম্পাউন্ডের ভেতরে তিনটি বাড়ীর মধ্যে একটি দোতালা বাড়ী খালি দেখতে পাই। এ বাড়ীর মালিক ছিলেন আমার রাজশাহী সরকারী কলেজের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক ড: আবদুল্লা আলমুতী শরফুদ্দিনের শ্বশুর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সাহেবের। ফ্ল্যাটটিতে দু'টো বেডরুম, ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম এবং দু'টো বাথরুম। বাসাটি হাসিনার পছন্দ হয়। এর ভাড়া ছিলো কম, পাঁচ শত টাকা। বঙ্গবন্ধু এ বাড়ীতে এসে প্রয়োজনে আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন ভেবে হাসিনার সম্মতিক্রমে পাঁচ শত টাকা অগ্রিম দিই। ১৪ই মার্চ সকালে ঠেলাগাড়ীতে শাশুড়ীর দেয়া আসবাবপত্র নিয়ে ঐ ফ্ল্যাটে রেখে আসি। কিন্তু পরদিন সেখানে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গবোধ করার কারণে ফ্ল্যাটটির রং ঠিকমত করা হয়নি এই অজুহাতে হাসিনা আমাকে তৎক্ষণাৎ ৩২ নম্বরে আসবাবপত্রসহ ফিরে আসতে বাধ্য করে। পরদিন সাত মসজিদ রোডের ওপর ধানমন্ডির (পুরাতন) ১৫ নম্বর রোডস্থ (নতুন ৮/এ-১৭৭ নম্বর) বাড়ীর নীচতলা নয় শত টাকায় ভাড়া নিই। ১৭ই মার্চ সকালে ঐ বাড়ির ড্রয়িং রুমে আসবাবপত্র রেখে আসি।

১৭। ১৮ই মার্চ সকালে সংবাদপত্রে ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট দেশের রাজনৈতিক সমস্যাদি এবং বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করেছেন এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে তিনি আশাবাদী। এই খবর দেখে হাসিনা ধানমন্ডির ১৫

নম্বর রোডস্থ ভাড়াকৃত বাড়ীর ফ্ল্যাটে যেতে ইতস্ততঃ করছিলো। ফলে ধানমন্ডির ১৫ নম্বরের ঐ বাসায় ওঠার আয়োজন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে হয়।

১৮। ২১শে মার্চ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর দলীয় নেতা ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে করে ঢাকায় এসে কড়া নিরাপত্তায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে হোটেল শেরাটন)-এ অবস্থান করেন। ঐ দিনই তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দুই ঘন্টা গোপন শলাপরামর্শ করেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের গতি কোনভাবেই মন্থর করা যাবে না।" ২২শে মার্চ বঙ্গবন্ধু এক প্রেস বিবৃতিতে বললেন, "লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে—প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবি ন্যায়সঙ্গত। তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। জয় বাংলা।"

১৯। ২২শে মার্চ ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠক খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছিলো বলে মনে হলো না। ঐ দিনেই সরকার পক্ষ থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কারণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু করার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হয়েছে। সরকারের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে ২৬শে মার্চ থেকে সারা দেশব্যাপী "অবরোধ আন্দোলন" শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন।

২০। ঐ সময় আভাস পাওয়া গিয়েছিলো যে, ইয়াহিয়া খান কোন শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করতে আন্তরিক ছিলেন না। আলোচনার অজুহাত দেখিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনরত জনতার বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিমানে ও জাহাজে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সৈন্য ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভারি অস্ত্রশস্ত্র আনা হচ্ছিলো। একদিন সংবাদপত্রে দেখা যায়, পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ সামরিক জাহাজ "সোয়াত" কয়েক হাজার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ কয়েক দিনের মধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাবে। এই সংবাদে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত কর্মচারীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কোন অবস্থাতেই তাঁরা "সোয়াত"কে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করতে দেবেন না। আন্দোলনের এহেন অবস্থায় ২৩শে মার্চ সকাল দশটায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। আমি সেখানে পৌঁছাই ৯টার দিকে। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন ছাত্র লীগের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ। লক্ষণীয় যে, গাঢ় সবুজ কাপড়ের মাঝখানে লাল

গোলাকার বলয়ের ভেতর সোনালী রং-এ অংকিত বাংলাদেশের মানচিত্রসহ তৈরী করা হয়েছিলো ঐ পতাকাটি। সভাশেষে এই চার নেতা একটি বিশাল মিছিলসহকারে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসায় এসে বঙ্গবন্ধুকে পতাকাটি অর্পণ করে এবং মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রদের একটি বিশেষ দল সামরিক কায়দায় তাঁকে অভিবাদন জানায়। ঐ দিনই ছাত্র-জনতা প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট ও হাইকোর্ট ভবনসহ বাড়ী বাড়ী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।

২১। ঐদিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে গম্ভীরভাবে খাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে শাশুড়ী বঙ্গবন্ধুকে বললেন, "এতদিন ধরে যে আলাপ-আলোচনা করলে, তার ফলাফল কি হলো কিছু তো বলছো না। তবে বলে রাখি, তুমি যদি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সমঝোতা কর, তবে একদিকে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনী তাদের সুবিধামত যে কোন সময়ে তোমাকে হত্যা করবে, অন্যদিকে এদেশের জনগণও তোমার ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হবে।" একথা শুনে বঙ্গবন্ধু রাগান্বিত হয়ে শাশুড়ীকে বলেন, "আলোচনা এখনো চলছে, এই মুহূর্তে সব কিছু খুলে বলা সম্ভব না।" এই পর্যায়ে শাশুড়ী রেগে গিয়ে নিজের খাবারে পানি ঢেলে দ্রুত ওপর তলায় চলে যান। তিনি না খেয়ে সারা দিন শুয়ে থাকলেন, কারো সঙ্গে কথাও বললেন না।

২২। ২৩শে মার্চ সকালে ও বিকেলে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ ও সামরিক জান্তার উপদেষ্টাদের মধ্যে দুই দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং এম. এম. আহমদ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ. আর. কর্ণেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও কর্নেল হাসান (গোয়েন্দা বিভাগ) সামরিক জান্তার পক্ষে বৈঠকগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন খান আবদুল কাউয়ুম খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো পৃথকভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যে সাতটার দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী শফিউল আজম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাসায় দেখা করে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। ঐদিন রাতে রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি" সঙ্গীত পরিবেশিত হলো।

২৩। ২৪শে মার্চ সকাল ও বিকেলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড: কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টাদের সঙ্গে দুই দফা আলোচনা করলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টারা ছিলেন এম. এম. আহমদ, বিচারপতি কর্নেলিয়াস, লেঃ জেনারেল পীরজাদা এবং কর্নেল হাসান। সাংবাদিকদের নিকট তাজউদ্দিন আহমদ শুধু বললেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তারই আলোকে বিস্তারিত আলোচনায় সিদ্ধান্তে পৌঁছার লক্ষ্যে এসব বৈঠক।"

২৪। ২৫শে মার্চ সকালে জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পার্টির জে. এ. রহিম ও মোস্তফা খারকেসহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করনে। ঐদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সামরিক জান্তার কারও আলোচনা হয়নি। বঙ্গবন্ধু, এ. এইচ. এম. কারুজ্জামান, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ডঃ কামাল হোসেন ও গাজী গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে প্রায় সারাক্ষণ নীচের লাইব্রেরী রুমে বসে ছিলেন। সেদিন সবার চোখে–মুখে ছিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ। মাঝে মধ্যে বঙ্গবন্ধু অন্যান্য ছাত্র ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে এক এক করে বিদায় দেন। রহস্যের ব্যাপার, সেদিন খন্দকার মোশতাক আহমদকে কখনও দেখা যায়নি। বিকেল তিনটার দিকে শেখ ফজলুল হক মণি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর শয়নকক্ষে আলাপ করেন। এর কিছুক্ষণ পর লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা জাকারিয়া চৌধুরী বাসায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোপনে আলাপ করেন। আলাপ শেষে প্রথমে শেখ মনি তার পরিবারের সকলকে নিয়ে সে রাতে টুঙ্গিপাড়া চলে যাবে বলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়। জাকারিয়া চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমাকে জানান যে, তিনি ঐ রাতেই বর্ডার পার হয়ে লন্ডন চলে যাবেন।

২৫। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যে সাতটার আগেই একে একে আওয়ামী লীগ ও এর অন্যান্য অঙ্গদলের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশ নিয়ে চলে যান। সন্ধ্যায় আসে ছাত্র নেতৃবৃন্দ। রাত ৮টায় এইচ. এম. কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। সে সময় আমি হাসিনাকে নিয়ে ছাদে গিয়ে অস্থির হয়ে পায়চারী করছিলাম। রাত যতোই বাড়তে থাকে ততোই চারদিকে লোকজন ও যানবাহনের চলাচল কমতে থাকে। চারদিক থমথমে অবস্থা লক্ষ্য করে আমি শঙ্কিত হই। যাহোক, ব্যস্ততার কারণে বঙ্গবন্ধুর রাতে খেতে দেরী হবে এই ভেবে শাশুড়ী বাদে আমরা সবাই পূর্বের নিয়ম ভঙ্গ করে সাড়ে ন'টার দিকে খেয়ে নিই। অতঃপর শেখ কামাল সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যেন চলে যায়।

২৬। রাত ১১টার দিকেও বঙ্গবন্ধু ওপরে আসছেন না দেখে হাসিনা আমাকে বলে, "আব্বা সারা বিকেল কিছুই খাননি। চলো আমরা দু'জন নীচে গিয়ে আব্বাকে নিয়ে আসি।" আমরা নিচে নামার সময় দেখি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেষ কথা বলছেন সিরাজুল আলম খান, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজকে। তাদের সঙ্গে কথা শেষ করে বঙ্গবন্ধু হাসিনাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বলেন, "মা তোকে আমি সারাদিন দেখিনি।" এ সময় বঙ্গবন্ধুর চোখ ছিলো টক্‌টকে লাল। রাত সাড়ে এগারটার দিকে নীচ থেকে কাজের লোকদের একজন উপরে এস জানায় যে, "ঝন্টু" নামের এক যুবক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চান। বঙ্গবন্ধু বললেন, "ওর কথাই তো আমি ভাবছি। ওয়াজেদ, তুমি ওকে ওপরে নিয়ে এসো।" ঝন্টু নামক ঐ যুবকটি নিজেকে লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের নেতা জাকারিয়া চৌধুরীর ছোট ভাই বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাঁকে আমি চিনি না বলে বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী

ছাত্র লীগের মহিউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে যাই। বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, "মুজিব ভাই, পাকিস্তান আর্মিরা আপনাকে মারতে আসছে, আপনি এক্ষুণি বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। তারা ট্যাঙ্ক, কামান ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইতিপূর্বেই ঢাকা শহরে প্রবেশ করার জন্যে তৈরী হয়েছে।" তারা আর কি পরিকল্পনা করেছে বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলে তিনি জানান যে, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ইপিআর বাহিনীর পিলখানাস্থ সদর দফতরে সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে এবং সারা ঢাকার রাস্তায় যাদেরকে পাবে, তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাবে এবং রেডিও ষ্টেশন, টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিকমিউনিকেশন কেন্দ্র ও ঢাকার ফুড গোডাউন বল প্রয়োগ করে পুনর্দখল করবে। তখন বঙ্গবন্ধু আমাকে চিৎকার করে ডেকে হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিয়ে আমাদের ভাড়াকৃত ফ্ল্যাটে চলে যেতে বলেন। এ খবর শোনার পর আমি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়াহিয়া খান এখন কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছি যে, ইয়াহিয়া খান বিকেল পাঁচটার দিকে বেইলী রোডের রাষ্ট্রপতি ভবন ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে চলে গেছেন।" অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কোথায় যাবেন এবং কামাল, জামালকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো কিনা। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমার এখন অন্যত্র চলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই তারা আমাকে মারতে চাইলে এ বাসাতেই মারতে হবে। কামাল অন্যত্র চলে গেছে। জামাল ওর মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, সে আমাদের সঙ্গে থাকবে।" এ কথা শোনার পর হাসিনা, রেহানা ও জেলী বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে।

২৭। "ওরা পরে যাবে", শাশুড়ী এ কথা বলায় আমি তড়িঘড়ি করে মাত্র একটি স্যুটকেস নিয়ে গাড়ি চালিয়ে রওনা দিই, কিন্তু গেইটে পৌঁছে দেখি চারদিকে থমথমে অবস্থা এবং বেশ কিছু অপরিচিত লোক বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর সামনে ও লেকের ধারে টহল দিচ্ছে। আমি আমার নতুন ভাড়া বাড়ীতে পৌঁছাই বারটার দিকে। সেখানে দেখতে পাই অনেক বাঙালী ছাত্র-জনতা সাত মসজিদ রোডে বিরাট গর্ত তৈরী করছে যাতে পাকিস্তান আর্মির লোকেরা সহজে মোহাম্মদপুরের দিকে যেতে না পারে। বাসায় ঢুকে বিছানার চাদর দিয়ে জানালায় পর্দা লাগিয়ে ফ্লোরে শোয়ার ব্যবস্থা করি। এর মিনিট বিশেক পর হাসিনা, রেহানা, জেলী ও যে যুবকটি ইতোপূর্বে অনেক বছর যাবত বঙ্গবন্ধুর বাসায় নানান কাজকর্মের দেখাশুনা করতো সেই ওয়াহিদুর রহমান পাগলাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর গাড়ীতে সেখানে পৌঁছায়। কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক, বিশেষ করে ইপিআর-এর পিলখানাস্থ হেড কোয়ার্টারের দিকে গোলাগুলি ও কামানের আওয়াজ শুনতে পাই। হাসিনাদের মাঝের রুমে শোয়ার ব্যবস্থা করে আমি ফ্লাটের সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়ে পাশের রুমে শুয়ে থাকি। রাইফেলের গুলি আমাদের বাসায় পড়তে শুরু করলে দু'টো রুমের মাঝখানে ড্রেসিং রুমের ভেতর হারিকেন জ্বেলে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর আর্মির কয়েকটি গাড়ী বাসার পাশের রাস্তা হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসার

দিকে চলে যায়। রাত ২টার দিকে আমাদের ফ্ল্যাটের কলিং বেল কয়েকবার বাজানো হয়। কিন্তু আর্মির লোক হতে পারে এই ভেবে আমি সাড়া দিলাম না। ভোর পাঁচটার দিকে মাইকে উর্দু ও জড়তাপূর্ণ বাংলায় রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা দেয়া হয়, "সারা ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। ঘরের বাইরে আসা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ বাইরে এলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। যাদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা দেখা যাবে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।"

২৮। ২৫শে মার্চ রাতে সুযোগের অভাবে ঐ ফ্ল্যাটে নাস্তা কিংবা খাবারের জন্যে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো না। যাহোক, ঐ রাতে পাগলা বুদ্ধি করে যে কিছু চাল, ডাল, লবণ, পেঁয়াজ, মরিচ ও রান্নার তেল এনেছিলো সেই ছিলো আমাদের একমাত্র ভরসা। ২৬শে মার্চ বিকেলের দিকে কামালের এক বন্ধু গোপনে অনেক বাড়ীর দেয়াল টপকিয়ে এসে আমাদের জানায় যে, পাকিস্তানী আর্মি রাত একটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে প্রবেশ করে তাঁকে, তাঁর সহকর্মী জনাব গোলাম মোরশেদ, কাজের লোক আজিজ, ফরিদ, বাবুর্চি নিয়াজ ও শিশু রাসেলকে দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত আজিজুন নেছা (বুড়ী)-কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। গোলাম মোর্শেদকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আহত করে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গেছে। শাশুড়ী, জামাল ও রাসেল বাসায় আছে। কামাল অন্যত্র তার বন্ধুদের সঙ্গে আছে। ঐ যুবকটি আরও জানায় যে, তথাকথিত "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার ২ নম্বর আসামী অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসায় ২৫শে মার্চ রাত বারটার পর পরই অতর্কিতে হামলা চালিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর লোকজন তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর লাশ ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। এ কথা শুনে পাগলা তৎক্ষণাৎ কারফিউ উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর বাসার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

২৯। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তান রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনার ব্যর্থতার জন্য আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ দায়ী করে সারা পূর্ব পাকিস্তানে পুনঃসামরিক শাসন জারি করেন। ঐ ভাষণে শক্তি প্রয়োগের আদেশ প্রদান এবং একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ দলকে বেআইনী ঘোষণা করার কথাও উল্লেখ করা হয়। ২৭শে মার্চ ভোর সকালে রেডিও ও মাইকে বার বার ঘোষণা করা হয় যে, ঐদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হবে এবং সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত দফতর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ কর্মস্থলে যেতে হবে। পরে জানতে পারি যে, পাকিস্তান সৈন্যরা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার বিধ্বস্ত করেছে। ইকবাল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক) হলে ৫০-৬০ জন ছাত্রসহ হলের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। জগন্নাথ হলে শতাধিক ছাত্রকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। ২৬ তারিখে দিনের বেলায় ঐ সমস্ত নিহত ছাত্রদের

দেহগুলো হলের সামনের মাঠে জ্বালানি কাঠের মত স্তূপীকৃত করে রাখা অবস্থায় দেখা গিয়েছিলো। রাতে মৃতদেহগুলোকে কবর দেয়ার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে বৃহৎ গর্ত খোঁড়ানো হয়। পরে তাদেরকেও গুলি করে হত্যা করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের চত্বরে একটি ক্যান্টিন চালাতেন সর্বজনপরিচিত 'মধু দা''। তার দু'কন্যা, এক পুত্র ও স্ত্রীসহ তাঁকেও গুলি করে হত্যা করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবনগুলোয় ঢুকে অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবসহ ১১ জন অধ্যাপক ও প্রভাষককেও পাকিস্তানী সৈন্যরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো ২৫শে মার্চের মধ্যরাতের পর। দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসসহ সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলো।

৩০। ২৭শে মার্চ সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি যে, পাকিস্তান আর্মির ডজনখানেক জোয়ান দু'টো জীপে ঐ বাসার গেটে মোতায়েন রয়েছে। গেটের কাছেই গ্যারাজে ছিলো আমার গাড়ী। গাড়ীর গ্লাসে তখনও লাগানো রয়েছিলো বাংলাদেশের পতাকা ও জয় বাংলা সম্বলিত নানান পোস্টার। যাহোক, উপস্থিত সৈন্যদের অনুমতি নিয়ে গ্যারাজে ঢুকে দরজা কিছুটা বন্ধ রেখে ভেজা রুমাল দিয়ে কোন রকমে পোস্টারগুলো তুলে ফেলি। অতঃপর গাড়ী বের করে হাসিনাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর পাশের বাসায় যাই। সেখানে জানতে পাই যে, শাশুড়ী জামাল ও রাসেলকে নিয়ে ২৬শে মার্চ রাতে ঐ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ঐ সকালে আমাদের সেখানে পৌছার কিছুক্ষণ আগে মোমিনুল হক খোকা তাঁদেরকে নিয়ে আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। এ কথা শুনে আমরা তাদের খোঁজে আমাদের বাসার দিকে চলে যাই। পথে আমার বাসার নিকট অপর একটি বাসার দোতলা থেকে রাসেল চিৎকার করে আমাদেরকে ডাক দেয়। ঐ ফ্ল্যাটে থাকতেন বঙ্গবন্ধুর সুহৃদ ক্যাপ্টেন কিউ. বি. এম. রহমান বাশার। সেখানে শাশুড়ীকে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁকে ফ্লোরে শোয়ানো হয়েছিলো এবং তিনি "বাবা, আর্মিরা কামাল-জামালকে মেরে ফেলেছে" বলে প্রলাপ করছিলেন। এরপর আমি হাসিনাদের সেখানে রেখে আশ্রয়ের খোঁজ নিতে আমার বন্ধু ও সহকর্মী ডঃ মোজাম্মেলের খিলগাঁওস্থ বাসায় যাই। ডঃ মোজাম্মেল ওর আব্বা-আম্মার সঙ্গে থাকতেন। ডঃ মোজাম্মেলের ছোট বোন-জামাই ও আমার সহকর্মী ডঃ ফয়জুর রহমানও ঐ বাসায় থাকতেন। ডঃ ফয়জুর রহমান তাঁর রুমটি আমাদের জন্য দেয়ার কথা জানান। সেখান থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আমি হাসিনা ও জেলীকে নিয়ে ডঃ মোজাম্মেলের আব্বার বাসায় সাময়িকভাবে আশ্রয় নেবো, আর খোকা কাকা শাশুড়ী, জামাল, রেহানা ও রাসেলকে নিয়ে ওয়ারীতে তাঁর শ্বশুরের বাসায় আশ্রয় নেবেন।

৩১। খিলগাঁওয়ে যাবার পথে দেখি যে, পাকিস্তান আর্মি রাজারবাগস্থ পুলিশ ব্যারাক সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিল্ডিংগুলো মর্টার ও কামানের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যাহোক, এদিক-সেদিক ঘুরে টহলরত আর্মির দৃষ্টি এড়িয়ে কারফিউ পুনরায় বলবৎ হওয়ার

পূর্বেই আমরা ড: মোজাম্মেলের বাসায় পৌঁছাই। এর কিছুক্ষণ পর ড: মোজাম্মেলের ছোট বোন আমাদের জানায় যে, ঢাকাস্থ সামরিক বাহিনীর কন্ট্রোল রুম থেকে ২৫শে মার্চ রাতে আক্রমণকারী সেনা ইউনিটগুলোকে ওয়্যারলেসে যে সমস্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলো সে রেকর্ড করে রেখেছে। সে আরও জানায় যে, ২৬শে মার্চ দুপুরে কোন এক বেতার কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছে যে, চট্টগ্রাম শহরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের সশস্ত্র লড়াই হচ্ছে। ঐ সংবাদ প্রচারের পর পরবর্তীতে আরও সংবাদ দেয়ার কথা জানিয়ে বেতার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

৩২। পরবর্তীতে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম. এ. হান্নান ২৬শে মার্চ দুপুরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাসম্বলিত বাণীর বরাত দিয়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণ প্রচার করেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে এই বেতার কেন্দ্রের স্বল্পকালীন অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার বাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দ্বীপ। বাণীটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

> "সম্ভবত এটাই আমার শেষ নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বিদেশী শত্রুসৈন্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে রাতের অন্ধকারে। ঢাকায় তারা ঘুমন্ত লোককে হত্যা করছে। এই বর্বর আক্রমণ এবং অবাধ গণহত্যার কথা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে জানিয়ে দিন। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আমার নির্দেশ, আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন এবং আপনাদের হাতে যা'ই থাকুক তাই নিয়ে দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত আপনাদের লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।"

৩৩। যা হোক, ২৭ শে মার্চ সন্ধ্যায় ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ঘোষণায় বার বার বলা হচ্ছিলো যে, মেজর জিয়া ভাষণ দেবেন। এর কিছুক্ষণ পর শোনা গেলো,

> "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বলছি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। দেশের সর্বত্র আমরা পাকিস্তানী হানাদারদের পর্যুদস্ত করে চলেছি। ইনশাআল্লাহ আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দেশকে আমরা শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হবো। জয় বাংলা।"

৩৪। এরপর বেতার কেন্দ্রটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ সকাল প্রায় দশটার দিকে ঐ বেতার কেন্দ্রটি থেকে মেজর জিয়া বলেন যে, ক্যাপ্টেন ভূঞার নেতৃত্বে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে আক্রমণ চালিয়ে জাহাজটি দখল করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন জায়গায় লড়াই অব্যাহত রয়েছে। মেজর জিয়া জনগণকে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে সমবেত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেখানে উপস্থিত হয়ে একটি বিশেষ ঘোষণা দেবেন। এই সংবাদ শুনে হাসিনা বলে, "আব্বার ২৫শে মার্চ রাতেই বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়ে আত্মগোপন করার

কথা ছিলো এবং তার জন্য পুরচুলাও এনে রাখা হয়েছিলো। পরবর্তীতে জিঞ্জিরায় তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর একত্রে চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বাইরে বেরুনোর কোন সুযোগ না পেলে যাতে ইপিআর-এর অয়্যারলেসের মাধ্যমে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর, অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ০০.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক হান্নান সাহেবকে বার্তা পাঠানো যায় তার জন্য আব্বা ব্যবস্থা করেছিলেন। ওরা বোধ হয় জানে না যে, আব্বাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

৩৫। পরবর্তীকালে জেনেছি যে, বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিলো টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ইপিআরএর ঐ বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু জনাব গোলাম মোর্শেদের মাধ্যমে ইপিআরএর ঐ সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। উক্ত কথোপকথনের সময়ই একজন কর্নেলের নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একটি দল বঙ্গবন্ধুর বাসায় সশস্ত্র হামলা চালিয়ে প্রবেশ করে এবং গোলাম মোর্শেদের মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। তিনি ঐ আঘাতে সংজ্ঞা হারান। তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই অন্যান্যের সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু জহুর আহমেদ চৌধুরী ও এম. এ. হান্নান সাহেবকে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিলো নিম্নরূপঃ

> "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করছে। ঢাকা-চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ, দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোন আপোষ নাই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদের এই সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

৩৬। ২৮ ও ২৯শে মার্চের বিভিন্ন সময়ে বেতারে মেজর জিয়া নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে দাবি করে জনগণের প্রতি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। ৩০ শে মার্চ সকাল ৮টার দিকে মেজর জিয়া উক্ত বেতারে বলেন, "অনিবার্য কারণবশত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লালদীঘি ময়দানে উপস্থিত হতে পারেন নি। এজন্য

আমি মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করছি।" জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা প্রকল্প থেকে প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে তার যে ইংরেজী ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ আছে সেটি বঙ্গানুবাদসহ হুবহু উদ্ধৃত করা হলোঃ

"The Government of the sovereign state of Bangladesh, on behalf of our Great Leader , the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh, and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of the seventy five million people of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate Government of the people of the Independent Sovereign State of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognised by all the Governments of the World. I, therefore, appeal, on behalf of our Great Leader Sheikh Mujibur Rahman, to the Governments of all the democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal Government of Bangladegh and take immediate measures for stopping the awful genocide that has been carried on by the army of occupation from Pakistan...
...The guiding principle of the new state will be, first neutrality, second peace and third friendship to all enmity to none. May Allah help us. Joy Bangla."

এর বাংলা অনুবাদ হচ্ছেঃ

সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র, আমাদের মহান নেতা বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক, শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে, শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করা হচ্ছে যে, শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার। আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত ভয়াবহ গণহত্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথমত নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয়ত শান্তি এবং তৃতীয়ত সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরীতা নয়। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা।"

৩৭। উপরিউক্ত ঘোষণার পর ঐ বেতার কেন্দ্র হতে আর কোন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়নি। এর পরের দিন হতে ঢাকা থেকে প্রতিদিন ঘন ঘন সামরিক বাহিনীর বহু হেলিকপ্টার, বিমান বাহিনীর প্লেন ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য বহনকারী প্লেনকে চিটাগং-এর দিকে উড়ে যেতে দেখি। এ ছাড়াও রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রাণে বেঁচে যে সমস্ত পুলিশ বাহিনীর লোকজন আমার বন্ধুর আব্বার বাসার আশেপাশের বাড়ীগুলোয় আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরাও এক এক করে অতি গোপনে নিঃস্বাবস্থায় সামনের ঝিলের মধ্য দিয়ে গ্রামের দিকে চলে যায়। আমাদের এলাকায় আত্মগোপন করে থাকা পুলিশ বাহিনীর লোকদের কাছ থেকে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে রাজারবাগস্থ পুলিশ বাহিনীর ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে সংঘটিত সশস্ত্র লড়াইয়ের আরও বিস্তারিত বিবরণ পাই। রাজারবাগস্থ পুলিশ বাহিনীর লোকজনকে সে রাতে সেনাবাহিনীর দল কী নির্মম, নৃশংস ও নির্বিচারে হত্যা করেছিলো তার বিবরণ পাই ঐ সমস্ত আত্মগোপন করা পুলিশদের কাছ থেকে। ঐ সময় আল্লাহর নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি যে, চিটাগংয়ের মেজর জিয়াউর রহমান ও তাঁর সহকর্মীদেরসহ অন্যান্য যাঁরা তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করছিলেন তাঁদের যেন কোন ক্ষতি না হয় এবং তাঁরা যেন দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিজয়ী হন।

৩৮। ১লা এপ্রিল হতে খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার গোলচক্করে ঢোকার প্রধান পথের কাছে ড: এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আণবিক শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা, এই নামে একটি বাড়ীর ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া হয়। শাশুড়ী, হাসিনা, জামাল, রেহানা, রাসেল, জেলী, খোকা কাকা, তাঁর স্ত্রী, দুই সন্তান ও আমি ঐ ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠি। ঐ ফ্ল্যাট থেকে দেখতাম যে, রাস্তায় আর্মি মাঝে মাঝে টহল ও বিভিন্ন ঘোষণা দিতো। পাঁচ-ছয় দিন পর বাড়ীওয়ালী শাশুড়ীকে ভাড়া ফেরত দিয়ে বলেন, "আপনাদের পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে। আল্লাহর দোহাই, আপনারা দয়া করে এই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। তা না হলে পাকিস্তানী আর্মি আমাদের বাড়ীটি ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দেবে।" ঐ বাসায় থাকার সময় একদিন কামাল এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমার শাশুড়ীকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা, আমি আজ রাতে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করো।" উপায়ন্তর না দেখে বেগম বদরুননেসার স্বামী নূরুউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদের তাঁর মগবাজারের চৌরাস্তার নিকট প্রধান সড়কে অবস্থিত বাড়ীর নীচ তলায় থাকতে দেন। ঐ বাসায় থাকার সময় একদিন পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দুইজন কর্মকর্তা প্রহরারত অবস্থায় করাচী বিমান বন্দরের লাউঞ্জে তোলা বঙ্গবন্ধুর ফটো সরকারের নির্দেশনায় প্রকাশ করা হয়। এই প্রথম জানতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানে নেয়া হয়েছে।

৩৯। তখন প্রায়ই বৃষ্টি হতো। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কিছু সংখ্যক অচেনা পশ্চিম পাকিস্তানী লোককে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেতো। কোন কোন রাতে পাকিস্তান আর্মির ট্রাক

বাড়ীটির সামনে এসে থামতো। এতে শাশুড়ী ঘুমাতে পারতেন না বলে তিনি আমাকে ঐ এলাকার ভেতরের দিকে একটি দোতলা বাড়ির ওপরতলা ভাড়া নিতে বলেন। বেশী ভেতরে বাসা খালি না পেয়ে ঐ বাসার কাছাকাছি একটি বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। সেখানে সপ্তাহ্ দুয়েক কেটে যায়। সেখান থেকে আমরা পাকিস্তান আর্মিকে বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে দেখতাম। লোকজনের কান্নাকাটি শুনতে পেতাম। রাতে শেয়াল-কুকুর কান্নার সুরে ডাকতো। এর মধ্যে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী এসে আমাদের জানায় যে, ১০ই এপ্রিল জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যগণ বঙ্গবন্ধুর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য) এবং ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের নিকট এক আম্রকাননে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সাহেবকে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম, মনসুর আলীকে অর্থমন্ত্রী এবং খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী করে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়েছে। দেশকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে "মুক্তি বাহিনী" গঠন করে কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে তার প্রধান নিয়োগ করা হয়েছে। যে স্থানে (ভবেরপাড়া) আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয় সে স্থানের নাম 'মুজিব নগর' রাখা হয়েছে।

৪০। উপরিউক্ত খবর পাবার দিন কিছুদিন পর ১২ই মে (১৯৭১) বিকেল দুটোর পর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এমন সময় এক পশ্চিম পাকিস্তানী দোতলায় উঠে আসলে আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বারান্দায় যাই। ভদ্রলোক নিজেকে মেজর হোসেন, পাকিস্তান আর্মির লোক বলে পরিচয় দিয়ে বলেন, "এই বাসায় শেখ মুজিবের পরিবার আছে। আমি সরকারী নির্দেশে আপনাদের গ্রেফতার করতে এসেছি।" গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে কিনা জানতে চাইলে মেজর হোসেন বলেন যে, তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এমন এক বিভাগের কর্মকর্তা যাঁদের বিনা সরকারী পরোয়ানায় যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন অবস্থায় গ্রেফতার করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি সেখানে বসে অয়্যারলেসে সংবাদ পাঠিয়ে আরো একটি সশস্ত্র সৈন্যসহ জীপ ও আর্মি ট্রাক নিয়ে আসেন। প্রায় সন্ধ্যার দিকে কড়া পাহারায় সেনাবহরটি আমাদের তৎকালীন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে ধানমন্ডির দিকে নিতে থাকে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে শেরাটন) বহিঃগমন গেটের পেছনে সাংবাদিক গোলাম রসুল মল্লিককে (বর্তমানে ENA-এর Chief) আমাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়তে দেখি। অতঃপর আমাদের ধানমন্ডির (পুরাতন) ১৮ নম্বর (নতুন ৯/এ) সড়কের ২৬ নম্বর বাড়ীতে ঢুকিয়ে আমাদের বাড়ীর বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এবং ১৫/২০ জন সশস্ত্র সৈন্যকে পাহারায় রেখে মেজর হোসেন চলে যান। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই শাশুড়ী অস্বস্তিবোধ করতে করতে এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ কথা পাহারারত আর্মির

কমান্ডারকে জানালে সে আমাকে গাড়ী নিয়ে তাকে সঙ্গে করে ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে যেতে বলে। পথে সে আমাকে জানায় যে, উক্ত বিদ্যালয়টিকে ধানমন্ডি এলাকার সামরিক হেড কোয়ার্টার্সে পরিণত করা হয়েছে এবং সেখান থেকে সে ক্যান্টনমেন্টস্থ আর্মি হেড কোয়াটার্সের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আমার শাশুড়ীর অসুস্থতার খবর অবহিত করবে। সে ভেতরে চলে যাবার পর পাঁচ-ছয়জন সামরিক বাহিনীর লোক আমার গাড়ীটিকে ঘিরে রেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুহ শেখ মুজিব্‌কা বড় লাড়কা শেখ কামাল হো?" উত্তরে আমি বলি যে, আমি শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামাল নই। আমি শেখ মুজিবের দামান্দ, ড: ওয়াজেদ এবং পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের একজন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। অতঃপর বাসায় ফিরে আসি। ইতিপূর্বে কারফিউ বলবৎ হয়েছিলো। আশেপাশে কোন দোকান-পাট না থাকায় আমাদেরকে সে রাত অনাহারে কাটাতে হলো। রাতে হাসিনা আমাকে জানায় যে, সেদিন দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগের তিন জন যুবক মগবাজারস্থ বাসায় এসেছিলো আমাদের ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করার জন্য।

৪১। পরদিন সামরিক বাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা একজন নার্সসহ শাশুড়ীর শারীরিক অবস্থা দেখার জন্য ঐ বাড়ীতে আসেন। তাঁর রক্তচাপ পরীক্ষা করে আমাদের বলা হয় যে, তিনি ভাল আছেন। তাঁর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই, এ কথা বলে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা নার্সকে নিয়ে চলে যান। এরপর শাশুড়ীর জন্য আর কোনরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি।

৪২। অন্তরীণ করার চতুর্থ দিনে মেজর হোসেন আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। শাশুড়ী মেজর হোসেনকে হাসিনার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কারণে তাকে নিয়ে আমার বাইরে যাওয়ার অনুমতি চান ও খোকা কাকার বাচ্চাদের চিকিৎসা ও লেখাপড়ার অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকেও বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার অনুরোধ জানান। মেজর হোসেন এ পর্যায়ে আমাকে জানান যে, সরকার আমাদের তত্ত্বাবধান করবে। তখন শাশুড়ি বলেন, "আমার জামাইয়ের অফিসের বেতন দিলেই চলবে, আমাদের সরকারী টাকা পয়সার দরকার নেই।" তখন মেজর হোসেন শর্ত দেন যে, আমি নিয়মিত অফিসে গেলে বেতন দেয়া হবে। এরপর মেজর হোসেন সেখানে পাহারারত সৈন্যদের কমান্ডারকে ডেকে বলেন, "ড: ওয়াজেদ ও তার স্ত্রী এবং মোমিনুল হক তার বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে যেতে পারবে, অন্যদের গেটের বাইরে যেতে দেবে না।"

৪৩। এর দুই-তিন দিন পর মেজর হোসেন আবার এসে আমাকে আলাদাভাবে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে আমি তাঁকে লাহোরস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে ১৯৬৩ সালে প্রশিক্ষণ থাকার সময়কাল থেকে পরিচিত পশ্চিম পাকিস্তানী বিজ্ঞানী ড: নিজাম উদ্দিনের কথা বলি। ড: নিজাম উদ্দিনের ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রে প্রায় দুই বছর কর্মরত থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, হৃদ্যতা, তাঁর বাসায়

আমার যাতায়াত, আমাদের বিয়েতে তাঁর উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়েও মেজর হোসেনকে অবহিত করি। মেজর হোসেনও ড: নিজাম উদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া ও পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার কথা আমাকে জানান। এরপর থেকে মেজর হোসেন আমার সঙ্গে অনেকটা মার্জিত ও খোলাখুলি ব্যবহার ও কথাবার্তা বলতেন। যাহোক, পরের দিন থেকে অবশ্যই অফিসে নিয়মিত যাবার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন। ঐ বাসায় কোন আসবাবপত্র কিংবা ফ্যান ছিল না। এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন কিনা একথা মেজর হোসেনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর অপারকতা প্রকাশ করে বলেন যে, আমাদেরকে ঐ অবস্থাতেই থাকতে হবে। ফলে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার হাতে বন্দীদশাকালে আমাদের সবাইকে ঘরের মেঝেতে ঘুমোতে হয়।

৪৪। পরদিন অফিসে এসে দেখি যে, আমার কক্ষের সমস্ত বই ও নথিপত্র তছনছ করে তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হয়েছে। সহকর্মীদের কাছে জানতে পারি যে, তৎকালীন আণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিচালক ড: এম. শমশের আলীর নির্দেশে এসব করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সহকর্মীদের ক্ষেত্রেও ড: শমশের আলী এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমি অবশ্য ড: শমশের আলীকে এ ব্যাপারে কোন কিছু বলিনি। এ সময় অফিসের অন্যান্য সহকর্মীর কাছে জানতে পারি যে, মার্চ মাসের শেষের দিকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী NAP (ভাসানী)–এর সভাপতি ও বয়োজ্যেষ্ঠ জননেতা মওলানা ভাসানীর টাংগাইলের সন্তোষের বাড়ীঘর ও বিষয় সম্পত্তি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে, তবে তিনি তার আগেই পরিবারবর্গসহ অন্যত্র পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন।

৪৫। ২৫শে মে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" থেকে জানতে পারি যে, মুজিব নগরে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের হাজার হাজার ছাত্র–জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জনগণকে চাঙ্গা করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা গান ও দেশাত্মবোধক গান বাজিয়ে শোনানো হতো। স্বাধীন বাংলা বেতারের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিলো এম. আর. আখতার মুকুল কর্তৃক রচিত ও পঠিত "চরমপত্র"। আমরা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে জয় বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতাম। ঐ "জয় বাংলা বেতার"–এ জানানো হয়েছিলো যে, NAP (মোজাফফর)–এর সভাপতি প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং এবং NAP (ভাসানী)–এর সভাপতি ও দেশের অন্যতম অবিসংবাদিত নেতা মওলানা ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মওলানা ভাসানীকে মুজিব নগরে গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমটির চেয়ারম্যানও নির্বাচিত করা হয়েছিলো।

৪৬। জুন মাসের প্রথম দিকে হাসিনাকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসক (Gynaecologist) ডা: এম. এ. ওয়াদুদের ক্লিনিকে নিয়ে যাই। ডা: ওয়াদুদের স্ত্রী ডা: সুফিয়া ওয়াদুদও স্ত্রীরোগ

চিকিৎসক ছিলেন। তাঁরা সদয় হয়ে হাসিনাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে প্রতি সপ্তাহে ক্লিনিকে আসতে বলেন। তাঁরা হাসিনাকে চেক আপ করার জন্য টাকা-পয়সা নিতেন না। জুন মাসের প্রথম থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থান ও সরকারী ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি, ইত্যাদি স্থানে আক্রমণ জোরদার করতে থাকে। জুন মাসের শেষের দিকে এই আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। যখনই বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যেতো, প্রহরারত সুবেদার মেজর স্টেনগান হাতে "ডক্টর সাব, ডক্টর সাব" বলতে বলতে আমার রুমে ঢুকতো। সে সময়ে তারা আমাদেরকে নানাভাবে হয়রানি ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতো। বাড়ীর ছাদে উঠে লাফালাফি করতো এবং লাইট জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোতে দিতো না। রাইফেলের মাথায় বেয়নেট লাগিয়ে কক্ষের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো।

৪৭। জুলাই মাসের মাঝামাঝি হাসিনাকে ডা: ওয়াদুদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মেডিক্যেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ সময় আমার শাশুড়ী যাতে হাসপাতালে হাসিনার সঙ্গে থাকার কিংবা দেখা করতে পারেন তার অনুমতি নেয়ার জন্য মেজর হোসেনের অফিসে ফোন করি। মেজর হোসেনের পরিবর্তে মেজর ইকবাল নামক এক সামরিক কর্মকর্তা বাসায় এসে আমার শাশুড়ীকে রূঢ় ভাষায় বলেন, "আপনি তো নার্স নন যে, হাসপাতালের কেবিনে আপনার মেয়ের সঙ্গে থাকা বা দেখাশুনা করার প্রয়োজন রয়েছে।" এহেন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন, এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেনের স্ত্রী লিলি ফুফু, হাসিনার সঙ্গে কেবিনে সারাক্ষণ থাকতেন। আমিও মাঝে মাঝে থাকতাম। ২৭শে জুলাই রাত ৮টার দিকে নির্ধারিত সময়ের ৬ সপ্তাহ পূর্বে আমাদের প্রথম সন্তানের (ছেলে) জন্ম হয়। এরপর থেকে কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজন বাচ্চা দেখতে আসতে শুরু করেন।

৪৮। একদিন খাবার নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে হাসিনা ও লিলি ফুফুকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তারা আমাকে জানায় যে, আমার সেখানে পৌঁছার ঘন্টাখানেক আগে বিহারীদের মতো দেখতে এক লোক কেবিনে ঢুকে উপস্থিত সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং লিলি ফুফু বাদে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখিয়ে রুম থেকে বের করে দেয়। সেদিন থেকে আমি কেবিনে প্রতি রাতে থাকতাম। পরদিন সেই বিহারী চেহারাধারী স্বাস্থ্যবান লোকটিকে কেবিনের সামনে দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে নিজেকে পাকিস্তান আর্মির একজন সদস্য বলে স্বীকার করে বলে যে, সরকারী নির্দেশ রয়েছে যে, উক্ত কেবিনে একজনের বেশি সেবিকা থাকতে পারবে না। সেদিন বাসায় ফিরে এসেও সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখি। শাশুড়ী আস্তে আস্তে বলেন যে, আগের রাতে হাবিলদার আকস্মিকভাবে স্টেনগান নিয়ে তাঁর কক্ষে ঢুকে বলেছিলো, "আপনারা জয় বাংলা রেডিও শোনেন। এটা বন্ধ না করলে জামালকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে ঘরের সিলিং-এ পা বেঁধে ঝুলিয়ে পিটিয়ে তার পিঠের চামড়া ওঠানো হবে।"

৪৯। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, আর্মিরা টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর আব্বার বাড়ী সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে চারজন লোককে হত্যা করা হয়েছে। এতে হাসিনার দাদা-দাদি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদেরকে ঢাকায় এনে বঙ্গবন্ধুর বড় বোনের মেয়ে জামাই (মীর আশরাফুদ্দীন) মাখন দুলাভাইয়ের আরামবাগস্থ বাসায় রাখা হয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার দিন আমি সরকারী বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে আরামবাগে গিয়ে দাদা-দাদিকে বাচ্চা দেখিয়ে তাঁদের দোয়া নিয়ে হাসিনাকে অন্তরীণ রাখা বাসায় নিয়ে আসি।

৫০। পরদিন সকাল বেলা দেখি যে, শাশুড়ী, হাসিনা ও রেহানা চিন্তিত হয়ে বাচ্চার পেটে তেল মালিশ করছেন। শাশুড়ী জানালেন যে, সারা রাত চেষ্টা করেও তাঁরা বাচ্চাকে পায়খানা করাতে পারেননি। সুতরাং ডাক্তারের চিকিৎসা ছাড়া বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে না। আমি তৎক্ষণাৎ ডা: ওয়াদুদকে ঘটনা জানিয়ে আমাদের বাসায় আসতে সবিশেষ অনুরোধ করি। তিনি একটু ভেবে তাঁর এ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে যেতে বললেন। ডাক্তার নিয়ে বাসায় পৌছালে তাঁকে ভেতরে যেতে প্রহরীরা বাধা দেয়। বাচ্চার কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তাদেরকে দায়ী করা হবে, এ কথা বলার পর তারা ডাক্তারকে ভেতরে যেতে দেয়। বহু কষ্টে বাচ্চাকে পায়খানা করানো হলো। আল্লাহর রহমতে এ বিপদ থেকে আমাদের ছেলে বেঁচে যায়।

৫১। উপরোক্ত ঘটনার পরের দিন রাত সাড়ে আটটার দিকে হাসিনার অবিরাম রক্ত ক্ষরণ শুরু হলে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন হয়। আমি ডাক্তার আনতে যেতে চাইলে হাবিলদার জোরপূর্বক স্টেনগানসহ আমার সঙ্গে যায়। অধিকন্তু পর্যাপ্ত গুলি ও সাবমেশিনগান নিয়ে সুসজ্জিত একজন জোয়ানকেও সে সঙ্গে নেয়। ডা: ওয়াদুদ তখন হাসপাতালে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বৃত্তান্ত শোনার পর তিনি আমার সঙ্গে আসতে চাইলে হাবিলদার আপত্তি করে। অতঃপর তিনি ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। রাত তখন প্রায় পৌনে দশটা, কারফিউ শুরু হওয়ার মাত্র পনের মিনিট বাকি। দোকান-পাট সব বন্ধ করা হয়েছিলো। সৌভাগ্য যে, ল্যাবরেটরী রোডে তখনও একটি ওষুধের দোকান খোলা ছিলো। দোকানের ঝাঁপ প্রায় বন্ধ করে ভেতরে কয়েকজন "জয় বাংলা" বেতার শুনছিলো। যাহোক, তাড়াতাড়ি ওষুধ নিয়ে নিরাপদে বাসায় ফিরি। এরপর হাসিনা ও আমাদের ছেলে আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে।

৫২। একদিন ছেলের গায়ে তেল মাখতে মাখতে শাশুড়ী ছেলের নাম কি হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করছিলেন। হাসিনা তখন বলে, "আব্বা আমাকে বলেছিলেন, ছেলে হলে জয় বাংলার "জয়" আর মেয়ে হলে "জয়া" নাম রাখতে।" শাশুড়ী ছেলেকে কোলে তুলে বলেন, "সত্যিই এ আমার জয়। আমার কোন ভাই নেই, জয় আমার সত্যিই ভাই। তাই মুজিব নামের সঙ্গে মিলিয়ে আসল নাম রাখলাম সজীব।" এই নাম শোনার পর উর্ধ্বতন কমান্ডাররা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, "জয় নাম কিস্‌লিয়ে রাখা?" আমি তাদের বোঝাই যে, নাতিকে পেয়ে শাশুড়ী খুব খুশী হয়েছেন। যেহেতু "জয়" মানে আনন্দ তাই শাশুড়ী "জয়" নাম

রেখেছেন। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে মাঝে মাঝে তারা আমাকে কটাক্ষ করে বলতো, "পশ্চিম পাকিস্তানমে এক নমরুদকো পাকড়াও করকে রাখা হুয়া, লেকিন এধার এক কাফের পয়দা হুয়া।"

৫৩। ৫ই আগস্ট সকাল ৯টার দিকে দেখি যে, শেখ জামাল একটি ছোট চাকু নিয়ে গেটের সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছে। এতে সৈন্যরা ভুল বুঝতে পারে ভেবে আমি জামালকে ডেকে ছুরিটি নিয়ে নিই। যেহেতু রাতে সৈন্যদের মানসিক নির্যাতনে ঘুমোতে পারতাম না, সুতরাং এর পর আমি ঘুমোতে যাই। আধ ঘন্টা পর হাসিনা আমাকে জানায় যে, জামালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সংবাদ শুনে আমি চুপচাপ সৈন্যদের অবস্থান স্থান গ্যারেজ ও তৎসংলগ্ন ঘরগুলো খুঁজে দেখি জামালকে সৈন্যরা কোথাও লুকিয়ে রেখে অত্যাচার করছে কিনা। ঘটনাটি আমার অফিসে না পৌছানো পর্যন্ত গোপন রাখার পরামর্শ দিয়ে আমি গাড়ী নিয়ে অফিসে যাই। অফিসে পৌছেই আমি মেজর হোসেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তাঁকে না পেয়ে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলীর অফিসে ফোন করি। রাও ফরমান আলী ঐ সময় কিছুদিনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় তাঁর অফিস থেকে আমাদের ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার কাদির দায়িত্বে রয়েছেন একথা জানিয়ে আমাকে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ব্রিগেডিয়ার কাদিরের অফিসটি ছিলো শেরে বাংলা নগরে। সে সময় সেখানকার বাড়ীগুলোকে পাকিস্তান আর্মির ট্রানজিট ক্যাম্পে পরিণত করা হয়েছিলো। বিকেল পাঁচটার দিকে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের অফিসে পৌছাই। তিনি অফিসে না থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী আমাকে ওয়েটিং রুমে বসান। এরপর পাঁচ ছয়জন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমাকে ঘিরে বসে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। ঘন্টাখানেক এ অবস্থায় কাটানোর পরও ব্রিগেডিয়ার কাদির না আসায় তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর কাছে জামালের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটি খুলে বলে তার পরামর্শ চাইলাম। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি টিক্কা খানের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমাকে গভর্নর হাউসে গিয়ে ব্যাপারটি তাঁকে জানাতে বললেন।

৫৪। তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমি তাড়াতাড়ি অফিসে এসে একজন নিরাপত্তা প্রহরীকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নর হাউসে গেলাম। টিক্কা খানের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীকে ঘটনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার পর তিনি আমাদেরকে অন্তরীণ রাখা বাসার পাশের বাসায় টেলিফোন করে আমাদের বাসায় প্রহরারত সৈন্যদের কমান্ডারের সঙ্গে কথা বললেন। ঘটনাটির পর সে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তৎসম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত জেনে নিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বাসায় ফিরে যেতে বললেন এই বলে যে, পরদিন ঐ বাসার ঘটনাটির ব্যাপারে যথাবিহিত তদন্ত করা হবে। ধানমন্ডির ঐ বাসার কাছে ফিরে দেখি যে, বাসা অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। বাসার গেইটে পৌছালে একজন সৈন্য আমাকে বন্দুক তাক করে গাড়ী বারান্দায় না গিয়ে

গ্যারাজে অবস্থানরত সৈন্যদের কমান্ডারের নিকট যাবার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করে। শাশুড়ী ও হাসিনা তখন অন্ধকার বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসেছিলেন। হাসিনা চীৎকার করে আমার উদ্দেশ্যে জানায় যে, এর কিছুক্ষণ আগে খোকা কাকাকে তারা গ্যারেজে ডেকে নিয়ে নানা ভাবে ভীতি প্রদর্শন করেছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই গ্যারেজে না গিয়ে হাসিনা আমাকে সোজা গাড়ী বারান্দায় যেতে বলে। হাসিনার পরামর্শ মোতাবেক আমি তখন গাড়ী বারান্দার দিকে যাবার জন্য গাড়ীটিকে ঘুরিয়ে নিয়েই ত্বরিত গতিতে বাসার বারান্দার দরজার নিকট পৌছাই। ঠিক ঐ মুহূর্তে বাড়ীর গেইটে কর্তব্যরত একজন সৈনিক গুলি ছোঁড়ে। ঐ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রহরারত সৈনিকেরা বাসার ভেতর ঘরের চারদিক ঘেরাও করে এবং ওদের কম্যান্ডার উচ্চঃস্বরে আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে তার নিকট যেতে বলে। আমি তাকে আমার কক্ষে আসতে বলি। অনেক বাক-বিতন্ডার পর সে বাড়ীর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে একজন রাইফেলধারী সৈনিকসহ নিজে একটি স্টেনগান হাতে আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে সরাসরি বলে যে, তার দৃঢ় বিশ্বাস আমি গাড়ীর পেছনের বুটের ভেতর লুকিয়ে জামালকে বাড়ীর বাইরে নিয়েছি। আমি আমার সন্তানের মাথায় হাত রেখে আল্লাহর নামে কসম করে বলি যে, জামালের নিখোঁজ হবার বিষয়ে আমি কোন কিছু জানি না। এ কথা শোনার পর হাবিলদারটি একটু শান্ত হয়ে আমাকে বলে, "আজকের মত ঠিক আছে। তবে পরের দিনের মধ্যে জামালকে খোঁজ করে উক্ত বাসায় ফেরত আনতেই হবে।"

৫৫। পরদিন সকালে অফিসে এসেই ব্রিগেডিয়ার কাদিরের দফতরে ফোন করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিই। পরে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে জামালের নিখোঁজ হওয়ার ও তৎপরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। তিনি নিজেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক বলে পরিচয় দিলেন। তাঁকে মার্জিত ও নম্র প্রকৃতির বলে মনে হলো। ঘটনাটির জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "আমার নিজের ছেলে নিখোঁজ হলে আমি নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতাম। অতএব আপনার শাশুড়ীর উক্ত ঘটনায় যে মানসিক অবস্থা হয়েছে তা আমি সহজেই অনুভব করতে পারি।" এ প্রসঙ্গে গত কয়েকদিন আগে শেরে বাংলা নগরের ফার্মগেইটে এক গভীর রাতে যে ঘটনা ঘটেছিলো তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন, "সেখানে দশ-বারো জন পাকিস্তানী সৈন্য প্রহরারত ছিল। অতর্কিতে মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সশস্ত্র আক্রমণ করে তাঁদের সকলকে মেরে ফেলে সেখান থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকলে পাকিস্তান টিকবে না। আমার অবশ্য বিশেষ কোন চিন্তা নেই, কারণ প্লেনে করে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে নিরাপদে চলে যাবো।" অতঃপর তিনি বলেন যে, একটা সংবাদ তিনি সরকারী গোপনীয় সভায় জানতে পেরেছেন, যা শুনে আমার শাশুড়ী অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন। তিনি বললেন, "আপনি আপনার শাশুড়ীকে বলবেন যে তাঁর বড় ছেলে, শেখ কামাল কলকাতায় নিরাপদে আছে।"

অতঃপর জামালের নিখোঁজ হওয়া ও তৎপরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার আশ্বাস জানিয়ে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন।

৫৬। এর একদিন পর সামরিক বাহিনীর দু'জন কর্মকর্তা ধানমণ্ডির ১৮ নম্বরস্থ বাসায় এসে বাসাটি বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ভেতরের সমস্ত ফুলের গাছ ও নারিকেল গাছের ডালপালা কাটিয়ে সাফ করিয়ে নেন। পরদিন সেই হাবিলদারকে ঐ বাসা থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। এর প্রায় সপ্তাহখানেক পর সামরিক বাহিনীর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্নেল লতিফ মেজর হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় এসে জামালের নিখোঁজ হওয়া এবং তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে সেই হাবিলদারকে সেখানে হাজির করে আমাদের সামনে তাকেও ঐ বিষয়ে জেরা করা হয়। পরিশেষে, কর্নেল লতিফ উপস্থিত সকলকে জানান যে, শেখ জামালের নিখোঁজ হওয়া বা বাসা থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে আমার কোন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা ছিলো না। এর পর থেকে তারা সৈন্য সংখ্যা এক কম্পানী থেকে দুই কম্পানীতে বৃদ্ধি করে। একজন পাঞ্জাবী হাবিলদারের অধীনে এক কম্পানী ও অপর একজন পাঠান হাবিলদারের অধীনে আর এক কম্পানী সৈন্য উক্ত বাড়ীতে প্রহরার উদ্দেশ্যে মোতায়েন করা হয়। বাড়ীর ছাদে বালির বস্তা দিয়ে নির্মিত বাঙ্কারে ভারী মেশিনগান ও গাড়ী গ্যারাজের ছাদে মাঝারি ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিনগান স্থাপন করা হয়। সবার তত্ত্বাবধানে ছিলেন একজন সুবেদার মেজর।

৫৭। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা তাড়াতাড়ি শেষ করে আগস্ট মাসের মধ্যেই তাঁকে ফাঁসি দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তৎমর্মে একটি বিদেশী পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিলো। ৩রা আগস্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান টেলিভিশনের এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ রয়েছে।" ৯ই আগস্ট এক সরকারী প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয়, "আগামী ১১ই আগস্ট থেকে গোপনে শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে।" ৩১শে আগস্ট জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী জানান, "আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এই বিচার সমাপ্ত হবে।" এ সমস্ত সংবাদ পাবার পর শাশুড়ীসহ আমরা সবাই দারুণভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এর কয়েকদিন পর শেখ জামালের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠিতে জানতে পারা যায় যে, সে ঐ বাড়ীতে প্রহরারত দু'জন যুবক সৈন্যের সহযোগিতায় বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পালিয়েছিলো এবং ইতোমধ্যে সে তার কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করেছে।

৫৮। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর, বাঙালী জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের কর্মকর্তা ও সদস্যদের সশস্ত্র হামলা ও হত্যাযজ্ঞ শুধু ঢাকাতেই

সীমাবদ্ধ ছিলো না, তারা চট্টগ্রামস্থ সেনানিবাসেও সেনাবাহিনীর বহু বাঙালী কর্মকর্তা ও সদস্যদের হত্যাসহ পূর্ব পাকিস্তানের জেলা শহরগুলোতে অবস্থিত বিভিন্ন সেনানিবাসের অনেক বাঙালী কর্মকর্তা ও সদস্যদেরও হত্যা করে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, জয়দেবপুর, বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, বরিশাল, প্রভৃতি সেনানিবাসের বাঙালী সামরিক কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁদের প্রাণ রক্ষার্থে পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ও আত্মরক্ষামূলক আক্রমণ চালাতে চালাতে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েন। ঐ সমস্ত শহরের ছাত্র-জনসাধারণ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) ও কমিউনিষ্ট পার্টির স্বাধীনতার সপক্ষের নেতাদের নেতৃত্বে সেখানের সেনানিবাসগুলো ঘেরাও করে রাখে এবং বাঙালী সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করে। বেশ কয়েকটি সেনানিবাস যেমন, বরিশাল, কুষ্টিয়া, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার সংবাদও ঢাকায় পৌছায়।

৫৯। পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা নিজেদেরকে নতুন করে সংগঠিত করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সারা পূর্ব বাংলায় নির্বিচার ও বর্বরোচিত "গণহত্যা" চালায়। শহর, বন্দর ও গ্রামে-গঞ্জে বাঙালী জনগণের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের লেলিয়ে দেয় তাদের কর্মকর্তারা। ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মীরপুর, সৈয়দপুর, পাকশী ও চট্টগ্রামে বসবাসরত অবাঙালীরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বাঙালী নিধন পরিকল্পনায় যোগ দেয়। এর ফলে ঢাকা, চিটাগাং ও খুলনা শহরসহ দেশের সকল শহর থেকে জনগণ প্রাণ রক্ষায় ছুটে যায় প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে কিছু বাঙালী গুণ্ডাপাণ্ডা ও অবাঙালী লোকদের নিয়ে পাকিস্তান সামরিক জান্তার সরাসরি মদদে মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা ও কর্মী তথাকথিত 'শান্তি কমিটি' গঠন করে এবং জামায়াতে ইসলামী ও নেজামের ইসলামের নেতারা গড়ে তোলে, "রাজাকার", "আল বদর" ও "আল শামস" নামে তিনটি কুখ্যাত বাহিনী। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এদের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াও এরা শহর, গ্রাম ও গঞ্জে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সমর্থকদের বাড়ীঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণ এবং হত্যা করতো। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের এই অমানবিক অত্যাচার, নির্যাতন ও জীবন নাশের ভয়ে হাজার হাজার পূর্ব বাংলার নর-নারী ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোয় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যারা নানা কারণে চলে যায়নি তারা কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে দিনরাত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। আগষ্ট মাসে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান অনুসারে তখন ভারতে (আশ্রয় গ্রহণকারী) শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ৯৮ লাখ ৯৯ হাজার ৩ শত ৫ জনে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, বিহার,

মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের মোট ৮২৫টি উদ্বাস্তু শিবিরে ৬৭ লাখ ৯৭ হাজার ২ শত ৪৫ জনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো ভারত সরকার। বাকি ৩১ লাখ ২ হাজার ৬০ জন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো।

৬০। স্বাধীন বাংলাদেশ (মুজিব নগর) সরকারের অনুমোদনে মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী পাকিস্তানী হানাদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টা সেক্টরে ভাগ করে ১১ জন সেক্টর কমাণ্ডার নিয়োগ করেন। ১ নম্বর সেক্টর ছিলো চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত অঞ্চলকে নিয়ে এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর মোহাম্মদ রফিক। নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ ছিলো ২ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এম. টি. হায়দারের ওপর। ৩ নম্বর সেক্টর ছিলো সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ, কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ভৈরব-আখাউড়া রেল লাইনের পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ নিয়ে এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ ও মেজর নূরুজ্জামান। সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি রোড পর্যন্ত অঞ্চল ছিলো ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন এবং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মেজর সি.আর.দত্তের ওপর। ৫ নম্বর সেক্টর গঠন করা হয় সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল ও ডাউকি-ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে নিয়ে এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। ৬ নম্বর সেক্টরের অধীনে রাখা হয় দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা এবং এর দায়িত্ব ছিলো উইং কমাণ্ডার এম. বাশারের ওপর। রাজশাহী, পাবনা, ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া অঞ্চলকে ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে রাখা হয় এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় মেজর কাজী নূরুজ্জামানকে। ৮ নম্বর সেক্টর গঠন করা হয় কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর জেলার অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল নিয়ে এবং এর দায়িত্বে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম. এ. মঞ্জুর। খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার অঞ্চলকে নিয়ে ৯ নম্বর সেক্টর গঠন করা হয় এবং এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মেজর এম. এ. জলিলের ওপর। হেড কোয়ার্টার্সের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এক সুসংগঠিত কমাণ্ড বাহিনীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ১০ নম্বর সেক্টরের। এই কমাণ্ড বাহিনীর দায়িত্ব ছিলো অভ্যন্তরীণ নদীপথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীপথ ছাড়াও এঁরা চট্টগ্রাম এলাকাতেও তৎপর ছিলেন। কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা ও ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদীর উভয় তীরবর্তী এলাকা ছিলো ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে এবং এর দায়িত্ব ছিলো মেজর আবু তাহের ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম. হামিদুল্লাহর ওপর।

৬১। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে সর্বজনাব শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আ. স. ম. আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজের সমবেত নেতৃত্বে পৃথকভাবে গঠন করা হয় "মুজিব বাহিনী"। এই বাহিনীর সদস্যদের পৃথকভাবে ট্রেনিং দেয়া হয় এবং এরা কখনো মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু এঁদের দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড ছিলো মুক্তিবাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। "মুজিব বাহিনী" ছাড়াও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এককালে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও তৎকালীন টাঙ্গাইলের ছাত্র যুবক কাদের সিদ্দিকী তাঁর একক নেতৃত্বে গড়ে তোলেন "কাদেরিয়া মুক্তি বাহিনী।" এই বাহিনীর সদস্যগণ দেশের ভেতর থেকেই কাদের সিদ্দিকীর তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং গ্রহণ করেন। দেশের অভ্যন্তরে যমুনা নদীর পূর্ব তীরাঞ্চল, টাঙ্গাইল জেলা ও ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলসমূহে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে টাঙ্গাইল জেলা ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা মুক্ত করে এঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়নক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী যখন ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর নিকট ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়, সে সময় কাদের সিদ্দিকী তাঁর বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বীরদর্পে সর্বপ্রথম ঢাকায় প্রবেশ করেছিলেন।

৬২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"সহ বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রায় প্রতিদিন বাংলাদেশের রণাঙ্গনের উত্তর-পূর্বাংশের যেসব জায়গার নাম উচ্চারিত হতো সেগুলো হচ্ছেঃ টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন জায়গা, আখাউড়া, দুলাই, শ্রীমঙ্গল, শমশের নগর, কুলাউড়া, জুরি, আটগ্রাম, লাতু, রাধানগর, ছাতক আর সুনামগঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসকাল এসব এলাকায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনীর মধ্যে কত যে সশস্ত্র লড়াই হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এলাকায় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমাণ্ডের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ১৪তম ডিভিশনকে এই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিলো। কুমিল্লার নিকটবর্তী সালদা নদী থেকে শুরু করে উত্তরে সমগ্র সিলেট জেলা এই ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলো। এই ১৪তম ডিভিশনের প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজী।

৬৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রভাবশালী উপদেষ্টা ছিলেন ড: হেনরী কিসিঞ্জার। জুলাই-এ ড: কিসিঞ্জারের (পাকিস্তানের) ইসলামাবাদ সফর পাকিস্তানের (সামরিক জান্তার) পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক অবস্থানকে নিশ্চয়তার মাত্রায় নিয়ে এসেছিলো। ইসলামাবাদ থেকে সারা

বিশ্বকে বিস্মিত করে হঠাৎ করে পিকিং সফরে গিয়েছিলেন ড: কিসিঞ্জার। এরপর আগস্ট মাসে দিল্লী এসেছিলেন ড: কিসিঞ্জার। ইসলামাবাদে তাঁকে যে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হয়েছিলো ঠিক তার উল্টো ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের নয়াদিল্লীতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকটি ছিলো একেবারে আন্তরিকতাহীন ও অত্যন্ত শীতল। ভারতে এসে (পূর্ব পাকিস্তানীদের আশ্রয়ের জন্য নির্মিত) উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ড: কিসিঞ্জার একটিবারের জন্যও দেখতে চাননি। ইন্দিরা গান্ধীর তিনজন অতি কাছের উপদেষ্টা ছিলেন পি. এন. হাকসার, টি. এন. কাউল ও ডি. পি. ধর। এঁরা তিনজনেই ছিলেন নেহেরু পরিবারের মত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। প্রখর মেধা, প্রজ্ঞা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনজনই। পি.এন.হাকসার ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি এবং টি. এন. কাউল ও ডি.পি. ধর ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা। ডি. পি. ধরের ওপর সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ও মুজিব নগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। মার্কিন সরকারের ভারতবিরোধী মনোভাব, ড: কিসিঞ্জারের জুলাই মাসের আকস্মিক পিকিং সফর এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তার ভারত ধ্বংসের শ্লোগান প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানী জনগণকে উত্তেজিত করে তোলার প্রচেষ্টা এবং পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধানোর প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ৯ই আগস্ট ২০ বছর মেয়াদী ইন্দো-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, যে কোন বৈদেশিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা পরস্পরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবে।

৬৪। ৮ই আগস্ট ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বাণীতে বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের প্রতি শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি জানিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ সৃষ্টির আহবান জানান। ১৭ই আগস্ট জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক আইন সমিতির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট তারবার্তায় শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি করা হয়। ২০শে আগস্ট হেলসিংকি থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১৩ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী সমিতির এক বৈঠকে বৃটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আর্থার বটমলী তাঁর ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি করেন। তিনি বলেন, "এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে একমাত্র শেখ মুজিবের সাথেই আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে।" ৪ঠা নভেম্বর বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনে বৃটিশ শ্রমিক দলীয় প্রভাবশালী নেতা মিঃ পিটার শোর হুঁশিয়ার করিয়ে দিয়ে বলেন, "বৃটিশ সরকার যেভাবে আবার পাকিস্তানকে সাহায্য দান শুরু করার পাঁয়তারা করছে তার পরিণাম শুভ হবে না। পাকিস্তানে এখন আসলে প্রয়োজন হচ্ছে একটা

রাজনৈতিক সমাধান। আর এ ধরনের সমাধান পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।"

৬৫। ১লা সেপ্টেম্বরে লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে এবং গভর্নরের পদে মুসলিম লীগের ডা: এ.এম. মালেককে। ডা: মালেক ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন গভর্নরের শপথ গ্রহণ করেন সে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কনভেনশন মুসলিম লীগের সাবেক গভর্নর মোনেম খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী ও খুলনার খান আব্দুস সবুর খান। ডাক্তার মালেকের বয়স ছিল ৭৪ বছর এবং তিনি পূর্বে চক্ষু চিকিৎসা ছাড়াও মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান সামরিক জান্তার ডা: মালেককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য ছিল মূলত দু'টি। প্রথমত তথাকথিত ক্ষমা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকায় অভ্যর্থনা ক্যাম্পের আয়োজন করে ভারতে (আশ্রয় গ্রহণকারী) বাঙালীদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়ত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বাহানা করে দক্ষিণপন্থী ও ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আসন বন্টন করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেমব্লির কিছু আসনে লোক দেখানো উপনির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। সে পরিকল্পনা মোতাবেক পাকিস্তান সামরিক জান্তা ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন এবং তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় তথাকথিত অভ্যর্থনা ক্যাম্প স্থাপন করার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু পাকিস্তান সামরিক জান্তার সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার নির্বাচন সম্পর্কিত এক সংশোধনী জারির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৮টা জাতীয় পরিষদের এবং ১০৫টা প্রাদেশিক পরিষদের আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান যথাক্রমে ১২ই ও ২৩শে ডিসেম্বরে সম্পন্ন করার ঘোষণা দেন। ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত ১০৮টি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছিলো।

৬৬। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পর ডা: মালেক কাউন্সিলিস্ট ও কনভেনশনিস্ট উভয় মুসলিম লীগ, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলসমূহ (যেমন, জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম) ও আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী গ্রুপের পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। ঠিক ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে বসবাসরত এক পশ্চিম পাকিস্তানী ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহিতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর একমাত্র কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান ঢাকায়

এসে আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী গ্রুপের কিছু সংখ্যক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে মামা এডভোকেট আবদুস সালাম খান ও সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘকালের অনুসারী ও সহকর্মী এডভোকেট জহিরুদ্দিন। ঠিক ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের দু'দিকেই জাতিসংঘ সৈন্য মোতায়েন করার সুপারিশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চেয়ে আর একটু নীচের স্তরের বাঙালী নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষাপটে মুজিব নগর সরকারের অজান্তে একটা বিশেষ মহল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দানের শর্তে আওয়ামী লীগের ৬-দফার ভিত্তিতে একটা কনফেডারেশনের আওতায় পাকিস্তানের (উভয় অংশ) ভৌগোলিক সীমারেখা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিরতির জন্যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলো। এমন কি এই উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর কয়েকটা ক্যাম্পে প্রচারপত্র পর্যন্ত বিলি করেছিলো ঐ গ্রুপের লোকেরা। উল্লেখ্য যে, ইরানের পরলোকগত শাহের মধ্যস্থতায় তেহরানে উভয় পক্ষের মধ্যে ঐ প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিলো। যুগোশ্লাভিয়ার প্রয়াত নেতা মার্শাল টিটো সিবিএস টেলিভিশন সাক্ষাৎকারেও ঐ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সময় বিশেষ সূত্রে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, আওয়ামী লীগের তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও কয়েকজন উর্ধ্বতন আমলাকে নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতি গোপনে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। পশ্চিমা রাজনৈতিক মহল ছাড়াও প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকাগুলো বার বার তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে আলোচনায় বসার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলো। পাকিস্তান সামরিক জান্তার উদ্দেশ্যে তৎমর্মে কয়েকটি বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো।

৬৭। নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২২শে সপ্টেম্বর (১৯৭১) তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় ... "(পাক-ভারত) উপমহাদেশে শরণার্থী পুনর্বাসন ও শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘকে সক্রিয় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর আন্তর্জাতিকভাবে এমন মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। জাতিসংঘ যদি নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক সুরাহার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই কেবল পাক-ভারতের বিস্ফোরণমুখী সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব হবে এবং নিরীহ ও ভুখা বাংলাদেশের মানুষদের বাঁচানো যাবে।" ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৭১) ওয়াশিংটনের ইভিনিং ষ্টার পত্রিকায় প্রখ্যাত সাংবাদিক ক্রশবি নেইস লিখলেন, "বর্তমানের এই জটিল ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একজন মাত্র ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি কোন রকমে গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন সম্প্রতি

বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাঁর পার্টি (পাকিস্তান) জাতীয় পরিষদে (নিরঙ্কুশ) সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভে সক্ষম হয়েছে। ২৫শে মার্চ সামরিক এ্যাকশন নেয়ার পর থেকে শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রয়েছেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গোপনে একটা মিলিটারী কোর্টে তাঁর বিচার হয়েছে। এ বিচারের সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু এই শাস্তি এখনও ঘোষণা করা হয়নি। শেখ মুজিবই হচ্ছেন একমাত্র বাঙালী নেতা যাঁর ইজ্জত ও ব্যক্তিগত বিপুল সমর্থন রয়েছে এবং তিনিই দেশকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে অন্য কোন সমাধান এখন তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেয়া খুবই মুশকিল হবে। অন্যদিকে এটা খুবই আনন্দজনক হবে যদি পাকিস্তান সরকার একটু বিবেকসম্পন্ন হয়ে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবকে উক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসে। এই বাঙালী নেতাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিয়ে (আলোচনার) সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত পাকিস্তানে সাহায্য দান অব্যাহত রাখায় সীমাবদ্ধ প্রভাব ব্যবহারের যে সুযোগ রয়েছে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের আগেই তার সবটুকু ব্যবহারের সময় এসেছে।" ২৫শে অক্টোবর (১৯৭১) কেনিয়ার সানডে পোস্ট পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, "পাকিস্তান যদি পূর্ব বাংলার (নির্বাচিত) নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে, তাহলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হবে এবং (তার) অস্তিত্ব বিপন্নের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া ছাড়াও অন্যান্য দেশকে নানা অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করবে।" মার্কিন সাংবাদিক জোসেফ ক্রাফট ওয়াশিংটন পোস্টে ২৫শে নভেম্বর এক নিবন্ধে লিখেন, "এখন এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, যখন গত মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় সামরিক শাসন পুনর্বার চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পাকিস্তানী শাসকচক্র যতটুকু চিবুতে পারে তার চেয়ে বেশি মুখ–গহ্বরে গ্রহণ করেছিল। যদিও বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং লাখ লাখ আদম সন্তানকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, তবুও পাকিস্তানী সৈন্যরা পূর্ব বাংলার পূর্ণ কর্তৃত্ব করায়ত্ত করতে পারেনি। উপরন্তু বাঙালীদের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেও পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালীদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন কতকগুলো সহজ শর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে গেলানো যাবে।"

৬৮। ৭ই মার্চ পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আহূত অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শিল্প কলকারখানা বন্ধ করে দেয়। ২৫শে মার্চ সামরিক শাসন পুনর্বার জারি ও নির্যাতন–হত্যার ভয়ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও পাকিস্তান সামরিক জান্তা পূর্ব বাংলার শিল্পকারখানাগুলোকে সম্পূর্ণ চালু করতে সক্ষম হয়নি। যদিও কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা–কর্মচারী অফিসে আসতেন, কিন্তু সেটাও ছিল দায়সারা ও লোক

দেখানো। অফিসে এসে কোন কাজকর্ম না করে তাঁরা বেশির ভাগ সময় কাটাতেন বাঙালীদের ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের খবরাখবর বিনিময়ের ব্যাপারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ও সংবাদ জানার জন্য। এ ছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়ার জন্য ঝুঁকি সত্ত্বেও অর্থ সংগ্রহে তাঁরা অনেক পরিশ্রম করতেন। ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রের প্রকৌশলী এ. এস. এম. এনামুল হক ও উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ড: এম. মোজাম্মেল হোসেন যৌথভাবে এ উদ্দেশ্যে আমাদের অনেকের কাছ থেকে প্রতি মাসে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিতেন।

৬৯। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিক থেকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি ও সশস্ত্র তৎপরতা বাড়তে থাকে। পুরানো ঢাকার বিভিন্ন স্থানসহ, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, বাড্ডা অঞ্চল, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, হাজারীবাগ, গ্রীন রোড, তৎকালীন ঢাকাস্থ পাকিস্তান রেডিও ষ্টেশন, শাহবাগ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলদ্বয়ের পশ্চিম পাশের এলাকা, পীলখানা, প্রভৃতি জায়গায় প্রায় প্রতি রাতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর টহলদারদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতো। এভাবে ঢাকা ও তার আশেপাশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনষ্টলেশনও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছিলো মুক্তিযোদ্ধারা। ঢাকায় অবস্থানরত প্রায় লোকজনই স্বেচ্ছায় আশ্রয়, খাবারদাবার ও সাহায্য করতো এই সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। ঢাকাস্থ অনেক যুবকযুবতীও গোপনে ট্রেনিং নিতো সেসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে। সে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধার কতিপয় সদস্য ২৩শে অক্টোবরের সন্ধ্যায় আইয়ুব খান কর্তৃক নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনেম খানের বনানীস্থ বাসভবনে ঢুকে বসার ঘরে তাঁকে তাঁর মুসলীম লীগের কয়েকজন সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনারত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

৭০। ১৯৭১ সালে বেশ সময় নিয়েই বর্ষা চলছিলো। বৃষ্টি একেবারে চলে যেতে যেতে শেষ হয় প্রায় অক্টোবরের মাঝামাঝি। তাই বলে মুক্তিযুদ্ধ থেমে থাকেনি। যুদ্ধ চলছিলো পুরো বর্ষা জুড়েই। বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই ক্রমাগত মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসছিলো। এ রকম অবস্থায় ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ডের ব্যারাক থেকে সে সময় আর্মি ট্রুপগুলোকে ভারতের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাবার কথা বলে সীমান্তে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ভারত অবশ্য তখনও পাকিস্তান সীমান্তে তার সৈন্য সমাবেশ ঘটায়নি। সে সময়ে ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন জেনারেল (১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ফিল্ড মার্শাল) স্যাম মানেক'শ। পাকিস্তানী সৈন্য সীমান্তে এগুনোর ১১ দিন পর ১৩ই অক্টোবর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সীমান্তে তাঁদের সৈন্য সমাবেশ শুরু করেন। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে দু'দল দু'দলের দিকে নিশানা তাক্ করলো—এদিকে পাকিস্তানী সৈন্য, অপরদিকে ভারতীয়রা। এ ব্যাপারটি প্রথম ঘটে ২৪শে অক্টোবর (১৯৭১)। সেই সময়ই ইন্দিরা গান্ধী ভাবলেন যে, বিশ্ব জনমতকে ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার সময় এসেছে। বিষয়টির

একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি তিনি চেয়েছিলেন। শেখ মুজিবের (নিঃশর্ত) মুক্তি, উদ্বাস্তুরা দেশে ফিরে যাবে আর সর্বোপরি বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ হবে—এগুলো কোন শর্ত সাপেক্ষে আলোচনার বিষয় নয়, বরঞ্চ তিনি বলেছিলেন, "এর বাইরের বিষয়গুলোই আলোচনায় আসতে পারে।" এই কথা নিয়েই মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ভ্রমণে বেরুলেন ইউরোপ ও আমেরিকায়। তিনি তাঁর ভ্রমণে বিভিন্ন স্থানে বললেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, মানবেতিহাসে এমন কলঙ্কজনক অধ্যায় আর দেখা যায়নি। সৎ উদ্দেশ্য থাকলে এ সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব তা নয়। তবে ভারতের একার পক্ষে এটা সত্যিই অসম্ভব। কেননা শরণার্থীদেরকে তো আর ফিরিয়ে দেয়া যায় না।"

৭১। এই সময় প্রায় আড়াই সপ্তাহ ধরে ইন্দিরা গান্ধী ব্রাসেল্স, ভিয়েনা, লন্ডন, অক্সফোর্ড, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, প্যারিস ও বন ঘুরলেন। উদ্বাস্তুদের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি এবং অর্থ সাহায্যও পেলেন, কিন্তু পেলেন না কোন সমাধান। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিকসন মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলেন, "ইয়াহিয়া খান তাঁকে পাক–ভারত সীমান্ত থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব আপনার উচিত হবে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী অপসারণ করা।" জবাবে ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত শান্তভাবে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে জানিয়েছিলেন, "ইয়াহিয়া খানকে তাঁর সমস্ত সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তান থেকেই সরিয়ে নিতে হবে, এর আগে কোন কথা নয়।" ১৪ই নভেম্বর নয়া দিল্লী ফিরে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যদি অগত্যা সামরিক অভিযান চালাতেই হয় তাহলে আমরা তা করবো। আশা করছি চূড়ান্ত ক্রাইসিসে ভারত এ মাসের শেষে কিংবা আগামী মাসের শুরুতে পৌঁছে যাবে; আর তখনই চালানো হবে চূড়ান্ত সামরিক অভিযান।"

৭২। ইন্দিরা গান্ধী যখন বিদেশ ভ্রমণে ছিলেন সে সময় ইয়াহিয়া খান ভারতকে অবাক করে দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে সব কিছুই স্বাভাবিক চলছে। যেটুকু অসুবিধা তার জন্য দায়ী একমাত্র ভারত। ভারতের ছত্রছায়াতেই দুষ্কৃতকারীরা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করছে বিশৃংখলা ও অশান্ত পরিবেশ।" ঐ সময় বিশ্ব জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগের নূরুল আমিনকে প্রধান মন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP)–এর চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে উপ–প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী ও ধর্মীয় দলের নেতাদের সমন্বয়ে একটি বেসামরিক মন্ত্রিসভা নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে চীনে পাঠালেন চীনের সঙ্গে একটা সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পন্ন করা যায় কিনা সে বিষয়ে আলাপ করার জন্য। সে সময় কোন চুক্তিতে চীন অস্বীকৃতি জানালেও পাকিস্তানে ফিরে এসে ভুট্টো

বললেন, "পাকিস্তানকে যে কোন ধরনের সাহায্য দেবার জন্য চীন সব সময় প্রস্তুত। অতএব ভারতের এ ব্যাপারে ধারণা থাকা উচিত।"

৭৩। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে একদিন বাসায় কাজের ছেলে ফরিদকে অনুপস্থিত দেখে হাসিনাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। হাসিনা জানায় যে, আগের দিন বিকেলে সে তাকে পাঠিয়েছিলো জয়ের জন্য কিছু ওষুধপত্র কিনে আনতে। এরপর সে আর ফেরেনি। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ফরিদ ফিরে আসে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে শীর্ণ এবং শুকিয়ে কাঠের মত হয়েছিলো। ফরিদ জানায় যে, ঐ দিন ওষুধ নিয়ে সে যখন আমাদের বাসায় ফিরছিলো তখন ধানমন্ডি গার্লস স্কুলের আর্মি ক্যাম্পের নিকটস্থ একটি খালি বাড়ীতে তাকে নিয়ে গিয়ে এবং তার হাত-পা বেঁধে আমাদের বাসায় প্রহরারত সুবেদার মেজর তাকে ভীষণ মারধর করায় সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলো। তার বাঁচার কথা ছিলো না। মারধর করে ছেড়ে দিলেও তারা তাকে আমাদের বাসায় না ফেরার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলো। অতঃপর সুস্থ হয়ে সে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। অস্ত্রশস্ত্র ও মালামাল বহনের কাজে সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিলো।

৭৪। অক্টোবরের শেষের দিকে দাদা ও দাদি আম্মা (বঙ্গবন্ধুর আব্বা ও আম্মা) ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদেরকে অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে পি. জি. (IPGMR) হাসপাতালে (পূর্বে শাহবাগ হোটেল) ভর্তি করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ শাশুড়ীকে অনুমতি না দেয়ায় বঙ্গবন্ধুর সবচে' ছোট বোন (জনাব এ.টি.এম. সৈয়দ হোসেনের স্ত্রী) দিনরাত হাসপাতালে থেকে দাদা ও দাদি আম্মার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। হাসিনা ও আমি রোজ বিকেলে তাঁদেরকে দেখতে যেতাম। লক্ষ্য করি যে, আর্মির গোয়েন্দা বিভাগের সশস্ত্র লোকজন কৌশলে দাদা-দাদিদেরকে যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন দেখতে যেতেন তাঁদের পরিচয় ও যাতায়াত জেনে নিতো এবং তাঁদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতো। ঐ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় প্রতিরাতেই ধানমন্ডির আশেপাশে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেলেই আমাদের বাসার প্রহরীদের দায়িত্বে নিয়োজিত সুবেদার মেজর ''ডক্টর সাব, ডক্টর সাব'' বলতে বলতে আমাকে আমার কক্ষের দরজা খুলতে বাধ্য করতো এবং স্টেনগান হাতে কক্ষে প্রবেশ করতো। তাছাড়াও রাতে আমার জানালার পাশেই বেয়নেট লাগানো বন্দুকসহ প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকতো। এর ফলে প্রায় কোন রাতেই আমি ঘুমোতে পারতাম না।

৭৫। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় ঢাকায় সামরিক বাহিনীর লোকজনদের যুদ্ধ-প্রস্তুত অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখা যায়। ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডস্থ আমাদের অন্তরীণ রাখা ঐ বাড়ীতে কর্তব্যরত পাকিস্তানী সৈন্যরাও ঐ সময় যুদ্ধ-প্রস্তুত অবস্থা গ্রহণ করে বাড়ীর এখানে সেখানে ট্রেঞ্চ খোঁড়া শুরু করে। ইন্দিরা গান্ধী আমার "ফুফী-শাশুড়ী হয়" এই বলেও অনেক সময় তারা আমার উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গোক্তি করে আমাকে বিব্রত করতো। এছাড়া প্রায়

সাড়ে আট মাস দুর্বিষহ অবস্থায় থাকার ফলে আমিও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এহেন পরিস্থিতিতে দাদা ও দাদিশাশুড়ীদেরকে দেখাশুনা এবং নিজের শারীরিক পরীক্ষা (Check up) ও চিকিৎসার জন্য আমি পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি হই নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

৭৬। আমি হাসপাতালে ভর্তি হবার কয়েকদিন পর একদিন হঠাৎ সন্ধ্যে ছয়টার দিকে সমগ্র ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সন্ধ্যে ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়। ঐ দিন ছাত্র ফেডারেশনের ১৯৬১-৬২ সময়কালের এককালীন সভাপতি ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত তাঁর কতিপয় আত্মীয়কে হাসপাতালে দেখতে এসে সংবাদ পেয়ে আমার কেবিনে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন বিকেল পৌনে ছয়টায়। আকস্মিক ও হঠাৎ করে কারফিউ বলবৎ করার ঘোষণা শুনে তিনিও স্তম্ভিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বাসায় ফেরার উপায় না পেয়ে সে রাতে তিনি আমার কেবিনে থেকে যান। সেদিন পি.জি. হাসপাতালের অতিনিকটবর্তী এলাকাসহ সারা ঢাকায় গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় এবং আমরা দু'জন প্রায় সারাটি রাত কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করে কাটাই। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত বলেন, "পাকিস্তানী সামরিক জান্তার শেখ মুজিবের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর না করা মারাত্মক ভুল হয়েছে। তা না করে শেখ সাহেবকে গ্রেফতার, সারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর নির্যাতন, অত্যাচার ও পূর্ব পাকিস্তানী সৈন্যদের অন্যান্য কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে এখন বিনষ্টের দ্বারপ্রান্তে এনেছে। পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অত্যাসন্ন, যার পরিণতি হবে অতি ভয়াবহ। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঘটনাকে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা আর কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না।"

৭৭। ২৩শে নভেম্বর পাকিস্তান জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। এরপর ২৫শে নভেম্বর এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন, "আগামী দশ দিনের মধ্যে আমি নাও থাকতে পারি। আমি রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ পরিচালনা করবো।"

৭৮। ৩রা ডিসেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংক্ষিপ্ত সফরে কলকাতায় আসেন। ঐ দিন বিকেলে কলকাতার গড়ের মাঠে একটি জনসভারও আয়োজন করা হয়েছিলো। কলকাতার বক্তৃতা-মঞ্চেই ইন্দিরা গান্ধী জানতে পারেন যে, পাকিস্তানী বিমান বাহিনী পশ্চিম ভারতের বেশ কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণ শেষ করেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এ সংবাদ ঘোষণা করা হয়। AIR-তে এও বলা হয় যে, ১৯৬৭ সালে ইসরাইল যেমন অতর্কিতে মিসরের বিমানক্ষেত্রগুলোতে আক্রমণ চালিয়েছিলো, ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলোতে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর আক্রমণও ছিল তেমনি। পশ্চিম ফ্রন্টে, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, অমৃতসর, ফিরোজপুর, চন্ডিগড়, ফরিদকোট, পাঠানকোট, সাদেক, ওক্‌হা, জোদপুর ও উত্তরলাই, আম্বালা, এমন কি দিল্লীর সন্নিকটে

আগ্রার বিমান ক্ষেত্র এবং পূর্ব ফ্রন্টের আগরতলা বিমান ঘাঁটিতে পাকিস্তানী বিমান বাহিনী আক্রমণ চালায়। বেশির ভাগ আক্রমণ ছিলো স্বল্প সময়ের। কেবল অমৃতসরেই সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়েছিলো পাকিস্তান বিমান বাহিনী। প্রথম আঘাতটি হানা হয় বিকেল ভারতীয় সময় ৫-৪৭ মিনিটে ফরাসী তৈরী মিরেজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী এফ-৮৬ স্যাবর জেট বিমান দিয়ে। প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানী স্থল বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে, বিশেষত পশ্চিম ফ্রন্টে পুন্চ সীমান্ত এলাকা এবং যুদ্ধবিরতি এলাকা কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায়।

৭৯। ঐদিন রাত ১০-৩০টায় ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছান। ততক্ষণে সারা দিল্লী শহরে যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক-আউট বলবৎ করা হয়েছিলো। সরকারের প্রতি সকল বিরোধী দলই সমর্থন জানিয়েছিলো ইতোমধ্যেই। রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি সারা ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এ রকম সঙ্কটজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন রাত ১২.২০মিনিটে। ঐ অল ইন্ডিয়া রেডিওর ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "শত্রুরা আমাদের বিমানক্ষেত্রসহ সীমান্তের সবগুলো প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ রকম সমূহ বিপদের মধ্যেও ভারত যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। গত মার্চ মাস থেকেই আমরা একটা ব্যাপক বিপদগ্রস্ত (পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের দোষ ছিলো যে, তাঁরা গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁদের সমস্যা আমাদেরকে ছুঁয়েছে—ভাবিয়েছেও বটে। চেষ্টা করেছি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের। কিন্তু বিশ্বসভা মূল সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে বাইরের দিকটা সামান্য আলোচনায় এনেছে মাত্র। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই অবস্থার অবনতি ঘটেছে। শৌর্যবান মুক্তিযোদ্ধারা জীবনকে যুদ্ধে বাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এক অসীম উন্মাদনায়। আমরা তাঁদের সম্মান করি। আজ এই যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করলো। এর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে আমার ওপর, আমার সরকারের ওপর এবং সর্বোপরি ভারতের সমস্ত জনগণের ওপর। যুদ্ধের তাণ্ডব থেকে আমাদের আর পেছনে ফেরার কোন উপায় নেই। আমাদের দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী যোদ্ধা জওয়ানরা দেশের প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে চলেছে। সারা ভারতে ঘোষণা করা হয়েছে জরুরী অবস্থা এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে।"

৮০। ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৭১) মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দু'জনের যুগ্ম দস্তখতে চিঠি লেখা হয়েছিলো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিলো, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে মুজিবনগর সরকারের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে একটা চিঠি পাঠান। অতঃপর ভারতীয়

সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ভারতীয় পূর্ব ফ্রন্টের সামরিক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে "ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বাহিনী" গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ৭ই ডিসেম্বর ভুটান সরকারও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।

৮১। ইতিমধ্যে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থার লোকজন এবং বিদেশী সাংবাদিক ও নাগরিকগণ নিরাপত্তার জন্য হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস সংস্থা উক্ত হোটেল চত্বরকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর পক্ষে বিমান বাহিনী ঢাকায় আক্রমণ শুরু করে ৬ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতের বারটার দিকে। ৭ই ডিসেম্বর সকাল থেকে প্রায় সারা দিন চলে ওদের ও পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর মধ্যে তুমুল আকাশ লড়াই। ঢাকায় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর স্বল্প সংখ্যক যুদ্ধজাহাজগুলোর প্রায় সবগুলো সেদিন বিধ্বস্ত হয়। সেদিনের লড়াইয়ে মিত্র বাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজকেও বিধ্বস্ত হতে দেখা যায়। ঢাকার প্রায় প্রতিটি বাড়ীর ছাদে উঠে লোকজন ঐ লড়াই প্রত্যক্ষ করে। লোকমুখে শোনা গিয়েছিলো যে, মিত্রবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের অনেক পাইলট ছিলেন মুক্তিবাহিনীর বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা, যার ফলে তাঁদের লক্ষ্যস্থলগুলো অতি পরিচিত ছিলো। পরের দিন সকালে পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর মাত্র দু'টো যুদ্ধজাহাজকে আকাশে উড়ে ঢাকার বাইরে যেতে দেখা যায়। ঐ যুদ্ধজাহাজ দু'টোকে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিধ্বস্ত করেছিলো বলে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে দাবী করা হয়েছিলো। এরপর পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আর কোন যুদ্ধজাহাজকে আক্রমণরত মিত্র বাহিনীর যুদ্ধজাহাজের মোকাবেলা করতে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ৭ই ডিসেম্বর তৎকালীন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ও USSR-এর প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজনেভ পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরীতে অনুষ্ঠিত পোলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে বক্তৃতা দানকালে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে যে রায় দিয়েছে সেই রায় এবং তথাকার জনগণের মৌলিক অধিকারকে ''রক্তাক্ত" পদ্ধতিতে দমন করার প্রচেষ্টা ও লাখ লাখ শরণার্থীর মর্মন্তুদ ঘটনার পরিণতি হচ্ছে এই যুদ্ধ।"

৮২। ৮ই ডিসেম্বর হতে পাকিস্তান ইস্টার্ন কম্যান্ড আকাশযুদ্ধে শক্তি হারিয়ে ফেলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর যুদ্ধজাহাজগুলো প্রতি দিনরাত ঢাকা ও এর আশেপাশের সামরিক লক্ষ্যস্থলের ওপর একরকম নির্বিঘ্নে আক্রমণ চালাতে থাকে। বিমান বাহিনীর সাহায্য না পাওয়ায় বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানী সৈন্যদের যে দশা হবার কথা ঠিক তাই ঘটতে থাকে। ৭ই ডিসেম্বর রাতে স্বাধীন বাংলা বেতার ও অল ইন্ডিয়া রেডিওসহ বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো, যেমন অস্ট্রেলিয়ান বেতার কেন্দ্র (ABC), বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন (BBC) -এর প্রচার কেন্দ্র, ভয়েস অব আমেরিকা (VOA)-এর প্রচার কেন্দ্র হতে পাকিস্তানীদের

যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতনের খবর শুনতে পাওয়া যায়। এরপর থেকে দিবারাত্রি শুধু পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজয়ের খবর আসা অব্যাহত থাকে। ১০ই ডিসেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনীর সৈন্যদেরকে ঢাকায় আসতে দেখা যায়। রণাঙ্গনে পর্যুদস্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের সদস্যরা পি.জি. হাসপাতালে এসে আশ্রয় নেয়। এই পরিস্থিতিতে প্রায় সমস্ত রোগী হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে পি.জি. হাসপাতাল ঐ সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্যে ভরে যাওয়ায় তার পরিচালক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, কয়েকজন ডাক্তার, নার্স, বঙ্গবন্ধুর অশীতিপর আব্বা-আম্মা ও তাঁদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন এবং আমি ছাড়া আর অন্য কোন রোগী হাসপাতালে ছিলো না বলে জানা যায়। এ দিকে পাকিস্তানের অনুরোধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। ঐ অধিবেশনে পাকিস্তানী দলের নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াহিয়া খান কর্তৃক নিয়োজিত কেন্দ্রীয় বেসামরিক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো। ইতোপূর্বে ৯ই ডিসেম্বর মার্কিন সরকার জাপানী দ্বীপপুঞ্জে তার ওকিনওয়া নৌঘাটি থেকে সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। পারমাণবিক ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঐ বিশাল নৌবহরে ছিলো বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'এন্টারপ্রাইজ', জলে-স্থলে আক্রমণে সক্ষম যুদ্ধজাহাজ "ত্রিপোলী" ইত্যাদি। ১৩ই ডিসেম্বর ঐ নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করার সংবাদ বিভিন্ন বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ইতোপূর্বে ভারত ও পাকিস্তানী বাহিনীদ্বয়ের অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবী জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন সরকারের পক্ষে পর পর পেশকৃত দু'টো প্রস্তাব পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের ভেটো প্রদানে সেগুলো অকৃতকার্য হয়ে যায়।

৮৩। ১৩ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে একটি হেলিকপ্টারে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা (বর্তমানে) বাংলা মোটর্স ও সোনারগাঁও হোটেলের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি এতিমখানার ওপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করে। এর ফলে এতিমখানাটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেখানে তখন অবস্থানরত ৫০-৬০ জন এতিম সন্তান মৃত্যুবরণ করে। একটি পৃথক বোমার আঘাতে এতিমখানার সামনে এয়ারপোর্ট রোডেও একটি বিরাট গর্ত হয়েছিলো। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার এ জাতীয় ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিলো বিশ্ববাসীকে এই বলে বিভ্রান্ত করা যে, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিমান বেপরোয়াভাবে সিভিলিয়ান (অসামরিক) এলাকার জনবসতির ওপর বিমান আক্রমণ চালাচ্ছিল। এরপর ১৪ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে (নিউইয়র্ক সময়) নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে (পাক-ভারত) উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তানকে অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করে আন্তর্জাতিক সীমানায় ফিরে নেয়ার দাবিতে যে

শেষ প্রস্তাব পাস হয়েছিলো তাও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ভেটো প্রদানে বাতিল হয়ে যায়।

৮৪। ১৩ই ডিসেম্বর সকালে ঢাকাস্থ পাকিস্তান রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করার কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে মুজিবনগর সরকার ও তার কর্মকর্তাদের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ঢাকার রেডিও থেকে অনুষ্ঠান প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটার দিকে তিনটি ভারতীয় বিমান একযোগে গভর্নর হাউসে রকেট নিক্ষেপ করে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে। বিমান হামলা বন্ধ হবার পর গভর্নর আবদুল মোতালেব মালেক, তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সৃষ্ট "নিরপেক্ষ এলাকা" হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে হোটেল শেরাটন)–এ আশ্রয় নেন। বি.বি.সি., এ.বি.সি. ভোয়া, প্রভৃতি বেতারে বলা হয় যে, ''নিরপেক্ষ এলাকায়" প্রবেশের সময় তাঁদের প্রত্যেকেই রেডক্রসের কাছে লিখিতভাবে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্কোচ্ছেদ করতে হয়েছিলো। গভর্নর ডা: মালেকের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারী মোজাফ্‌ফের হোসেন, পুলিশের আই.জি. ঢাকা বিভাগের কমিশনার, প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেক্রেটারীরা ছাড়াও কয়েকজন ভি.আই.পি. ছিলেন। ঐ দিনেই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নির্দেশে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক) থেকে সমস্ত টাকা–পয়সা, স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা লুন্ঠন এবং ব্যাংক চত্বরে বস্তায় বস্তায় কাগজের নোট পোড়ানোর খবর পাওয়া যায়। এ ছাড়াও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতায় তার দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল্ শামস্ বাহিনীর লোকেরা সরকারী বাস ডিপোগুলোর বাসগুলো ধ্বংস এবং সেগুলোর যন্ত্রপাতি লুন্ঠন করা ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি, রেকর্ডপত্র ইত্যাদি বিনষ্ট করে।

৮৫। ১৫ই ডিসেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দু'টো ভারতীয় বিমান সারা ঢাকায় লিফলেট ফেলে। ভারতীয় আর্মী চীফ–অব–স্টাফ ও মিত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেক'শ–এর নামে প্রচারিত উক্ত লিফলেটে পূর্ব পাকিস্তানের পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, "অবিলম্বে আমার অগ্রগামী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে আপনাদের সৈন্য বাহিনী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। ... এরপরও যদি আমার আবেদন মোতাবেক আপনারা পুরো সামরিক বাহিনীসহ আত্মসমর্পণ না করেন, তাহলে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টার পর আমি মিত্রবাহিনীকে পূর্ণোদ্যমে আঘাত হানার নির্দেশ দিতে বাধ্য হবো।" উর্দু ও ইংরেজীতে জেনারেল মানেক'শ–এর এই আহ্বান বাংলাদেশের সর্বত্র বিমানযোগে বিতরণ করা হয়েছিলো। ঐ তারিখে সন্ধ্যা থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও (AIR) থেকেও জেনারেল মানেকশ'র কন্ঠে টেপকৃত উক্ত আহ্বান কিছুক্ষণ পর পর প্রচার করা হয়েছিলো। উক্ত আহবানে আরও বলা হয়েছিলো,

"পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১৫ তারিখ বিকেল ৬টা থেকে ১৬ তারিখ সকাল ৯টা পর্যন্ত ভারতীয় বিমান হামলা বন্ধ রাখা হবে।"

৮৬। ১৬ই ডিসেম্বর ভোর ছ'টায় পি.জি. হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম আমার কেবিনে এসে গম্ভীরভাবে বললেন, "ডঃ ওয়াজেদ, ভারতীয় বিমান বাহিনী আজ ৯টার পর ক্যান্টনমেন্টের ওপর কার্পেট বোম্বিং করলে পি.জি. হাসপাতালও আক্রান্ত হতে পারে। অতএব আমার পরিবারবর্গসহ আপনি আপনার দাদা-শ্বশুর, দাদী-শাশুড়ী ও ফুফুকে বাসায় নিয়ে যান। যদিও এম্বুলেন্সে পর্যাপ্ত জ্বালানি নেই, তবুও এর জন্য চেষ্টা করে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।" অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার দিকে আমি অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সাহেবের আম্মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ, দাদা, দাদী ও ফুফু-আম্মাকে নিয়ে একটি এম্বুলেন্সে হাসপাতাল ত্যাগ করি। তখন সারা ঢাকায় কারফিউ বলবৎ ছিলো এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা অস্ত্রহাতে এদিক ওদিক পালাচ্ছিলো। যাহোক, নিরাপদে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সাহেবের পরিবারবর্গকে তাঁর সেন্ট্রাল রোডস্থ বাসায় এবং দাদা-দাদী, ফুফু-আম্মাকে সোবহানবাগে তাঁর সরকারী ফ্ল্যাটে রেখে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসার পশ্চিম পাশের বাড়ীর দোতলায় এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন (পরবর্তীতে BCIC-এর দীর্ঘকালীন চেয়ারম্যান ও তৎপরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের বাণিজ্য সচিব)-এর ফ্ল্যাটে আমি আশ্রয় নিই। সেখানে পৌঁছে অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত ঘোষণায় শুনি যে, ঢাকায় পাকিস্তান সামরিক জান্তার আত্মসমর্পণের সময়সীমা ঐদিন বিকেল ৩টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৮৭। এদিকে দুপুর থেকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা এসে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করতে শুরু করে। ঐ সময় জানতে পারি যে, ১৫ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতেই মুক্তিবাহিনী ও কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে "কাদেরিয়া বাহিনী''-এর সহায়তায় ভারতীয় ১০১ মাউন্টেন ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল গান্ধর্ব্য নাগরা তাঁর এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ও সহকর্মী এবং কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদেরিয়া বাহিনীর কিছু সদস্যদের নিয়ে কালিয়াকৈর হয়ে ঢাকা-মানিকগঞ্জ সড়ক পথে মীরপুর ব্রিজের উত্তর পাশে আমিনবাজারে এসে পৌঁছেছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর সকালে ঐ ব্রিজের দক্ষিণ পাশে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে কিছু সংঘর্ষ হবার পর বেলা ১১টার দিকে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল জমশেদ মীরপুর ব্রিজের কাছে গিয়ে মেজর জেনারেল গান্ধর্ব্য ও তাঁর দুইজন উচ্চপদস্থ সহকর্মী এবং কাদের সিদ্দিকীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদেরকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ পাকিস্তান ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ারটার্স নিয়ে যান।

৮৮। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ২টার দিকে তিনটি ভারতীয় সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল জ্যাকব তাঁর কয়েকজন

উচ্চপদস্থ সহকর্মীদের নিয়ে ঢাকা পৌছান। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ৮–১০টি সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে ভারতীয় ইস্টার্ন সেক্টরের সামরিক বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কম্যান্ডের সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক সহকর্মী এবং মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকারকে নিয়ে ঢাকা পৌছান। পাকিস্তান ইস্টার্ন সামরিক কম্যান্ডের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)–এর সেই স্থানে যেখানে মাত্র ৯ মাস ৯ দিন আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ (১৯৭১) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ১৬ই ডিসেম্বর সকালের দিকে ঢাকার পথঘাট ছিলো প্রায় জনশূন্য। কিন্তু বেলা তিনটার দিকে সেখানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার লোক পরাজিত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান দেখতে জমায়েত হয়। তখন চারদিকে শুধু গগনবিদারী "জয় বাংলা" শ্লোগান। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) বিকেল ঠিক ৪টা ১৯ মিনিটের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন কম্যান্ডের পক্ষে লেঃ জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী ভারত–মুক্তিবাহিনীর যৌথ কম্যান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন (পরিশিষ্ট–৪ দ্রষ্টব্য)। হাজার হাজার জনতা ও শতাধিক দেশী–বিদেশী সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করেন। ঢাকা নগরীর প্রতিটি বাড়ীতে তখন গাঢ় সবুজের ওপর লাল বলয়ের মধ্যে সোনালী রং–এর বাংলাদেশের মানচিত্রসম্বলিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিলো।

৮৯। এদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চৌ–এন–লাই সখেদে বলেন, "ঢাকার পতন ভারতের বিজয়ের পথে অগ্রগতির প্রমাণ নয়, বরং এশীয় উপমহাদেশে এক অন্তহীন যুদ্ধের সূচনামাত্র।" ১৭ই ডিসেম্বর পিকিং (বর্তমানে বেইজিং)–এ চৌ–এন–লাই আরও বলেন, "ভারতই পাকিস্তানের ঘাড়ে তথাকথিত বাংলাদেশের ক্রীড়নক সরকারকে চাপিয়ে দিয়েছে।"

৯০। ১৬ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেলো। পশ্চাদপসারণরত পাকিস্তানী সৈন্যরা ১৩ই ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। শহরের উপকণ্ঠে এসব আইনজীবী, চিকিৎসক ও শিক্ষকদের লাশ পাওয়া যায়। রাজশাহীতেও অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। ঢাকায় ১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর রাতে কারফিউ–এর মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ী বাড়ী হামলা চালিয়ে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার অন্তর্ভুক্ত অনেক বুদ্ধিজীবীকে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকার মোহাম্মদপুর পশ্চিম প্রান্তের ইটখোলা ও মীরপুরের উত্তরের কবরস্থানের পাশে ৫০–৬০ জনের লাশ পাওয়া যায়। এঁদের অনেককে এক সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে ডোবার পাশে রেখে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো,

আবার কাউকে কাউকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেসব বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী কর্মচারীসহ সব ধরনের পেশার ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর আবাসিক এলাকা দুটো ছিলো মূলত অবাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল।

৯১। ১৬ই ডিসেম্বর দিবাগত রাতে (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "... সম্ভবত নিরাপত্তা পরিষদে এটাই হচ্ছে আমার শেষ বক্তৃতা। যদি নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে থাকে যে, আমি আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ব্যাপারটা বৈধ করার জন্য এতে অংশ গ্রহণ করবো, তাহলে এটুকু বলতে পারি যে, কোন অবস্থাতেই আমি তা করবো না। আমি নিরাপত্তা পরিষদ থেকে আত্মসমর্পণের দলিল গ্রহণ করবো না। আমি একটা (সামরিক) আগ্রাসনকে বৈধ করার অংশীদার হবো না। কেন গত তিন-চার দিন ধরে নিরাপত্তা পরিষদ বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করলো? এটার অর্থ কি এই নয় যে, ঢাকার পতনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। কেন আমি নিরাপত্তা পরিষদে সময় নষ্ট করবো? ... আমি এই মুহূর্তে (নিরাপত্তা পরিষদ থেকে) ওয়াক আউট করলাম।" অল ইন্ডিয়া রেডিওসহ বিভিন্ন বিদেশী রেডিওতে বলা হয়েছিলো যে, ওয়াক আউট করার পূর্ব মুহূর্তে ভুট্টো সাহেব ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদে পেশকৃত সর্বশেষ প্রস্তাবের কপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছিলেন। যাহোক, ১৭ই ডিসেম্বর ভারত সরকার একতরফাভাবে ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টেও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।

৯২। ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লোক মারফত খবর নিয়ে জানতে পারি যে, তখনও ধানমন্ডীর (পুরাতন) ১৮ নম্বর (নতুন ৯/এ নম্বর) রোডস্থ ২৬ নম্বর বাড়ীটিতে পাকিস্তানী আর্মির সৈন্যরা প্রহরারত রয়েছে। কিন্তু শাশুড়ী, হাসিনা, রেহানা, রাসেল, জয় ও অন্যরা কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে কেউই সঠিক তথ্য দিতে পারলো না। পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই ডিসেম্বর সকাল ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বাড়ীর পশ্চিম পাশের বাসার (শরায়ে খাম) ডা: এ. সামাদ খান চৌধুরী, তাঁর মেজো ছেলে, এ, আহাদ খান চৌধুরী (আহাদ) এবং এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেনসহ আমি একটি গাড়ীতে করে ধানমন্ডী বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশের রাস্তা (পুরাতন) ২০ নম্বর (নতুন ১২/এ নম্বর) হয়ে ১৮ নম্বর রাস্তায় প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ঐ বাড়ীটির দিকে অগ্রসর হই। বাড়ীটির কাছে পৌঁছানো মাত্রই সেখানকার একজন সৈন্য গাড়ীটির দিকে বন্দুক তাক করে আমাদেরকে থামতে আদেশ করে। তখন বিপদের ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি গাড়ী থেকে বেরিয়ে দু'হাত উঁচু করে দাঁড়ালে—হয়তো আমাকে চিনতে পেরে—সে আমাদের গাড়ীটিকে বাড়ীটির গেইটের দিকে নিতে বলে। সেখানে পৌঁছে বাড়ীটির ভেতরে লোকজনের কোন সাড়াশব্দ না

ইকবাল হল ক্যাম্পের নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ।

৯৯। মুজিবনগর সরকারকে তখন সদ্য স্বাধীন (শত্রুমুক্ত) বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেই দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করাসহ ঐ সমস্ত আটককৃত অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হতে হয়। তাছাড়া একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশু রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো গঠন, ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলায় তাঁদের সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। উপরন্তু আত্মসমর্পণকারী পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা নিরূপণ করার দায়িত্বও তাঁদের নিতে হয়। ঐ সময় পাকিস্তান বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো ৯১,৫৪৯ জন। বাংলাদেশে নিরাপত্তার অভাব বিবেচনায় এদের ভারতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছিলো যে, ঐ সমস্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় ঢাকায় আবার ফেরত আনা হবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে এসব যুদ্ধবন্দীকে ভারতে পাঠানো শুরু হয়। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে পরাজিত পাকিস্তানী সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর জেনারেল জমসেদ, রিয়ার এ্যাডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডোর ইমামুল হক প্রমুখকে হেলিকপ্টারযোগে কলকাতায় নিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টার্স ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তির ভারতে স্থানান্তর ১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারীর মধ্যে সম্পন্ন হয়।

১০০। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হওয়ার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষার স্বার্থে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিজেদের কৌশল পুনঃনির্ধারণপূর্বক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে সরিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে যুগপৎ সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভুট্টোর জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের সভা বর্জন করে ইসলামাবাদে ফেরার অব্যবহিত পর। এর পর পরই এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে সদম্ভে বলেন, "সমর শক্তির জোরে একটা পরিণতিকে চাপিয়ে দেয়া যায় কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয় না। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ।" অতঃপর ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু।
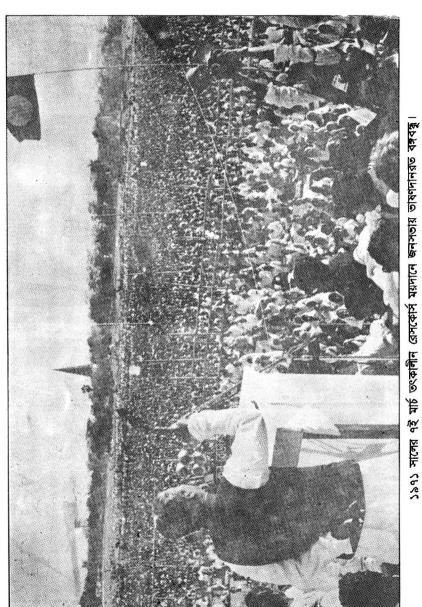
১৯৭১ সালের জানুয়ারীতে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের সভায় অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মঞ্চে উপবিষ্ট বঙ্গবন্ধু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
১৯৭২ সাল

১। 'মুজিব নগর' থেকে স্বদেশে ফিরেই বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এবং অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী অবস্থান নিলেন বঙ্গভবন (পাকিস্তান আমলে গভর্নর হাউস)–এ। অপরদিকে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ গিয়ে উঠেন তাঁর আগামসি লেনস্থ নিজস্ব বাসায়। এর কয়েকদিন পর, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ তাঁর মন্ত্রিসভার কিছুটা রদবদল ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর স্থলে আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদকে নতুন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী নিয়োগ করেন।

২। তাজউদ্দিন আহমদের খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্র বিষয়ক দায়িত্ব থেকে সরানোর কারণ কিছুটা ছিল তাঁদের দু'জনের পরস্পর বিপরীতমুখী মতাদর্শ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্নে ব্যক্তিগত সংঘাত। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় শেখ মুজিব এবং খন্দকার মোশতাক একই সঙ্গে দলের যুগ্ম–সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে দলের কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবের উদ্যোগে দলটিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে পরিবর্তিত নামকরণ করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ"। দলের উক্ত কাউন্সিল সভার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আব্দুস সালাম খান ও অন্যান্য অল্পসংখ্যক সদস্যসহ খন্দকার মোশতাক আহমদ দল থেকে বেরিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন এবং এর সহ–সভাপতি নির্বাচিত হন। যতই দিন যেতে থাকে ততই আওয়ামী লীগে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়ায়। খন্দকার মোশতাকের বিরোধিতা তখন পরিচালিত হয় তাজউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে। কিন্তু উপরোক্ত কারণ ছাড়াও খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করার কারণ

ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত লংঘন করে কলকাতায় তাঁর স্বাধীনতা বিরোধী গোপন চক্রান্তমূলক বিভিন্ন ভূমিকা ও তৎপরতা। তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে অবিচল এবং সমাজতন্ত্রী শিবিরের, বিশেষতঃ (তৎকালীন) সোভিয়েট ইউনিয়ন ও প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। অপরদিকে খন্দকার মোশতাক আহমদের টান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে এবং তিনি চেয়েছিলেন কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সঙ্গে আপোষ করে পাকিস্তান অটুট রাখতে। শুধু তাই নয়, এই আপোষ ফরমূলা নিয়ে কলকাতায় মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন প্রতিনিধির সঙ্গে খন্দকার মোশতাকের আলোচনাও হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ ও আপোষ আলোচনা শুরু করতে। ঐ গোপন বার্তাটি ধরা পড়েছিল এবং তারপরই বাংলাদেশ সরকার খন্দকার মোশতাককে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করে। তাঁর পরিবর্তে তখন লন্ডনে অবস্থানরত এবং সেখানে স্বাধীনতার পক্ষের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা করে জাতিসংঘে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হতে সরানোর পূর্বে এসব ঘটনার কথা তাজউদ্দিন আহমদের মনে ক্রিয়াশীল থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল।

৩। মন্ত্রিসভার উপরোল্লিখিত রদবদলের কয়েকদিন পর সুলতান শরিফ আমাকে জানান যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ হারিয়ে ক্রুদ্ধ খন্দকার মোশতাক তাজউদ্দিনের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে অসুস্থতার ভান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের জেলখানায় কি অবস্থায় আছেন এবং আদৌও জীবিত আছেন কি না সেসম্পর্কে কারও কোন তথ্য জানা ছিল না। তদুপরি, তখন পর্যন্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করা সম্ভব না হওয়া, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী এবং অন্যান্য দল ও গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃত্বের অধীনে অবস্থান, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেও পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি, স্বাধীনতা বিরোধী ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনীর সদস্য ও নেতাদের মুক্ত বিচরণ ইত্যাদির কারণে দেশে এক অস্বস্তিকর ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল। এহেন পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে অনৈক্য ও কোন্দলের খবর প্রকাশ পেলে তার পরিণতিতে সদ্য অর্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে এই আশংকায় আমি তৎক্ষণাৎ সুলতান শরিফকে সঙ্গে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবকে দেখতে যাই। আমাকে পেয়ে আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করার জন্যে খন্দকার

মোশতাক আহমদ সাহেব তখন সুলতান শরিফসহ সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলকে কেবিনের বাইরে পাঠিয়ে দেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আমি তাঁকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করি। খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব প্রথমে অনমনীয় ভাব দেখালেও শেষমেষ আমার প্রস্তাবে রাজি হন এই শর্তে যে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া না হলেও, মন্ত্রী পরিষদে যথাযোগ্য জ্যেষ্ঠতাসহ অর্থ কিংবা শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্যে আমি বঙ্গবন্ধুর নিকট তদবির করবো। এর পরদিন খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

৪। এদিকে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের অন্যান্য অংগদলসমূহ এবং মুজিব বাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ৭ই মার্চ (১৯৭২) তারিখে রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)–এ এক জনসভার ঘোষণা দেয়া হয়। ঐ সময় কয়েকটি বিশেষ মহল থেকে এই মর্মে প্রচারণা ছড়ানো হয় যে, তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে আন্তরিক নন। এই সংবাদ শোনার পরদিন সকালে আমি বঙ্গভবনে গিয়ে তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এবিষয়ে অবহিত করি। আমরা তখনও ধানমন্ডির সেই ১৮ নম্বর রোডের বাসায় থাকতাম। সেদিন বিকেলে তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব আমাদের বাসায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে তখন পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেসম্পর্কে শাশুড়ীকে অবহিত করেন। এর পরদিন ঐ বাসায় একটি টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়।

৫। ঐ সময় বিশ্বের প্রায় সব জায়গা থেকেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে পাকিস্তানের প্রতি দাবী জানানো হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব, ইউরোপের প্রায় অর্ধেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনজীবী সমিতিও ইসলামাবাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে আবেদন জানান। অনেকগুলো মুসলিম দেশের সঙ্গে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্যে পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এও বলা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবের যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব পাকিস্তানকে গ্রহণ করতে হবে এবং তার ফলাফল কখনোই ভালো হবে না। এরপরেও আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। অবশেষে ৩রা জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে করাচীর এক জনসভায় জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

৬। ৮ই জানুয়ারী (১৯৭২) বিবিসি–এর সকালের সংবাদে বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে ৭ই জানুয়ারী দিবাগত রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে লন্ডনের পথে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই খবর আনন্দের হলেও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই তখনও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেনি। বিবিসি–এর পরবর্তী সংবাদে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উক্ত

বিমানটি ঐদিন সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে পৌঁছেছে। লন্ডন বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বৃটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং লন্ডনের হোটেল ক্ল্যারিজে তাঁর জন্যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই খবর প্রচার হওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাছের ও পরিবারবর্গ, চার বোন ও তাঁদের পরিবারবর্গ এবং ঢাকায় অবস্থানরত অন্যান্য নিকট আত্মীয়-স্বজন আমাদের ধানমন্ডির ঐ ১৮ নম্বর রোডের বাসায় ছুটে আসেন। তখন সকলের দু'চোখ ভরে উঠেছিল আনন্দাশ্রুতে। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে টেলিফোনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রথমে কথা বলেন আমার শাশুড়ী। এরপর বঙ্গবন্ধু, এক এক করে বাসায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলেন। ঐ দিন সন্ধ্যেয় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখা করেন।

৭। পরদিন, অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারী (১৯৭২) সকালে শাশুড়ী বলেন যে, আমি যেন তাজউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর ১০ই জানুয়ারী তারিখে দেশে ফেরার সময়সূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি। তাই সকাল ১০টার দিকে সুলতান শরিফকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনে তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করতে যাই। তাজউদ্দিন সাহেব তখন বঙ্গভবনের দোতলার কোণাস্থ খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগের ময়জুদ্দিন আহমেদ, গাজী গোলাম মোস্তফা এবং আরও দু'জন নেতার সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আমাদের দেখে তাজউদ্দিন সাহেব আওয়ামী লীগ নেতাদের বিদায় জানিয়ে পাশের ড্রইং রুমে আমাদের নিয়ে বসেন। শাশুড়ীর কথা তাঁকে জানালে তাজউদ্দিন সাহেব বলেন যে, তিনি দুপুরের দিকে আমাদের বাসায় গিয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করে বঙ্গবন্ধুর ফেরার সময়সূচী চূড়ান্ত করবেন।

৮। ঐ দিন তাজউদ্দিন সাহেব শাশুড়ীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জন্যে আমাদের বাসায় আসেন ১টার দিকে। তাজউদ্দিন সাহেব শাশুড়ীকে জানান যে, ইতিপূর্বে লন্ডন ও দিল্লীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার ব্যাপারে একটি সময়সূচী তৈরী করা হয়েছে। ঐ সময়সূচী অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু একটি বিশেষ বৃটিশ বিমানে ৯ই জানুয়ারী রাতে লন্ডন ত্যাগ করবেন এবং পরদিন দুপুরের দিকে দিল্লী পৌঁছাবেন। দিল্লীতে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা পৌঁছে সেখানে এক ঘণ্টা যাত্রাবিরতি করে বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা পৌঁছাবেন। ঢাকায় পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)-এ জনসভায় ভাষণ দেবেন। ঐ দিন কলকাতাতেও যাত্রাবিরতি করলে ঢাকায় রেসকোর্সের সভাস্থলে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে, এই ভেবে শাশুড়ী তাজউদ্দিন সাহেবকে কলকাতার কর্মসূচী বাতিল করার পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়তঃ দিল্লীতে বিমান পরিবর্তন করলে বৃটেনের জনগণ মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন সে কারণে এই বৃটিশ বিমানেই

বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে আসা সমীচীন হবে বলে শাশুড়ী মন্তব্য করেন। এ কথা শোনার পর তাজউদ্দিন সাহেব দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডি.পি. ধরকে টেলিফোন করে শাশুড়ীর মতামত তাঁকে অবহিত করেন। অতঃপর সাব্যস্ত হয় যে, লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু শুধু দিল্লীতে এক ঘণ্টার জন্য যাত্রাবিরতি করে একই বিমানে দিল্লী থেকে সোজা ঢাকা আসবেন।

৯। ১০ই জানুয়ারী (১৯৭২) দুপুরের দিকে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান 'কমেট' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করে। দিল্লীর লাখো জনতা, ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সেনাবাহিনীর তিন প্রধান, শীর্ষস্থানীয় নেতা ও বৈদেশিক কূটনৈতিকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ অসুস্থতার জন্যে দিল্লীতে ছিলেন না। তিনি বঙ্গবন্ধুকে এ যুগের সবচাইতে বড় অহিংস গান্ধীবাদী নেতা বলে আখ্যায়িত করে তাঁর জন্যে শুভেচ্ছা বার্তাসহ ফুলের মালা পাঠিয়েছিলেন পালাম বিমান বন্দরে। অভ্যর্থনা পর্ব শেষে, সেখানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। বিমান বন্দরে সমবেত হাজার হাজার মানুষের সুবিধার্থে সেখানে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকারের প্রতি ভারতের সর্বাত্মক সমর্থনের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "তাঁরা বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। রণাঙ্গনে ভারতের হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, হাজার হাজার সৈন্য আহত হয়ে জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছে।" ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি বহু দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন এবং অনেক দেশের নেতাদের টেলিগ্রামের মাধ্যমে অনুরোধ করেছেন আমার মুক্তির জন্যে পাকিস্তান সামরিক জান্তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে।" বাংলাদেশ ও ভারতের আদর্শগত মিলের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।" তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানীরা যখন আমাকে আমার জনগণের মাঝ থেকে (বন্দী করে) নিয়ে যায়, অনেক কেঁদেছিল তারা। আমার বন্দিত্বের সময় সেই কেঁদে ওঠা মানুষগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জীবনযুদ্ধে। আর আমি যখন দেশে ফিরে যাচ্ছি তখন তারা বিজয়ী। লক্ষ লক্ষ বিজয়ী মুখের হাসির মাঝে আমি ফিরে যাচ্ছি। এক জীবনব্যাপী বন্দিত্ব থেকে আমি ফিরে যাচ্ছি মুক্ত, স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশে। সামনে যে ব্যাপক কাজ পড়ে রয়েছে সেখানে আমার জনগণের সঙ্গে তা (সম্পন্ন) করবার সংকল্প নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার দেশে- বাংলাদেশে। সামনে যে পথ আমরা রচনা করবো তা হবে শান্তির এবং প্রগতির পথ। কারো জন্যে কোন ঘৃণা বুকে নিয়ে আমি ফিরছি না। মিথ্যার ওপরে সত্যের জয়, অশুচিতার উপরে শুচিতার জয়, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় এবং সর্বোপরি অশুভ ও অসত্যের ওপরে সার্বজনীন সত্যের বিজয়ের প্রেক্ষাপটেই আমি ফিরে যাচ্ছি আমার নিজের দেশে– রক্তস্নাত ও শুচিতায় উদ্ভাসিত স্বাধীন বাংলাদেশে।" পরিশেষে, ভারতের জনগণ ও সরকারকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ভারত হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। কৃতজ্ঞতার কোন ভাষা আমার নেই।"

১০। ১০ই জানুয়ারী (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর শুভাগমনের খবর শুনে সারা ঢাকার মানুষ আনন্দ ও উচ্ছ্বাস–উল্লাসে ফেটে পড়ে। সকালে হাজার হাজার লোক রাস্তায় নেমে পড়ে। দলে দলে কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ, ফেষ্টুন, "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ" সম্বলিত ব্যানারসহ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা হাতে রেসকোর্স ও তেজগাঁও বিমান বন্দরের দিকে আসতে থাকে। দুপুরের মধ্যে লাখ লাখ মানুষের সমাগমে সারা রেসকোর্স ময়দান ভরে যায়। রেসকোর্স ময়দান থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত সারা রাস্তা হয়ে যায় লোকে লোকারণ্য। বিমান বন্দরের ভেতরেও হাজার হাজার লোক অবস্থান নেয়। এত জনতার সমাবেশ ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। মুশকিলে পড়লেন পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা। ইতিমধ্যে একটা গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্সে আসবার পথে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা করা হতে পারে। একে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবারও দরকার ছিল, কেন না রাজাকার, আলবদর, আলশামস্–এর ধর্মোন্মত্ত পাকিস্তানী বহু এজেন্ট তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিরাপত্তা বিভাগের পরামর্শ ছিল বঙ্গবন্ধুকে আর্মাড্ কারে অথবা সম্ভব হলে ট্যাংকে করে এয়ারপোর্ট থেকে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে আসার জন্যে। ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা দ্রুত মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, এ দায়িত্ব নিরাপত্তা বাহিনীর চেয়ে তাদেরই বেশী। অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব তারা নিল। এয়ারপোর্ট থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত পুরো রুটেই তারা অবস্থান নিল। বিভিন্নভাবে অবস্থান নিয়েছিল তাঁরা। গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ নির্বিশেষে সবগুলো জায়গাতে গিয়ে এবং জনতার সঙ্গে মিশে তাঁরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল।

১১। বিকেল ৩টায় বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ (সাদা কমেট) বিমানটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করে। এরপর সেখানে সমবেত লাখ লাখ জনতা আনন্দ–উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাঁরা শোকরানা জানায় মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে। বিমান বন্দরের ভেতরেও ছিল হাজার হাজার মানুষ। বিমান থেকে অবতরণের সিঁড়ির মুখে কোন রকমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ। তোফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আ.স.ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ এক এক করে বিমানে উঠে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে মাল্যভূষিত করে। বঙ্গবন্ধুসহ প্রত্যেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে একটি ডজ ট্রাকে বঙ্গবন্ধুকে রেসকোর্স ময়দানে নেয়ার

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ছাত্রনেতাসহ প্রায় বিশ-পঁচিশ জন ট্রাকের উপর বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ছিলেন। হৃদয়ের গভীর থেকে মানুষের চওড়া গলায় তালে তালে ভেসে আসতে থাকে শুভাশীষ ধ্বনি, "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, জয় বাংলা।" লোকের প্রচণ্ড ভিড়ে গাড়ীটি অতি মন্থর গতিতে রেসকোর্স ময়দানের দিকে এগোয়। তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত এতটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ঐ ট্রাকটি রেসকোর্স ময়দানের জনসভাস্থলে পৌঁছায় পৌনে পাঁচটার দিকে। বঙ্গবন্ধুর গলায় তখন এত ফুলের মালা যে তাঁকে আর দেখাই যাচ্ছিল না।

১২। রেসকোর্সে পৌঁছতেই বঙ্গবন্ধু দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেলেন। ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা বৃহ্যের মতো করে তাঁকে বেষ্টনীতে নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ করে সভা মঞ্চে উঠে তোফায়েল আহমদ বললেন, "ভাইসব, বঙ্গবন্ধু মঞ্চের দিকে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আপনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। কিন্তু তার আগে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের সবার নিরাপত্তার জন্যে দয়া করে প্রত্যেকে বসে পড়ুন। হাত দুটোকে মাটির ওপর রাখুন। সঙ্গে সঙ্গে নজর রাখুন আপনার আশেপাশের প্রত্যেকের ওপর। খুনীর হাত যে কোন জায়গা থেকে উঠে আসতে পারে। কড়া নজর রাখবেন।" এর একটু পরেই মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু। উত্তেজনায় সবার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। পুরো রেসকোর্স ময়দান ভরা মানুষগুলো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সামনে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই দেখছেন। উত্তেজনায় উদ্বেল আনন্দধ্বনি ক্রমশঃই বেড়ে চললো। ঐ অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধু বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বঙ্গবন্ধু বললেন, "১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা জয় করে এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই এই ঐক্য বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙ্গালীও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে।" অতঃপর বঙ্গবন্ধু ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তাঁরা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি বাংলাদেশের এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। যুদ্ধ চলাকালে রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে, শত শত সড়ক-পুল, রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, দোকান-পাট হানাদার পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা ধ্বংস করে দিয়েছে। অফিস, ব্যাংক ও

ট্রেজারীগুলো লুট করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করেছে।" পশ্চিম পাকিস্তানে জেলখানায় তাঁর বন্দীদশা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আপনারা জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করবো না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙ্গালী, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।"

১৩। এরপর পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। আমি কামনা করি আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নাই।" বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় নীতি কি হবে তা ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বে-ইজ্জত করেছে। ইসলাম ধর্মের অবমাননা আমরা চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। যার যা ধর্ম তা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালন করবে।" দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলাপের কথা উল্লেখ করে অতঃপর বঙ্গবন্ধু বলেন, "তাঁর সঙ্গে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইবো, ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনী তখনই প্রত্যাহার করে নেবেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে দেয়া হয়েছে।"

১৪। এরপর মুক্তিযুদ্ধে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "প্রায় এক কোটি মানুষ- যাঁরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বাকী যাঁরা দেশে রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, সেই বীর মুক্তিবাহিনী, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, বেংগল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও নাম না জানা লাখ লাখ নর-নারী তাঁদের সবাইকে আমার সালাম জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহবান জানিয়েছিলেন আর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে

এনেছেন"। বক্তৃতার এই পর্যায়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি" উদ্ধৃত করে বঙ্গবন্ধু বললেন, "এবার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালী পুড়ে সোনার মানুষ হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর খেদোক্তির জবাবে আপনারা প্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গালী বীরের জাতি। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের পদানত করতে পারবে না।"

১৫। দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার সংকল্প ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু বললেন, "বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকেরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না, করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, বস্ত্র পায়, বাসস্থান পায়, শিক্ষার সুযোগ পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।" অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তি পাবার পূর্বে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর যে আলাপ হয়েছিল তার প্রসংগ টেনে বঙ্গবন্ধু বলেন, "পাকিস্তানের কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা (লুস কনফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে) শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়, তাহলে এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে শেখ মুজিব সর্বপ্রথম প্রাণ দেবে।" পরিশেষে, জাতিসংঘ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্যে আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করার আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে সীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়ার জন্যে সাহায্য করুন। জয় বাংলা।"

১৬। রেসকোর্স ময়দানের জনসভা শেষে, সদলবলে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজার জেয়ারত ও সেখানে পুষ্পস্তবক এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বঙ্গবন্ধু আমাদের ধানমন্ডির (পুরাতন) ১৮ নম্বর (নতুন ৯/এ নম্বর) বাসায় আসেন সাড়ে ছয়টার দিকে। ইতিপূর্বে তাঁর আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা এবং তাঁর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ঐ বাসায় এসে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক এক করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই সারাক্ষণ কাঁদছিলেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এরপর ঐ বাসায় শাশুড়ী ও আমার শয়নকক্ষের মাঝখানের ড্রেসিং রুমে বঙ্গবন্ধু, শেখ ফজলুল হক মণি,

সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ এবং আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসেন। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোলকাতায় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের ভূমিকা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁরা মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্টর কম্যান্ডারদের মতাদর্শ ও ভূমিকা সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। সবশেষে, ঐ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তৎসম্পর্কে তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দেন। ঐ সময় ভারতীয় সেনা-বাহিনীর মেজর তারার অধীনস্থ জোয়ানরা ঐ বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। বঙ্গবন্ধু যখন উক্ত চার ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক ছাত্র-যুবক ঐ বাড়ীর ছাদে উঠে পটকা ও অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আনন্দ উল্লাস করছিল। এ ছাড়াও সারা ধানমন্ডী ও ঢাকা শহরের অন্যান্য এলাকাতেও মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ছাত্র-যুবকেরা পটকা ও অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে জয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বাড়ীর ছাদের গোলাগুলি বন্ধ করার আদেশ করলেন। একই সঙ্গে অন্যান্য এলাকায়ও সর্বপ্রকার গোলাগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্যে তিনি ছাত্রনেতাদের প্রতিও নির্দেশ দিলেন।

১৭। চার ছাত্রনেতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলাপ শেষ হয় রাত প্রায় ৯টার দিকে। ততক্ষণে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্যে ঐ বাসায় ডিউটি দিতে আসেন বাংলাদেশ পুলিশের ১৫-২০ জন সদস্য। তাঁরা ঐ বাড়ীর সামনের বাড়ীর চত্বরে অবস্থান নেয়া শুরু করেন। ধানমন্ডীর (পুরাতন) ১৮ নম্বর রোডস্থ ২৩ নম্বর দোতলা বাড়ীটি শাশুড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকার নিয়েছে ঐমর্মে ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে জুলফিকার আলীর ঘোষণা শোনার পর। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বাড়ীটির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করেছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকেরা ২৫শে মার্চ (১৯৭১) রাতে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। ঐ বাড়ীটিকে পুনরায় বাসোপযোগী করে নিতে প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন হবে সে বিষয় চিন্তায় রেখে শাশুড়ী ধানমন্ডীর ১৮ নম্বর রোডস্থ এই বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিলেন। রাত ৯টার দিকে ঐ বাড়ীটিতে আসবাবপত্র নেয়া হচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর তারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু মেজর তারাকে বললেন, "আমি এখন নিজের দেশে ফিরেছি। আমার দেশে আমার নিরাপত্তার জন্যে আপনাদের দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে আপনাদের লোকজন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়েছেন। এখন তাঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন। অতএব এক্ষণি আপনি আপনাদের লোকজনদের এই বাড়ীর ডিউটি থেকে প্রত্যাহার করে নিন।" প্রথমে মেজর তারা এটাসেটা বলে একটু আপত্তি করেছিলেন বটে কিন্তু বঙ্গবন্ধু পুনরায় একই উক্তি করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনীর জোয়ানদের সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নেন।

১৮। ১১ই মার্চ (১৯৭২) সকালে খাওয়ার টেবিলে বঙ্গবন্ধু একা নাস্তা খাচ্ছিলেন। শাশুড়ী সেখানে ছিলেন না। আমিও নাস্তা খাওয়ার জন্যে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। বঙ্গবন্ধুকে একান্তে পেয়ে গত রাতের চার ছাত্রনেতার সঙ্গে তার আলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "বিরাজিত পরিস্থিতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত এবং তা বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত আপনার হাতে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব রাখা সমীচীন হবে। উপরন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও আপনার হাতে রাখা দরকার।" আমার কথাগুলো শেষ না হতেই বঙ্গবন্ধু কিছুটা রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, "বাবা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তুমি কোলকাতায় ছিলে না। কাজেই তুমি বর্তমানের রাজনীতির রহস্য বুঝবে না। আমরা সুদীর্ঘকাল সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে সংগ্রাম করেছি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আমরা অংগীকারাবদ্ধ। ১৯৭০-এর নির্বাচনেও জনগণ এর জন্যে বিপুল ম্যানডেট দিয়ে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। তুমি তোমার বিজ্ঞানের কাজ কর। রাজনীতি নিয়ে এখন তোমার মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই।" তাঁর এই বক্তব্য শোনার পর আমি আর কিছু বলার সাহস করি নি। অতঃপর বঙ্গবন্ধু শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গভবনে চলে যান।

১৯। সেদিন টেলিভিশনে রাত ৮টার সংবাদে বলা হয় যে, দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করা হয়েছে। পরদিন, অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। ঐ দিনই বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে মন্ত্রিসভায় ব্যাপক রদবদল ঘটান। আওয়ামী লীগের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে নিয়োগ করা হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদকে সেচ ও পানি সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব আব্দুল মালেক উকিলকে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী এবং ডঃ কামাল হোসেনকে আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী। একই তারিখে বঙ্গবন্ধু তোফায়েল আহমদকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক সচিব এবং পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে নির্বাচিত ছাত্রলীগের এককালীন সভাপতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসের উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব রফিকউল্লাহ চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। পরের দিন রফিকউল্লাহ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে, চাকরিতে জেষ্ঠ্যতার বিবেচনায় তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ করা যায় না। যাহোক, এর কিছুদিন পর তাঁর পদমর্যাদা প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী হিসেবে পুনঃনির্ধারিত করা হয়। ১২ই জানুয়ারী পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়ার সরকারদ্বয় এবং ১৩ই জানুয়ারী ঘানার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২০। ১৪ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু দেশে গণতান্ত্রিক পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন যে, ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাদেশের নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে এবং অতি শিগ্‌গির তদুদ্দেশ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হবে। খসড়া সংবিধানে বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্যে প্রস্তাবিত গণপরিষদের অধিবেশন আহবান করার ব্যাপারে প্রয়োজনের চাইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হবে না বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রীয় নীতির মূল ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রবাসী অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মূল রাষ্ট্রীয় নীতি হবে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী দিল্লীতে, এমনকি রেসকোর্স ময়দানের জনসভার ভাষণেও এ তিন নীতিকেই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সুতরাং ১৪ই জানুয়ারীর সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর ''জাতীয়তাবাদ''-এর নীতিকে রাষ্ট্রীয় মূল নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২১। ১৫ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে এক সরকারী আদেশে দেশের সর্বত্র মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলার ব্যবসা ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে রমনার রেসকোর্স (ঘোড়দৌড়) ময়দানকে একটি বিশেষ উদ্যানে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এর নতুন নামকরণ করা হয় ''সোহরাওয়ার্দী উদ্যান"। ১৬ই জানুয়ারী নেপাল সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দেশে যাতে আইনসিদ্ধ বাহিনী ছাড়া অন্য কারও নিকট অস্ত্র-শস্ত্র না থাকে সেজন্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিশেষ করে যে কোন অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র দশদিনের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করা হয় ১৭ই জানুয়ারী। ২০শে জানুয়ারী যুগোশ্লাভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২২শে জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার অস্ত্র-শস্ত্র জমা দেয়ার সময়সীমা ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা পাকিস্তানী বাহিনীকে গণহত্যা, লুন্ঠন, নারী মর্যাদাহানির কাজে সহযোগিতা ও সহায়তা করেছিল তাদের বিচার করার উদ্দেশ্যে দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২) জারি করা হয় ২৪শে জানুয়ারী। একই দিনে বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গঠিত "কাদেরিয়া বাহিনী"-এর সদস্যরা টাঙ্গাইলে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে তাদের যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র জমা দেয়। ২৫শে জানুয়ারী (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২৯শে জানুয়ারী সরকার ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক

বাংলাদেশে গণহত্যা ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ৩০শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র জমা দেয়। সর্বশেষ, ৩১শে জানুয়ারী পল্টনস্থ ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে অস্ত্র-শস্ত্র জমা দেয় মুজিব বাহিনীর সদস্যরা।

২২। মুক্তিযুদ্ধ শেষে ভারত থেকে দেশে ফেরার পথে ২১শে জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে আসামের ফরিদগঞ্জে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বললেন, ''মিসেস গান্ধীর মত দয়ালু মানুষ হয় না। বাংলাদেশের জনগণ এই মহিয়সী নেত্রী এবং ভারতের জনগণের সহানুভূতির কথা কোনদিন বিস্মৃত হবে না। স্বাধীন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।" অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান থেকে ৭ই জানুয়ারী মুক্তি দেয়ার সময় জনাব ভুট্টো পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে (কনফেডারেশনের মত) একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বললেন, ''পাকিস্তানের সঙ্গে কিছু একটা যোগসূত্র রাখার জন্যে ভুট্টো সাহেব শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁকে (জনাব ভুট্টোকে) বলে দিতে চাই, এটা শুধু আজকের জন্যেই অসম্ভব ব্যাপার নয়, অনাগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটা অসম্ভব ব্যাপার হয়েই থাকবে। বাঙ্গালীরা পাকিস্তানীদের বর্বরতার কাহিনী কোন দিনই ভুলতে পারবে না।"

২৩। জানুয়ারী (১৯৭২)-এর শেষ সপ্তাহে একদিন আমার বন্ধু ডঃ ইসহাক তালুকদার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিসে আসে। তাকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। কুশলাদি বিনিময়ের পর অত্যন্ত বেদনাহত হৃদয়ে সে আমাকে জানায় যে, আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাশুকুর রহমান আর ইহজগতে নেই। উল্লেখ্য যে, মাশুকুর রহমান টোজো পদার্থ বিজ্ঞান ও অংক শাস্ত্রে ডাবল অনার্সসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠি ছিল। মাশুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের অনাবাসিক ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও কর্মী ছিল। এম. এস. সিতে আমরা থিসিস গ্রুপে একই সঙ্গে পড়তাম। ১৯৬১ সালে ফজলুল হক হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় আমি ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতির প্রার্থী হওয়ায় সে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল। হল ছাত্রদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে সরাসরি ক্যানভাস (Canvass) করা দৃষ্টিকটু হবে বিবেচনায় সে তার দল (ছাত্র ইউনিয়ন)-এর সহ-সভাপতি পদপ্রার্থীর পক্ষে মুখে কিছু না বলে ''সৈয়দ আহমদকে ভোট দিন" সম্বলিত পোস্টার পিঠে লাগিয়ে সারাদিন হল চত্বরে ঘোরাফেরা করে ক্যানভাস করতো। নির্বাচনী প্রচারণা শেষে প্রতি রাতে অবশ্য মাশুক আমার গেষ্ট হিসেবে হলে আমার সঙ্গে খেতো। পরবর্তীতে সে লন্ডন থেকে এ্যাকচিউএ্যারী অংক শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী করে ১৯৭০ সালে দেশে ফিরে তৎকালীন ইস্টার্ণ ফেডারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে উচ্চ পদে চাকরি পেয়ে উক্ত কোম্পানীর চিটাগাং অফিসে পদস্থ হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের

মাঝামাঝি অসহযোগ আন্দোলনের সময় সে অফিসের গাড়ী নিয়ে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করে। মাশুকের এক ছোট ভাই ও বোন ছিল। ওদের আব্বা হাবিবুর রহমান ছিলেন যশোরের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত এডভোকেট। মাশুকের আব্বা মারা যান যখন ওর বয়স হয়েছিল মাত্র সাত বছর। বঙ্গবন্ধু ওদের আব্বাকে ভালোভাবে জানতেন। ঐ সময়ের অসহযোগ আন্দোলন কোন্ দিকে মোড় নিতে পারে তৎসম্পর্কে পরিস্থিতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মাশুক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করি। সাক্ষাতের সময় বঙ্গবন্ধু ওর আম্মা ও ভাই-বোনদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং ওকে খুব আদর করেন। ১৮ই মার্চ মাশুক ওর আম্মা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করতে যশোরে গিয়েছিল। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) রাতে পাকিস্তান আর্মীর লোকেরা ওদের বাসা থেকে ওকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে ভীষণ মারধর করে। আসলে পাকিস্তানী আর্মীরা ওদের বাসায় আক্রমণ করেছিল ওর ছোট ভাই খালেদুর রহমান টিটোকে গ্রেফতার করার জন্যে। কারণ টিটো তখন নক্সালপন্থী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল বলে তাদের কাছে তথ্য ছিল। যাহোক, পরদিন মাশুককে তারা ছেড়ে দেয় এই শর্তে যে, সে ওর ছোট ভাইকে আর্মীর নিকট সোপর্দ করবে। ছাড়া পেয়ে মাশুক ভারতে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। একদিন অপর চারজন সঙ্গী নিয়ে মাশুক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী সামরিক ঘাঁটির উপর গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরছিল। পথে এক জঙ্গলে ঘুমিয়ে থাকার সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর দালাল রাজাকারের লোকেরা পাকিস্তানী আর্মীকে ওদের অবস্থানের কথা জানালে আর্মীর এক দল ওদের ঘেরাও করে অতর্কিত আক্রমণ করে। পাকিস্তানী সেনাদের ঐ আক্রমণে মাশুকসহ তিনজন মৃত্যুবরণ করে, ওদের মাত্র একজন কোনরকমে পালিয়ে বেঁচে যায়।

২৪। ঐদিন ডঃ ইসহাক তালুকদার আমাকে আরও জানায় যে, কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের দলসহ পিকিং (বর্তমান বেইজিং)-পন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের নিধন করা হবে বলে মুজিব বাহিনীর কর্মীরা হুমকি দিয়েছে। যার ফলে সম্ভাব্য হানাহানি ও রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে ঐ দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা লুকিয়ে থাকছেন। তার এ তথ্য আমার বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব ছিল, কারণ কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের মত নেতারা অতীতে অনেক রাজনৈতিক ও জনগণের দাবি আদায়ের ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি সমর্থন ও সহায়তা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁরাও লড়েছিলো। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশে স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যা হোক, আমি ডঃ ইসহাক তালুকদারকে জানাই যে, কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনো যেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। অতঃপর ডঃ ইসহাক তালুকদার চলে যায়। এর দু'দিন পরের ঘটনা। আমি তখনো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ধানমণ্ডির (পুরাতন) ১৮ নম্বর (নতুন ৯/এ)

রোডস্থ ২৩ নম্বর ভাড়াকৃত বাসায় থাকতাম। ঐ দিন সকালে অফিসে যাওয়ার জন্যে গাড়ী চালিয়ে ঐ বাসা থেকে বের হচ্ছিলাম। গেটে দেখি যে, অন্যান্য দর্শনার্থীর সঙ্গে কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেনন রাস্তায় লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থেকে নেমে ওদের কাছে যাই। ওঁরা দু'জন আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাদের নীচের বসার ঘরে বসিয়ে রেখে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করার জন্যে উপর তলায় চলে যাই। বঙ্গবন্ধু তখন ফজলুল হক মণির সঙ্গে তাঁর শয়ন কক্ষে আলাপ করছিলেন। কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননের কথা বলার পর বঙ্গবন্ধু আমাকে তৎক্ষণাৎ তাঁদের উক্ত কক্ষে নিয়ে আসতে বললেন। আমি কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননকে সেখানে নিয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু তাঁদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তাঁদের বললেন, ''তোমরা অতীতেও আমাকে বহু রাজনৈতিক ইস্যুতে সমর্থন ও সহায়তা করেছো। মুক্তিযুদ্ধেও তোমরা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছো। সদ্য মুক্ত স্বাধীন দেশ এখন সর্বদিক দিয়ে বিধ্বস্ত। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলা এবং সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতাকে সুসংহত করার কাজে তোমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা আমার একান্ত প্রয়োজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ব্যাপারে তোমরা সবাই আমাকে সর্বপ্রকারে সমর্থন ও সহায়তা করবে। তাছাড়া তোমরা তো এ দেশেরই সন্তান, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তোমাদেরও লক্ষ্য। দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পার না"। এরপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের গোপনীয় আলাপ রয়েছে বলে জানালে আমি তাঁদের সেখানে রেখে অফিসে চলে যাই।

২৫। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধে সবদিক দিয়ে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা ছিল একটি অপরিসীম কঠিন দায়িত্ব। এর আগে বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি অংশ থাকায় এ দেশের প্রায় প্রতি সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত। সারা দেশের রাস্তা-ঘাট, সেতু-বন্দর, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, কয়েক কোটি পরিবারের বাড়ী-ঘর, যুদ্ধ ও পাকিস্তানী সেনা ও তাদের দোসর-দালাল, রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও অন্যান্য বাহিনীর অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের তাণ্ডবলীলায় হয়েছিল বিধ্বস্ত। প্রায় এক কোটি বাংলাদেশের লোক বাড়ী-ঘর, ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসর-দালালদের হাতে অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত এবং সর্বোপরি নিহত হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে। সরকারী গাড়ী-বাস-ট্রাক, ট্রেনের ইঞ্জিন-বগী, জাহাজ, হেলিকপ্টার, বেসামরিক বিমান, স্টীমার, বিশেষ করে নদী পারাপারের জাহাজ, প্রভৃতির সবকিছুই বিধ্বস্ত করেছিল পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসর-দালাল বাহিনীর লোকেরা। ব্যাংকে গচ্ছিত প্রায় সম্পূর্ণ নগদ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ব্যাংক ও কার্যালয়ে

স্থানান্তরিত করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানী লোকেরা ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক পূর্বেই। ব্যাংকে রক্ষিত অবশিষ্ট টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রৌপ্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর লোকেরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন গোডাউন থেকে প্রায় তিরিশ লাখ টন খাদ্যশস্য পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করেছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। অগ্নিসংযোগে ভস্মিভূত করেছিল অনেক খাদ্য গুদাম। পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারকৃত বিরাট অংক ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যান্যভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ন্যূনতম তৎকালীন মুদ্রামানের এক হাজার কোটি টাকা। ঢাকায় কর্মরত আনরড (UNROD)-এর হিসেব অনুসারে এই পরিসংখ্যাণ তখন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের হিসেবে জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যে তখন অবিলম্বে প্রয়োজন ছিল প্রায় পঁচাশি কোটি ডলার।

২৬। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে তখন বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্ব হয় বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেঃ (১) প্রায় তিন কোটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসিত করা; (২) পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রায় পাঁচ লাখ সামরিক-বেসামরিক বাঙ্গালীকে দেশে ফেরত আনা ও পুনর্বাসন করা; (৩) বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনা গঠন করে সেগুলোর কর্মকান্ডে দেশপ্রেমিক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা; (৪) দেশে আইন শৃংখলা ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে কাজে নিবেদিত বিভিন্ন বেসামরিক, সামরিক ও অন্যান্য আইনসিদ্ধ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; (৫) দেশে সাংবিধানিক শাসন কায়েম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের আয়োজন করা ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইন বলবৎ করা; (৬) পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসর-দালাল, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ও অন্যান্য সংগঠনের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশে গণহত্যা, লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক কাজে নিজেরা সংগঠিত করা বা এ জাতীয় কাজে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতা ও সাহায্য করার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বিচারের মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা; (৭) স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি অর্জন করা ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য লাভ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো এবং (৮) পাকিস্তানের নিকট হতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং স্বাধীনতাপূর্ব সময়কালে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায় করা। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেই এ সমস্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা ও সাধনায় সদাজাগ্রত ছিল।

২৭। ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর সরকার পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন আমলে তঘমাপ্রাপ্ত ৫৩ জন উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করে। প্রশাসনকে পাকিস্তানী দোসর–দালালদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সকল সরকারী, আধা–সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলাস সামগ্রী বর্জন করার নির্দেশে দেওয়া হয় ২রা ফেব্রুয়ারী। একই দিনে বঙ্গবন্ধু সরকারী, আধা–সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানান তাঁদের প্রাপ্য বেতনের দশ শতাংশ সরকারের নিকট প্রত্যার্পন করার জন্যে। বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সর্থশ্লিষ্ট সবাই সাড়া দেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃটেন ও ফ্রান্সসহ আটটি দেশের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল' গঠন করে উক্ত তহবিলে মুক্ত হস্তে নগদ অর্থ, শিশু খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য যে কোন সামগ্রী দান করার জন্যে দেশের বিত্তবান জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতি অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে ''সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়" বঙ্গবন্ধু সরকারের এই মূল সূত্রের ভিত্তিতেই দেশে দেশে চলতে থাকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় ও বন্ধুত্বের অন্বেষা।

২৮। জাতীয় পুনর্গঠনের প্রয়োজনে ব্যাপক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কোলকাতা সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ই জানুয়ারী (১৯৭২) তারিখে স্বদেশে ফেরার পথে ভারতের দিল্লী ছাড়াও কোলকাতায়ও বঙ্গবন্ধুর জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সময়াভাবে তখন সেখানে তার পক্ষে যাত্রাবিরতি করা সম্ভব ছিল না। যাহোক, দেশে ফেরার পর প্রথম সুযোগে বঙ্গবন্ধু ৬ই ফেব্রুয়ারী মাত্র এক দিনের সফরে কোলকাতায় গমন করেন। বঙ্গবন্ধুকে এক নজর দেখার জন্যে লাখ লাখ লোক বিমান বন্দর ও শহর থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত সারা রাস্তায় সমবেত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দমদম বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। কোলকাতার বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে স্মরণাতীতকালের এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তা ও সাহায্য প্রদান করায় ভারতীয় সরকার এবং জনগণের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ''কবি গুরু আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী, রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি'। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন যে বাঙ্গালী মানুষ হয়েছে।" বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, ''নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে যাবো তাই।" জনসভা শেষে, রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রথম সুযোগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য

প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় ইন্দিরা গান্ধী উক্ত বিষয়ে এ পর্যায়ে বলেন, ''বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তো এখনও পর্যন্ত নাজুক রয়েছে। পুরো 'সিচুয়েশন' বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই করা হবে।" যাহোক, এতদবিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত আলাপের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চ (১৯৭২) তারিখ থেকে ২৫শে মার্চ তারিখের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত দুই প্রধানমন্ত্রীর এক যুক্ত ইশতাহারে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ এবং সর্বপ্রকার বর্ণবাদ ও উপনিবেশিকতার বিরোধিতার নীতির আলোকে দুই দেশের জনগণের আশা-আকাঙক্ষার বাস্তব রূপদানের সংকল্প এবং এই লক্ষ্যে দুই দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে শান্তিকামী, সৎপ্রতিবেশীসুলভ সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। এরপর ৯ই ফেব্রুয়ারী কিউবা, ১০ই ফেব্রুয়ারী জাপান এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী কানাডা বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

২৯। ১৪ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এডওয়ার্ড কেনেডী এক ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত কার্যকলাপে ও গণহত্যার তীব্র নিন্দা করায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় শহীদ দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ''শোষণমুক্ত সোনার বাংলা কায়েমই আমাদের লক্ষ্য।" একই ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে নিখোঁজ ও শহীদানের পরিবারবর্গের জন্যে তাঁর সরকারের সাহায্যদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছিল অনতিবিলম্বে সেখানে আটকেপড়া পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালীকে বাংলাদেশে এবং এখানে আটকাপড়া পাঁচ লক্ষাধিক পাকিস্তানী (অবাঙ্গালী) নাগরিকদের পাকিস্তানে ফেরতের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সরকারের উক্ত লোক বিনিময়ের প্রস্তাব নাকচ করে সেদেশে অবস্থিত বাঙ্গালীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে আটক রাখার কথা ঘোষণা করে। এরই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে বাঙ্গালীদের আটকের প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট এক জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) তারিখে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩০। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বাড়ীর মেরামত কাজ সম্পন্ন হলে তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ ধানমন্ডির ১৮ নম্বর রোডস্থ

ভাড়াকৃত বাড়ী ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজের বাড়ীতে চলে যান। আমি ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ ৩ নম্বর বাড়ীর উপর তলার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিই এবং হাসিনা ও আমাদের সন্তান জয়কে নিয়ে সেখানে চলে যাই। এই বাড়ীটির মালিক এক আধা-সরকারী দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব আইনুল হক। এই পরিবার হাসিনাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। বেগম আইনুল হক হাসিনাদের দূরসম্পর্কের খালা হন। উক্ত বাড়ীটি মীরপুর সড়ক থেকে দ্বিতীয় বাড়ী এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ী এই বাড়ীটির দু'টো বাড়ীর পশ্চিমে অবস্থিত। এরপর ১লা মার্চ (১৯৭২) তারিখে (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু পাঁচদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মস্কো গমন করেন। মস্কো বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেখানে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার প্রধান ব্রেজনেভসহ সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। ৩রা মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক চুক্তি। একই তারিখে স্বাক্ষরিত হয় ''মুজিব কোসিগিন'' যুক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণায় বাংলাদেশের পুনর্বাসন তৎপরতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়। দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, "বাইরের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পাস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যাবলীর সমাধান হওয়া উচিত।" উল্লেখ্য, শ্রীলংকার সরকার ৪ঠা মার্চ তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

৩১। (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়নে ছয়দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ৬ই মার্চ তারিখে। ঐ তারিখে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্‌ (ইপিআর)কে পুনর্গঠিত করে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স্‌ (বিডিআর) গঠন করা হয়। ইতিপূর্বে (২১ ফেব্রুয়ারী) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী থেকে কয়েক হাজার সদস্য নির্বাচন করে একটি বিধিবদ্ধ জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। মস্কো থেকে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিডিআর এবং রক্ষীবাহিনীকে একীভূত করার। কারণ এই দুই বাহিনীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। কিন্তু ঐ ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে এই দুই বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয় পিলখানার চত্বরে। এদের সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌছায় যে ওদের গোলাগুলি বন্ধ করানোর জন্যে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং নিজে পিলখানায় যেতে বাধ্য হন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে বিডিআর-এর বাইরে অপর একটি পৃথক প্যারামিলিটারী সত্তা হিসেবে বহাল রাখার পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইত্যবসরে, ১০ মার্চ সোয়াজিল্যান্ড, ১১ই মার্চ গ্রীস এবং ১৩ই মার্চ সুইজার-ল্যান্ডের সরকারগুলো বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৩২। ১৫ই মার্চ (১৯৭২) তারিখ থেকে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের আনুষ্ঠানিক–ভাবে প্রত্যাবর্তন শুরু হয়। ১৭ই মার্চ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে ঢাকায় আসেন। ঐ দিনটি ছিল বঙ্গবন্ধুর ৫৩তম জন্মদিন। ঢাকায় ইন্দিরা গান্ধীকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানানো হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (পুরাতন রেসকোর্স ময়দান) আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণদানকালে শ্রীমতি ইন্দিরা ও বঙ্গবন্ধু একইভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক অধিকতর উন্নত করার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। উক্ত সমাবেশে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আরও বলেন, ''বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং জনগণের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।" ১৮ই মার্চ সকাল দশটার দিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বঙ্গভবনে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক অনানুষ্ঠানিক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঐ সাক্ষাতের সময় আমাদের নয় মাসের শিশু জয়কে সঙ্গে নিয়ে হাসিনা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ দিন বিকেলে ইন্দিরা গান্ধীকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং সন্ধ্যায় মুজিব–ইন্দিরা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু স্ব স্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি পঁচিশ বছর মেয়াদী শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন (পরিশিষ্ট–৫ দ্রষ্টব্য)। একই দিনে স্বাক্ষরিত হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত ঘোষণা। অতঃপর ঐ দিনই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৩। ২৩শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশের গণ–পরিষদের সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত একটি রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করা হয়। ২৬শে মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। ঐ তারিখে দেশের ব্যাংক–ইন্সুরেন্স কোম্পানী, পাট, বস্ত্র, চিনিকলসহ বৃহৎ ও ভারী শিল্প জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির মালিকদের খাজনা প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করে ব্যক্তি মালিকানায় জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং হাট–বাজার, নদী–জলা প্রভৃতির ইজারাদারী প্রথা বিলোপ করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে আহত ও পংগু মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করে কিছুসংখ্যক কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও লাভজনক ব্যবসায়িক সংস্থাকে উক্ত ট্রাষ্টের দায়িত্বে ন্যস্ত করার কথাও ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লাঞ্ছিত ও ছিন্নমূল বীরাঙ্গনাদের জন্যেও অনুরূপ কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করার কথাও ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য তহবিল থেকে তাঁদের পরিবার–পরিজনকে এককালীন সাহায্য মঞ্জুরীর কথাও বঙ্গবন্ধুর সরকার ঘোষণা করে।

৩৪। অনেক টাল-বাহানার পর ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিলে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার স্বীকৃতি দেয়। ৬ই এপ্রিল দুর্নীতির অভিযোগে ১৬ জন গণপরিষদ সদস্য (এমসিএ)-কে আওয়ামী লীগ হতে বহিষ্কৃত করা হয়। ৬ই এপ্রিল গ্যাবনের সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৮ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশে পৃথক সামরিক স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি করে। একই তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রস্তাবাকারে গৃহীত সর্বসম্মত অনুরোধে "বৃহত্তর দলীয় ও জাতীয় স্বার্থে" বঙ্গবন্ধু সাময়িকভাবে দলীয় প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হন। ৯ই এপ্রিল দুর্নীতির অভিযোগে আরও ৭ জন গণপরিষদ-সদস্যকে আওয়ামী লীগ হতে বহিষ্কৃত করা হয়।

৩৫। ১০ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অতঃপর গণপরিষদের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্যে আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি ১৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১২ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের আরও আটজন নেতা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ঐদিনই বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার দফতর পুনর্বন্টন করেন। ১৪ই এপ্রিল শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের অংগীকারের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। ১৪ই এপ্রিল তারিখে মালাগাছির সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৬ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৭ই এপ্রিল যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে মেহেরপুরের মুজিব নগরে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। ১৮ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সরকার কমনওয়েলথ সংস্থা থেকে তার দেশের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। ২১শে এপ্রিল সিয়েরা লিওন এবং ২৫শে এপ্রিল লাওসের সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৬শে এপ্রিল তারিখে হাট-বাজারের ইজারা প্রথা বিলোপ করে একটি সরকারী অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ২৬শে এপ্রিল তারিখে লাইবেরিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৯শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধু ভিয়েতনাম থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণের জন্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহবান জানান।

৩৬। ১লা মে রক্তরাঙা মহান মে দিবস হিসেবে উদযাপিত হয় যথাযথ মর্যাদায়। এই প্রথম বাংলাদেশে মে দিবসে সাধারণ ছুটি প্রদান করা হয়। শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীকার আদায়ের প্রতীক এই দিনে একটি শ্রমিক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের জন্যে এককালীন এডহক অর্থ সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেন। ৪ঠা মে আটক বাঙ্গালীদের পাকিস্তানের জিন্দাখানা

থেকে ফেরত আনার দাবীতে সমগ্র ঢাকা শহরে জনতার বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়। ৮ই মে তারিখে সারাদেশে এই প্রথম যথাযথ মর্যাদায়, পরম শ্রদ্ধা ও আনন্দ-উৎসবের মধ্যদিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন (২৫শে বৈশাখ) পালিত হয়। এই দিন সকাল দশটার দিকে অফিসে যাওয়ার আগে আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। হাসিনা ইতোপূর্বেই শিশু জয়কে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলো। বাসার দোতালায় পৌঁছে হাসিনার মত বয়সী একজন সুন্দরী ভদ্র মহিলাকে আমার শাশুড়ীসহ সেখানে উপস্থিত সকল মহিলার কপালে টিপ লাগাতে দেখলাম। হাসিনা আমাকে ঐ মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বলে যে, তাঁর বাড়ী ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশে। তিনি লন্ডনে লেখাপড়ার সঙ্গে ছোটখাটো চাকুরী করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অনেক সংগঠনের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্যে কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন। হাসিনা আরও বলে যে, তিনি একটু পরেই সেখান থেকে তৎকালীন বাংলাদেশ বেতার (রেডিও) ভবনে যাবেন। যেহেতু আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিসে বেতার ভবনের পাশ দিয়েই যেতে হয়, সুতরাং আমার গাড়ীতে যাওয়ার জন্যে হাসিনা ঐ ভদ্র মহিলাকে পরামর্শ দেয়। যা হোক, সেদিন অফিসে যাওয়ার সময় আমি ঐ মহিলাকে ঢাকা বেতার (রেডিও) অফিসে পৌঁছে দেই। পথে ঐ মহিলা আমাকে আরও অনেক কাহিনী বলেছিলেন। এরপর ঐ মহিলাটির সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হয় নি।

৩৭। ঐ দিন রাতে হাসিনা আমাকে জানায় যে, কর্নেল (ঐ সময়ের পদমর্যাদা) জিয়াউর রহমান সাহেবের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পারিবারিক কিছু সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে ইতোপূর্বে বেশ কয়েকদিন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসেছিলেন। হাসিনা আমাকে আরও জানায় যে, ১৯৭১-এর মে মাসে বেগম খালেদা জিয়াকে জিয়াউর রহমান সাহেব লোক মারফত চিঠি লিখে ভারতে তাঁর (জিয়া সাহেবের) নিকট চলে যাওয়ার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও খালেদা জিয়া ভারতে যাননি বলে জিয়া সাহেব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯৭১-এর জুলাই মাসে বেগম খালেদা জিয়া তাঁর দুই সন্তানসহ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার খবর শুনে জিয়া সাহেব শুধু দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তই হননি, মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। এসব ঘটনার কারণে ঐ সময়ে কর্নেল জিয়াউর রহমান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। হাসিনা আমাকে আরও জানায় যে, এই পারিবারিক মনোমালিন্যের সমস্যা নিরসনে সাহায্য করার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে ঐ সময় অনেক অনুরোধ করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। খুশীর বিষয় যে, এর অল্প কিছুকাল পর বেগম জিয়ার পারিবারিক সমস্যার অবসান হয়েছিল।

৩৮। ৯ই মে সারদার পুলিশ বাহিনীর এক শিক্ষা সমাপনী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু জনগণের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য ও কর্মকর্তার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। ১০ই মে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ১১ই মে মেক্সিকো এবং ১২ই মে আরও তিনটি দেশের

সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৪ই মে ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্বরতার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের ডাকে ঢাকায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় "ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী হামলা বন্ধ কর" বলে উচ্চকিত শ্লোগান দেয়া হয়। ১৭ই মে বঙ্গবন্ধুর সরকার ভোগ্যপণ্যের বিদ্যমান গগনচুম্বী মূল্য হ্রাস করার লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৮ই মে বিদ্যমান ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় দোষত্রুটি বিলোপ করে স্বাধীন বাংলাদেশের উপযোগী একটি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদানের জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিশিষ্ট ও প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৯শে মে বিভিন্ন জটিলতা অতিক্রম করে অবশেষে পূর্বগঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে গণহত্যা, লুণ্ঠন, জনগণের বাড়ীঘর ও কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ এবং নারী ধর্ষণে সহায়তা করার অপরাধে অভিযুক্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ বাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বিচার শুরু হয়।

৩৯। ২১শে মে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৪শে মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনা হয়। বাংলা সাহিত্যে, বৃটিশ শাসন অবসানের রাজনৈতিক আন্দোলনে, দুর্বল শ্রেণীর ওপর শাসক ও শোষক শ্রেণীর সকল নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে সকল সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষকে সচেতন ও উজ্জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে কবির অবিস্মরণীয় লেখনীর জন্যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গবন্ধুর সরকার চিরস্থায়ীভাবে কবিকে দান করে ধানমন্ডির (পুরাতন) ২৮ নম্বর (নতুন ১৫ নম্বর) রোডস্থ একটি দোতলা বাড়ী। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে কবিকে দেখতে যান। ঐ সময় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সুদীর্ঘকাল পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন ও বাকশক্তিহীন কবির বড় বড় দুচোখ থেকে তখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিদ্রোহের বাণী। ২৫শে মে বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবির উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মত তাঁর জন্মদিন পালিত হয়।

৪০। এদিকে আরও অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৫শে মে আর্জেন্টিনা, ২৬শে মে হাইতি, ১লা জুন চিলি এবং ৬ই জুন ইকুয়েডোরের সরকারগুলো বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৭ই জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার পাট রফতানী কর্পোরেশন গঠনে একটি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে। ২১শে জুন জাম্বিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করে। ২২শে জুন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ২৮শে জুন রুমানিয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৯শে জুন যোগাযোগ মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গণপরিষদে রেল-

বাজেট পেশ করেন। ৩০শে জুন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ গণপরিষদে পেশ করেন জাতীয় বার্ষিক বাজেট।

৪১। ইত্যবসরে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ১লা জুলাই আকস্মিকভাবে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর ১৭/১৮ বৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠ কন্যা বেনজীর ভুট্টোকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সিমলায় আগমন করেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর প্রথমে ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে বৈঠক হয় অন্য কোন উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা ছাড়াই। এরপর উভয় সরকারের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের উপস্থিতিতে ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীর আরও কয়েক দফা আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে অতীতের সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকল্প ব্যক্ত করে ভুট্টো ও ইন্দিরা গান্ধী একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই চুক্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডে দুই দেশের মধ্যে ১৯৭১-এর ১৭ই ডিসেম্বরে যুদ্ধবিরতির সময়ে প্রকৃত নিয়ন্ত্রিত সীমানা মেনে নেয়া এবং পারস্পরিক মতবিরোধ ও এই চুক্তির আইনগত ব্যাখ্যার পার্থক্য সত্ত্বেও উক্ত নিয়ন্ত্রিত সীমানা লঙ্ঘনে ভীতি প্রদর্শন কিংবা শক্তি প্রয়োগের যে কোনো ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক আটক ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয় এই সিমলা চুক্তিতে। এর অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু বললেন, "বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।" কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বললেন, "পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার কোন অধিকার বাংলাদেশের নেই। কারণ পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে।" জবাবে ভারতের পক্ষ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা হয়, "প্রকৃত সত্য এই যে, পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর কাছে। আর সে কারণেই যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নে যে কোন সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের মতৈক্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে।"

৪২। ৩রা জুলাই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ লাভ করে। ১২ই জুলাই তাঞ্জানিয়া এবং ২১শে জুলাই মাল্টার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের যুব নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ চলছিল। এক গ্রুপ ছিল গণতান্ত্রিক পথ ও পন্থায় দেশে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করায় বিশ্বাসী, আর অন্য গ্রুপ ছিল বৈপ্লবিক পথ ও পন্থায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ। ভবিষ্যতে দলের নেতৃত্ব দখল করার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাও ছিল আওয়ামী লীগের যুব নেতাদের মধ্যে কোন্দলের আর একটি কারণ। অতঃপর এসবের ফলশ্রুতিতে ছাত্র লীগের নেতা ও কর্মীরা দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকে এবং অবশেষে ২১শে জুলাই আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে এবং নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনের নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র লীগের দুটো পৃথক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নূরে আলম সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন ছাত্র লীগের অংশের সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

৪৩। ১৯৭১-এর ৩রা ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরে অবস্থানরত পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক প্রায় সমস্ত জাহাজ ও নৌযান বিধ্বস্ত হয়ে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের ঐ সময় একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর অচল ও সম্পূর্ণ অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে খাদ্য, কল-কারখানার যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আনার জন্যে চট্টগ্রাম বন্দরটিকে জরুরী ভিত্তিতে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। উক্ত কাজে কোন বিদেশী কোম্পানীকে নিয়োগ করার জন্যে সরকারের অর্থভাণ্ডারে তখন প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে (তৎকালীন) সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকার নিজ খরচে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্যে একটি বিশেষ টীম পাঠায়। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই নিমজ্জিত সকল জাহাজ ও নৌযান সরিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরটিকে মুক্ত করতে সমর্থ হয় সোভিয়েট সরকার কর্তৃক পাঠানো বিশেষ নাবিক দল। অতঃপর ২২শে জুলাই চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারোপযোগী ঘোষণা করা হয়।

৪৪। ২২শে জুলাই রাতে বঙ্গবন্ধু তলপেটের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২৩শে জুলাই জানা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর গলব্লাডারে পাথর সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক এবং IPGMR-এর পরিচালক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম জানান যে, বঙ্গবন্ধুর গলব্লাডারের ক্ষত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁকে বাঁচানোর জন্যে অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া কোন বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে ঝুঁকি নিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। বঙ্গবন্ধু অবশ্য দেশেই তাঁর অস্ত্রোপচার করার জন্যে অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাপ দিয়েছিলেন। অবশেষে, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গবন্ধু অস্ত্রোপচারের জন্যে লন্ডনে যেতে সম্মত হন। চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে অতঃপর ২৬শে জুলাই বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন যাত্রা করেন। ২৮শে জুলাই লন্ডনের হারলী স্ট্রীটস্থ একটি

ক্লিনিকে বঙ্গবন্ধুকে ভর্তি করানো হয়। ২৯শে জুলাই বঙ্গবন্ধুর তলপেটে অস্ত্রোপচার করে পাথরে ক্ষত গলব্লাডার অপসারণ করা হয়। ৩০শে জুলাই একটি সরকারী ইশতেহারে জানানো হয় যে, অস্ত্রোপচার সাফল্যজনক হওয়ায় বঙ্গবন্ধু ঝুঁকিমুক্ত হয়েছেন।

৪৫। ঐ সময় বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। ৪ঠা আগস্ট বাংলাদেশ সরকার ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ১২ লক্ষ একর পতিত জমি বিনামূল্যে বন্দোবস্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৫ই আগস্ট বলিভিয়ার সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৮ই আগস্ট বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল বীমা কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করে এক অধ্যাদেশ জারি করে। একই তারিখে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে সদস্যপদের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্র পেশ করে। ৯ই আগস্ট দালাল আইনের সংশোধনের প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। ১০ই আগস্ট তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

৪৬। এদিকে ১৩ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ক্লিনিক ত্যাগ করে লন্ডনের একটি হোটেলে গিয়ে ওঠেন। কিন্তু সেখানে দলে দলে বাঙ্গালী শুভাকাঙ্ক্ষী দর্শনার্থীদের উপস্থিতির চাপে বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকগণ বঙ্গবন্ধুকে লন্ডন ছেড়ে ইউরোপের অন্য কোন দেশের স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার জোর পরামর্শ দেন। অতঃপর ২১শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক অধ্যাপক নূরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চলে যান। স্বাস্থ্যকর নিরিবিলি স্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের দূতাবাস থাকার কারণে বঙ্গবন্ধু জেনেভা যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৪৭। এদিকে ২১শে আগস্ট বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যপদ প্রদানের বিষয়টি আলোচনা করার জন্যে নিরাপত্তা পরিষদে পুনরায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবারও চীনের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবে আগের মতই বিরোধিতা করেন। এদিকে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২৩শে আগস্ট তারিখে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুষ্কৃতকারীরা হাতবোমা নিক্ষেপ করে। এতে কেউ হতাহত না হলেও উক্ত বোমার বিস্ফোরণে অফিসটির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২৪শে আগস্ট পানামা এবং উরুগুয়ের সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৫শে আগস্ট তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের পুনরায় বৈঠক বসে। নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পাস হয়,

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে চীন এতে ভেটো প্রদান করে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘে সদস্যপ্রাপ্তির পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রথম ভেটো প্রদান করে। চীনের এই ভেটো প্রয়োগের প্রতিবাদে বাংলাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

৪৮। ২৯শে আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই সংশোধিত আইনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ বছর সাজার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিমধ্যে আউস মৌসুমে অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানি এবং মুক্তিযুদ্ধে বিপর্যস্ত পরিবহনে খাদ্য সরবরাহ বিলম্বিত হওয়ার ফলে সারাদেশে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ৩০শে আগস্ট তারিখে দেশে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্যে মন্ত্রী পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাসানীর আহবানে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় কিছু কিছু ভুখা মিছিল প্রদর্শিত হয় এবং পরে পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসমাবেশে মাওলানা ভাসানী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

৪৯। এদিকে ১০ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের আহবানে বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভেটো প্রদানের প্রতিবাদে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল গণসমাবেশ হয়। উক্ত গণসমাবেশে NAP (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টিসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা চীনের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানের তীব্র নিন্দা করে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১২ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকার দেশের ৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকার উপর রাষ্ট্রবিরোধীমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে শো-কজ নোটিশ জারি করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক আয়োজিত সর্বদলীয় জনসভায় হাতবোমা নিক্ষেপে ২০ ব্যক্তি আহত হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্যোদ্ধারে ৪৮ দিন বিদেশ থাকার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তেজগাঁও বিমান বন্দরে এক সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভেটো প্রদানের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখজনক আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "অতীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরের পর বছর ধরে ভেটো দিয়েছিল জাতিসংঘে গণচীনের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে। আমরা তখন বলেছিলাম যে গণচীনকে বাদ দিয়ে জাতিসংঘ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। আজ সেই গণচীন ভেটো দিয়েছে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে। গণচীন জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়েছে, নিশ্চয়ই বাংলাদেশও একদিন পাবে।"

৫০। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সরকার ১৯৭৩-এর মার্চ মাসে সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু গণভবনে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সম্মেলনে ভাষণ দেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর এক সরকারী আদেশে দুর্নীতির দায়ে আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল সংস্থার চেয়ারম্যানসহ ৪ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। ২১শে সেপ্টেম্বর

তারিখে সরকার দুর্নীতির দায়ে জাতীয়করণকৃত বাওয়ানী মিলের জেনারেল ম্যানেজার এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ঢাকা উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু আরও ১৯ জন এম.সি. একে আওয়ামী লীগ হতে বহিষ্কৃত করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভ্যাটিকান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই তারিখে সরকার এক আদেশে বাংলাদেশ বিমানের প্রশাসককে দুর্নীতির দায়ে সাসপেন্ড করে। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নাগরিকদের পবিত্র মক্কা শরীফে হজব্রত পালনের সুযোগ প্রদান করার অনুরোধ জানিয়ে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক আদেশে সরকার দুর্নীতির দায়ে আধা-সরকারী সংস্থা ওয়াসা (WASA)-এর চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করে। একই তারিখে সরকার রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা "হককথা", "মুখপত্র" এবং "স্পোকসম্যান"-এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়। এই দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে ভাষণদানকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনগণের সেবা করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনে যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুশৃংখল বাহিনীরূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

৫১। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশে খাদ্য-বস্ত্রসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর দুস্প্রাপ্যতার কারণে জনমনে অস্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। মাত্র ছয় মাস আগে নয় মাসের যুদ্ধে এবং পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সামরিক জান্তার সুপরিকল্পিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছিল সর্বপ্রকারে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল চরমভাবে। ১৯৭২ সালে অনাবৃষ্টি এবং বিধ্বস্ত শিল্প কলকারখানাগুলোকে পুনরায় সক্রিয় ও উৎপাদনযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা এবং শিল্প উৎপাদন কার্যক্রম নানা কারণে পদে পদে বিঘ্নিত হওয়ার ফলে দেশে এ সময় খাদ্য-বস্ত্রসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর অপ্রতুলতা দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল না। খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের সাময়িক ঘাটতি মেটানোর ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সরকার যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েও ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক যে দেশী-বিদেশী চক্রান্ত, একশ্রেণীর মজুতদার, মুনাফাখোর, অসাধু চোরাচালানী গোষ্ঠীর কারসাজি এবং পাকিস্তানপন্থী আমলা ও অন্যান্য শ্রেণী-গোষ্ঠীর অসহযোগিতার কারণে সরকারের এতদবিষয়ে গৃহীত পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও ব্যবস্থা নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে খাদ্যবস্ত্রসহ অন্যান্য সব দ্রব্যসামগ্রী হয়ে পড়ে দুস্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য যার ভোগান্তি পোহাতে হয় স্বল্প ও সীমিত আয়ের এবং গ্রামের সাধারণ জনগণকে। এতদ্ব্যতীত

পাকিস্তানী দালালদের অন্তর্ঘাত ও ধ্বংসাত্মকমূলক কার্যকলাপে দেশে ক্রমান্বয়ে অবনতি হতে থাকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এবং জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার। এসব কিছুর ফলে জনসমাজে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে অস্বস্তি, অসন্তোষ ও অস্থিরতা। দেশের এহেন পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তোলে মাওবাদী উগ্রপন্থী প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ও গুপ্ত সংগঠনগুলোর প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ। এ সময়ে মাওলানা ভাসানীর অসহযোগ ও সরকার বিরোধী উক্তি, বক্তব্য ও ভূমিকা মাওবাদী উগ্র বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও গুপ্ত সংগঠন এবং পাকিস্তানপন্থী দালাল ও সংগঠনগুলোর উপরোক্ত কার্যকলাপ পরিচালনার সাহস ও শক্তি সঞ্চারে সহায়ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। গণচীনের অনুসারী সিরাজ শিকদারের পূর্ববাংলা সর্বাহারা পার্টি "স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশ ভারতের পদানত" বলে উল্লেখ করে, "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা" কায়েমের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। হক, তোহা, মতিন, আলাউদ্দিন, দেবেন শিকদার, শান্তি সেন, অমল সেন প্রমুখের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন গণচীনমুখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলও একইভাবে ভারত ও সোভিয়েট বিরোধী শ্লোগান দেয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের সংকল্প নিয়ে গোপন রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। এদের অধিকাংশই হিংসাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির পথ বেছে নেয় এবং সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এই প্রস্তুতিরই অংশ হিসেবে তাঁরা শুরু করেন (তাঁদের ভাষায়) "জাতীয় দুশমন" খতমের অভিযান। মাওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে "নতুন পতাকা ওড়াবার" হুমকি দেন।

৫২। 'হক কথা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে মাওলানা ভাসানী একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সরকার এবং ভারত ও (তৎকালীন) সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বল্গাহীন প্রচারণা চালাতে লাগলেন। মাওলানা ভাসানীর বঙ্গবন্ধুর সরকার বিরোধী এরূপ উক্তি, বক্তব্য ও ভূমিকা লক্ষ্য করে একদিন আমি শাশুড়ীকে বললাম, "১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মাওলানা ভাসানীকে বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ঐ উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত করায় সম্ভবতঃ মাওলানা ভাসানী মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।" শাশুড়ী বললেন, "অতীতেও দেখেছি যে, তাঁর সেবা ও এটাসেটার প্রয়োজন মেটাতে শেখ সাহেব একটুও গাফলতি বা অবহেলা করলে মাওলানা ভাসানী এরূপ আচরণ করতেন। তোমার শ্বশুর একবার 'হুজুর' বলে ভাসানী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" উল্লেখ্য, এনায়েতউল্লাহ খানের সাপ্তাহিক 'হলিডে' মাওলানা ভাসানীর "হক কথা"-এর অনুরূপ প্রচারণার সামিল হয়।

৫৩। অপরদিকে পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ ও পি.ডি.পি. ইত্যাদি দলের নেতারা গোপনে পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে 'মুসলিম বাংলা' কায়েমের গোপন তৎপরতায় লিপ্ত হয়। তখন লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সংগ্রাম' পত্রিকা "মুসলিম বাংলা" আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার চালাতে থাকে।

ডাকযোগে এই পত্রিকা প্রচুর সংখ্যায় বাংলাদেশে প্রেরিত হতে থাকে। মাওলানা ভাসানীও চরম সাম্প্রদায়িক এসব অশুভ শক্তির গোপন তৎপরতার প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে বললেন, "মুসলিম বাংলার জন্যে যারা কাজ করছে, তাদের আমি দোয়া করি। আল্লাহ্‌র রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।" অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মাওলানা ভাসানী যিনি জীবনে দীর্ঘকাল প্রগতিশীল রাজনীতির কথা বলেছেন, নির্যাতন ভোগ করেছেন, জীবন সায়াহ্নে তিনি নিজেকে একাধারে বামপন্থী উগ্রপন্থীদের স্বঘোষিত অভিভাবক এবং চরম দক্ষিণ পন্থীদের বিশ্বস্ত মুখপাত্রে পরিণত করলেন।

৫৪। ১লা অক্টোবর তারিখ হতে বঙ্গবন্ধুর সরকার সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে। ৫ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে চোরাচালান রোধ করার জন্যে সীমান্তে নৌ ও সেনাবাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন। ৬ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর সরকার চোরাচালান রোধ করার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাসমূহকে সেনাবাহিনীর অধীনে ন্যস্ত করে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ–ভারত সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির কার্যকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

৫৫। ১০ই অক্টোবর তারিখে ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে বিশ্বশান্তি পরিষদ এক ইশতাহারে বঙ্গবন্ধুকে নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের অধিকার আদায়, আর্থ–সামাজিক মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনে তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অত্যন্ত অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিও কুরী' পদক পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু আনন্দের সঙ্গে উক্ত পুরস্কার গ্রহণে তাঁর সম্মতি এবং এই সম্মান প্রদানের জন্যে ধন্যবাদ ব্যক্ত করে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী রমেশ চন্দ্রের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। ১২ই অক্টোবর তারিখে ডঃ কামাল হোসেন স্বাধীন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদের সুচিন্তিত বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্যে গণপরিষদে পেশ করেন। ১৪ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করার জন্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন। ১৫ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করার জন্যে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রধানের নিকটও একটি জরুরী তারবার্তা পাঠান। ১৭ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের পদ লাভ করে। ১৯শে অক্টোবর তারিখে গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধানের উপর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। ১৯শে অক্টোবর বাংলাদেশ ইউনেস্কো (UNESCO)-এর সদস্যপদ লাভ করে। এদিনই বিকেলে বঙ্গবন্ধু দুইজন পাকিস্তানী সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দান করেন। ২৩শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর আবেদনের জবাবে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৫শে অক্টোবর পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি

স্যার রবার্ট জ্যাকসন পাকিস্তানের ইসলামাবাদে পৌঁছান। ৩১শে অক্টোবর তারিখ মেজর (অবঃ) জলিলকে সভাপতি এবং আ.স.ম. আব্দুর রবকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে গঠন করা হয় 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' (জাসদ)। "বিপ্লবকে পরিপূর্ণতা প্রদান" এবং দেশে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" কায়েম করা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ, যদিও সিরাজুল আলম খান তখন গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কোন কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেননি, তবে একথা কারও অজানা ছিল না যে, তিনিই ছিলেন ঐ দলের প্রকৃত কর্ণধার ও আদর্শিক গুরু।

৫৬। 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' গঠনের প্রায় মাস দেড়েক আগের ঘটনা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি একদিন সকাল এগারোটার দিকে আমি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অফিস (পুরাতন) গণভবনের (বর্তমান 'সুগন্ধা') নীচতলায় প্রধানমন্ত্রীর সচিব রফিকউল্লাহ চৌধুরীর অফিসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ও আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে উপর তলায় কমিটি কক্ষে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। এই সময় সিরাজুল আলম খান কিছুটা উত্তেজিত অবস্থায় রফিকউল্লাহ চৌধুরীর অফিসকক্ষে প্রবেশ করে। উত্তেজিত অবস্থায় সিরাজুল আলম খান বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত রাজনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তক্ষুণি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার জন্যে রফিকউল্লাহ চৌধুরীকে অনুরোধ করে। অনুমতি পাওয়ার পর সিরাজুল আলম খান উপরের কমিটি কক্ষে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়। মিনিট বিশেক পর উত্তেজিত অবস্থায়ই পুনরায় রফিকউল্লাহ চৌধুরীর অফিস কক্ষে ফিরে এসে বলে, "বঙ্গবন্ধুকে আজ সেখানে উপস্থিত সকলের সামনে সবকিছু বিস্তারিতভাবে অবহিত করলাম। সময় বেশী নাই। এখন সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্ভর করছে।" তার উত্তেজিত হওয়ার কারণ জানার জন্যে আমি তাঁকে অফিসের বারান্দায় বঙ্গবন্ধুর বসার স্থানে নিয়ে যাই। তার উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে আমাকে বলে, "ওয়াজেদ, তুই বিজ্ঞানী, বিষয়টা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবি।" অতঃপর চার চেয়ারের মাঝখানের একপায়া বিশিষ্ট গোল টেবিলটির উদাহরণ দিয়ে সে আমাকে আরও বলে, "ওয়াজেদ, তুই বল, এই টেবিলটি চার পায়া বিশিষ্ট হলে এর চেয়ে অধিকতর স্থিতিশীল হতো কিনা?" জবাবে আমি বললাম, "যে কোন টেবিল বা আসনের চার পায়া থাকলে নিশ্চয়ই এক পায়াবিশিষ্ট টেবিল বা আসনের চেয়ে বেশী স্থিতিশীল ও অটল থাকে। আর যে কোন টেবিল বা আসনের পুরো নীচ অংশ জুড়ে পায়া সংযুক্ত রাখলে সবচেয়ে বেশী স্থিতিশীল ও অটল থাকে।" অতঃপর আমি ওকে আরও বললাম, "সিরাজ, এই টেবিলের উদাহারণ দিয়ে তুই এটা বুঝাতে চাচ্ছিস যে বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চার মূলনীতির মধ্যে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের নীতিকেই বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন।" সিরাজুল আলম খান তখন বলে, "তুই ঠিকই বুঝেছিস। বঙ্গবন্ধু এখন একপায়া বিশিষ্ট টেবিলের অবস্থায় রয়েছেন।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু এক্ষুণি এবিষয়ে সংশোধনমূলক কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁর জন্যে তিনিই দায়ী হবেন বলে আমি আজ তাকে পরিষ্কার বলে দিলাম।" তখন আমি তাকে বললাম, "তোমাদের আরও একটু ধৈর্য্য রাখা সমীচীন হবে।" অতঃপর আমার সঙ্গে পুনরায় আলাপ না করা পর্যন্ত তারা যেন যে কোন অবাঞ্ছিত বা হঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করি। "আচ্ছা, পরে তোর সঙ্গে এ বিষয়ে আবার আলাপ করা হবে"—এই বলে তখন সিরাজুল আলম খান আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। উল্লেখ্য, এরপর প্রায় দেড়বছর সিরাজুল আলম খান কিংবা তার অনুসারীদের কারও সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কিংবা আলাপ হয়নি।

৫৭। ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদিত এবং তা ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই বঙ্গবন্ধুর সরকার ঘোষণা দেয় যে, ১৯৭৩ সনের ৭ই মার্চ গণপরিষদে অনুমোদিত সংবিধানের বিধান অনুসারে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গণপরিষদে অনুমোদিত সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে চারটি রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শ ও নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সাধারণ জনগণ কর্তৃক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক সরকারের ব্যবস্থা রাখা হয়। উক্ত সংবিধানে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে বিচার বিভাগের সার্বভৌমত্ব, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সমান সুযোগ-সুবিধা, ধর্ম-বিশ্বাস, চিন্তা ও বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশ সংগঠনের অধিকারের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকারও লিপিবদ্ধ করা হয় উক্ত সংবিধানে। "সামর্থ অনুযায়ী কাজ এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক" এই নীতির ভিত্তিতে সকলের জন্যে কর্মসংস্থানের বিধানও উক্ত সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। সমতা, জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং জাতিসংঘের সনদকে গ্রহণ করা হয় বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে। "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সংগে বৈরীতা নয়" এই নীতিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয় উক্ত সংবিধানে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী তরুণ সমাজের ভোটাধিকার প্রদান এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত তরুণ সমাজের আপোষহীন সংগ্রামের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি হিসেবে ভোটাধিকারের বয়ঃসীমা ২১ বছর থেকে ১৮ বছরে হ্রাস করা হয় উক্ত সংবিধানে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান সন্নিবেশিত করে। মোট কথা, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বিক ন্যায় বিচার এবং শোষণহীন

ও কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার সকল বিধিবিধান ও সুযোগ রাখা হয়েছিল উক্ত সংবিধানে। এতে ঘটেছিল বাংলাদেশের আপামর জনগণের দীর্ঘকাল যাবত লালিত স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এর জন্যে দেশের আপামর জনগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতি জানিয়েছিল তাদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম মোবারকবাদ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

৫৮। ইতিপূর্বে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদেশী উন্নত দেশগুলোসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছিল। ৫ই নভেম্বর তারিখে জাপান সরকার যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রস্তাব দেয়। ৬ই নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ কলম্বো পরিকল্পনা সাহায্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ১১ই নভেম্বর শেখ ফজলুল হক মণিকে সভাপতি এবং নূরে আলম সিদ্দিকীকে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গঠন করা হয়। ১৪ই নভেম্বর পাকিস্তানে আটক তবলিগ জামাতের ৮০ জন বাঙালীকে ঢাকায় তবলিক জামাতে যোগদান করার জন্যে মুক্তি দেয়া হয়। ১৫ই নভেম্বর খুলনা জেলার দৌলতপুরে ২৯টি পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০ কোটি টাকার পাট সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়।

৫৯। ১৮ই নভেম্বর তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়ে ২৩টি দেশ যৌথভাবে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাব পেশ করে। ২০শে নভেম্বর তারিখে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে গণহত্যা ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ১৯৭১ সালে নিয়োজিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ডাঃ এ. এম. মালিককে দালাল আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। ২৩শে নভেম্বর তারিখে রাশিয়ার মস্কোস্থ লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মানসূচক 'পেট্রিস লুমুম্বা' পদক পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালে ভারতীয় পশ্চিম ফ্রন্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আটকপ্রাপ্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্ধীদের বিনা শর্তে মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৩০শে নভেম্বর তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ দানের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিভাবে অনুমোদিত হয়।

৬০। ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আটককৃত সৈন্যদের সমসংখ্যক পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালীদের বিচারের হুমকি প্রদান করেন। ৬ই ডিসেম্বর তারিখ জাতীয় রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় দলের শিক্ষা সমাপণী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী জওয়ানদের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও

সততার সঙ্গে জনগণ তথা জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।

৬১। ৯ই ডিসেম্বর সকাল এগারোটায় ডাঃ ওয়াদুদ ও ডাঃ মিসেস সুফিয়া ওয়াদুদের তত্বাবধানে ধানমণ্ডির ২/এ, রোডস্থ তাঁদের ক্লিনিকে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান (মেয়ে) ভূমিষ্ঠ হয়। ডাঃ ওয়াদুদ এই সুসংবাদ প্রথম বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন। এই সুসংবাদের খুশীতে বঙ্গবন্ধু তৎক্ষণাৎ উক্ত ক্লিনিকে গিয়ে হাসিনাকে ও সদ্য ভূমিষ্ঠ তাঁর নাতনীকে মোবারকবাদ ও দোয়া করেন। আমি তখন অফিসে ছিলাম। এর একটু পরেই ঐ সংবাদ পেয়ে আমি হাসিনা ও সন্তানকে দেখতে যাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগে থেকেই শাশুড়ী ও বঙ্গবন্ধুর সব ছোট বোন লিলি ফুফু আম্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পন্ন হওয়ায় আমরা সবাই আল্লাহ-তায়ালার নিকট আমাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। এর দু'দিন পর হাসিনাকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-এর যুদ্ধ চলাকালে আমাদের প্রথম সন্তানের (ছেলের) জন্মের সময় ডাঃ ওয়াদুদ যেমন তাঁর ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ কোন টাকা-পয়সা নেননি, এবারও তিনি ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ কোন টাকা-পয়সা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

৬২। ১৪ই ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনের স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র দুই দিন। উক্ত সময়কালে গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ ৪ঠা নভেম্বর তারিখে অনুমোদিত সংবিধানের কপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেন। এরপর ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ মধ্যরাতের পর থেকে গণপরিষদ ও গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই জাতিকে একটি সংবিধান প্রদান করে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭২) তারিখ থেকে দেশে সংবিধান-সম্মত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় বঙ্গবন্ধু দেশ ও বিদেশের জনগণ ও নেতাদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও গভীর আস্থা অর্জন করেছিলেন।

৬৩। ১৬ই ডিসেম্বর অনেক আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয় জাতীয় বিজয় দিবস। উক্ত দিবস অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু উক্ত জনসভায় ভাষণ দেন। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গভবনে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধু সংবিধান মোতাবেক পুনরায় শপথ গ্রহণ করেন। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু সুপ্রীম কোর্ট ভবন উদ্বোধন করেন। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু ঢাকার মীরপুরে ১৯৭১-এ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে খুলনায় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের নেতা অধ্যাপক আবু সুফিয়ানসহ দু'জন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। উক্ত ঘটনায় বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বেদনা ও মর্মাহত হন। এহেন রক্তাক্ত ঘটনার মধ্যে দিয়েই সমাপ্ত হয় ১৯৭২ সাল।

১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী "কাদেরিয়া বাহিনীর" টাঙ্গাইলে আয়োজিত অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে।
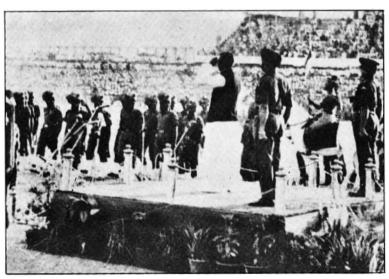
১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার অনুষ্ঠানে ভারতীয় বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এলে তাঁর সঙ্গে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুঃ বাম দিক থেকে সামনের সারিতে রাসেলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী, রেহানা, জয়কে নিয়ে হাসিনা ও বেগম নাসের এবং পেছনের সারিতে শেখ জামাল, শেখ কামাল, শেখ নাসেরের জেষ্ঠ্যা কন্যা মীনা ও লেখক।

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদী "মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি" চুক্তিতে স্বাক্ষরদানরত ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু।
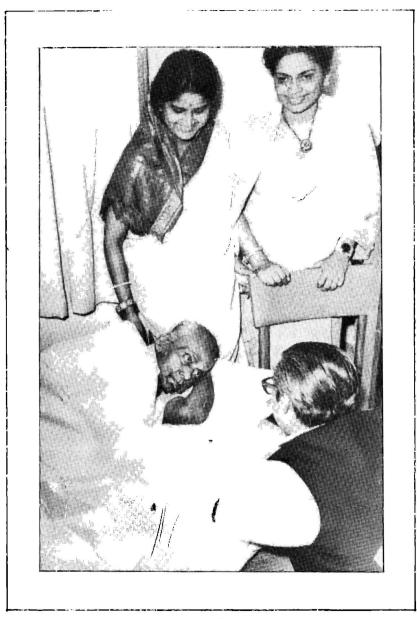
১৯৭২ সালের ২৪শে মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনার পর কবির শয্যাপাশে বঙ্গবন্ধু।

১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষরদানরত বঙ্গবন্ধু।
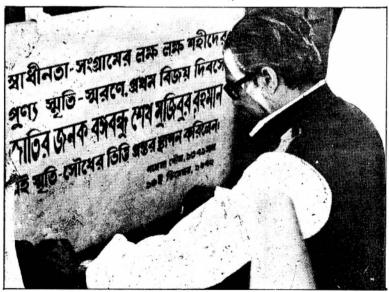
১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে দেশের মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে সাভারে "জাতীয় স্মৃতিসৌধের" ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনরত বঙ্গবন্ধু।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
১৯৭৩ সাল

১। ১৯৭৩-এ বছর শুরু হয় এক দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১লা জানুয়ারী তারিখে ন্যাপ (মোজাফফর)-এর আহ্বানে তৎকালীন উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতম বিমান হামলার প্রতিবাদে ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় বের হয় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল। এরূপ একটি ছাত্র মিছিল ঢাকার তোপখানা রোডস্থ মার্কিন তথ্য কেন্দ্র (USIS)-এর নিকট এলে সেখানে মোতায়েনরত পুলিশ বাধা দেয়। অতঃপর ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। ফলে ২ জন নিহত ও ৬ জন আহত হয়। আমি এ সময় সচিবালয়ের প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন বিভাগের যুগ্মসচিব, বঙ্গবন্ধুর ছোট বোনজামাই এ.টি.এম. সৈয়দ হোসেন সাহেবের কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর অফিস ছিলো ঐ বিল্ডিংয়ের একই তলায়। গোলাগুলির আওয়াজ শুনে সৈয়দ হোসেন সাহেবসহ অফিসের সকলে বিচলিত হন। গোলাগুলির এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর অফিস কক্ষ হতে বারান্দায় চলে এসে সেখানে উপস্থিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এবিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। গোলাগুলির ঘটনা বঙ্গবন্ধুর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল বলে মনে হলো এবং তখন তাঁকে অত্যন্ত মর্মাহত দেখাচ্ছিল।

২। ৮ই জানুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রথম শিল্প বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করা হয়। অনধিক ২৫ লাখ টাকা মূল্যের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত না করার অঙ্গীকার করা হয় উক্ত বিনিয়োগ নীতিতে। ঐ দিনই বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর প্রথম শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু বিডিআর-এর জোওয়ানদের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বিডিআর-এর সদস্যদের ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কর্তৃক তাঁদের ওপর আক্রমণকালে এবং মুক্তিযুদ্ধ

চলাকালে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং স্বাধীন দেশে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্যে তাঁদের প্রতি আহবান জানান।

৩। ২১শে জানুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু দল, গ্রুপ ও রাজনৈতিক মত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে নিষ্ঠা, সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নে ও দেশ গড়ার কাজে তাঁর হাতকে শক্ত করার জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা কামনা করেন। এদিকে একই দিনে পল্টনে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় মাওলানা ভাসানী বললেন, "বাংলাদেশকে আমি ভিয়েতনামে পরিণত করে ছাড়বো।" বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানী বললেন, "মুজিব তুমি আমার সঙ্গে পিকিং চলো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গণচীনের স্বীকৃতি এনে দেবো। আমেরিকায় চলো, যত সাহায্য দরকার এনে দেবো। পাকিস্তান চলো, ৫ লাখ বাঙ্গালীকে মুক্ত করে আনবো।"

৪। ৭ই মার্চ (১৯৭৩) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২২শে জানুয়ারী তারিখে। ২৫শে জানুয়ারী তারিখে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী প্রতীক বন্টন করা হয়। ২৮শে জানুয়ারী তারিখে শ্রমিক অসন্তোষজনিত কারণে ৪টি বস্ত্রমিলে লকআউট ঘোষণা করা হয়। ৩১শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগের অংগদল শ্রমিক লীগের আহ্বানে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়।

৫। ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকারের একটি সরকারী আদেশে ১৬টি শিল্প ইউনিট 'সেনা কল্যাণ সংস্থার' নিকট হস্তান্তর করা হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে জাতীয় সংসদের ৯টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এর দু'টো আসনে বঙ্গবন্ধু প্রার্থী ছিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শনে যান এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ কুর্ট ওয়ালহেইম ২৪ ঘণ্টার সফরে ঢাকা আসেন। ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ঐদিনই বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙ্গালীদের) পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে জরুরী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে তাঁর প্রতি আবেদন জানান। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রদানের বিষয়েও বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যগণ কর্তৃক ঢাকায় বাঙ্গালীদের সশস্ত্র আক্রমণের সময়

বিধ্বস্ত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ মাওলানা ভাসানীকে টাঙ্গাইলস্থ সন্তোষ থেকে ঢাকার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ৫ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু পিজি হাসপাতালে অসুস্থ মাওলানা ভাসানীকে দেখতে যান এবং তাঁর কুশলাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ কিছু সময় কাটান।

৬। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনের দিনটি যতই এগিয়ে আসছিল ততই উত্তপ্ত হয়ে আসছিল দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭২) তারিখে সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কথাবার্তা শুরু হয়। ছোট- বড়-মাঝারি সকল দলেই সাজ সাজ রব। কিন্তু আওয়ামী লীগের মোকাবেলায় নিজেদের শক্তি সম্পর্কে কম-বেশী সচেতন ছিল মোটামুটি সকলেই। তাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছে থেকেই উঠলো সম্মিলিত বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব। আর তখনই প্রস্তাবিত ঐক্যফ্রন্ট গঠন এবং তার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে উগ্র বামপন্থী, ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ মাওলানা ভাসানীর প্রতি অনুরোধ জানায়। উল্লেখ্য, ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলো সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ থাকায় তাদের দলগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোন অবকাশ ছিল না। যা হোক, নির্বাচনকে সামনে রেখে বাজিমাতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অতীতের পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও শোষকদের মত তারাও ভারতবিরোধী প্রচারণা, ইসলামের দোহাই এবং সাম্প্রদায়িক জিগিরকেই বেছে নেয় আওয়ামী লীগকে খতম করার হাতিয়ার হিসেবে। এমনকি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর কণ্ঠেও ছিল একই সুর। আওয়ামী লীগকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এক ডজনেরও বেশী দল-উপদল গ্রুপ সমবায়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি'। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ ও মাওলানা ভাসানী নিজেও অনেক চেষ্টা করেন জাসদকে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে। কিন্তু একলা চলার নীতিতে বিশ্বাসী এবং এককভাবে নির্বাচনে অধিকতর সাফল্য অর্জনে আশাবাদী জাসদকে উক্ত সর্বদলীয় কমিটিতে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও, এদের সবার নির্বাচনী প্রচারের সুর ছিল একই। ব্যতিক্রম ছিল শুধু অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং কমরেড মণি সিং-এর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি। এই দু'টো দল নির্বাচনী অভিযানে নেমে যে বক্তব্য জাতির সামনে পেশ করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছাড়া তা মোটামুটি আওয়ামী লীগের বক্তব্যেরই অনুরূপ ছিল।

৭। নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু জনসংযোগ সফরে বের হন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর নির্বাচনী জনসভায় যে বিপুল জনসমাবেশ হয়, তাঁর সফর ও জনসভাকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রাণোচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয় তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরকার বিরোধী মহলগুলোর অপপ্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জনসংযোগ সফরের বিভিন্ন পর্যায়ের সভা-সমাবেশে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বললেন, "সত্তরের নির্বাচনে ৬ দফার পক্ষে ভোট চেয়েছিলাম। আপনারা ভোট দিয়েছিলেন আমার নৌকায়। পাকিস্তানীরা ৬ দফা মানেনি। আমিও আপোষ করিনি। আপনাদের সঙ্গে বেঈমানী করিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আজকের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশকে গড়ে তুলতে হবে। ষড়যন্ত্র চলছে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার। এই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হবে। মানুষের খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নাই। আমার এই দুঃখী মানুষদের বাঁচাতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি মূল রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে সোনার বাংলা কায়েম করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, স্বাধীন, শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশে স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার মাত্র। জনগণের শত্রুরা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে। ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত আর গুপ্ত হত্যার দ্বারা এরা দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। রাতে মানুষ ঘুমাতে পারে না। এদের অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করতে হবে। বন্দুকের নল নয়, বরং জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। শোষকের দিন শেষ হয়ে গেছে। শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যেই আমি সারা জীবন সংগ্রাম করেছি। আজ আমার একমাত্র কামনা, বাংলার দুঃখী মানুষ, বাংলার গরীব চাষী, শ্রমিক-মজুর ও অন্যান্য ছিন্নমূল মানুষ যেন মাথা গুঁজবার ঠাঁই পায়, পেট ভরে খেতে পায়, পরনের কাপড় পায়, রোগের চিকিৎসা পায়, সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করতে পারে। যদি আমার ওপর আস্থা থাকে, আমাকে ভোট দেবেন, আমার মার্কা নৌকা।"

৮। ১৯৭৩-এর সাধারণ নির্বাচনে সংসদের ৩০০ আসনে ১৪টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ৯৫৯ জন এবং ১২১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ১ হাজার ৮০ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৭ই মার্চ (১৯৭৩) তারিখে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯২টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান, সোহরাব হোসেন, জিল্লুর রহমান, শ্রী মনোরঞ্জন ধর ও তোফায়েল আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অপর ৮টি আসনে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাসদের আব্দুস সাত্তার এবং ৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগের এই বিপুল বিজয়ে বিরোধী দলগুলোর অনেক নেতা অভিযোগ করেছিলেন যে, নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক প্রার্থী হয়তো বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্বাচনের রায়কে নিজের পক্ষে এনেছেন। কিন্তু

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহার করে কিংবা রেডিও–টেলিভিশনে ঘোষণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থীকে নির্বাচনে জেতানো হয়েছে এবিষয়ে কোনই সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৯। ১৮ই মার্চ (১৯৭৩) তারিখে আওয়ামী লীগ 'শপথ দিবস" পালন করে। এই উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। ১৯শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার রেশনে সপ্তাহে মাথাপিছু তিন পোয়া চাউল ও সোয়া দুই সের গম বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৫শে মার্চ (১৯৭৩) তারিখে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ মূল্যবান ও অসাধারণ অবদান রাখার জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ৫৪৬ জনকে জাতীয় খেতাব প্রদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৮শে মার্চ লেবাননের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুসলিম আরব জাহানের লেবাননই দ্বিতীয় দেশ, যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৩০শে মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকাস্থ আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষা সেমিনার উদ্বোধন করেন।

১০। ১৮–২০শে মার্চ (১৯৭৩) তারিখে আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। ইতিপূর্বে শেখ ফজলুল হক মণি শেখ শহিদুল ইসলামকে ছাত্র লীগের সভাপতি হওয়ার জন্যে তাকে রাজি করাতে আমার শাশুড়ীর ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছিল। শেখ শহীদ তখন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল। শাশুড়ী কয়েকবার শেখ মণির প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, শেখ শহীদ এখন চাকুরী করায় আমার বোনের সংসারটা মোটামুটি চলে যাচ্ছে। শেখ শহীদ এই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ছাত্র লীগের সভাপতি হলে তারা পুনরায় অভাব অনটনের মধ্যে পড়বে।" যা হোক, পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শেখ শহীদ ছাত্র লীগের সভাপতির দায়িত্ব নিতে সম্মতি দেয়। অতঃপর ছাত্র লীগের উপরোল্লিখিত সম্মেলনে শেখ শহীদকে সর্বসম্মতিক্রমে ছাত্র লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১১। ৪ঠা এপ্রিল (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার 'বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতি' আদেশ জারি করে। ৫ই এপ্রিল তারিখে টংগী শিল্প এলাকায় দুই দল শ্রমিকের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে ঢাকা স্টেডিয়ামের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে টঙ্গী শিল্প এলাকার কয়েক হাজার শ্রমিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ৭ই এপ্রিল (১৯৭৩) তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১১ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা বিধান ও তাদের অতিসত্বর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করার পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন। ১২ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারের নতুন

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে দিল্লী যাত্রা করেন। ১৭ই এপ্রিল (১৯৭৩) তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের এক যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের ফেরত আনা, বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙ্গালীদের) পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো এবং পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ইস্যুগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার পক্ষে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক ৯৩ হাজার সদস্যদের থেকে মাত্র ১৯৫ জন কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের পাকিস্তানে আটক ৫ লাখ বাঙ্গালীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্যে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে নিঃশর্ত মুক্তিদানের ইঙ্গিতও দেয়া হয় উক্ত যুক্ত ঘোষণায়। ২১শে এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থপরিপন্থী কাজের অপরাধের জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ৩৯ জন জন্মগত বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করে।

১২। এই সময়ে ঘটা একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারত সরকারের আণবিক শক্তি ডিপার্টমেন্ট-এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন থেকে প্রকৌশলী জনাব এ.এস.এম. এনামুল হক, আণবিক চুল্লী বিশেষজ্ঞ ডঃ এম. আহসান ও আমাকে ভারতে পাঠানো হয় ২১শে মার্চ (১৯৭৩) তারিখ থেকে বোম্বেস্থ ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে দুই সপ্তাহব্যাপী First Indian National Conference on Nuclear Science and Technology-এ অংশগ্রহণ এবং ঐ সুবাদে ভারতের বিভিন্ন আণবিক শক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা পরিদর্শন করার জন্যে। কনফারেন্স চলাকালে প্রতিদিন ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক ডঃ রাজা রামান্না ঐ প্রতিষ্টানের কয়েকজন পরিচালক ও উর্ধ্বতন বিজ্ঞানীসহ আমাদের মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন করতেন। একদিন ডঃ রামান্না ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণকৃত এবং ঐ সময় ভারতে আটককৃত ৯৩ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের দীর্ঘকাল ভারতে না রাখার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অভিমত। সুতরাং তিনি বলেন যে, আমি যেন বাংলাদেশে ফিরেই তৎবিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করি। ডঃ রামান্না আরও বলেন যে, বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধীর উচিৎ হবে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের থেকে কেবলমাত্র কর্মকর্তাদের রেখে অন্যান্যদের অনতিবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে অতি শীঘ্রই একটি ঘোষণা দেওয়া। ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে উপরোক্ত সম্মেলন শেষে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে, মাদ্রাজের কালপাক্কামে, অন্ধ্র প্রদেশের হায়দ্রাবাদে, রাজস্থান প্রদেশের কোটায়, কাশ্মীরের শ্রীনগরস্থ গুলমার্গে এবং কোলকাতায় ভারতের বিভিন্ন আণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা পরিদর্শন করে আমরা এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে দেশে ফিরে আসি। আমার ভারত সফরের সময় হাসিনা বঙ্গবন্ধুর বাসায় থাকতো। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর বাসায় হাসিনার কক্ষটি একমাত্র

আমাদের জন্যেই সংরক্ষিত রাখা হতো। আমাদের নিজস্ব আলাদা ফ্ল্যাট থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিরাত আমরা বঙ্গবন্ধুর বাসায় থাকতাম। ভারত থেকে ফিরে এসেই ডঃ রামান্নার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত অভিমত বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করি। আমি বঙ্গবন্ধুকে এও জানাই যে, সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন ডঃ রামান্না শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর একজন বিশেষ উপদেষ্টা ও সমর্থক।

১৩। ২রা মে (১৯৭৩) তারিখে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল খাদ্যশস্য ঘাটতি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করার জন্যে বিশ্বের নিকট আবেদন জানান। ৫ই মে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিনা মূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের নিকট খাস জমি বন্টনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ই মে আওয়ামী লীগ খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে সরকারের নিকট ২০ দফা দাবী পেশ করে। এ সময় অতিবৃষ্টি ও পাহাড়িয়া ঢলে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৪টি জেলা বন্যাকবলিত হয়। ১২ই মে বঙ্গবন্ধু ঐ সমস্ত বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন। ১৫ই মে ৩ দফা দাবীতে মাওলানা ভাসানী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ১৬ই মে বঙ্গবন্ধু অনশনরত মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৮ই মে নোয়াখালী জেলার চরক্লার্কে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বন্টন করা হয়। ১৯শে মে বঙ্গবন্ধুর নিকট বেতন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়। ২০শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের ৪টি আসনের উপনির্বাচনে, দুইটিতে আওয়ামী লীগ, একটিতে জাসদ এবং অপরটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়। ২২শে মে তারিখে মাওলানা ভাসানী বিরোধী দলীয় নেতাদের অনুরোধে তাঁর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বশান্তি পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বশান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'জুলিও কুরী' পদক প্রদান করেন। ২৬শে মে পাকিস্তানে বাঙ্গালী নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের আহ্বানে সারাদেশে প্রতিবাদ সভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে পাকিস্তানে আটকেপড়া হাজার হাজার বাঙ্গালীর সর্বস্ব লুট করা এবং তাদের বন্দী শিবিরে আটক রাখার খবর পাওয়া গিয়েছিল। পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো হুমকি দিয়েছিলেন এই বলে যে, পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা হলে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদেরও বিচার করা হবে। ২৯শে মে তারিখে ফরিদপুরের নড়িয়ায় নিজ বাসভবনে আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি নূরুল হক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

১৪। ৬ই জুন তারিখে কর্নেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ারের পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। ৮ই জুন তারিখে ডঃ কুদরত-ই-খুদা বঙ্গবন্ধুর নিকট শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৮ই জুন তারিখে দুষ্কৃতকারীদের একদল রাজশাহীর নিয়ামতপুর থানার ছাতড়া ফাঁড়ি আক্রমণ করে সেখানকার সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র লুট করে। একই

তারিখে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ভাড়া করা বোয়িং বিমান লন্ডন যাত্রা করে। ২২শে জুন তারিখে দুষ্কৃতকারীর একটি দল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার মাধিয়া ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র-শস্ত্র লুট করে। ২৬শে জুন তারিখে দুষ্কৃতকারীর একটি দল কাঠালিয়া থানার আমুয়া ফাঁড়ি লুট করে। ২৮শে জুন তারিখে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং বাংলাদেশে প্রথম একটি ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিল। ঐ দিন রাতে দুষ্কৃতকারীর একটি দল বরিশালের চরফ্যাশন পুলিশ থানা লুট করে। ২৯শে জুন দুষ্কৃতকারীর একটি দল রামগড়ের জালিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালায়।

১৫। ১লা জুলাই (১৯৭৩) তারিখে বাংলাদেশ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ৩রা জুলাই তারিখে দুষ্কৃতকারীদের একটি দল খুলনার মোড়েলগঞ্জ থানার তেলিগাতি পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র লুট করে। ৫ই জুলাই তারিখে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে ৫ কোটি ৫১ লাখ ডলার সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৮ই জুলাই দুষ্কৃতকারীরা পটুয়াখালীর পাথরঘাটা থানায় চরকুয়ানী এবং বরিশাল জেলার বাউফল থানার বগা ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলা চালায়। ৯ই জুলাই তারিখে দুষ্কৃতকারীর দু'টি পৃথক দল যথাক্রমে ঢাকার বৈদ্যেরবাজার থানার অলিপুরা ফাঁড়ি এবং ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার পাটগাথিয়া ফাঁড়ি আক্রমণ করে প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র লুট করে। ১০ই জুলাই তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে ১০টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করে জাতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে। ১২ই জুলাই তারিখে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীর একটি দল বরিশাল জেলার বাউফল থানার ধুলিয়া ফাঁড়ি লুট করে। ১৩ই জুলাই তারিখে মরক্কোর সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৪ই জুলাই জাতীয় সংসদ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে আইন প্রণয়ন করে। ১৬ই জুলাই গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের বিষয়ে দিল্লীতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে গঙ্গার পানি বন্টন প্রশ্নে ভারত ও বাংলাদেশ একমত না হওয়া পর্যন্ত ফারাক্কা বাঁধ চালু না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৭ই জুলাই তারিখে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়ার সরকারগুলো বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৮ই জুলাই তারিখে দালাল আইনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ সাবেক কনভেনশন মুসলিম লীগ প্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরী মারা যান। ২৫শে জুলাই তারিখে দুষ্কৃতকারীর দু'টি পৃথক দল যথাক্রমে ঢাকার লৌহজং থানা এবং ফরিদপুরের কোতোয়ালী থানার রামকৃষ্ণ মিশন ফাঁড়ি লুট করে। ২৬শে জুলাই বঙ্গবন্ধু যুগোশ্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর এবং কানাডার রাজধানী অটোয়ায় কমনওয়েলথ্ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ দিনের জন্যে বিদেশ যাত্রা করেন।

১৬। ঐ সময় আমি ইটালীর ট্রিয়েস্টেস্থ আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানবিষয়ক কেন্দ্রে জুন মাস থেকে ৬ মাসের জন্যে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি ট্রিয়েস্টের উক্ত

কেন্দ্রে যোগদান করেছিলাম ২১শে জুন (১৯৭৩) তারিখে। সেদিনই প্রফেসার আব্দুস সালাম আমার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রফেসার সালাম ছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রধান বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেও প্রফেসার সালামকে তাঁর প্রধান বিজ্ঞানবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে বহাল রেখেছিলেন। ২১শে জুন তারিখে সাক্ষাতের সময় প্রফেসার সালাম কুশলাদি বিনিময়ের পর আমাকে বলেন যে, ১৯৭১-এর মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ সাহেবের আলাপ-আলোচনা বৈঠকের সময় তাঁকে ঢাকায় উপস্থিত থাকার জন্যে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি সে অনুযায়ী করাচী পৌঁছেছিলেন ১৮ই মার্চ তারিখে। সে সময় প্রফেসার সালাম হাসিনার জন্যে একটি কার্ডিগান ও আমার জন্যে একটি কলম সঙ্গে এনেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা এম.এম. আহমেদ প্রফেসার সালামকে বলেছিলেন যে, ঢাকায় গিয়ে তাঁকে তাঁদের শর্তে শেখ সাহেবকে রাজি করাতে হবে। জবাবে প্রফেসার সালাম এম.এম. আহমেদকে জানিয়েছিলেন যে, শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল আমার মাধ্যমে এবং তাও স্বল্প সময়ের জন্যে এবং তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে সম্মত কিন্তু তাঁদের শর্তে তাঁকে রাজি করার কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পরের দিন প্রফেসার সালামকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর ঢাকায় যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর প্রফেসার সালাম আমাদের জন্যে ক্রয়কৃত দ্রব্যগুলো পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ আই.এইচ. উসমানীর কাছে রেখে এসেছিলেন পরবর্তীতে সেগুলো আমাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে। প্রফেসার সালাম আমাকে আরও জানান যে, তিনি ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক ডঃ শমসের আলীর নামে একটি প্রকল্পের অনুদান হিসেবে তিন হাজার ডলারের একখানা চেকও লিখেছিলেন ঐ সময়। এ কথা বলে তিনি ড্রয়ার থেকে ঐ চেকটি বের করে আমাকে দেখান। প্রফেসার সালাম আরও বলেন যে, বাংলাদেশে গণহত্যার ঘটনা হয়েছিল তা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। যা হোক, ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বাংলাদেশে গণহত্যা ও অন্যান্য দুষ্কর্মের জন্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন আমার কাছে। অতঃপর প্রফেসার সালাম আরও বলেন যে, জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সঙ্গে প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তাঁকে বলেছিলেন, "Professor Salam, Allama Iqbal dreamt of two Pakistans but Mr Jinnah wanted one Pakistan. Now see what has heappened. (প্রফেসার সালাম, আল্লামা ইকবাল কল্পনা করেছিলেন দু'টি পৃথক পাকিস্তানের কিন্তু মিস্টার জিন্নাহ চেয়েছিলেন একটি পাকিস্তান। এখন দেখুন মিস্টার জিন্নাহর পাকিস্তানের কি দশা হয়েছে)।"

১৭। বঙ্গবন্ধুর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে যুগোশ্লাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসার খবর পেয়ে প্রফেসার সালাম আমাকে বললেন যে, তিনি ঐ সময় বেলগ্রেড গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং সেজন্যে আমি যেন ব্যবস্থা করি। অতঃপর এতদবিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নেয়ার জন্যে আমি ঢাকায় হাসিনাকে ফোন করি। পরদিন হাসিনা আমাকে জানায় যে, প্রফেসার সালামের প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ কোন আপত্তি নেই তবে বিষয়টি অত্যন্ত গোপন রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু ২৭শে জুলাই বেলগ্রেড পৌঁছাবেন বলে স্থির করা হয়েছিল। এর দিনসাতেক পূর্বে ইটালীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আমাকে অবহিত করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে ২৯শে জুলাই সকাল দশটার মধ্যেই বেলগ্রেডে পৌঁছাতে বলেছেন এবং সেজন্য তাঁরা ব্যবস্থা করেছেন। আমি সার্ভিস কোচে যথাসময়ে বেলগ্রেড পৌঁছাব বলে আমাদের দূতাবাসকে অবহিত করি। ইতব্যসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো কানাডা ও আমেরিকা সফর শেষে পাকিস্তানে ফেরার পথে ইটালীর রাজধানী রোমে কয়েকদিনের জন্যে যাত্রাবিরতি করেন। এই পর্যায়ে প্রফেসার সালাম আমাকে জানান যে, ভুট্টো সাহেব রোমে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যে বার বার তাগিদ দিচ্ছেন। পাকিস্তান বাংলাদেশকে তখনও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় বঙ্গবন্ধু ভুট্টোর প্রস্তাব সম্পূর্ণ নাকচ করে দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রফেসার সালাম আমার সঙ্গে তাঁর বেলগ্রেড যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে বঙ্গবন্ধুকে দেয়ার জন্যে তাঁর একটি পত্র আমাকে দিয়ে বললেন, "শেখ সাহেবের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে, তিনি যেন পাকিস্তানী ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে শুধুমাত্র ১৯৫ জন কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের বিনা শর্তে মুক্তি দেন।" তিনি আরও বলেন যে, পরবর্তীতে ১৯৫ জনের বিচার করে ওদের থেকে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের ফাঁসি দেয়া যেতে পারে। যা হোক, যথাসময়ে আমি বেলগ্রেড পৌঁছেই বঙ্গবন্ধুকে এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাহেবকেও এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল। অতঃপর বঙ্গবন্ধু তাঁর সফর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে ভূমধ্যসাগরের যুগোশ্লাভিয়ার উপকূলবর্তী প্রেসিডেন্ট টিটোর অবকাশস্থান ব্রিয়নী দ্বীপে তাঁর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের জন্যে চলে যান। এই সফরে বঙ্গবন্ধু আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় ভোজে আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেই সুবাদে প্রেসিডেন্ট টিটোকে অতি কাছে থেকে দেখার এই প্রথম সুযোগ ও সৌভাগ্য হলো আমার। সেদিন প্রত্যক্ষ করলাম যে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রেসিডেন্ট টিটোর ছিল প্রগাঢ় সহমর্মিতা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। ৩১শে জুলাই তারিখে যুগোশ্লাভিয়ায় ৫ দিন রাষ্ট্রীয় সফর শেষে বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে রওনা দেন কানাডার রাজধানী অটোয়ার উদ্দেশ্যে। যুগোশ্লাভিয়া ও কানাডীয় সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফেরেন ১৩ই আগস্ট।

১৮। আগস্ট মাসে বাংলাদেশে মারাত্মক বন্যায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেশের অগণিত মানুষ নিপতিত হয় সীমাহীন দুঃখ, কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যে। মানুষের এহেন নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্রও কোন সাড়া জাগাতে পারেনি উগ্র বামপন্থী ও স্বাধীনতা বিরোধী লোকদের বিবেকে। তারা অব্যাহত রেখেছিল তাদের পূর্বপরিকল্পিত সহিংস অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ। ১লা আগস্ট তারিখে দুষ্কৃতকারীরা ঢাকা জেলার ঘিওর থানার জাবড়া ফাঁড়ি লুট করে। ২রা আগস্ট তারিখে দুষ্কৃতকারীদের এক দল হামলা চালায় কুষ্টিয়ার মীরপুর থানার আমলা ফাঁড়িতে। ৫ই আগস্ট তারিখে ঢাকার শিবপুর থানায় দুষ্কৃতকারীরা চালায় বেপরোয়া হামলা। ৭ই আগস্ট তারিখে দুষ্কৃতকারীদের একদল সশস্ত্র হামলা চালায় বরিশালের বাবুগঞ্জ থানায় চানপাশা ফাঁড়িতে। ৯ই আগস্ট কুষ্টিয়ার মীরপুর থানার আটগ্রাম ফাঁড়িতে চালানো হয় সশস্ত্র হামলা। ১০ই আগস্ট দুষ্কৃতকারীদের এক দল সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লুট করে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার উঁচাখিলা ফাঁড়ি। ১১ই আগস্ট তারিখে দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চুনাটি ফাঁড়িতে। ১৩ই আগস্ট তারিখে চট্টগ্রামে গ্রেনেড চার্জ করে একটি ব্যাংক ডাকাতি করা হয়। একই তারিখে দুষ্কৃতকারীরা সশস্ত্র হামলায় লুট করে পটুয়াখালীর পাথরঘাটার জ্ঞানপাড়া রেঞ্জার অফিস, বরিশালের স্বরূপকাঠি থানার ইন্দেরহাট ফাঁড়ি এবং ঢাকার কাপাসিয়া থানা। ১৫ই আগস্ট দুষ্কৃতকারীরা হামলা চালায় পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা থানার ফৈস্থান ফাঁড়িতে। ২০শে আগস্ট লৌহজংয়ে সংঘটিত হয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে তিন ঘণ্টা গুলিবিনিময়। ২৩শে আগস্ট তারিখে দুষ্কৃতকারীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লুট করে কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার চন্দনপুরা ফাঁড়ি। ২৫শে আগস্ট তারিখে সশস্ত্র দুষ্কৃতিকারীরা বৈদ্যেরবাজারের আনন্দবাজার হাট হতে ৯ ব্যক্তিকে অপহরণ করে এবং পরে ৭ জনকে হত্যা করে। উগ্র বামপন্থী ও স্বাধীনতাবিরোধী লোকদের এহেন সহিংস অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে দিনরাত উৎকণ্ঠিত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে থাকে সারাদেশের জনসাধারণ। দেশের এহেন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে জনগণ আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে ঐ সময় প্রদত্ত মাওলানা ভাসানীর বঙ্গবন্ধুর সরকার বিরোধী বিভিন্ন উক্তি, বিবৃতি ও বক্তব্যে। ২৯শে আগস্ট (১৯৭৩) তারিখে মাওলানা ভাসানীর ৩দফা দাবীর পক্ষে জনসমর্থন প্রদর্শনে তাঁর অনুসারীরা সারা ঢাকা শহরে সাধারণ হরতাল পালন করে।

১৯। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং আগস্টে দিল্লীতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা শ্রী পি.এন. হাকসার এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী, পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙ্গালীদের) স্ব স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হয় এই চুক্তিতে। এই চুক্তিতে আরও বলা হয় যে, এই লোক বিনিময়

শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অবশিষ্ট ১৯৫ জন (পাকিস্তানী) যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এর অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধুর সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, "একমাত্র সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ এ ধরনের কোন আলোচনায় বসতে পারে।" ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উপরোক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় স্বভাবতঃই আশা করা হয়েছিল যে, অতঃপর পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু স্বীকৃতি দেয়া তো দূরের কথা, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে পাকিস্তান ধরণা দেয় গণচীনের দুয়ারে। ৩০শে আগস্ট তারিখে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক (তৎকালীন) প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ ছুটে যান পিকিংয়ে (বেইজিংয়ে)। সেখানে তাঁর চীনা নেতাদের সঙ্গে প্রধানতঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হয়। অতঃপর আজিজ আহমদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, "পাকিস্তানী ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচারের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা পর্যন্ত পাকিস্তান ও গণচীন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির বিরোধিতা করে যাবে।"

২০। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধু জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের উদ্দেশ্যে রওনা হন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, "বিশ্ব শোষক আর শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত।" আর শোষকের বিশ্বের অন্তহীন ঐশ্বর্যের নগ্ন অহমিকার পদতলে পিষ্ট, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নিদারুণ কষাঘাতে জর্জরিত শোষিত বিশ্বের আত্মার আর্তনাদকেই বঙ্গবন্ধু প্রতিধ্বনিত করেন তাঁর বক্তৃতায়। বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "শোষিত বিশ্বকে বাঁচাতেই হবে।" জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সেখানে উপস্থিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রথম তাঁকে অভিনন্দন জানান কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "মুজিব, শোষকের বিশ্বের বিরুদ্ধে শোষিত বিশ্বের এই বাঁচার সংগ্রাম আমারও সংগ্রাম।"

২১। এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো, তানজিনিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারে, কম্বোডিয়ার প্রিন্স নারোদম সিহানুক, সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের আন্তরিক মতবিনিময় হয়। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকারের সময় ফিদেল ক্যাস্ট্রো সমাজতন্ত্রের মতাদর্শে বিশ্বাসী চিলির (তৎকালীন) প্রেসিডেন্ট আলেন্দেকে উৎখাত করার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে CIA-এর ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার কথা উল্লেখপূর্বক তাঁকে বলেছিলেন, "সি. আই. এ. সম্পর্কে সাবধান। সুযোগ পেলেই কিন্তু তারা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।" ফিদেল ক্যাস্ট্রোর এই মন্তব্যের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "পরিণতি যাই হোক, আমি আপোষ করবো না।" পাকিস্তানী আমলের উর্ধ্বতন আমলাদের বঙ্গবন্ধু কর্তৃক চাকরির ধারাবিহকতা বজায় রাখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে

ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাঁকে আরও বলেছিলেন, "আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখ পেশার নেতৃস্থানীয়দের সরকারী প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করুন। এরা ভুলের পর ভুল করে সঠিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে—কিন্তু এরা কোনো ষড়যন্ত্র করবে না। আপনার মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের আরও বেশী করে দায়িত্ব দিন এবং সম্পূর্ণভাবে ওদের বিশ্বাস করুন। অন্যথায়, আপনি কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।"

২২। আর একটি পৃথক সাক্ষাৎকারের সময় লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব করতে চাই। অবশ্য এর জন্যে প্রথমেই আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনার দেশের নাম বদলিয়ে 'বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র' রাখার জন্যে।" প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর এই প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, তথা স্বাধীনতাযুদ্ধে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের একটি ভিন্নধর্মী চিন্তা-চেতনা, মনমানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ অমুসলিম। সর্বোপরি, আল্লাহতায়ালা তো শুধু আল মুসলেমীন নন, তিনি তো রাব্বুল আলামীন, সব কিছুরই স্রষ্টা, মহান। সুতরাং আপনার প্রস্তাব কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।" এরপর লিবিয়ার কাছ থেকে বাংলাদেশ কি প্রত্যাশা করে বা কি চায় প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা চাই লিবিয়ার স্বীকৃতি। স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি লিবিয়ার স্বীকৃতি।"

২৩। সে সময় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের সময় সৌদি আরবের (তৎকালীন) বাদশা ফয়সাল প্রথমেই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, "আমি শুনেছি যে, আসলে বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশী। অবশ্য এসব সাহায্য দেয়ার জন্যে আমাদের পূর্বশর্ত রয়েছে।" বাদশা ফয়সালের এই কথার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার তো মনে হয় না, বাংলাদেশ মিসকিন-এর মতো আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে। বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কা'বা শরীফে নামাজ আদায়ের অধিকার চাচ্ছে। পবিত্র কা'বা শরীফে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের নামাজ আদায়ের হক রয়েছে। এ ব্যাপারে আবার শর্ত কেনো? আমরা আপনাদের কাছ থেকে ভ্রাতৃসুলভ সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করি।" অতঃপর সৌদি আরবের কাছ থেকে বাংলাদেশ আসলে কি চায়, বাদশা ফয়সালের এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এই দুনিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাই আমি জানতে চাই, কেনো সৌদি আরব আজও পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না।" বঙ্গবন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে বাদশা ফয়সাল বলেছিলেন, "সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে

বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' রাখতে হবে।" বাদশা ফয়সালের এই প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু এসম্পর্কে ইতিপূর্বে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে যে কথা বলেছিলেন তার পুনরুল্লেখ করে আরও বলেছিলেন, "আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি এ্যারাবিয়া' নয়। আপনাদের দেশটার নাম মরহুম বাদশা ইবনে সউদ–এর নামে 'কিংডম অব সৌদি এ্যারাবিয়া' রাখা হয়েছে। কই আমরা কেউই তো এ নামে আপত্তি করিনি।" এরপর বাদশা ফয়সাল বলেছিলেন, "এছাড়া আমার অন্য একটি শর্ত রয়েছে এবং তা হচ্ছে, অবিলম্বে সমস্ত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।" বাদশা ফয়সালের এই প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এটাতো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। এই দু'টো দেশের মধ্যে এ ধরনের আরও অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। যেমন ধরুন বাংলাদেশ থেকে কয়েক লাখ পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙ্গালীদের) পাকিস্তানে ফেরত নেয়া এবং পাকিস্তানে আটকে পড়া পাঁচ লক্ষাধিক বাঙ্গালীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ পরিশোধ করা, এমন বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে। এসবের মীমাংসা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধুমাত্র বিনাশর্তে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় হবে না। আর সৌদি আরবই বা এতো উদগ্রীব কেন?" বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের জবাবে বাদশা ফয়সাল একটু রূঢ় সুরে বলেছিলেন, "শুধু এটুকু জেনে রাখুন, সৌদি আরব আর পাকিস্তান একই কথা। পাকিস্তান আমাদের সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। যাহোক, আমাদের দু'টো শর্তের বিষয় চিন্তা করে দেখবেন। একটা হচ্ছে, বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, আর একটা, বিনাশর্তে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। আশা করি, এরপর বাংলাদেশের জন্যে সাহায্যের কোনো কমতি হবে না।" আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত এই জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) তারিখে।

২৪। বঙ্গবন্ধুর আলজিয়ার্স থেকে স্বদেশে ফেরার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে বৈঠক করে একটি যুক্ত ঘোষণায় বলেন যে, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেয়া হবে। এই যুক্ত ঘোষণার পর, আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের প্রথম দলটি একটি বিশেষ বিমানে ঢাকা এসে পৌঁছায় ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) তারিখে। এদিকে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে পাকিস্তানের (তৎকালীন) প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, "১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত না পাঠানো পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের শর্ত অপূর্ণই থেকে যাবে। আর জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং

বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের প্রশ্নই ওঠে না।" এর বার দিন পর ৩রা অক্টোবর (১৯৭৩) তারিখে গণচীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী চিয়ান কুয়ান হুয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বলেন, "জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকরী করার পরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারে—কোনক্রমেই তার আগে নয়।"

২৫। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা, গুপ্তহত্যা ও সহিংস অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ শুরু হয় ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন শতাধিক। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সংসদ নির্বাচনের পর গুপ্তহত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিয়াত্তরের জুন মাস পর্যন্ত গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গদলসমূহের কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দুই হাজারকেও ছাড়িয়ে যায়। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও বহু নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ হারায় গুপ্তহত্যা ও অন্যান্য সহিংস অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে। ফলে, ১৯৭৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ১৭ মাসে গুপ্তহত্যাকাণ্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯২৫টিতে। আর পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলাকারী বাহিনীর ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে ৬০টি। ফলে, দেশের সর্বত্র শহর, বন্দর, গঞ্জে ও গ্রামে নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতির সঞ্চার হয়। এই পরিস্থিতিকে নিজের সহিংসতার রাজনীতির সাফল্য বলে মনে করে জাসদের সন্ত্রাসবাদী অংশ ও উগ্রপন্থী দলগুলো তাদের তৎপরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন আদর্শ-চেতনা বিস্মৃত, সামাজিক অনাচার ও অর্থনৈতিক অনটনজনিত হতাশায় জর্জরিত এবং বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বহু তরুণ সন্ত্রাসবাদী এই গ্রুপ ও দলগুলোতে যোগদান করে। আদর্শগত কারণে নয় বরং নেহায়েত অস্ত্র সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থতার সুযোগের আশায় বহু রাজাকার, আলবদর ও আলসামস্-এর সদস্য সন্ত্রাসবাদী দলগুলোয় আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে, বহু সন্ত্রাস, গুপ্তহত্যা এবং পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করার ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে প্রতিদিন। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যে সমস্ত সন্ত্রাসী ও সহিংস ঘটনার খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা থেকে এ সময়ের পরিস্থিতি সহজেই অনুমান করা যায়।

২৬। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৩) তারিখে ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার ধানীখোলা ফাঁড়ি এবং কুষ্টিয়ায় চুয়াডাঙ্গা থানার শরৎগঞ্জ ফাঁড়ি লুণ্ঠিত হয় দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায়। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আরিচা ফেরিতে রক্ষীবাহিনীর সদস্য ও দুর্বৃত্তের মধ্যে গুলি বিনিময়ে ৪ জন নিহত হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় ফরিদপুরের কোতয়ালী থানার চানপুর ফাঁড়ি। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে ব্রাশফায়ারে নিহত হয় ৪ জন ছাত্র। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেনাবাহিনী ও দুর্বৃত্তদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে নিহত হয় ৬০ জন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায়

লুণ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার কালারপুর ফাঁড়ি। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হয় চট্টগ্রাম বন্দরে ২ জন শ্রমিক। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীর ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় সিরাজগঞ্জ–ঈশ্বরদী ট্রেন লাইনে একটি ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে এবং এতে শিশু ও নারীসহ বহু লোক হতাহত হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে দুর্বৃত্তের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার সারিফল ফাঁড়ি। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে দুর্বৃত্তরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে রাজশাহী জেলার বাঘমারা থানার দামনাস ফাঁড়ি লুট করে এবং এই ঘটনায় ৮ জন পুলিশ নিহত হয়। ৩রা অক্টোবর তারিখে পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রক্ষীবাহিনীর সদস্য ও দুর্বৃত্তদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে ৮ জন নিহত হয়। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা ও খাদ্যগুদাম। ৬ই অক্টোবর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা থানা। ৬ ও ৭ই অক্টোবর দুই রাত্রিতে ১৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটে চুয়াডাঙ্গায়। ৯ই অক্টোবর তারিখে দুষ্কৃতকারীরা সশস্ত্র হামলা করে যশোর জেলার হরিনাকুন্ড থানা লুট করে। ১০ই অক্টোবর ঢাকায় ৬ ব্যক্তি নিহত হয় দুর্বৃত্তদের হামলায়। ১৩ই অক্টোবর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের দু'টো পৃথক দল সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লুণ্ঠন করে কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানার হালসা ফাঁড়ি এবং টাঙ্গাইল থানার পোড়াবাড়ি ফাঁড়ি।

২৭। উপরোল্লিখিত অশুভ রাজনীতির উদ্ধত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকতর বলিষ্ঠতার সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে গঠিত হয় 'গণ ঐক্যজোট'। বাংলাদেশ আওয়মী লীগ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কমরেড মণি সিং–এর নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় এই ঐক্যজোট। এই গণঐক্যজোট গঠন সম্পর্কিত ঘোষণার পরদিন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে 'মুজিব–মণি–মোজাফফর, বাংলার তিন মীরজাফর' এই শ্লোগান তুলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ(NAP), চরম বামপন্থী দলগুলো এবং এসব দলের ছত্রছায়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার দালাল দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা তাঁদের দৃষ্টিতে 'ভারত–রাশিয়ার পুতুল সরকার' উচ্ছেদের অভিন্ন লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে 'সংগ্রামের জন্যে ঐক্য মোর্চা' গড়ে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

২৮। ১৭ই অক্টোবর তারিখে জাপানে এক সপ্তাহের রাষ্ট্রীয় সফরের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে তিন দেশের যুক্ত ঘোষণায় ত্রিমুখী লোক বিনিময় যুগপৎ পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও পাকিস্তান এ ব্যাপারে টালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ২২শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে প্রতিটি বাঙ্গালীকে ফেরত নিচ্ছে।

কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙ্গালীদের) বিপুল সংখ্যককেই পাকিস্তান নিচ্ছে না।" ২৪শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু জাপান সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর কিছুদিন পর জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিক অবাঙ্গালীদের ফেরত নেবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অবস্থানকারী প্রায় পাঁচ লাখ অবাঙ্গালীর অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে সেখানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারা ভারত থেকে এ দেশে এসেছিলো।

২৯। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইসরাইল কর্তৃক ১৯৬৭-এর যুদ্ধে দখলকৃত তাঁদের স্ব স্ব ভূখন্ড মুক্ত করার লক্ষ্যে মিশর, সিরিয়া ও জর্দান যৌথভাবে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখনও এই আরব দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তদুপরি, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কমবেশি সব আরব দেশগুলোতে প্রচারণা চলছিলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তবুও এক কূটনৈতিক অভিযানে অবতীর্ণ হলেন বঙ্গবন্ধু। ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আরবদের প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, "আরবরা আমাদের স্বীকৃতি দিক বা না দিক, তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের ন্যায্য সংগ্রামে আমরা তাঁদের পাশে আছি।" ইসরাইলের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর ১৮ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এই আরব দেশগুলোর জন্যে চা এবং একটি মেডিকেল টিম পাঠায়।

৩০। আগস্ট থেকে ডিসেম্বর (১৯৭৩)-এর মধ্যে আরও কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৩শে আগস্ট আইভরি কোস্টের সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে জায়ারের সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিশর ও সিরিয়ার সরকারদ্বয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে নাইজারের সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গিনি বিসাউয়ের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৬ই অক্টোবর ক্যামেরুন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ই অক্টোবর তারিখে জর্দানের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২৩শে অক্টোবর তারিখে দাহোমীর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অতঃপর ৪ঠা নভেম্বর কুয়েতের সরকার এবং ৫ই নভেম্বর ইয়েমেনের সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছিলো।

৩১। ১৪ই অক্টোবর আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই তিনটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'গণঐক্যজোট' গঠিত হওয়ার পরেও ১৯৭৩ সালে জাসদের সন্ত্রাসী অংশ ও উগ্র বামপন্থীদের হত্যা, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ

এবং পুলিশ ও আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও ফাঁড়ি হামলার ঘটনা শুধু জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতির সঞ্চারই সৃষ্টি করেনি, এতে জানমালেরও বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৭ই অক্টোবর কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানার খাদিমপুর ফাঁড়িতে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় জানমালের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। ২১শে অক্টোবর দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার হারতা ফাঁড়ি। ২৩শে অক্টোবর দুষ্কৃতকারীদের একটি দল সশস্ত্র হামলা চালায় রাজশাহী জেলার তানোর থানার পাঁচনদার ফাঁড়িতে। ২৫শে অক্টোবর তারিখে দুর্বৃত্তের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানা। ২৬শে অক্টোবর তারিখে বরিশাল জেলার মেহেদীগঞ্জ থানার ভাষাণচর ফাঁড়ি লুণ্ঠিত হয় দুষ্কৃতকারীদের মারাত্মক হামলায় এবং এই ঘটনায় ৩ জন পুলিশ নিহত হন। ২৮শে অক্টোবর দুষ্কৃতকারীদের একটি দল সশস্ত্র হামলায় লুট করে পটুয়াখালী জেলার পাথরঘাটা থানা। ১লা নভেম্বর দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র হামলায় টাঙ্গাইল থানার পাথরাইল ফাঁড়ি সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। ১৪ই নভেম্বর তারিখে সুন্দরবনে সেনাবাহিনীর একটি দলের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র সংঘর্ষে অনেক ব্যক্তি হতাহত হয়। ২২শে নভেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানা। ২৩শে নভেম্বর দুষ্কৃতকারীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ হামলা চালায় ঢাকা জেলার কালীগঞ্জ থানার বারোবাজার ফাঁড়িতে। ২৫শে নভেম্বর দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র হামলায় লুণ্ঠিত হয় রাজশাহী জেলার তানোর থানার পাচনদর ফাঁড়ি। ২৯শে নভেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের মারাত্মক হামলায় কুমিল্লা জেলার মতলব থানা লুণ্ঠিত ও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়।

৩২। ৩০শে নভেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে এই আশায় যে, তারা অতীতের কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত ও অনুশোচনার বশবর্তী হয়ে স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করার জন্যে এবং দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সরকারের এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার দায়ে অভিযুক্ত ও আটককৃত প্রায় ৩৪,৬০০ জন মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি. জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলো এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদের নেতৃত্বে গঠিত রাজাকার, আলবদর, আলসামস ইত্যাদি সংগঠনগুলোর নেতা ও কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা মুক্তি পান। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে পি.ও. ৮–এর মাধ্যমে দালাল আইন নামে একটি জেনোসাইড এ্যাক্ট প্রবর্তন করেছিলো। ১৯৭২–৭৩ সালে যখন পি.ও. ৮–এর অধীন কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার চলছিলো, তখন দেশের উগ্র বামপন্থী এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী মহলের অনেকেই সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। সে সময় যে সমস্ত রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী দালাল ও ঘাতকদের বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাওলানা ভাসানী,

ডঃ আলীম-আর-রাজী, অধ্যাপক আবুল ফজলসহ সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকাগোষ্ঠী। উপরন্তু মাওলানা ভাসানী এক পর্যায়ে ১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে দালাল আইন বাতিল করার দাবি জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আলটিমেটামও দিয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলো বিদেশী চাপ এবং এতো লোকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্যে যথাযথ সাক্ষ্য-সাবুদ জোগাড়ের ক্ষেত্রে নানান দুরূহ অসুবিধা ও সমস্যা এবং প্রশাসনিক নিরতিশয় দুর্বলতা। সে যাইহোক, বঙ্গবন্ধুর সরকারের ঐ সাধারণ ক্ষমতার আওতায় সকল রাজাকার ও ঘাতক অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না এবং যারা অভিযোগে বিচারাধীন ছিল না কেবল তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল এই সাধারণ ক্ষমা। খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অপহরণ প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির জন্যে সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য ছিল না। সর্বোপরি, এ জাতীয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আর কখনও বিচার করা যাবে না এতদমর্মে সংবিধানগত কোনও বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা ইনডেমনিটি বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেনি বঙ্গবন্ধুর সরকারের এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

৩৩। জাতীয় বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭৩) তারিখে বঙ্গবন্ধু বেতার (রেডিও) ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "...দু'বছর আগে কি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম? চারিদিকে অসংখ্য নরকংকাল, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের লাশ, বীরাঙ্গনা মা ও বোনের আর্ত হাহাকার, অচল কল-কারখানা, থানা-আইন-আদালত শূন্য ও বিধ্বস্ত, ব্যাংকে তালা, ট্রেজারী খালি, রেলের চাকা বন্ধ, রাস্তা-ব্রিজ ধ্বংস, বিমান ও জাহাজ একখানাও নেই। যুদ্ধের জন্যে অনেক ক্ষেতে ফসল বোনা সম্ভব হয়নি, পাট ঘরে ওঠেনি, নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, বাস, লরী, ট্রাকের শতকরা সত্তরভাগ হয় নষ্ট, না হয় অচল। অনেকের হাতে তখন অস্ত্র। তাদের মধ্যে আছে বহু দুষ্কৃতকারী। আমাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য ছিল না। পুলিশ ছিল না। জাতীয় সরকার চালাবার মতো দক্ষ অফিসারও ছিল না। তখন পাকিস্তানে বন্দী কয়েক লাখ বাঙ্গালী। ভারত থেকে ফিরে আসছে প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী উদ্বাস্তু যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করেছিল। তখনই দরকার এদের জন্যে রিলিফ, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত বাঙ্গালীকে বাঁচানোর জন্যে চাই অবিলম্বে খাদ্য। ওষুধ চাই, কাপড় চাই, চারদিকে এই 'চাই চাই আর নাই নাই'-এর মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু। ...আমি জানি না রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোনো দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু হয়েছে কিনা। আমার জানা মতে হয়নি। বাংলাদেশ সরকার বিপ্লবের পর এক বৎসরের মধ্যে সংবিধান তৈরি করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেয়ার বয়স একুশের বদলে আঠারো বৎসর করে ভোটাধিকারের সীমা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে, তৈরি হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্য জাহাজবহর। বি.ডি.আর. সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত,

স্থল (সেনা) বাহিনী মাতৃভূমির ওপর যে কোনো হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমান বাহিনী। থানা ও পুলিশ সংগঠনের যে ৭০ ভাগ পাকিস্তানীরা নষ্ট করেছিল, এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সরকার এখন আরও নজর দিতে পারবে। ...দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে। দেশের সকল ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা এখন আপনাদের। কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৮০% ভাগ মালিক আপনারা। ....পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত (কৃষি) জমির খাজনা তুলে নেয়া হয়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি, শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের চেষ্টা। ফলে বাংলাদেশ ধীর গতিতে হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্যাটার্ন বদলাতে চলেছে। একটা কৃষিনির্ভর আধা সামন্ত সামাজিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টায় আমরা নিযুক্ত আছি। ....এই স্বাধীনতা তখনই আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। তাই আসুন, এই দিনে অভাব, দারিদ্র্য, রোগ-শোক ও জরার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করি। সংগ্রাম ঘোষণা করি চোরাচালানী, কালোবাজারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে সোনার বাংলা গড়ার কাজ সফল হবে না। ....যারা ধ্বংস করে, ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায়, তারা শুধু সরকারের শত্রু নয়, দেশ ও জনগণের শত্রু। তারা যে সম্পদ হরণ করে, ধ্বংস করে, তা জনগণের সম্পত্তি। কোনো পুঁজিপতি বা ব্যক্তিমালিকের সম্পত্তি নয়। বিপ্লবের নামে যারা উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারে মাতেন, তারা বিপ্লবের মিত্র নন, জনগণেরও বন্ধু নন। আপনারাও এই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে আবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন তাঁরা অনুতপ্ত হলে তাঁদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।”

৩৪। ১৬ই ডিসেম্বর আনন্দ-উল্লাস ও যথাযথ মর্যাদায় তৃতীয় জাতীয় বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। দিনটি ছিল সাধারণ ছুটির দিবস। রাজপথে সেনা (স্থল) নৌ ও বিমান বাহিনীত্রয়, রক্ষীবাহিনী, বি.ডি.আর. পুলিশ, আনসার ও অনেক বেসরকারী সংগঠনের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

৩৫। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। অতঃপর তাঁকে বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের দূত হিসেবে নিয়োগ করা হলে তিনি উক্ত পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব মুহম্মদ উল্লাহ অস্থায়ী

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এর প্রায় ৭/৮ মাস আগে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসায় এসেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতে। তখন রাষ্ট্রপতি চৌধুরী সংসদীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কাজকর্ম বিশেষ না থাকায় তাঁর অস্বস্তি বোধের কথা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেছিলেন এবং উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদ হতে অন্য কোনো নিম্নতর পদে নিয়োগ করা দৃষ্টিকটু দেখায় বিধায় বঙ্গবন্ধু তখন তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হননি। বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্ট্রপতি চৌধুরীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বইপত্র লেখার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে।

৩৬। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর নির্বাচন ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে শুরু হয় এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত হয়। গোপন ব্যালট ও সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্দলীয় ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে ঘটেছিল বহু গোলযোগ, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা–হাঙ্গামা। যার ফলে বহুলোক হতাহত হয়। এহেন অনভিপ্রেত, অপ্রীতিকর ও অত্যন্ত দুঃখজনক রক্তপাতের মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয় ১৯৭৩ সাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
১৯৭৪ সাল

১। ইটালীর ট্রিয়েস্টেস্থ আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থ বিষয়ক কেন্দ্রে ৬ মাস গবেষণা কর্ম শেষে আমি ১লা জানুয়ারী (১৯৭৪) তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করি। দেশে ফেরার ১ সপ্তাহের মধ্যেই আমি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই। মস্তক ও মুখমণ্ডলসহ সারা শরীরে বসন্তের ফোঁড়া ওঠে। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি ছেলে-মেয়েদের স্বার্থেই পৃথক শয়নকক্ষে অবস্থান নিই। একদিন দেখি যে, আমার ছেলে জয় আমার রুমে এসে সেখানে রাখা একটি চেয়ারে বসলো। তখন ওর বয়স মাত্র আড়াই বছর। আমার কামরায় আসা ওর উচিৎ হয় নি। আমি বললাম, "আব্বু, আমি তো অসুস্থ, তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি।" জয় বললো, "আব্বু, আমি তো তোমাকে দেখতে এসেছি, তুমি কেমন আছ।" আমার অসুস্থতায় আমার ঐ আড়াই বছরের শিশুর এই সংবেদনশীলতার কথা স্মরণ করলে এখনও আমার মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে জয়ের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসায়। আমি অসুস্থ হওয়ার পর শাশুড়ী প্রায় প্রতিদিন আসতেন আমাদের বাসায়। উল্লেখিত ঘটনার দিন কয়েক পর একদিন বঙ্গবন্ধু আসেন আমাকে দেখতে ও আমার কুশলাদি জানতে। তিনি সোজা চলে আসেন আমার রুমে। তখন জয়ের ঐ কাহিনীর বর্ণনা করে আমি বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আমার ছেলের কাছে আপনি কিন্তু হেরে গেলেন।" বঙ্গবন্ধু তখন জয়কে কোলে নিয়ে আদর করে বললেন, "তোমার ছেলের কাছে ভবিষ্যতে অনেকেই হেরে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" যাহোক, হাসিনার নিরবচ্ছিন্ন সেবা-শুশ্রূষায় আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। সে সময় হাসিনা যেরকম কষ্ট করে ও ঝুঁকি নিয়ে আমার সেবা-যত্ন করেছিল তা কোনদিন বিস্মৃত হবার নয়। যাহোক, সে সময় সৌভাগ্যক্রমে হাসিনা, ছেলে-মেয়ে কিংবা বাসার আর কেউই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি।

২। আমার বসন্ত রোগ এমন গুরুতর ছিল যে তা সেরে গেলেও আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে দারুণভাবে। এবার দায়িত্ব নিলেন আমার শাশুড়ী স্বয়ং। প্রতিদিন দুপুরে আমার সর্বকনিষ্ঠ

শ্যালক শিশু রাসেলকে স্কুল থেকে নেয়ার সঙ্গে আমাকেও আমার অফিস থেকে তাঁর বাসায় নেয়ার ব্যবস্থা করলেন আমার শাশুড়ী। হাসিনা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই কাটাতো সারাদিন। এই সময় থেকে আমার নিত্য রুটিন হয়ে গেল শাশুড়ীর বাসায় দুপুরে খাবার খাওয়া। এ ছাড়াও রাতে বঙ্গবন্ধু বাসায় না ফেরা পর্যন্ত হাসিনা বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে থাকতো বলে প্রায় প্রতিরাতেই খাবার খেতে হতো শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে। কোন কোন দিন রাত বেশী হয়ে গেলে আমরা সে বাসায়ই থাকতাম। বঙ্গবন্ধুর বাসার উপর তলার হাসিনার রুমটি শাশুড়ী আগের মতই সংরক্ষিত রেখেছিলেন যাতে আমরা যে কোন সময় সেখানে থাকতে পারি। বঙ্গবন্ধুর আদেশে আমাদের আর একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল জয়কে রোজ সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই তাঁর কাছে রেখে আসা। অবস্থামত হাসিনা অথবা আমাকে নতুবা আমাদের বাড়ীর কাজের ছেলে মোঘলকে এই কর্তব্য পালন করতে হতো। বঙ্গবন্ধু সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় জয়কে সযত্নে খাওয়াতেন। তাঁর পানকরা ফলের রসের শেষাংশটুকু তাঁর পরমাদরের নাতী জয়কে পান করানো ছিল বঙ্গবন্ধুর নিত্যকার রুটিন। জয়ও পরমাগ্রহে পান করতো সেই ফলের রস।

৩। ১৮-২০শে জানুয়ারী (১৯৭৪) ঢাকায় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অফিস প্রাঙ্গণে দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে এই কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু দলীয় কর্মীদের প্রতি 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির' উদাত্ত আহবান জানান এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সমাজ জীবনের পরতে পরতে দুর্নীতির যে ভয়াবহ বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ গভীর তমিস্রায় ছেয়ে যাবে।" দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাচালানী, মজুতদারী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এদের শায়েস্তা করে জাতীয় জীবনকে কলুষমুক্ত করতে না পারলে আওয়ামী লীগের দুই যুগের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানের গৌরবও ম্লান হয়ে যেতে পারে।" দুর্নীতিবাজ ও সমাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার জন্যে তিনি ছাত্র-যুব সমাজ ও শ্রমিক শ্রেণীসহ সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতিও আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অর্থের লোভে যারা বুভুক্ষুর মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, চোরাচালান-কালোবাজারী করছে, যারা ওষুধের লেবেল লাগিয়ে মুমূর্ষুর মুখে তুলে দিচ্ছে বিষ, তাদের লোলুপ জিহ্বা কেটে দিতে হবে।" সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও গুপ্তহত্যাকাণ্ডে লিপ্ত উগ্র বামপন্থী প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও গ্রুপগুলোর তীব্র সমালোচনা করে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, "তারা যা করছে তা বিপ্লব নয়, বিপ্লবের বিকৃতি— পার্ভারসন। নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করে আর অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে বিপ্লব হয় না। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও

ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সোনার বাংলা কায়েমের দলীয় ওয়াদার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে নিরলসভাবে সংগ্রাম করে যেতে হবে।" কাউন্সিল অধিবেশনের শেষপর্যায়ে দলীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রসঙ্গ যখন সাবজেক্ট কমিটিতে আলোচিত হয়, তখন কমিটি সর্বসম্মতভাবে বঙ্গবন্ধুকেই পুনরায় দলের সভাপতির পদে সমাসীন থাকার অনুরোধ জানায়। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে দলের কোন সদস্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, স্পীকার, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলে তিনি আর দলের কর্মকর্তা থাকতে বা নির্বাচিত হতে পারেন না। দেশের স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে প্রস্তাবাকারে গৃহীত সর্বসম্মত বিশেষ অনুরোধে বঙ্গবন্ধু তখন বৃহত্তর জাতীয় ও দলীয় স্বার্থে সাময়িকভাবে দলীয় প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু উপরোল্লিখিত কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন, "প্রথমতঃ দলের গঠনতন্ত্র আমি অমান্য করতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ দেশবাসী আমাকে 'জাতিরজনক' হিসেবে সম্মানিত করেছেন। কি করে আমি একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি থাকি?" শেষ পর্যন্ত ২০শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধুরই প্রস্তাব অনুসারে জনাব এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব কামরুজ্জামান বাণিজ্য মন্ত্রীর পদে ইস্তফা প্রদান করেন।

৪। ২১শে জানুয়ারী তারিখে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ জাতিসংঘের দফতরে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের জন্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে জনাব মুহম্মদ উল্লাহ জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ২৪শে জানুয়ারী জনাব মুহম্মদ উল্লাহ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৮শে জানুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মালেক উকিল জাতীয় সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হন।

৫। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মার্শাল টিটো ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ-যুগোশ্লাভিয়া যুক্ত ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ঢাকা ত্যাগ করেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইসলামী সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব তোহামী ঢাকা আগমন করেন। জনাব তোহামী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতকারের সময় ২৩-২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠেয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান।

৬। জাতীয় সংসদের ১৯৭৪ সালের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব মুহম্মদ উল্লাহর ভাষণ প্রদানের মধ্য দিয়ে। ঐ দিনই

সংসদে পেশ করা হয় ১৬টি অর্ডিন্যান্স ও ১৪টি বিল। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও প্রেস সেন্সারশীপের বিধানসহ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়নে আরও একটি বিল সংসদে পেশ করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিশেষ ক্ষমতা বিলটি সংসদে বিপুল ভোটে পাস হয়। অতঃপর শেষ হয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। উল্লেখ্য যে, বিশেষ ক্ষমতা আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ঐ সময়ের বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে। বঙ্গবন্ধুর সরকারের কোনও চিন্তা বা অভিপ্রায় ছিল না এটিকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষিত রাখার।

৭। ফেব্রুয়ারীর ৫ই থেকে ৭ই তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা হয় আওয়ামী যুবলীগের জাতীয় কাউন্সিল। এর কিছুদিন আগে শেখ ফজলুল হক মণি আমার কাছে প্রস্তাব দেয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হবার জন্যে। আমি তার এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে আমাকে রাজি করানোর জন্যে আমার শাশুড়ীর কাছে শেখ ফজলুল হক মণি ধর্ণা দেয়। শাশুড়ী তো শেখ মণির প্রস্তাবে কোন সায় দেননি বরং তিনি আমাকে এবিষয়ে হুঁশিয়ার করে দেন। শেখ মণি দ্বিতীয়বার তার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে আমি তাকে বললাম, "মণি, তুমি নিশ্চয়ই জান যে, কোন সরকারী বা আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা সরকারী অনুদানপুষ্ট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় কোন রাজনৈতিক দল কিংবা -এর অঙ্গদলের সদস্য হতে পারে না। তোমাকে আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, এই মুহূর্তে আণবিক শক্তি কমিশনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কোন অভিপ্রায় কিংবা বাসনা আমার নেই।" এর জবাবে শেখ মণি বলল, "রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও কল-কারখানাগুলোর সুলতান শরীফসহ অনেক প্রশাসকই তো যুবলীগে যোগদান করেছেন।" আমি তখন বললাম, "এটা তোমাদের শুধু ভ্রান্ত নীতিই নয়, একটি অন্যায় কাজও বটে।" আমার এই কথা বলার পর শেখ মণি আমাকে এ ব্যাপারে আর কোন রকম পীড়াপীড়ি করেনি। যাহোক, ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধুর প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল শুরু হয়। এই কাউন্সিলে শেখ মণি দ্বিতীয়বারের জন্য আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আর নতুন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জনাব সৈয়দ আহমদ।

৮। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার ঢাকা পৌরসভাকে একটি করপোরেশনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নতুন করপোরেশনের মেয়র ও অন্যান্য ওয়ার্ড সদস্যদেরও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটে নির্বাচিত করার কথাও উল্লেখ করা হয় উক্ত সরকারী ঘোষণায়। একই তারিখে বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই প্রথম আরব জাহানের একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের এ ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য, ইরাকই আরব জাহানের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

৯। অনেক লম্ফঝম্ফ ও বাগাড়ম্বর প্রদর্শন করার পর অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৪) তারিখে পাকিস্তান বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। একই তারিখে তুরস্ক ও ইরানের সরকারদ্বয়ও বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করে। পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সংবাদে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ করে। ঐদিন বাংলাদেশ বেতারের দুপুর ১টার সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় যে, বঙ্গবন্ধু লাহোরে ২৩-২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠেয় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ঐদিন বিকেল পাঁচটার দিকে শাশুড়ীর বাসায় গিয়ে দেখি যে, শেখ মণি বঙ্গবন্ধুর লাহোরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে (শাশুড়ীকে) রাজি করানোর চেষ্টা করছে। আমার শাশুড়ী বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না এই কারণে যে, বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। আর এই সুযোগে জনাব ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এসে পাকিস্তানী দালাল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করবে। শাশুড়ী আরও বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানে বাংলাদেশের কোন দূতাবাস খোলা হয়নি, সুতরাং সেখানে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধুর দেখাশুনা করার কর্তৃত্ব থাকবে সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। এসব কারণে আমার শাশুড়ী বঙ্গবন্ধুর ঐ মুহূর্তে পাকিস্তানে যাওয়ার বিরোধিতা করে তাঁর পরিবর্তে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী পরিষদের সর্বজেষ্ঠ্য সৈয়দ নজরুল ইসলামকে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাঠানো যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। শেখ মণি ও আমার শাশুড়ীর মধ্যে যখন এসব কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক ঐ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরেন। অতঃপর শাশুড়ী ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর মতামত বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি বলেন, "আমার লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার আর কোন অবকাশ নেই, কারণ সৌদী আরবের বাদশাহ্ ফয়সাল লাহোর সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়ে আমার নিকট তারবার্তা পাঠিয়েছেন। উপরন্তু, আমার শুভাকাঙক্ষী ও সুহৃদ বন্ধু আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুরারি বুমেদিন তাঁর প্রেসিডেনসিয়াল প্লেন পাঠিয়েছেন আমাকে লাহোর নেয়ার জন্যে এবং ঐ প্লেনটি ইতোমধ্যেই ঢাকায় পৌছেছে। সুতরাং আমার লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা সমীচীন হবে না।" উল্লেখ্য, ঐ দিন বিকেলে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর পরিবর্তে একজন মন্ত্রীকে লাহোরে পাঠানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি এই যুক্তি দেন যে, বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সুরাহার জরুরী তাগিদ হ্রাস পাবে এবং বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থীরা অধিকতর সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হওয়ার সাহস ও প্রেরণা পাবে।

১০। ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগ করেন পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে। লাহোর বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান পাকিস্তানের জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো। পাকিস্তানের তিন সামরিক বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল বঙ্গবন্ধুকে 'গার্ড-অব-অনার' প্রদান করে। অতঃপর উপস্থিত সামরিক বাহিনীর দল বঙ্গবন্ধুকে সম্মানসূচক অভিবাদন প্রদান করে। এই সময় বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। উপস্থিত ভি.ভি.আই.পি'দের সঙ্গে পরিচয় শেষে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের তিন সামরিক প্রধানের নিকট পৌছান। প্রথমে নৌবাহিনীর প্রধান বঙ্গবন্ধুকে সামরিক কায়দায় স্যালুট করে করমর্দন করেন। এরপর বিমান বাহিনী প্রধান বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট করে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন। সবার শেষে ছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান এবং ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জনসাধারণের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক অভিযান ও গণহত্যার নেতৃত্বদানকারী নরপিশাচ জেনারেল টিক্কা খান। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্যালুটের জবাবে একটু হাত ওঠালেন বটে কিন্তু তাঁর দিকে তাকালেনও না কিংবা তাঁর সঙ্গে করমর্দনও করলেন না। সম্মেলন শেষে অতিথি রাষ্ট্র নেতাদের সম্মানে লাহোরস্থ ইতিহাসখ্যাত শালিমার গার্ডেনে প্রদান করা হয় গণসংবর্ধনা। মঞ্চে দেখা গেল ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসের আরাফাত এবং লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মের গাদ্দাফিকে এক এক করে বঙ্গবন্ধুকে সোৎসাহে আলিঙ্গন করতে। পরিশেষে, জনাব ভুট্টো ও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্কের প্রতীকস্বরূপ পরস্পরের হাত ধরে দু'জন একত্রে দু'হাত উঠিয়ে উপস্থিত জনগণের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

১১। লাহোরে একান্তে শীর্ষ বৈঠকের সময় বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোর নিকট প্রস্তাব রাখেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত প্রশ্ন ও সমস্যাদির সুরাহা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে। জনাব ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর এই কথার জবাবে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে ঢাকায় শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব করেন। যাহোক, বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে জনাব ভুট্টোকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানান। অতঃপর ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন এবং ঐ সুযোগে জনাব ভুট্টোর সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় সফরে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ঢাকায় আগমন করেন। রাষ্ট্রপতি মুহম্মদ উল্লাহ ও বঙ্গবন্ধু ঢাকা তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একান্ত শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রাতেই প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধুর সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২রা মার্চ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৭৫টি ভুয়া তাঁত কারখানা বাতিল করা হয়। একই দিনে দুর্নীতির দায়ে বিসিকের চট্টগ্রাম অফিসের

৪ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। এই তারিখে আরও ৪৪টি ভুয়া তাঁত ফ্যাক্টরী বাতিল করা হয়। ৬ই মার্চ তারিখে সিমেন্ট এবং ঢেউটিনের ৯৮১টি ভুয়া ডিলারশীপ বাতিল করা হয়।

১২। ইতোমধ্যে শেরেবাংলা নগরে তখন আধাসম্পন্ন সংসদ ভবনের পাশেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও দফতর ভবনের কাজ সম্পন্ন করে এই চত্বরের নামকরণ করা হয় 'গণভবন'। ইতিপূর্বে পুরাতন গণভবন (বর্তমান 'সুগন্ধা' অতিথি ভবন) প্রধানমন্ত্রীর বৈকালিক অফিস হিসেবে ব্যবস্থা করা হতো। একদিকে এই পুরাতন গণভবনটি আয়তনে ছোট বলে বৈকালিক অফিস ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জন্য এটি উপযুক্ত ছিল না। তাছাড়া পুরাতন 'গণভবনের' প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, কারণ অতীতে আইউব খান ও ইয়াহিয়া খান উভয়েই সেখানে অনেক অপকর্ম, দুষ্কর্ম ও কুকর্ম করেছেন। যাহোক, ৭ই মার্চ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর দফতর আনুষ্ঠানিকভাবে শেরেবাংলা নগরস্থ 'নতুন গণভবনে' স্থানান্তর করা হয়। ঐ দিনই ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন গণভবন তৈরী হয়েছে এই মর্মে সমালোচনা করে দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকায় একটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়। আমার শাশুড়ী কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই বাসভবনে অবস্থান করতে অস্বীকৃতি জানান। এর কারণ হিসেবে তিনি বললেন যে, সরকারী ভবনের আরাম-আয়েশে প্রতিপালিত হলে তাঁর ছেলে-মেয়েদের মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণে অহমিকাবোধ ও উন্নাসিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে ধানমণ্ডীর ৩২ নম্বর রোডস্থ তাঁর নিজস্ব বাড়ীতেই রয়ে গেলেন।

১৩। বঙ্গবন্ধু লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদানকে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তি ও পাকিস্তানীপন্থীরা নিজেদের সাফল্য বলে বিবেচনা করে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অধিকতর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই বেআইনী ঘোষিত জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি প্রভৃতি দলের একশ্রেণীর সদস্য এবং অন্যান্য পাকিস্তানীপন্থীরা বেনামীতে রাজনীতির আসরে নামার প্রয়াসে 'চাঁদ তারা মার্কা' পতাকা নিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রী দল গঠন করেন। এদের এক সভায় 'ভারতের রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং অবিলম্বে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার জন্য তাঁর কাছে দাবী জানানো হয়। শুধু তাই নয়, এই মহল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ এবং কারাগারে আটক দালালদের জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণও দাবী করে। সারা দেশে মসজিদে মসজিদে এবং ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে শুরু হয় তীব্র সরকারবিরোধী প্রচারণা। মার্চের গোড়ার দিকে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ কবি দাউদ হায়দারের একটি কবিতায় মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অশালীন উক্তির অজুহাতে সারাদেশে এটিকে উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী

চক্র চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত এবং শক্তিশালী করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। দাউদ হায়দারের চাকুরীচ্যুত ও গ্রেফতার হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী মহল ও শক্তিগুলোর এই বিক্ষোভ ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘটনায়ই প্রমাণ করে যে, তাদের এহেন কর্মকাণ্ড ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিমূলক।

১৪। ৮ই মার্চ আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুরারি বুমেদিন স্বল্পকালীন রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন। হৃদ্যতা, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ পরিবেশে বঙ্গবন্ধু ও জনাব বুমেদিনের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক হয়। ১১ই মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সেখানে বিশেষ সামরিক কুচকাওয়াজ ও মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে বঙ্গবন্ধু সেখানে সামরিক মহড়া পর্যবেক্ষণ করেন।

১৫। ১৩ই মার্চ তারিখ সকালে বঙ্গবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাসনালী থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর শ্বাসনালী থেকে রক্তক্ষরণের কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে তাঁর ১১ই মার্চ তারিখে কুমিল্লায় সুদীর্ঘ সময় ধরে ধুলোবালির মধ্যে সামরিক পর্যবেক্ষণ করাকে দায়ী করেন। অতঃপর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসার জন্যে গঠিত চিকিৎসা বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁর ফুসফুসের ক্ষতস্থান থেকে এই রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। অতএব তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ফুসফুসের ক্ষতস্থান নিরাময়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোন ওষুধেও বঙ্গবন্ধুর অসুস্থতার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। তাঁর শ্বাসনালী দিয়ে রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে। অতঃপর চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি বিশেষ যন্ত্র বঙ্গবন্ধুর শ্বাসনালী দিয়ে প্রবেশ করিয়ে একটি সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করা ছাড়া তাঁর ফুসফুসনালীর ঐ ক্ষত নিরাময় করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বাংলাদেশে তখন এই বিশেষ যন্ত্র কিংবা উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সার্জন ছিলো না। অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাওয়ার সুপারিশ করা হয়।

১৬। ১৭ই মার্চ তারিখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) কর্তৃক পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আহবান করা হয়। এই দিবসটি ছিলো বঙ্গবন্ধুর ৫৪তম জন্ম দিন। বঙ্গবন্ধু তখন অসুস্থতায় শয্যাশায়ী এবং তাঁর পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় জাসদ-এর সভাপতি মেজর (অবঃ) জলিল বলেন যে, পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁর সমর্থক এবং তাদের নিয়ে জাসদ অস্ত্রবলে সরকারকে উৎখাত করবে। পল্টনে জনসভা শেষে জাসদ-এর নেতাদের নেতৃত্বে একটি বিরাট জঙ্গী মিছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (মন্ত্রীদের এলাকার) মিন্টু রোডস্থ বাড়ীতে আক্রমণ চালায়। তখন সেখানে কর্তব্যরত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের সদস্যদের সঙ্গে মিছিলকারীদের

সহিংস সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে পারস্পরিক গোলাগুলিতে ৬ জন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হন। একই সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত জাসদ-এর সভাপতি মেজর (অবঃ) জলিল এবং সাধারণ সম্পাদক আ.স.ম. আব্দুর রবসহ ১৭ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করেন। এই সহিংস সংঘর্ষের সংবাদে অসুস্থ বঙ্গবন্ধু ভীষণ মর্মাহত হন। গণমিছিলসহ মন্ত্রীর বাসস্থানে সহিংস হামলা করার ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়, কারণ এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি।

১৭। ইতোপূর্বে চিকিৎসকরা অসুস্থ বঙ্গবন্ধুকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দিলে বঙ্গবন্ধু প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এদিকে তাঁর ফুসফুসের রক্তক্ষরণ কোনক্রমেই বন্ধ করা যাচ্ছিলো না। একদিন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ব্যাধির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে আমাকে জানালেন যে, এর চিকিৎসার জন্যে তাঁর বিদেশে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। অতএব এই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুকে রাজি করানোর জন্যে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আমাকে সবিশেষ পরামর্শ দিলেন। যাহোক, অবশেষে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু সম্মত হলেন। কিন্তু এখন সমস্যা হলো তিনি কোন দেশে যাবেন। এই সময় (তৎকালীন) সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেদিন শেখ মণির সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের এই আমন্ত্রণ সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত আলাপ হয়। শেখ মণি বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানান। অতঃপর ১৯শে মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু, আমার শাশুড়ী, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা ও শিশু রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে চিকিৎসার জন্যে মস্কোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসস্থানের দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হলো হাসিনা ও আমার ওপর। ফলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে হাসিনা ও আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ঐ সময় সার্বক্ষণিক হিসেবে অবস্থান নিতে বাধ্য হই।

১৮। মস্কো থেকে আমার শাশুড়ী প্রায় প্রতিদিন ফোনে বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হাসিনাকে অবহিত করতেন। ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিল একমাত্র হাসিনার (আপন) খালাতো ভাই শেখ শহীদুল ইসলাম। শেখ শহীদ তখন ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল। শেখ শহীদ প্রায় সারাদিন বাইরে থাকতো। ওর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হতো শুধু রাতে খাবারের সময়। এই সময় ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিলো—এক গ্রুপ বিভিন্ন সভা-মিছিলে শেখ মণির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতো। শেখ মণির পত্নী আরজু হাসিনার নিকট এতদবিষয়ে অভিযোগও করেছিল কয়েকবার। একদিন হাসিনা শেখ শহীদকে এবিষয়ে প্রশ্ন করলে সে জানায় যে, ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান (বর্তমানে প্রগশের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা) এবং তার সমর্থকরা শেখ মণিবিরোধী তৎপরতার জন্য দায়ী। শেখ শহীদ আরও বলে যে, শেখ মণিই শফিউল আলম প্রধানকে ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদক নির্বাচিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং জনাব আলম ও তার সমর্থকদের ওপর তার (শেখ শহীদের) কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পরদিন, আরজু হাসিনার নিকট ফোনে শেখ শহীদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ করলে সে হাসিনা তাকে (শেখ শহীদের বক্তব্য উল্লেখ করে। ফোনে কথাবার্তার এই পর্যায়ে হাসিনার শেখ শহীদের বক্তব্যকে সমর্থন করার কারণে আরজু রাগে ফেটে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ টেলিফোন ছেড়ে দেয়। তখন আরজু এও বলে যে, সে হাসিনার সঙ্গে আর কোনদিন কথা বলবে না। উল্লেখ্য, হাসিনা ও আরজুর মধ্যে পরস্পর বোনের সম্পর্ক এবং ওরা সমবয়সী দুই বন্ধু। এই ঘটনার পর শেখ মণির বাসা থেকে টেলিফোন আসা বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর মস্কো যাত্রার পর থেকে শেখ মণি একবারও আমাদের দেখতে না আসায় তখন আমি শুধু মনঃক্ষুণ্ণই হইনি, অত্যন্ত বিস্মিতও হই।

১৯। চিকিৎসার জন্যে বঙ্গবন্ধুর মস্কোয় অবস্থানকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৪ঠা এপ্রিল সকাল সাড়ে আটটার দিকে শেখ কামাল মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন করে। হাসিনা ও আমি তখন নাস্তা খাচ্ছিলাম। কামালের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কুশলাদি সম্পর্কে অবহিত হই। অতঃপর সাড়ে নয়টার দিকে কামাল নাস্তা খেতে শুরু করে। হাসিনা ও আমি কামালের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, ঠিক এই সময় কামালের কক্ষে টেলিফোন বেজে ওঠে। অতঃপর কামাল টেলিফোন রিসিভ করার জন্যে ওর কক্ষে যায়। অল্পক্ষণ পরেই কামাল আমাদের কাছে এসে জানায় যে, আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের ৭ জন সদস্যকে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে ওর জনৈক বন্ধু ওকে টেলিফোনে ঐ সময় অবহিত করেছে। অতঃপর হাসিনা ও আমার আপত্তি সত্ত্বেও কামাল নাস্তা অসমাপ্ত রেখে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে চলে যায়। এদিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হাসিনা এখানে সেখানে টেলিফোন করে ঐবিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করে। বেলা বারটার দিকে কামালকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মণির বঙ্গবন্ধুর বাসায় আসার সংবাদ পাই। শেখ মণি প্রায় দেড়ঘণ্টা যাবত কামালের সঙ্গে নীচের বসার ঘরে গোপন আলাপ করে চলে যায়। ঐ সময় এদের একজনও হাসিনা কিংবা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কোন আলাপ করেনি। দুপুরে খাবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ৭ জন ছাত্রের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কামাল আমাদের অবহিত করে। হত্যাকাণ্ডে নিহত ঐ ৭ জন ছাত্রলীগের সদস্য সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিল। ঐ রাতে ভোর ২টার দিকে হল থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে মহসিন হলের 'কমনরুমের' পাশে ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপের কয়েকজন সদস্য স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। যারা ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি জোগাড় করে কামাল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে বলে আমাদেরকে আশ্বাস দেয়। কামাল আরও বলে, "দোষী ব্যক্তিদের কাউকেও ক্ষমা করা হবে না।" এর দিন দুয়েক

পর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানসহ ১৫ জন ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন ছাত্রকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

২০। ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শুরু হয়। ৯ই এপ্রিল তারিখে এই ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন সমাপ্ত হয়। অতঃপর ঐ দিনেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের যুদ্ধাপরাধীদের অবশিষ্ট ১৯৫ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করা হয়। ১১ই এপ্রিল তারিখে মস্কোতে প্রায় ২১ দিন চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। দেশে ফিরেই ১৩ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে সারাদিন আলাপ পরামর্শ করেন। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু গুপ্তহত্যা এবং সমাজবিরোধী তৎপরতা বন্ধ করার লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার এবং সমাজবিরোধীদের দমনের জন্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

২১। এদিকে কয়েকটি ডানপন্থী এবং চরম বামপন্থী মাওবাদী রাজনৈতিক দল মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর সরকারবিরোধী একটি যুক্তফ্রান্ট গঠনের উদ্যোগ নেয়। অতঃপর ১৪ই এপ্রিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ (ভাসানী), জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক–কৃষক সাম্যবাদী দলের সমন্বয়ে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' নামে ৬–দলীয় ঐক্যজোট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাতের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার সংগ্রাম ও তৎপরতা পরিচালনার দৃঢ় সংকল্পও ব্যক্ত করা হয় এই ঘোষণায়। অতঃপর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ৬–দলীয় ঐক্যজোট (যুক্তফ্রন্ট) ২৩শে এপ্রিল পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে। উক্ত জনসভায় মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সরকার উৎখাত এবং আওয়ামী লীগকে নির্মূল করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

২২। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝির ঘটনা। শাশুড়ী দুপুরে আমার অফিসে গাড়ী পাঠালেন আমাকে তাঁর বাসায় নেয়ার জন্যে। হাসিনা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই ছিল। খাবার সময় তিনি আমাকে একটি ইংরেজীতে লেখা চিঠি দিলেন পড়ে দেখার জন্যে। শাশুড়ীকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন ব্রিগেডিয়ার লিখেছেন উক্ত চিঠিটি। এটি লন্ডন থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে। এর একটি অনুলিপি শেখ মণির নিকটও পাঠানো হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার সাহেব বঙ্গবন্ধুর শ্বাসনালী থেকে রক্তক্ষরণের সংবাদে উৎকণ্ঠিত হয়ে লিখেছেন উক্ত চিঠি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, লাহোরে ২৩–২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তানে উপস্থিতির সুযোগে তাঁর শরীরে গোপনে অনুপ্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে ক্যান্সার জাতীয় মারাত্মক ব্যাধির ভাইরাস প্রস্তুত করার

নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ঐ ভাইরাস এমন একটি সূঁচের ভেতর সংরক্ষিত থাকবে যা হাতের তালুতে কিংবা আঙুলে সংগোপনে রাখা যায়। উক্ত ভাইরাস ভর্তি সূঁচটি জুলফিকার আলীর হাতের তালুতে কিংবা আঙুলে স্থাপন করা হবে যাতে শেখ মুজিবের সঙ্গে ভুট্টোর করমর্দন কিংবা আলিঙ্গনের সময় সেটিকে তাঁর (শেখ মুজিবের) শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়। একজন মুসলমান হিসেবে অপর একজন মুসলমানের ক্ষতি করার এ প্রস্তাবে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত চিঠিটিতে। সম্ভবতঃ, অন্য কোন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এ জাতীয় ভাইরাস প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তা শেখ সাহেবের শরীরে ঐ সময়ে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বলে তিনি সন্দিহান। পরিশেষে, ব্রিগেডিয়ার সাহেব বঙ্গবন্ধুর রোগমুক্তির জন্য কামনা করেছেন আল্লাহর দরবারে।

২৩। ৪ঠা মে তারিখে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের খাদ্যদ্রব্য পরিস্থিতি, অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয় উক্ত সভায়। এ সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোট কথা, এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতি। অতঃপর দেশের স্বার্থ, বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পরিপন্থী কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুর সরকার ১০১ জন রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে।

২৪। ১২ই মে ভারত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করেন। ঐ দিনেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই মে নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ইন্দিরা-মুজিব আনুষ্ঠানিক শীর্ষ বৈঠক। এর পর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই মে ভারত ও বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে মতৈক্য ব্যক্ত করে। ১৬ই মে তারিখে ভারত ও বাংলাদেশ একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। উক্ত যুক্ত ঘোষণায় বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী কয়েকটি ছিটমহল সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বেরুবাড়ী ছিটমহল ভারতের এবং দহগ্রাম, আংগোরপোতা, আসালং, লাঠিয়াল ও পাথুরিয়া ছিটমহলগুলোকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দহগ্রাম ও আংগোরপোতা ছিটমহল দু'টির সঙ্গে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হিসেবে ভারতের তিনবিঘা (দৈর্ঘে ১৭০ মিটার, প্রস্থ ৮০ মিটার) আয়তনের একটি

করিডোর চিরস্থায়ী মেয়াদে বাংলাদেশকে ইজারা দেওয়ার অঙ্গীকারও করা হয় উক্ত যুক্ত ঘোষণায়। ১৬ই মে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু দিল্লী থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

২৫। ১৭ই মে তারিখে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদের বৈঠক শুরু হয়। ঐ সময় এক সন্ধ্যায় হাসিনা ও ছেলেমেয়েসহ আমি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিলাম। তখন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প-কারখানা স্থাপন ও পুঁজি বিনিয়োগে সরকারের নীতি প্রণয়নের সুপারিশমালাসম্বলিত একটি স্মারকলিপি বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশ করেন। বাংলাদেশ সরকার অতি শিগগির শিল্প ও পুঁজিবিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করবে বিধায় বঙ্গবন্ধু ঐ স্মারকলিপিটি আমাকে দিয়ে ঐ রাতেই সে সম্পর্কে আমাকে মতামত দিতে বলেন। আমি স্মারকলিপিতে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ গভীর মনোযোগে পড়ে এবং চিন্তা করে সে রাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খাওয়ার পর তাঁকে আমার মতামত জানাই। বঙ্গবন্ধু তৎক্ষণাৎ আমার মতামতের সঙ্গে ঐকমত্য ব্যক্ত করে যে সমস্ত বিষয়ে আমার ইতিবাচক সম্মতি রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে দিতে বলেন। আমার এতদবিষয়ে মতামত দেয়ার আইনগত অধিকার, পদমর্যাদা কিংবা ক্ষমতা না থাকার কারণে আমি সে সমস্ত বিষয়ে আমার মতামত পরদিন টাইপ করে দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি তাতে সম্মত হন। অতঃপর পরদিন অফিসে আমি আমার আরও কয়েকজন উর্ধ্বতন সহকর্মীর সঙ্গে তৎবিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করি এবং সেদিন রাতেই তা বঙ্গবন্ধুকে দেখাই। সেটি পড়ে বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন যে, তাঁর সরকারী কোন উপদেষ্টা কোন বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক পরামর্শ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে পরদিনই আমার এই প্রতিবেদন তাঁর অর্থনৈতিক বিষয়ক সচিব ডঃ সাত্তারকে দিয়ে আসতে বলেন। বঙ্গবন্ধু আরও বললেন, "ডঃ সাত্তারকে বলবে, তিনি যেন তোমার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকারী প্রস্তাব তৈরী করে আমার বিবেচনার জন্য পেশ করেন যথাশীঘ্রই, বিশেষ করে, শিল্প বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন শুরু করার পর্যাপ্ত সময়ের আগেই।"

২৬। ৩রা জুন (১৯৭৪) তারিখে সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ঐ তারিখেই সংসদে ৩টি শোক প্রস্তাব ও ৯টি বিল পেশ করা হয়। ৬ই জুন তারিখে বাংলাদেশকে জাতিসংঘে সদস্যপদ প্রদানের প্রশ্নে স্বস্তি পরিষদের আরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই জুন (১৯৭৪) তারিখে অনুষ্ঠিত স্বস্তি পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের জন্যে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। ১৫ই জুন তারিখে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি.ভি. গিরি ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। ১৮ই জুন তারিখে শ্রী ভি, ভি, গিরি সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেন।

২৭। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে দেশের প্রায় সর্বত্র প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। অতিবৃষ্টির কারণে সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলসমূহ বন্যায় প্লাবিত হয় এবং

ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই দেশে খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ১৯৭৩ সালে প্রথম অনাবৃষ্টিতে এবং পরে বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেশে এই খাদ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ। এই বছরে একই কারণে ভারতেও খাদ্য ঘাটতি হয়েছিল। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ই.ই.সি সদস্যভুক্ত কয়েকটি দেশ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য আমদানী করার জন্যে। কিন্তু চোরাচালানী, মজুতদারী, কালোবাজারীদের এবং দুষ্কৃতকারীদের খাদ্যগুদামে অগ্নিসংযোগ ও খাদ্য বহনকারী ট্রাক, ট্রেন ও জাহাজ ধ্বংস করার মত অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে দেশে সৃষ্টি হয় দারুণ খাদ্য সঙ্কট। উপরন্তু, দুষ্কৃতকারী ও দুর্বৃত্তদের সশস্ত্র সহিংস কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে নাজুক ও অস্বস্তিকর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে নির্ধারিত ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর।

২৮। ২৭শে জুন (১৯৭৪) তারিখে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন। তাঁর সঙ্গে সর্বমোট সফরসঙ্গী ছিলেন ১০৭ জন। স্বাধীন বাংলাদেশে জনাব ভুট্টোর এটাই ছিল প্রথম সফর। জনাব ভুট্টোর ঢাকা পৌঁছানোর আগেই পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি অগ্রবর্তী দলকে পাঠানো হয়েছিল। তখন বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, এই অগ্রবর্তী দলের লোকজন পি.ডি.পি, মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের মধ্যে প্রচুর উপঢৌকন ও অর্থকড়ি বিতরণ করেন। এসব করা হয়েছিল যাতে জনাব ভুট্টো ভালো সংবর্ধনা পান সে জন্যে। যাহোক, বঙ্গবন্ধুর সরকার একজন বিদেশী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হিসেবে জনাব ভুট্টোকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার সেই ভয়াল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে জনাব ভুট্টোর মুখ্য ভূমিকার কথা বাংলার মানুষ তখনও ভুলে যায়নি। তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় জনাব ভুট্টোর ঢাকায় আগমনের দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কোন রকম মন্তব্য ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার সামরিক বাহিনীর ভয়াবহ বর্বরতা ও গণহত্যার কিছু আলোকচিত্র প্রকাশে। বিমান বন্দরে ঠিকই প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল জনাব ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে। তবে এই সংবর্ধনাকারীদের অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তানী নাগরিক (অবাঙালী) এবং বাংলাদেশের পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থক। জনাব ভুট্টোর এই সফরকালেও তাঁর বাঙালী বিরোধী ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে স্বভাবতই জনমত বিক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্তস্তবক অর্পণ করতে গেলে এক বিরাট জনতা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা "খুনী ভুট্টো ফিরে যাও" বলে শ্লোগান দেয়।

২৯। ২৮শে জুন প্রথমে কোন উপদেষ্টা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু ও জনাব ভুট্টোর একান্তে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ বঙ্গবন্ধু ও জনাব ভুট্টোর মধ্যে সুদীর্ঘ ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাকালে বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙালীদের) পাকিস্তানে ফেরত নেয়া এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য পরিসম্পদ পরিশোধের প্রশ্ন তুলে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাছে ৫ হাজার কোটি টাকা দাবী করেন। কিন্তু জনাব ভুট্টো এই মৌলিক ইস্যুগুলো এড়িয়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। জবাবে বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোকে সাফ জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অবাঙালীদের পাকিস্তানে ফেরত না নেওয়া এবং পাঁচ হাজার কোটি টাকা পরিসম্পদ পরিশোধ না করা পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হবে না। জনাব ভুট্টো ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ সময়কার ঘটনাবলীকে ভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করে তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার কথা অস্বীকার করার অপচেষ্টা করেন। এর জবাবে, জনাব ভুট্টোর সম্মানে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোকে এবিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "ইচ্ছা করলেই ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না।" অতঃপর ২৯শে জুন তারিখের পত্র-পত্রিকায় বলা হয় যে, বাংলাদেশে আটকেপড়া ৫ লাখ পাকিস্তানী নাগরিক (অবাঙালীদের) পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া এবং বাংলাদেশের পাওনা পরিশোধের জন্য উথাপিত বাংলাদেশের দাবীর প্রশ্নে ভুট্টোর অনমনীয় মনোভাবের দরুন মুজিব-ভুট্টো আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

৩০। জনাব ভুট্টো ঢাকায় এসে (পিকিংপন্থী) বামপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক (পাকিস্তানপন্থী) ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন ন্যাপ (ভাসানী)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা মশিউর রহমান (যাদু মিয়া)। বিভিন্ন সূত্রের মতে জনাব মশিউর রহমান জনাব ভুট্টোকে অনুরোধ করেছিলেন কোন অবস্থাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সব বিষয়ে ফয়সালা না করার জন্যে। ২৯শে জুন বাংলাদেশ ত্যাগ করার প্রাক্কালে গণভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বাংলাদেশের দায়দেনা ও পাওনা সম্পর্কে বলেন, "I have not brought a blank cheque।" পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনকালে প্লেনে জনাব ভুট্টো এক সাংবাদিককে বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়াদির ব্যাপারে সমঝোতা না করে তিনি যুক্তিযুক্ত কাজ করেছেন। অথচ পাকিস্তানে পৌঁছেই জনাব ভুট্টো এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "বাংলাদেশে আমার তাৎপর্যপূর্ণ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।"

৩১। ২৯শে জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি পথ মিছিল বঙ্গভবনের দিকে যাওয়ার পথে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে

মওলানা ভাসানী ৩০শে জুন তারিখে সারা ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করার জন্যে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঐ দিন বায়তুল মোকাররাম প্রাঙ্গণ থেকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি জঙ্গী মিছিল বের করার চেষ্টা চালানো হলে পুলিশের হস্তক্ষেপে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ২৯শে জুন রাতে মওলানা ভাসানীকে জনাব মশিউর রহমানের মগবাজারস্থ বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর ঐ রাতেই তাঁকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ রাখা হয়। মওলানা ভাসানীর গ্রেফতার করার প্রতিবাদে তাঁর নেতৃত্বাধীন ৬-দলীয় ঐক্যফ্রন্ট সারা ঢাকায় ৫ই জুলাই তারিখে হরতাল পালনের আহবান জানায়। কিন্তু সেদিন ঢাকায় কোন হরতাল পালিত হয়নি।

৩২। ৬ই জুলাই (১৯৭৪) তারিখে গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দেশের বুক থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী তৎপরতার মূলোচ্ছেদ, চোরাচালান, মজুতদারী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী নিরোধ ও গুপ্তঘাতকদের হাতিয়ারবাজির অবসান ঘটিয়ে জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে কঠোরতর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত বৈঠকে দুষ্কৃতকারীদের সমাজবিরোধী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ দমনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ফাঁসি ও ফায়ারিং স্কোয়াডের ব্যবস্থা করার জন্যে আইন প্রণয়নেরও প্রস্তাব করা হয়। এই বৈঠকের পরেই বঙ্গবন্ধু প্রশাসন যন্ত্রকে অধিকতর সচল ও সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে ৭ই জুলাই মন্ত্রী পরিষদ থেকে ছয়জন মন্ত্রী এবং তিনজন প্রতিমন্ত্রীকে অপসারণ করে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী পরিষদের পুনর্বিন্যাস করেন। যাঁরা মন্ত্রী পরিষদ হতে অপসারিত হন তাঁরা ছিলেন সর্বজনাব শামসুল হক, মোল্লা জালালউদ্দিন, মতিউর রহমান, শেখ আব্দুল আজিজ, জেনারেল (অবঃ) এম.এ.জি. ওসমানী, ডঃ মফিজ চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, শাহজাহান আব্দুল মালেক এবং বেগম নূরজাহান মুর্শেদ। ঐ দিনই বঙ্গবন্ধুর সরকার কতিপয় বিশেষ ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের নাগরিকদের স্থল, নৌ ও বিমান পথে বিদেশ যাত্রার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ৯ই জুলাই তারিখে ঘোষণা করা হয় যে, চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনীকে সীমান্তে পাঠিয়ে সীমান্ত সীল করে দেবার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ১১ই জুলাই চারজন উচ্চপদস্থ আমলাকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয় এবং চট্টগ্রামে একজন নব্য কোটিপতি ও তার কতিপয় সহযোগীকে গ্রেফতার করার কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। ১৬ই জুলাই শিল্পমন্ত্রী নতুন পুঁজি বিনিয়োগ নীতি ঘোষণা করেন। এই পুঁজি বিনিয়োগ নীতিতে ব্যক্তিমালিকানায় পুঁজি বিনিয়োগ সিলিং ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ১৫ বছরের মধ্যে এরূপ কোন শিল্প জাতীয়করণ না করার অঙ্গীকার করা হয়। ১৮ই জুলাই জনস্বার্থের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকা এবং দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকার ডি.আই.জি.-কে

সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। ২২শে জুলাই (১৯৭৪) তারিখে সংসদে পাশ হয় চোরাচালান, মজুতদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্য-কলাপের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদানের বিধান সম্বলিত আইন।

৩৩। জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান এবং চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধের উদ্দেশ্যে সমাজ শত্রুদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক উপরোক্ত কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত বিভিন্ন মহল সংঘবদ্ধভাবে সরকারী প্রয়াস বানচালের চক্রান্ত জোরদার করার কাজে কৃতসংকল্প হয়। ভোগ্যপণ্য বাজারে ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সঙ্কট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। একপর্যায়ে চাউলের সের দশ-পনের টাকা, লবণের সের বিশ টাকা, সরিষার তেল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা এবং শুকনো মরিচের সের আশি টাকায় পৌঁছায়। একইভাবে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনী দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য।

৩৪। বলাবাহুল্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর তরুণ যুবকদের একটি বিরাট অংশকে নিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে জাসদ হয়ে দাঁড়ালো বঙ্গবন্ধুর সরকারবিরোধী যে কোন ধরন ও চরিত্রের লোকের আশ্রয়স্থল। ফলে, 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' কায়েমের উদ্দেশ্যে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' করার জন্যে যে জাসদের জন্ম পরিশেষে তা হয়ে দাঁড়ায় এক বহুশ্রেণী ভিত্তিক সংগঠন। এমনকি দুর্নীতির অভিযোগে সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনের পদচ্যুত কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের ঠাঁই মিললো জাসদ-এ। এ ছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাজিত এবং স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থীরা বঙ্গবন্ধুর সরকারের বিরুদ্ধে জাসদকে ব্যবহার করে। স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল, পুঁজিপতি ও শোষিত শ্রেণীর লোকেরা স্বস্বার্থে জাসদকে সাহায্য-সহযোগিতা ও অর্থ-সম্পদ প্রদান করে। অতঃপর ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং আসন্ন খাদ্য সঙ্কটের মুখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) কর্নেল (অবঃ) আবু তাহেরের নেতৃত্বে অতি গোপনে সারা দেশব্যাপী গড়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও প্রাক্তন সৈনিকদের সমবায়ে সশস্ত্র 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। শুধু তাই নয়, জাসদ, কর্নেল (অবঃ) তাহেরের সহায়তায় অতি গোপনে সংগঠিত করতে থাকে বাংলাদেশের প্রতিটি সেনানিবাসের সৈনিক ভাইদেরকে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' নামে। উল্লেখ্য, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীমুক্ত 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের সংকল্প নিয়ে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে গঠিত গুপ্ত সংগঠন পূর্ব বাংলার 'সর্বহারা পার্টি'-এর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দিন যথাযথ সংযোগ রক্ষা করতেন বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতা কর্নেল (অবঃ) তাহেরের সঙ্গে।

৩৫। জনাব ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের আট সপ্তাহ্ পর আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ আফগানিস্তান ও ইরানে সফরে যান। আফগানিস্তান ও ইরান সফর শেষে খন্দকার মোশতাক আহমদ বেসরকারীভাবে জেদ্দায় গমন করেন। ঐ সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ ইরানে গণচীনের নেতা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেদ্দায় গিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ পাকিস্তানী দলের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। খন্দকার মোশতাক আহমদের এ সফর সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মঞ্চ নেপথ্যে বলা হয়, "গত বছরে ইত্তেফাকের একটি নিজস্ব সংবাদে বলা হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক স্থানে বাংলাদেশ সরকারের জনৈক নেতার সহিত চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং চীনা নেতার তরফ হইতে এ ব্যাপারে বিশেষ অনুকুল সাড়া পাওয়া যায়। গত ২৪শে মে'র নিবন্ধে আমরা তৎসম্পর্কে লিখিয়াছিলাম, বাংলাদেশের সেই নেতা তখন নিজের নাম প্রচারে অস্বীকৃতি জানাইলেও আমরা পরবর্তীকালে জানিতে পারি যে, বাংলাদেশ সরকারের সেই নেতাটি ছিলেন আমাদের বিচক্ষণ বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। আর অকুস্থলটি ছিল বাগদাদ। আর আফগানিস্তান সফরকালে কাবুলে চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকারের কথা জানা গিয়াছে। এটা অনস্বীকার্য যে, তিনি 'ফরেন ট্রেড' করার উপলক্ষে বেশ কিছু 'ফরেন এ্যাফেয়ার্সে'র কাজও করিয়াছিলেন এবং তাহা করিতে গিয়া তিনি হয়তো কোন কোন মহলের বিরাগভাজনও হইয়াছিলেন।" খন্দকার মোশতাকের উক্ত বিদেশ সফরের পর পরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কাকুলের মিলিটারী একাডেমীতে এক ভাষণে বলেন, "Soon some changes are going to take place in this region. (অতি শীগগির এতদঞ্চলে কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে)।"

৩৬। ১৯৭৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসদুটোতে বাংলাদেশের জনজীবনে এক নজিরবিহীন খাদ্য-বস্ত্রসহ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যজনিত বিপর্যয়ের পাশাপাশি নেমে আসে আর এক অভিশাপ—সর্বনাশা বন্যা। ৫ই জুলাই রংপুর, সিলেট, পাবনা ও জামালপুর জেলাগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ৮-ই জুলাই তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে এই সমস্ত জেলার বন্যাকবলিত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। ১৭ই জুলাই দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করায় বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। ২৩শে জুলাই দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির সংবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯শে জুলাই তারিখে রংপুর জেলার বন্যা দুর্গত এলাকাসমূহে খাদ্য-বস্ত্রসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তীব্র অভাবের কথা বিভিন্ন পত্র-পতিকায় প্রকাশিত হয়। ৩০শে জুলাই ঢাকাস্থ বিভিন্ন বিদেশী মিশন ও দূতাবাস বন্যার ধ্বংসলীলার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ৩১শে জুলাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গণভবনে ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হয়।

৩৭। ১লা আগস্ট বন্যা পরিস্থিতির অবনতিতে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলাদু'টির সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ২রা আগস্ট দেশের বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেনা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ৩রা আগস্ট মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকে যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে দেশের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর সরকার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোর জনগণকে সাহায্য ও তাদের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌছানো ও বিতরণের জন্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীত্রয়কে নিয়োগ করে। ৪ঠা আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে সিলেট জেলার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। ৫ই আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ হেলিকপ্টারে ময়মনসিংহ জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। ৬ই আগস্ট তারিখে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে মেঘনা নদীর পানি বিপদসীমার পাঁচ ফুটেরও উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ভয়াবহ এই বন্যায় বিধ্বস্ত হয় অগণিত ঘরবাড়ী এবং বিনষ্ট হয় বিস্তীর্ণ এলাকার জমির ফসল। ৮ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত এক সরকারী তথ্য বিবরণীতে এ যাবত বন্যায় সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানী হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়। ৯ই আগস্ট ঢাকার বন্যা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে। ১০ই আগস্ট তারিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেশের সার্বিক বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকার উর্ধ্বে হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। ১১ই আগস্ট রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১২ই আগস্ট তারিখে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা খাদ্য-সাহায্য কর্মসূচীর অধীনে বাংলাদেশের জন্য ১০ লাখ ডলার মঞ্জুর করে।

৩৮। ১৪ই আগস্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বলা হয় যে, দেশে ১৯৭৪ সনের বন্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৫৫ সনের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বলা হয়। ১৮ই আগস্ট তারিখে জাতীয় রেডিও-টেলিভিশনের এক বিশেষ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বন্যাজনিত বিপর্যয়ের মোকাবেলায় সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের প্রতি আকুল আবেদন জানান। উক্ত ভাষণে তিনি বিদেশী রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিও আবেদন জানান বাংলাদেশের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রপীড়িত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে খাদ্য-বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্যে। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারযোগে রংপুর জেলার চিলমারী মহকুমার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারে ফরিদপুর জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুরারি বুমেদিন বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত মানবতার সাহায্য করার জন্যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান। ১৬ই সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ার সরকার বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যে ১০লাখ ডলার অনুদান প্রদানের কথা ঘোষণা করে। ২২শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু বন্যার্তদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বন্যা

উপদ্রুত এলাকাগুলোর প্রতিটি মহল্লা ও গ্রামে লংগরখানা খোলার জন্যে দলমত নির্বিশেষে সকল মহল এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

৩৯। ইতোপূর্বে (১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষাবস্থা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে নিউইয়র্কে যেতে হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্যে। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত উল্লাসমুখর প্রতিনিধিবর্গের তুমুল করতালির মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ দেন মাতৃভাষা বাংলায়। বঙ্গবন্ধুই প্রথম ব্যক্তি যিনি জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই বলেন, "আজই এই মহামান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালী জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালী জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালী জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবেন। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে।"

৪০। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ..."আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে আমরা সামগ্রিক ধ্বংস, ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারী ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরী অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে কারিগরীবিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে

তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরীভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে।"

৪১। অতঃপর বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যাজনিত ও অন্যান্য কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পর পর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ। আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতোফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহবান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহ এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু বিঘ্নিত হয় নাই, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মত দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে।" নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে জাতিসংঘের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধু মাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটা স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য জীবন যাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরী ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্র সজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।"

৪২। অতঃপর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোষ মীমাংসার

পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতঃপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তির কাঠামো এবং স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া, আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সঙ্গে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোন উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যতে শান্তি ও স্থায়ীত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোন পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোন দর কষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।" পরিশেষে, বঙ্গবন্ধু বলেন, "জনাব সভাপতি, মানুষের অজয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতেছি। আমাদের মত যেসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি, কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" জাতিসংঘে এই ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সঙ্গে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

৪৩। কোন দেশের সরকার প্রধান যখন প্রথমবারের মত জাতিসংঘে ভাষণ দিতে যান তখন সাধারণতঃ প্রটোকল প্রথানুযায়ী তাঁকে সৌজন্যমূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারের ফরেন মিনিষ্ট্রি থেকে বার বার অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর ওয়াশিংটন সফর সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে যখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যাই হোক না কেন বঙ্গবন্ধু তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য ওয়াশিংটন যাবেনই, তখন নিরুপায় হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারের জন্য ১লা অক্টোবর তারিখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড বঙ্গবন্ধুকে শীতল ও আন্তরিকতাহীন অভ্যর্থনা জানান। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী

আলোচনা যতক্ষণ চলার কথা ছিল তার আগেই মিস্টার ফোর্ড আলোচনা শেষ করে দেন। আরও উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার তখন ওয়াশিংটনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতও করেননি, যদিও এর আগে তিনি নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের দফতরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এহেন আচরণে বঙ্গবন্ধু অপমানিত বোধ করেন এবং মর্মাহত হন। বঙ্গবন্ধুর মনে আঘাত লেগেছিল আরেকটি কারণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেছিলেন, "Bangladesh is an international basket case।" নিজের দেশ সম্পর্কে ডঃ কিসিঞ্জারের এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ বক্রোক্তি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। কিন্তু তিনি কিছুও বলেননি তখন। এবার ওয়াশিংটন সফরের সুযোগে বঙ্গবন্ধু ডঃ কিসিঞ্জারের ঐ বক্রোক্তির জবাব দিলেন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই। ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কেউ কেউ বাংলাদেশকে 'International basket case' বলে উপহাস করেন। কিন্তু বাংলাদেশ basket case নয়। দুইশো বছর ধরে বাংলাদেশের সম্পদ লুট করা হয়েছে। বাংলাদেশের সম্পদেই শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে লন্ডন, ডান্ডি, ম্যাঞ্চেস্টার, করাচী, ইসলামাবাদের। ....আজো বাংলাদেশে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে। একদিন আমরা দেখাবো বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।"

৪৪। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু চার দিনের জন্য ইরাকে রাষ্ট্রীয় সফরে বাগদাদ পৌছান ৩রা অক্টোবর তারিখে। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু ইরাকী শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোপ–আলোচনা করেন। ৬ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট বকরের সঙ্গে একান্তে আলাপ–আলোচনা করেন। ঐ দিনই বাংলাদেশ ও ইরাকের মধ্যে দু'টো পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৭ই অক্টোবর তারিখে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাক সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৪৫। ৮ই অক্টোবর তারিখে খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO) বাংলাদেশকে তার খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্যে জরুরী ভিত্তিতে যথাসাধ্য খাদ্যশস্য প্রদানের আশ্বাস দেন। ১০ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে সহায়তা করার জন্যে ৫ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের কথা ঘোষণা করে। একই তারিখে কাতার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্যে বাংলাদেশকে ১৫ লাখ ডলার অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। ১৬ই অক্টোবর জাপান বন্যার্তদের ত্রাণ সামগ্রী প্রদান ও পুনর্বাসনের জন্যে ৮০ লাখ ডলার অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

৪৬। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সবচেয়ে সংকটময় সময় ছিল আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—এই তিন মাস। জুলাই ও আগস্ট মাসে নজিরবিহীন বন্যায় বিপুল শস্যহানীসহ

সারাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীরও বেশী লোকের ঘরবাড়ী ও বিষয়-আশয় বিধ্বস্ত হয়। ফলে, দেশের প্রায় ৪ কোটি লোক সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। বৃহত্তর রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলাগুলোর বন্যা উপদ্রুত এলাকার লোকেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থ, অন্ন, বস্ত্র ও ওষুধ-পত্রের অভাবে জর্জরিত লাখ লাখ মানুষ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে কষে বেঁচে থাকার কঠিন সাধনা চালাতে থাকে। বাঁচার দুর্নিবার তাগিদেই অগণিত মানুষ পথে নেমে আসে। গ্রাম থেকে গঞ্জে, গঞ্জ থেকে বন্দরে-শহরে গিয়ে আছড়ে পড়ে নিরন্ন মানুষের অন্তহীন মিছিল। জীবন্ত কংকালের মিছিল। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, রাজপথে, জনপদে অযুত মানুষের সকরুণ কণ্ঠ কেবলই "আমাদের অন্ন দাও, রুটি দাও, ওষুধ-পত্র দাও, বস্ত্র দাও" বলে আর্তনাদ করে ফিরতে থাকে। এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী ও অন্যান্য সরকারী সংস্থা, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, দলীয় কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর লোকদের নিয়োগ করাসহ দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের লোকদের প্রতি আকুল আবেদন জানান। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর সরকার। বিদেশ থেকে জরুরী ভিত্তিতে আমদানীকৃত খাদ্য-শস্য দ্রুততার সঙ্গে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় রিলিফের গম। বাংলাদেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে ৫৭৫৭টি লংগরখানা খোলা হয় এবং লংগরখানাগুলোতে নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র ও বস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যে গাড়ী, লঞ্চ, বিমান ও হেলিকপ্টারে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। এতদসত্ত্বেও, সরকারের হিসাব মতেই দেশে দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকাসমূহে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার লোকের অনাহারে ও অনাহারজনিত বিভিন্ন রোগে প্রানহানী ঘটে। এই সময় বঙ্গবন্ধু সারাক্ষণ থাকতেন বিমর্ষ ও মর্মাহত। তিনি সারা দুর্ভিক্ষকাল ভাতের পরিবর্তে কেবল রুটি খেয়ে কাটালেন এই বলে, "দেশের জনগণ ভাত পাচ্ছে না, আমি ভাত খাবো কোন অধিকারে।"

৪৭। ১৯৭৪ সালের এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে দেশ ও বিদেশের কতিপয় বিশেষ মহলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল বলে তখন দেশ-বিদেশের কিছু পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সনের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর সরকার খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য অস্ট্রেলিয়া, কয়েকটি ই.ই.সি সদস্যভুক্ত দেশ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে। চলতি বাজার দরেই এসব খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের কথা ছিল। অর্থ যোগান দেওয়ার কথা ছিল সুদহারের ঋণ থেকে। ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মে বঙ্গবন্ধুর সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানীগুলো সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশে পৌছানোর জন্যে স্থিরকৃত দু'টো বড় চালানের বিক্রয় বাতিল করে। বাংলাদেশ ঐ সময় বহু

চেষ্টা করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঋণ লাভে ব্যর্থ হয়। একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পি.এল-৪৮০ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠানো বিলম্বিত করে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বাংলাদেশ কিউবার কাছে পাট বিক্রয় করায় বাংলাদেশ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য কি না সর্বাগ্রে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে, কিউবার সঙ্গে গোপনে ৪০ লাখ পাটের থলে রপ্তানীর চুক্তি সম্পর্কিত একটি খবর বাংলাদেশের বিশেষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদের কাটিং নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দু'দুবার সাক্ষাৎ করেন। ফলশ্রুতিতে যথাসময়ে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে নানা অজুহাত ও অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়। নিঃসন্দেহে, খাদ্য দ্রব্যাদির সংকট নিরসনের ব্যাপারে বঙ্গববন্ধুর সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। যেমন ১৯৭৩ সালের ১লা আগস্টে ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে বাংলাদেশের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বৈঠক করেন। উক্ত বছরের ৩০শে আগস্ট বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য সংস্থার সহকারী প্রশাসক মিস্টার মরিস উইলিয়ামের মধ্যে এক বৈঠক হয় এবং ১৯৭৪ সালের ৯ই জানুয়ারী ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। এসব সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল একটাইঃ খাদ্যশস্য সাহায্য প্রার্থনা।

৪৮। বাংলাদেশের এই দুর্দিনে (তৎকালীন) সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার যথাসাধ্য সহায়তা ও সহযোগিতা করেছিল। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নগদ অর্থে কেনা ২ লাখ টন খাদ্যশস্য জাহাজযোগে সে দেশের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার অনুরোধ জানালে সে খাদ্যশস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার বাংলাদেশকে প্রদান করে যার ফলে সংকটপূর্ণ রেশন ব্যবস্থা সে সময় চালু রাখা সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের পক্ষে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অতি নগণ্য।

৪৯। ১৩ই অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ৩৭ দিন ধরে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তেজগাঁও বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাজউদ্দিন সাহেব বলে বসলেন, "ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা রসাতলে গিয়েছে।" জনাব তাজউদ্দিন আহমদের এই মন্তব্য পত্র-পত্রিকায় বড় বড় হেডলাইনে ফলাও করে ছাপানো হয়। এর পরে কতিপয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর এই মন্তব্য উল্লেখপূর্বক বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেতৃত্বে ঐক্য ও অনুসৃত অর্থনীতি সম্পর্কে নানান মতামত ব্যক্ত করা হয়। এর ফলে তাঁর ঐ মন্তব্যকে কেন্দ্র

করে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ দলের নেতাদের মধ্যে যথাক্রমে তাজউদ্দিন আহমদের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের সৃষ্টি হয়।

৫০। এই ঘটনার দিন সাতেক পর এক সন্ধ্যায় খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমি তখন সেখানেই ছিলাম। তিনি আমাকে পরদিন সকালে তাঁর বাসায় যেতে বলেন। সে মোতাবেক আমি আমার বন্ধু তৎকালীন রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প কোম্পানী 'বাংলাদেশ ফাইসন্স'-এর প্রশাসক সুলতান শরিফকে সঙ্গে নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের আগামসি লেনস্থ বাসায় যাই। খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব তখন তাঁর বিশেষ বৈঠকখনায় বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে একান্তে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর তাহের উদ্দিন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আলাপ শেষে বেরিয়ে গেলে খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে তাঁর উক্ত বৈঠকখানায় ডেকে পাঠান। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে, আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনাব তাজউদ্দিন আহমদের ১৩ই অক্টোবর তারিখের মন্তব্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া আমার কাছে ব্যক্ত করা। তিনি অতঃপর বললেন, "মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য হয়ে তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রকাশ্যে সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য কিংবা সমালোচনামূলক মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই। অতএব তাঁকে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। জনাব তাজউদ্দিন আহমদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে।" খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের এই মন্তব্যের জবাবে আমি বললাম, "১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারীতে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ফিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নেতৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার পর থেকে আমি রাজনীতি সম্পর্কে কোনই চিন্তা-ভাবনা করি না। কাজেই এবিষয়ে আমার কোনরূপ মন্তব্য করা সমীচীন হবে না।" অতঃপর সুলতান শরীফকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি। এর কিছুদিন পর, ২৬শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীপরিষদ থেকে ইস্তফা দেন। এই দুঃখজনক ঘটনার পর থেকে তাজউদ্দিন আহমদ রাজনীতিতে বেশ নিষ্ক্রিয় থাকেন। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীর সঙ্গে তিনি বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন বলেও কোন খবর শোনা যায়নি। শুধু মাঝে মধ্যে তাঁকে সকালে দেখা যেত আবাহনী স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে তাঁর ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা-হাঁটি করতে।

৫১। ১৯৭৪-এর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝির ঘটনা। ঐ সময় আমি বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কমিশনের পক্ষে বাংলাদেশের সরকারের নিকট হতে ২০০-২৫০ একর জমি বরাদ্দ নেয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত

ছিলাম। ইতোপূর্বে এ বছরের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার কর্মসূচীর আওতায় আমার আণবিক চুল্লী ও পরমাণু শক্তির সার্বিক শান্তিপূর্ণ প্রায়োগিক প্রযুক্তির সম্পর্কে পোস্ট ডক্টরাল প্রশিক্ষণার্থে এক বছরের জন্য জার্মানী যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন সময়ের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এম. ইন্নাছ আলী আমার জার্মানী যাওয়া স্থগিত করে দেন। কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিকভাবে তিনটি স্থান নির্বাচন করেছিলাম। এই তিনটি স্থান ছিল যথাক্রমে (১) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের স্থান (তৎকালীন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের জন্য নির্ধারিত বর্তমানে বাংলাদেশ (স্থল) সেনাবাহিনীর ক্যান্টনম্যান্ট), (২) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ স্থান এবং (৩) গণকবাড়ীস্থ স্থান (বর্তমানে যেখানে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত রয়েছে)। গণকবাড়ীস্থ স্থানটি একটু বেশী দূরে হওয়ায় একদিন বঙ্গবন্ধুকে বললাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানটি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানটি আণবিক শক্তি কমিশনের জন্য বরাদ্দ করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পার্শ্বস্থ স্থানটি রক্ষীবাহিনীর জন্য নির্ধারণ করা সব দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হবে। আমার প্রস্তাবটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সঠিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু আমাকে পরামর্শ দেন তাঁর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করতে। বঙ্গবন্ধু এও বললেন যে, উক্ত স্থানে রক্ষীবাহিনীর স্থাপনা নির্মাণের কাজ খুব বেশী দূর সম্পন্ন না হয়ে থাকলে ঐ স্থানটিই আণবিক শক্তি কমিশনের প্রস্তাবিত আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

৫২। অতঃপর পরদিন সকালে শেরে বাংলা নগরস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তোফায়েল আহমদের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করতে যাই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গেটে কর্তব্যরত একজন লোক আমার পরিচয় জেনে আমাকে সোজাসুজি তোফায়েল আহমদের অফিস কক্ষে পৌঁছে দেন। তোফায়েল আহমদের অফিস কক্ষে তখন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কিছু দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অফিস টেবিলের এক পাশে মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান বসে ছিলেন। আমি তোফায়েল আহমদের মুখোমুখী হয়ে সেখানের চেয়ারে বসে থাকলাম। প্রায় বিশ মিনিট ধরে বিভিন্ন দফতরে ফোন করে তোফায়েল আহমদ মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা করেন। আমি মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমানকে তখন চেহারায় চিনতাম, কারণ তিনি ইতোপূর্বে কার্যোপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসেছিলেন বেশ কয়েকবার। কিন্তু তখন কেউই আমাকে মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান যখন অফিস কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার জন্য দরজা খুলছিলেন, এই পর্যায়ে তোফায়েল আহমদ আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে

তাঁকে আহবান জানায়। প্রথমে আমাকে তাঁর কাছে "দুলাভাই" বলে পরিচয় করিয়ে দিলে জিয়া সাহেব আমার নাম ও বিস্তারিত পরিচয় জানতে চান। আমার সঠিক পরিচয় জেনে জিয়া সাহেব বললেন, "আপনিই তাহলে সেই ডঃ ওয়াজেদ। গত এপ্রিলের (২৪–২৭ তারিখে) 'প্রথম জাতীয় ইলেকট্রনিক্স সিম্পোজিয়াম'–এর একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমি আপনাদের আণবিক শক্তি কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। আমি যেখানেই যাই লোকজন আপনার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। আমি আশা করেছিলাম যে, উক্ত সিম্পোজিয়াম উপলক্ষে আপনাদের অফিসে যাওয়ার সুযোগে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে।" এরপর তিনি আমাদের আণবিক শক্তির ব্যবহার বিষয়ক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিলেন। পরিশেষে, মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান আমাকে বললেন যে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা'–এর দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত রয়েছে এবং উক্ত খাতে গবেষণার জন্য বেশ কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়। আণবিক শক্তি কমিশন থেকে প্রস্তাব করলে তিনি গবেষণার জন্য উক্ত খাত হতে কিছু অর্থকড়ি আমাদেরকে প্রদান করতে পারবেন। অতঃপর এবিষয়ে যে কোন সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

৫৩। ২৯ শে অক্টোবর (১৯৭৪) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সেক্রেটারী (মন্ত্রী) ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার দু'দিনের বাংলাদেশ সফরে ঢাকায় আগমন করেন। ৩০শে অক্টোবর তিনি গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টা ব্যাপী আলাপ–আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তিনি বলেন, "A man of vast conception. I had rarely met a man who was the father of his nation and this was a particularly unique experience for me. (শেখ মুজিবুর রহমান প্রগাঢ় ধ্যান–ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তি। একটা জাতির স্থপতি এ জাতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আমার কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়েছে এবং এজন্যে এটা (আজকের সাক্ষাৎকার) আমার জন্য ছিল একটি অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা)।" বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের উপরোক্ত মন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বা সূচনা বলে জনমনে ধারণার সৃষ্টি করে, সঞ্চার করে সুদিনের প্রত্যাশা।

৫৪। ১৯৭৪–এর নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের গোড়ার দিকের ঘটনা। ঐ সময় একদিন সকালে অফিসে আসে আমার রংপুর জিলা স্কুলের সহপাঠী মুকিতুর রহমান খোকনের পরলোকগতা একমাত্র বড় বোনের বড় ছেলে ইসকান্দার আলভী মঞ্জু। ১৯৫৬ সালে যখন আমি রংপুর জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম সে সময় মুকিতদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম এবং সারা দিন গল্প গুজব করে কাটাতাম। মঞ্জুর আম্মা (নেলী আপা), নানা অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ জনাব মকবুলুর রহমান সাহেব ও নানী (খোকনের আম্মা)

আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। পরবর্তীতে কতদিন না ওদের রংপুর শহরের ধাপস্থ বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেছি। মুকিতুর রহমান খোকনের আম্মা আমাকে নিজের ছেলের মতই আদর-যত্ন করতেন এবং আমি তাঁকে 'খালা' বলে সম্বোধন করতাম। এইভাবে মুকিতদের পরিবারের সঙ্গে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে যা আজ পর্যন্ত অটুট আছে। মঞ্জুও আমাকে নিজের মামার মতই মনে করে এবং আমিও ওকে নিজের ভাগ্নের মত স্নেহ করি। মঞ্জু এত মেধাবী যে, ছোট বেলায় আব্বা-আম্মাকে হারানো সত্ত্বেও পরবর্তীতে ভালোভাবে লেখাপড়া করে ১৯৭২ সালে ঢাকা বোর্ডের এস,এস,সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৭৪ সালে মঞ্জু ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল এবং একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে তাকে তার হোস্টেলের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেদিন মঞ্জু আমাকে জানায় যে, এর কিছুদিন আগে তার হোস্টেলের অন্যান্য ছেলেরা এক সন্ধ্যায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দালালী করার অভিযোগে ঐ হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঐ ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। অন্যান্যদের সঙ্গে মঞ্জুকে দায়ী করে উক্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করেছিল। মঞ্জু আমাকে জানায় যে, কেবলমাত্র হোস্টেলের ক্যাপ্টেন বলেই তাকে উক্ত ঘটনার জন্যে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৫৫। যাহোক মঞ্জুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই পরদিন আমি টেলিফোনে জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তাঁর ঢাকাস্থ সেনানিবাসের অফিসে যাই। কুশলাদি বিনিময়ের পর আমি ১৯৭১-এর মার্চ মাসে এবং তৎপরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অতি প্রশংসনীয় ভূমিকার উল্লেখ করে তাঁর কাছ থেকে সে সময়ের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা বা অহমিকার কোন চিহ্ন দেখলাম না। তিনি ধীরে ধীরে ও শান্তভাবে আমাকে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের ২৬ তারিখ হতে তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করলেন। এর এক পর্যায়ে আমি তাঁকে জানাই যে, ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের দিকে এক বছরের জন্য আমি তৎকালীন পশ্চিম জার্মানী যাবো পোস্ট ডক্টরাল গবেষণার কাজে। এইভাবে কথাবার্তায় প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। আলাপের শেষে, আমি তাঁকে মঞ্জুর ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত করি। এই সাক্ষাতের পর প্রায় দেড় মাস যাবত জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার কোনরূপ যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হয় নি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন সকালে বঙ্গবন্ধুকে গণভবনের হেলিপ্যাডে বিদায় জানাতে গিয়ে জিয়া সাহেবের সঙ্গে আমার দু'এক মিনিট কথাবার্তা হয়। মঞ্জুর ব্যাপারে আর কোনও খোঁজ না নেয়ায় তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন বলে আমাকে জানালেন। তিনি আমাকে এও জানালেন যে, ঐ ঘটনার জন্য ঐ হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টই দায়ী ছিলেন। অতঃপর ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে আমার (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী যাওয়া চূড়ান্তবাবে নির্ধারিত হয়েছে জেনে

জিয়া সাহেব বললেন, "ডঃ ওয়াজেদ, hats off to you। আমি সর্বান্তকরণে আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি।" মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ।

৫৬। ৩রা নভেম্বর কয়েকজন বিশেষজ্ঞসহ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসে। ৪ঠা নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর সরকার যমুনা সেতুর জন্যে আরিচা ঘাটের উত্তরে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে। ৫ই নভেম্বর তারিখে বঙ্গবন্ধু মিশর ও কুয়েতে রাষ্ট্রীয় সফরে নয় দিনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে মিশরের রাজধানী কায়রো গমন করেন। ইত্যবসরে ৬ই নভেম্বর তারিখে হল্যান্ডের সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশকে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করে। একই তারিখে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ই নভেম্বর তারিখে কায়রোতে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ আলাপ-আলোচনা বৈঠক। অতঃপর বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে যৌথ সহযোগিতা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ তারিখেই কায়রো থেকে বঙ্গবন্ধু কুয়েত যান। কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল্ সাবাহ্ বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ১১ই নভেম্বর কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল্ সাবাহ্ এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এক শীর্ষ বৈঠক। ১২ই নভেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশকে ১০ কোটি টাকার জরুরী ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৪ই নভেম্বর তারিখে মিশর ও কুয়েতে ৯ দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন রাতে বঙ্গবন্ধু বর্ণনা করলেন কি রকম আরাম-আয়েশ ও বিলাস বৈভবে জীবন যাপন করেন কুয়েতের আমির ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা। কুয়েতের আমির শেখ জাবের আল্ সাবাহ্ বঙ্গবন্ধুকে আংকেল শেখ মুজিব বলেও সম্বোধন করেছিলেন বলে বঙ্গবন্ধু আমাদের অবহিত করেন। কুয়েতের আমির শেখ জাবের বঙ্গবন্ধুকে এও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে স্থাপিত চাচা-ভাস্তের সম্পর্ক ক্ষণিকের নয়—চিরস্থায়ী।

৫৭। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝির দিকে একদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু তাঁর শয়নকক্ষের সামনের লবিতে বসে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখছিলেন। শাশুড়ী, হাসিনা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এক পর্যায়ে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন মধ্যবয়সী ও তরুণ নেতা সেখানে উপস্থিত হন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এটাসেটা বিষয়ে কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে তাঁদের একজন তাঁকে বলেন, "লীডার, আপনি জাতির জনক হয়েও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন আর রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদমর্যাদায় আর এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এটা বেমানান ও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়। সুতরাং আমরা সবিনয়ে আপনার কাছে আবেদন জানাই যে, দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন করে তদস্থলে রাষ্ট্রপতির শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনপূর্বক আপনি দেশে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হোন।" উপস্থিত অপরাপর নেতারা সমবেতভাবে উক্ত

প্রস্তাবের প্রতি জোর সমর্থন ব্যক্ত করেন। "আচ্ছা, ভেবে দেখবো" এই বলে বঙ্গবন্ধু তাদের বিদায় দেন। এর সপ্তাহখানেক পর যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সেই একই নেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রস্তাব করেন, "লীডার, আপনাকে শুধু রাষ্ট্রপতি হলেই চলবে না, পরবর্তীতে সংসদে আমরা আপনাকে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিতে চাইবো।" এই প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, "রাষ্ট্রীয় কোন পদে কাউকে আজীবনের জন্য নির্বাচিত করা গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ও রীতিনীতির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। সুতরাং এইটি করা চলবে না।" এর দিন পাঁচেক পরের ঘটনা। একদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের অপর কয়েকজন মধ্যবয়সী ও তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধুকে বলেন, "লীডার, আপনি এমন এক ব্যক্তি যে, আপনি জনগণকে যদি ডানদিকে যেতে আহবান জানান তাঁরা তাই করবেন আর যদি তাঁদেরকে বাম দিকে যেতে বলেন তাঁরা তাও করবেন। আপনার প্রতি জনগণের রয়েছে অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা।" বঙ্গবন্ধু তাঁদের কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন বটে কিন্তু তার জবাবে কোনকিছুই বললেন না।

৫৮। ২৫শে নভেম্বর তারিখে প্রায় চার বছর পর বাংলাদেশ থেকে প্রথম হজ্বফ্লাইট মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ২৬শে নভেম্বর তারিখে (তৎকালীন) পূর্ব জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী মিস্টার হোর্স্ট ঝিন্ডারম্যান ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন। ২৮শে নভেম্বর তারিখে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ১৯ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মালয়েশিয়ার রাজা টুংকু আবদুল হালিম ও রাণী বারমায় সুবী ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আগমন করেন। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ ও বঙ্গবন্ধু তেজগাঁও বিমান বন্দরে তাঁদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

৫৯। ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী দিবস উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামস্থ নৌঘাঁটিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ সময় এক দাপ্তরিক কাজে আমি চট্টগ্রামে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং, ঐ সুবাদে এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার আমার সুযোগ হয়। সেদিন সকালে প্রথম যাই চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। বঙ্গবন্ধু রাসেলকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রীয় বিশেষ প্লেন 'বলাকায়' সেখানে যথাসময়ে পৌছান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু প্রথমে নৌজোয়ানদের কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রথমে বলেন, "...আজ আপনাদের দেখে সত্যিই আমার বুক আনন্দে ভরে ওঠে। আপনারা অনেককেই জানেন, (বাংলাদেশের) স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নৌবাহিনীর যে কয়জন বাঙালী সৈনিক বাংলাদেশে ছিল, তারা সামান্য শক্তি নিয়ে সামরিক বাহিনীর ভাইদের সঙ্গে মিলে বাংলার জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের কাছে (নৌ) জাহাজ ছিল না। তাদের কাছে (পর্যাপ্ত) গোলাবারুদ ছিল না। তাদের কাছে (প্রায়) কিছুই ছিল না। কিন্তু তারা নিজেরা নৌকা পর্যন্ত ক্রয় করে শত্রুর মোকাবেলা করবার চেষ্টা করেছে। তখন আপনাদের অনেক

ছেলে (সৈনিক) শহীদ হয়েছে, অনেকে আত্মাহুতি দিয়েছে, রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা এনেছে। পাকিস্তানী আমলে বাঙালীদের নৌবাহিনীকে চান্স দিত না। আপনাদের অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আমরা তখন তাদের সঙ্গে এই নিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম। যারা জীবনে কখনো পানি দেখে নাই, যারা পানির মধ্যে গোসল করে নাই, তাদের নৌবাহিনীতে গ্রহণ করা হতো। আর যারা বাংলাদেশের মানুষ, যারা পানির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে, যারা পানির মধ্যে খেলে বেড়িয়েছে, নদীমাতৃক এই বাংলার সেই বাঙালীদের নৌবাহিনীতে স্থান হতো না। এর জন্য সংগ্রাম বহুদিন চলেছে। আজ তিন বছর হতে চলেছে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলার ছেলেরা যখন আত্মাহুতি দিয়ে সংগ্রাম চালায়, আমি যখন (পাকিস্তানের) জেলখানা থেকে ফিরে আসি, তখন সামান্য কয়েকজন লোক ছাড়া নৌবাহিনী বলে কোন পদার্থ ছিল না। আজ দেখে আমার আনন্দ হয়, সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই আপনাদের নৌবাহিনী গড়ে উঠেছে। দেশের মানুষ আজ দুঃখী। দেশের মানুষ আজ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। বিদেশ থেকে খাবার আনতে হয়। দুনিয়ায় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলার অর্থনীতি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই আমি চেষ্টা করেছি, যেখান থেকে হোক, আমাদের সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী, সকলকে যাতে কিছু কিছু জিনিস দিয়ে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারি।"

৬০। বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী তা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু অতঃপর বলেন, "বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। আমাদের নৌবাহিনীর প্রয়োজন আমাদের সম্পদাদি রক্ষা করবার জন্যে। সাইক্লোনের মোকাবেলা করবার জন্যে। আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা শান্তিকামী জাতি। আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু আত্মরক্ষা করার মতো ক্ষমতাও আমাদের থাকা দরকার।" নৌবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "নৌবাহিনীর ছেলেরা, তোমরা যা করেছো তার জন্য আমার অভিনন্দন নাও। সামান্য জিনিস নিয়ে, একখানা, দু'খানা ভাঙ্গা (নৌ) জাহাজ কোনমতে মেরামত করে তোমরা আজ এই সমুদ্র পাহারা দিচ্ছ। এর জন্য আমি তোমাদের মোবারকবাদ জানাই। দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানীরা আমাদের টাকা দিয়ে পঁচিশ বৎসরে যে নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিল, তার একখানা সম্পদও আমরা পাই নাই। একখানা যুদ্ধ জাহাজ, একখানা গাদাবোট বা একখানা মালবাহী জাহাজও আমাদের দেওয়া হয় নাই। দেবে কিনা, তাও জানি না। দেওয়ার ইচ্ছা বোধ হয় তাদের নাই। তা তাদের কাছ থেকে কিছু না-ই বা পেলাম। মাটি যখন পেয়েছি, বাংলার মানুষ যখন আছে, বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা যখন আছে, বাংলার সম্পদ যখন আছে, তখন ইনশাআল্লাহ্ সবই আমরা গড়ে তুলতে পারবো, আমাদের সব জিনিসই হবে।" এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আস্তে আস্তে আমাদের সবই গড়তে হবে। চারদিকে যা অবস্থা, গঠনমূলক কাজ দিয়ে মানুষকে তা থেকে বাঁচানো দরকার। দেশের মানুষকে বাঁচাতে

হবে। রাস্তাঘাট, সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ, রক্ষীবাহিনী, সবই আমাদের গড়তে হবে।"

৬১। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু বলেন, "তোমাদের কমান্ডারের কাছে শুনেছি, তোমরা অনেক কষ্টে আছো। তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রয়োজন অনেক। হ্যাঁ, সত্যিই অনেক প্রয়োজন। সবই তোমরা পাবে, কিন্তু আস্তে আস্তে। আমি বাংলাদেশকে বিক্রি করতে চাই না, মর্টগেজ রাখতে চাই না। বিক্রি করলে বা মর্টগেজ রাখলে জিনিসের অভাব হয় না। কিন্তু আমি নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে সাহায্য চাই, নিজেকে বিক্রি করে বা মর্টগেজ দিয়ে চাই না। আমি আস্তে আস্তে নৌবাহিনী গড়বো। নৌকায় করে আমার নৌবাহিনীর ছেলেরা চলবে। তবুও আমি বাংলাদেশকে মর্টগেজ দিয়ে কারও কাছ থেকে কিছু আনবো না। ...অবশ্য যারা বন্ধু রাষ্ট্র, যারা আমাদের স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বকে সম্মান করে সাহায্য করতে চায়, তাদের কাছ থেকে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য নেবো। যতদিন আমি বেঁচে আছি, বাংলার মানুষকে, বাংলাদেশকে মর্টগেজ রেখে সাহায্য নেবো না। সে সাহায্যকে আমি ঘৃণা করি।"

৬২। ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু রেডিও-টেলিভিশনে 'জাতীয় বিজয় দিবস' উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের শুরুতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "১৯৭১ থেকে ১৯৭৪, সময়ের দিক থেকে মাত্র তিন বছর। একথা সত্য যে, তিন বছর আপনাদের কিছু দিতে পারবো না, একথা আমি আপনাদের বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেয়ার খাতা একেবারে শূন্য পড়ে থাকেনি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য কোটি কোটি মণ খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করা ছাড়াও ২৫ বিঘা পর্যন্ত (কৃষি) জমির খাজনা মওকুফ, শ্রমিক ভাইদের নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধি, বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন, পাটের নিম্নতম মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীদের মর্যাদা দিয়ে বর্ধিত হারে বেতন প্রদান—এ জাতীয় কয়েকটি ব্যবস্থা, যা সরকার কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও কার্যকর করেছে। একই সঙ্গে আমাদের দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠাই করা হয়নি, মীরপুর, নয়ারহাট, তরাঘাট প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন সেতু নির্মাণ করে দেশের উন্নততর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই এটাও জানেন যে, যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জরিপ কাজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছিল, খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হয়েছিল। দেশবাসীও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির কিছুটা ফল লাভ করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে নতুন করে গঠন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, দেশ পুনর্বাসন পর্যায় শেষ করে প্রবেশ করেছিল পুনর্গঠনের নতুন দিগন্তে। ১৯৭২-এর দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টি, ১৯৭৩-

এর আঞ্চলিক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও দেশ যখন পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে উপর্যুপরি দু'টি বিপর্যয় নেমে এলো। প্রথমতঃ, মুদ্রাস্ফীতি। উপরোক্ত, আমাদের রফতানী পণ্যের মূল্য বিশ্ববাজারে এই সময়ে বৃদ্ধি তো পায়ই নি, বরং অনেকাংশে কমে গেছে। দ্বিতীয়তঃ এবারের প্রলয়ংকরী বন্যা। যার ফলে ১৭টি (বৃহত্তর) জেলার ৪ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো মারাত্মকভাবে। দশ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য হলো নষ্ট। এই দুই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠন হয়েছে বিঘ্নিত। এর সঙ্গে একদল নরপশু চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদার ও ঘুষখোরের হীন কার্যকলাপ অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে। সেপ্টেম্বরে বন্যার তাণ্ডব শুরু হওয়ার পর থেকে ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করা হয়েছে এবং কোন কোন অঞ্চলে এখনও তা অব্যাহত আছে। হেলিকপ্টার থেকে নৌকা পর্যন্ত যখন যেটা পাওয়া গেছে, তাতে করেই এই তৈরী খাদ্য পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বন্যা কবলিত মানুষের কাছে।"

৬৩। অতঃপর বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ আজ তিনটি মহাবিপদ তথা তিন শত্রুর মোকাবেলা করছে। (১) মুদ্রাস্ফীতি—যা আজ সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে, (২) প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যা এবং (৩) চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ, মজুতদার ও ঘুষখোর—এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে। আজ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন তেল, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্য আমদানীর জন্য আমাদের ব্যয় করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের চক্রে অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রফতানী পণ্য উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই দেশ-বিদেশের মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা ও মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনা, ওয়েজ আর্নার স্কীমে পণ্য আমদানী তথা পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বিলি-বন্টনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা আমরা করছি। বাজারে ইতিমধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ...বাংলাদেশে অফুরন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনাধীন। এই পথে আমরা বেশ কিছুটা অগ্রসরও হতে পেরেছি। প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে একাধিক ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ....আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় তেলের সন্ধান লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তেল অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিদেশী তেল কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। মুদ্রাস্ফীতির পরেই আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা বন্যার কথা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'টি জিনিসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—সময় ও অর্থ। পাকিস্তানী শোষকরা ২৫ বছরের শাসন ও শোষণে এ ব্যাপারে কিছুই করে নি। বরং বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে বিরাট ঋণের বোঝা।

বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী ভিত্তিতে চেষ্টা করছে। আমাদের নতুন প্রতিরোধ সংগ্রামে সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান শত্রু চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোর ও ঘুষখোরের দল। মানুষ যখন অনাহারে মারা যায়, তখনও এই সব নরপশুর দল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখের গ্রাস অন্যত্র পাচার করে দিয়ে থাকে। বিদেশ থেকে ধার-কর্জ, এমনকি ভিক্ষা করে নেয়া পণ্য ও বাংলার সম্পদ মজুতের মাধ্যমে এরা মুনাফার পাহাড় গড়ে। এদের কোন জাত নেই, নেই কোন দেশ। এই সব নরপশুদের উৎখাতে আমি আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।"

৬৪। অতঃপর কতিপয় মহলের সহিংস, ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এখানে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না। রাতের অন্ধকারে সন্ত্রাস সৃষ্টিই তাদের প্রধান উপজীব্য। ৪ জন সংসদ সদস্যসহ তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও নিরীহ গ্রামবাসীকে এদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। তারা জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করে জনগণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করতেও দ্বিধা করছে না। সরকার তো দূরের কথা, কোন শান্তিপ্রিয় নাগরিকই এটা বরদাস্ত করতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে জনগণের কোন কল্যাণ বা সমস্যার সমাধান হয় না। এ পন্থা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এছাড়াও ক্ষমাপ্রাপ্ত কিছু কিছু লোক দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে না। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান, বাংলাদেশে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা সকলেই এদেশের নাগরিক। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা সমঅধিকার ভোগ করবেন।"

৬৫। এরপর তাঁর সরকারের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির সাফল্যের কিছুটা উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেন, "বিগত একটি বছরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আপনারাই তার বিচার করবেন। শুধু এইটুকু বলবো, জাতিসংঘে আজ বাংলাদেশ স্বীয় ন্যায়সঙ্গত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ইসলামিক শীর্ষ বৈঠক ও কমনওয়েলথ—সর্বত্র বাংলাদেশ সম্মানিত এবং সমাদৃত। প্রতিবেশী প্রতিটি দেশ, বিশেষ করে, নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও বার্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হৃদ্যতাপূর্ণ। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা আমরা করেছি। এমনকি মানবতাবিরোধী জঘণ্য অপরাধের জন্য যাদের বিচার হওয়ার কথা ছিল, সেই সব যুদ্ধাপরাধীকেও আমরা মার্জনা করে দিয়েছি। বাংলার মানুষের এই বদান্যতা ও ঔদার্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সাবেক পাকিস্তানের সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বাঁটোয়ারা এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিকদের (অবাঙালীদের) ফিরিয়ে নেয়া পাকিস্তানের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাকিস্তান এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে না। আরব ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত।

দুর্দিনে তাঁরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যার সময় তাঁরা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শুরু থেকেই বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, শোষিত, নির্যাতিত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ও কারো প্রতি বৈরীতা নয়, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বের যে নীতি অনুসরণ করে আসছে, আজ তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।"

৬৬। ১৮ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ আল নাহিয়ান আবুধাবি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ১৯শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু ও শেখ জায়েদের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০শে ডিসেম্বর আরব আমিরাতে সফর শেষে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা যে কিরূপ আরাম-আয়েশ ও বিলাস-বৈভবে জীবন-যাপন করেন তিনি তার একটি মনোগ্রাহী বর্ণনা আমাদের কাছে করেছিলেন।

৬৭। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার যখন চরম সর্বনাশের করাল গ্রাস থেকে দেশকে উদ্ধারের পথের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত ছিল, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তখন অবাধ গণতন্ত্রের সুযোগে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দোহাই দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে 'জেহাদে' অবতীর্ণ হয়। জাসদ থেকে শুরু করে মাওলানা ভাসানীর ন্যাপ, মাওবাদী উগ্র বামপন্থী বিভিন্ন প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও সরকার বিরোধী অভিযানে সামিল হয়। স্বভাবতঃই, বেআইনী ঘোষিত স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর সদস্যবৃন্দ, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, প্রভৃতি পাকিস্তানী দালাল সংগঠনগুলোর সদস্য এবং সমাজবিরোধীরাও সরকার বিরোধী এই অভিযানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগদান করে। এই প্রকাশ্য তৎপরতার পাশাপাশি অধিকতর তীব্রতায় চলতে থাকে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি, জাসদের গণবাহিনী, প্রভৃতি গুপ্ত সংগঠনগুলোর হাতিয়ারবাজী এবং হত্যালীলা। নাশকতা, ব্যাংক ডাকাতি, রাহাজানি, গুপ্তহত্যা, থানা-ফাঁড়িতে সশস্ত্র আক্রমণ, খাদ্যশস্যের গুদাম লুট, খাদ্যশস্য বহনকারী ট্রাক, ট্রেনের বগি ও জাহাজ ধ্বংস, পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ, ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। প্রতিদিন এ ধরনের ঘটনার খবর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬৮। ৫ই জানুয়ারী পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে ঢাকায় ৬টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১০ই জানুয়ারী তারিখে ভোলার জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোতাহার উদ্দিন কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ১১ই জানুয়ারী তারিখে দুষ্কৃতকারীদের কারসাজিতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের প্রবেশমুখে ৮ হাজার টন সিমেন্টবাহী 'গোল্ড কুইন' জাহাজটি দুর্ঘটনায় পতিত

হয়। ২৫শে জানুয়ারী তারিখে দুষ্কৃতকারীরা নারায়ণগঞ্জের 'কুমুদিনী' পাটের গুদামে এবং বালুর ঘাটের দু'টো পাটের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। ২৭শে জানুয়ারী তারিখে দুষ্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে যশোরের জুট মিল। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে দুর্বৃত্তরা পদ্মার কাটিছাটা চরে একই সময়ে ১০টি লঞ্চে ডাকাতি করে। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন যশোরের প্রাক্তন এম. সি. এ. জনাব মোশাররফ হোসেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দুষ্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে আলীজান জুট মিল। ৪ঠা মার্চ তারিখে দুষ্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে দৌলতপুরের ২৩টি পাটের গুদাম। ৯ই মার্চ তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী ঢাকার মোহাম্মদপুরের জনতা ব্যাংকের শাখা থেকে ৭০ হাজার টাকা ছিনতাই করে। ১৫ই মার্চ তারিখে দুষ্কৃতকারীরা নারায়ণগঞ্জের একটি জনতা ব্যাংকের শাখা থেকে ৩ লাখ টাকা ছিনতাই করে। ১৬ই মার্চ তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন ঢাকা জেলার মনোহরদি থানার সংসদ সদস্য গাজী ফজলুর রহমান। একই তারিখে দুষ্কৃতকারীদের কারসাজিতে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ লাইনের জামতৈল স্টেশনের অদূরে একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। ২২শে মার্চ তারিখে রাজশাহীর নলডাঙ্গায় দুষ্কৃতকারীদের বোমা বিস্ফোরণে ৭ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ২৭শে মার্চ তারিখে ভেড়ামারায় বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ২০শে এপ্রিল তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত রাজশাহীর হরিয়ান জনতা ব্যাংকের শাখা হতে ৩৮ হাজার টাকা ছিনতাই করে। ৩০শে এপ্রিল সাভারে সোয়া লাখ টাকাসহ একটি টাকা জালকারী দলকে গ্রেফতার করা হয়।

৬৯। ২রা মে তারিখে দুষ্কৃতকারীরা চাঁদপুর মহকুমার ফরিদগঞ্জ থানায় সশস্ত্র হামলা চালায়। ৭ই মে তারিখে নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইল থেকে বিমান বিধ্বংসী কামান ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। ২৯শে মে তারিখে দুষ্কৃতকারীরা সশস্ত্র হামলায় ঢাকা জেলার সাভারের নিকট শিমুলিয়া পুলিশ ফাঁড়িটি লুট ও ধ্বংস করে। ১১ই জুন তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্রাবাস থেকে ২৯৭ বাক্স গুলি উদ্ধার করা হয়। ১২ই জুন তারিখের রাতে চট্টগ্রামে ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কারসাজিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ ও শ্রমিক লীগের সভাপতি জনাব এম. এ. হান্নান। ১৭ই জুন তারিখে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ২৩শে জুন কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলায় বগুড়া জেলার ধুপচাঁচিয়া থানা লুট ও ধ্বংস করে। এতে ২ জন পুলিশ নিহত হয়। ৯ই জুলাই কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলা চালায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানায়। ১৬ই জুলাই কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলায় লুট ও ধ্বংস করে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ থানার ৮টি পুলিশ ফাঁড়ি। ১লা আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রঘোনা থানায় কতিপয় দুষ্কৃতকারীর সশস্ত্র হামলায় ২ জন বিডিআর বাহিনীর সদস্য নিহত হয়। ১৫ই আগস্ট তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলা চালায় ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর থানায় এবং এতে ২ ব্যক্তি নিহত হয়। ২০শে আগস্ট তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত ঢাকা জেলার

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বেতকারস্থ জনতা ব্যাংকের শাখা হতে ৫৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে। একই তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সন্দীপ দ্বীপের নিকট একটি ২২ হাজার মণ গমবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

৭০। ২২শে আগস্ট মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ভাগ্যকুলের জনতা ব্যাংক শাখায় সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কারসাজিতে ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানার কন্ট্রোল রুমটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। এই বিস্ফোরণে ২০ ব্যক্তি হতাহতসহ বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হয়। ১১ই অক্টোবর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলা চালায় মাদারীপুরের সাহেবরামপুর রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে। এই ঘটনায় ২ জন রক্ষীবাহিনীর সদস্যসহ ৯ ব্যক্তি নিহত হয়। ২০শে অক্টোবর তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত রংপুর জেলার শ্যামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে সশস্ত্র হামলায় লুট করে কয়েকটি গমবাহী ওয়াগন।

৭১। ২১শে অক্টোবর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলা চালায় লৌহজং থানা ও রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে। ২৭শে অক্টোবর তারিখে ঢাকায় কতিপয় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন পাকিস্তানের এককালীন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)-এর পত্নী। ৩০শে অক্টোবর তারিখে খুলনা জেলার শরণখোলার সুন্দরবনে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ও রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। উক্ত ঘটনায় ৯ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ১লা নভেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কারসাজিতে সুনামগঞ্জের জালালপুর গ্রামের প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্ড অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। ৭ই নভেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলায় লুট ও ধ্বংস করে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখান থানা। ২৯শে নভেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলায় লুট ও ধ্বংস করে ঢাকা জেলার কালিয়াকৈরের পুলিশ ফাঁড়ি। ১লা ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলা চালিয়ে লুট ও ধ্বংস করে বগুড়া জেলার ধুপচাঁচিয়া থানা। ২রা ডিসেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীদের দু'টো দল সশস্ত্র আক্রমণে লুট ও ধ্বংস করে যথাক্রমে চট্টগ্রামের শুকুরছড়ি ও চন্দ্রঘোনা পুলিশ ফাঁড়িদ্বয়। একই তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত সশস্ত্র হামলা চালিয়ে শিবালয় থানাস্থ জনতা ব্যাংকের শাখা হতে ৬৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারী সশস্ত্র হামলায় লুট ও ধ্বংস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার গোড়াইছড়ি পুলিশ ফাঁড়ি। ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্তের সন্ত্রাসমূলক ঘটনায় মুন্সীগঞ্জে ১০ ব্যক্তি নিহত হয়। একই তারিখে কতিপয় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন ফরিদপুরের সাবেক এম. সি. এ. জনাব আবু ইউসুফ আমিনউদ্দিন। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজী ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালায়। উক্ত তারিখে দুষ্কৃতকারীরা দেশের কয়েকটি রেলওয়ে ষ্টেশন ও তফসিল অফিসে সশস্ত্র হামলা চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে দুষ্কৃতকারীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজী ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালায়। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর

কারসাজিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয় টঙ্গীর নিশাত জুট মিলে। উক্ত অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

৭২। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত পবিত্র ঈদের জামাত-নামাজে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে। ঐদিন সকাল দশটার দিকে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া গ্রামের বাড়ী থেকে তাঁর গুরুতর অসুস্থ পিতা শেখ লুৎফর রহমান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় ফিরছিলেন। হেলিকপ্টারেই বঙ্গবন্ধুকে উক্ত নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দুঃসংবাদ জানানো হয়। ঐ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু দারুণভাবে মর্মাহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পবিারবর্গের সদস্যদের বহনকারী হেলিকপ্টারে হাসিনাসহ আমিও ছিলাম। এর পর বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ হয়ে যান। তিনি সারাক্ষণ চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। কারও সঙ্গে কোন কথা বললেন না তিনি। ঢাকায় পৌঁছে হেলিকপ্টার থেকে নামবার সময় বঙ্গবন্ধু বিড় বিড় করে বললেন, "মানুষের ধৈর্য ও সহ্যের একটা সীমা পরিসীমা আছে। এখন আমার চরম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এতে হয় সকল হত্যা, নাশকতা, অন্তর্ঘাত ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অবসান হবে, নয় তো আমি নিজেই শেষ হয়ে যাবো।"

৭৩। ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৪) তারিখে বঙ্গবন্ধু সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অরাজকতাজনিত সঙ্কট মোকাবেলার জন্যে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। সরকারের পক্ষ থেকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা প্রসঙ্গে সারাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয়, "অবাধ গণতন্ত্রের সুযোগের যেভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক তৎপরতার পরিবর্তে যেভাবে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে জাতীয় বিপর্যয় অনিবার্য করে তোলার জন্য সমাজবিরোধীরা যেভাবে অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে, নাশকতা, অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং নির্বিচার গুপ্তহত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেভাবে জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা, ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করা হয়েছে, জনগণের নির্বাচিত ও আস্থাভাজন কোন সরকারই তার মোকাবেলায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। সুপরিকল্পিত এই নৈরাজ্য, অরাজকতা ও সঙ্কট থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে এই কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া সরকারের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না।"

৭৪। সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা আমার কাছে অশনি সংকেত—মহাবিপদের সংকেত বলে মনে হলো। আমার বুক শিউরে ওঠে এক অজানা মহাবিপর্যয়ের আশঙ্কায়। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি মূহ্যমান হয়ে পড়ি। তখন দেশের অনেকেরই এ অবস্থা হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। এহেন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার সঙ্গে সমাপ্ত হয় ১৯৭৪ সাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১৯৭৫ সাল

১। সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম চাঞ্চল্যকর ঘটনা ছিল সিরাজ শিকদারের পতন। ১লা জানুয়ারী (১৯৭৫) মাওবাদী উগ্র বামপন্থী দল, 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' প্রধান সিরাজ শিকদারকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য যে, কমরেড সিরাজ শিকদার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে শ্রেণীমুক্ত "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" কায়েমের সংকল্প নিয়ে ১৯৭২ সালে গঠন করেন গুপ্ত সংগঠন 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি'। গুপ্তহত্যা, রাহাজানি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ফাঁড়িতে সশস্ত্র হামলা, খাদ্য ও পাটের গুদামে অগ্নিসংযোগ, খাদ্যদ্রব্য বহনকারী পরিবহন ধ্বংস, ইত্যাদি সহিংস, নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ ছিল পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিরাজ শিকদার কোন কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চান কিনা, তখন তিনি বলেছিলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কারোরও সঙ্গে নয়।" ২রা জানুয়ারী বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেলে প্রথম জানতে পারি যে, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় সিরাজ শিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই খবর শুনে আমি দারুণভাবে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হই। বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে কোন বিরোধী কুচক্রী মহল এই অত্যন্ত অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন অনেকেই। যাহোক, পরের দিন অর্থাৎ ৩রা জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে পুলিশের এক ভাষ্যে বলা হয় যে, নিজের দলের একটি গুপ্ত ঘাঁটি চিনিয়ে দেয়ার জন্যে পুলিশ গাড়ীতে করে সাভারের দিকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাবার সময় সিরাজ শিকদার পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। অতঃপর ঘটনাটির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করে।

২। ২রা জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক লীগের নেতা আবদুল মান্নানকে। ৩রা জানুয়ারী তারিখে জরুরী অবস্থা আইনবলে জরুরী ক্ষমতা বিধি–বিধান জারি করা হয়। উক্ত বিধি–বিধানে নাশকতা, সন্ত্রাসী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, চোরাচালানী, কালোবাজারী এবং গুপ্তহত্যার মতো অপরাধের দায়ে দোষী ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এই সব সমাজ বিরোধী কাজের দমনে সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে খাদ্য বিভাগ ও বিজি প্রেসের মোট ৪৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এক লাখ রেশন কার্ড জালিয়াতির অভিযোগে। ৬ই জানুয়ারী তারিখে সরকার জরুরী অবস্থা আইনের আওতায় সারাদেশে সর্বপ্রকার সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, লকআউট অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৭ই জানুয়ারী তারিখে সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠন করে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স। একই তারিখে হল্যান্ডের সরকার বাংলাদেশকে ১৬ কোটি টাকার সাহায্য ও ঋণ প্রদানের কথা ঘোষণা করে।

৩। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। আমি আমার বিদেশে উপার্জিত অর্থে একটি নিশান গাড়ী আমদানী করেছিলাম ১৯৭৪ সালে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার কর্মসূচীর অধীনে আমার ১৯৭৫–এর মার্চ মাসে (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী যাওয়া চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলে আমি উক্ত গাড়ীটি আইনসম্মত উপায়ে বিক্রী করার সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে প্রয়োজন হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি। অতএব উক্ত গাড়ীটি বিক্রী করার অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রীর বরাবরে একটি পত্র লিখে তৎকালীন বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি নিই।

৪। খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব ঐদিন বিকাল ৩টায় তাঁর আগামসি লেনস্থ বাসায় আমাকে যেতে বলেন। তিনি তখন তাঁর বাড়ীর ছাদের লবিতে ছিলেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাওয়ার সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক তরুণ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সম্ভবত, তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে মেজর রশীদ বলে পরিচয় দিলেন। উপরের ছাদের লবিতে পৌঁছে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের মুহূর্তে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার বড় ছেলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সেখানে হাজির হন। অতঃপর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন খন্দকার মোশতাক আহমদের উদ্দেশ্যে কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। এর অল্পক্ষণ পরেই খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব মইনুল হোসেনকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "বাবা মইনু, ওয়াজেদ অনেকদিন পর আমার কাছে এসেছে বিশেষ একটা দাপ্তরিক কাজে। অতএব তুমি আজকের মত চলে যাও। আগামীকাল আবার এসো।" ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন চলে যাওয়ার পর আমার গাড়ী বিক্রির প্রয়োজনীয়তার কারণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আমি বাণিজ্যমন্ত্রীকে

লেখা চিঠিটি খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবকে প্রদান করি। অতঃপর খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন, "এটি অতি সামান্য ব্যাপার। আগামীকাল অফিসে গিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবো। এখন এই সুযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।" অতঃপর, খন্দকার মোশতাক আহমদ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার শ্বশুর যে দেশের সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করেছেন সে সম্বন্ধে তুমি কোন কিছু জান কিংবা শুনেছো কিনা? বঙ্গবন্ধুর এটা করা মারাত্মক ভুল হবে।" এর জবাবে আমি বললাম, "আপনি যদি আমাকে খুলে বলেন বঙ্গবন্ধু সংবিধানের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা করেছেন তাহলেই তো আমি বুঝতে পারবো সেটা তাঁর ভুল পদক্ষেপ হবে কিনা। তবে বঙ্গবন্ধুকে আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে আমার বিশ্বাস যে, তিনি সংবিধানে এমন কোন পরিবর্তন ঘটাবেন না যার ফলে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ও বিধিব্যবস্থা বিনষ্ট হয়।" আমার এই কথার জবাবে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব বলেন যে, মন্ত্রী পরিষদের একজন সদস্য হয়ে তিনি সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন না। যা হোক, উপরোক্ত ব্যাপারে খোঁজ–খবর নেয়ার জন্য তিনি আমাকে পরামর্শ দেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

৫। এর দু–একদিন পর আমদানী ও রফতানী বিষয়ক নিয়ন্ত্রকের অফিস থেকে আমাকে উক্ত গাড়ীটি বিক্রি করার অনুমতি দেয়া হয় এই শর্তে যে, পরের তিন বছরে আমি আর কোন গাড়ী আমদানী করতে পারবো না। এই শর্ত শিথিল করার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখে আমি আবার খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় যাই। তিনি আমাকে আশ্বাস দেন যে, ঐ শর্ত প্রত্যাহার করার জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। সেদিনও তিনি বঙ্গবন্ধুর সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তখন আমি বললাম, "কাকা, স্বাধীনতার পর থেকে আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলি না। আপনি বরঞ্চ শেখ মণির সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করুন।" এর জবাবে খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব বললেন, "মণিকে বলে কিছু হবে না, কারণ সে নিজেই তোমার শ্বশুরের পক্ষাবলম্বন করছে।" এ কথা বলেই তিনি আবারো আমাকে ঐবিষয়ে খোঁজ–খবর নেয়ার পরামর্শ দিয়ে বিদায় দিলেন। এর পর আমি আর কখনও খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবের বাসায় যাইনি।

৬। ১১ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধু কুমিল্লাস্থ সামরিক একাডেমীতে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদায়ী জেন্টেলম্যান ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবার সংগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই জন্যই আজ বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশ সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" অতঃপর এই সামরিক

একাডেমীর তখনকার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি অবশ্য জানি, আজ আমাদের এই একাডেমীর ধরতে গেলে কিছুই নেই। আমরা সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে এর কাজ শুরু করেছিলাম। অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। তোমাদের কমান্ডাররা অনেক অসুবিধার মধ্যে তোমাদের ট্রেনিং দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমি যা দেখলাম, তাতে আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোন দেশের যে কোন সৈনিকের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারবে। তাদের সে শক্তি আছে। তবে একদিনে কিছু হয় না। আমরা তিন বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছি। এর মধ্যে একাডেমীর জন্য যতটুকু দরকার, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। এমনকি, আমার নিজের চেষ্টায়ও এটা-ওটা জোগাড় করে এক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে।" এরপর সামরিক ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি পাকিস্তানী আমলের অবহেলার কথা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, "পাকিস্তানীরা বলতো, বাঙালীরা সামরিক বাহিনীতে যোগদানের অযোগ্য। তারা কাপুরুষ, তারা যুদ্ধ করতে জানে না। কিন্তু পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলাদেশের মাটিতে দেখে গেছে, বাঙালীদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা কেমন। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে তাদের বড় বড় শক্তিধর বিশালদেহী পুরুষেরও জান বেরিয়ে যেতো। আমরা বাঙালীরা আর যাই হই না কেন, কাপুরুষ নই।"

৭। অতঃপর দেশ থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি উচ্ছেদ করার তাঁর সংকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "যে দুঃখী মানুষ দিনভর পরিশ্রম করে, তাদের পেটে খাবার নেই, গায়ে কাপড় নেই, বাসস্থানের বন্দোবস্ত নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। পাকিস্তানীরা আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। কাগজ ছাড়া আমাদের কারও জন্য কিছু রেখে যায়নি। আমাকে বিদেশ থেকে ভিক্ষে করে সব জিনিস আনতে হয়। কিন্তু চোরের দল সব লুট করে খায়, দুঃখী মানুষের সর্বনাশ করে। এবার আমি শুধু জরুরী অবস্থাই ঘোষণা করিনি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, বাংলাদেশের মাটি থেকে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোর আর চোরাচালান-কারীদের নির্মূল করবো।" বাংলাদেশের আর এক শ্রেণীর মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আর একদল লোক আছে, যারা বিদেশীদের অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়। তারা রাতের অন্ধকারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। একটি লোক কেমন করে যে পয়সার লোভে মাতৃভূমিকে বিক্রি করতে পারে, তা ভাবলে আমরা শিউরে উঠি। যারা বিদেশের আদর্শ বাংলাদেশে চালু করতে চায়, এ দেশের মাটিতে তাদের স্থান হবে না।" স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন মন-মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গবন্ধু এর পর বলেন, "মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যেন পাকিস্তানী মনোভাব না আসে। তোমরা পাকিস্তানীদের সৈনিক নও, বাংলাদেশের সৈনিক। তোমরা হবে আমাদের জনগণের। তোমরা পেশাদার বাহিনীও নও, কেবল সামরিক বাহিনীও নও। দরকার হলে তোমাদের আপন হাতে উৎপাদন করে খেয়ে বাঁচতে হবে।" পরিশেষে, বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। এ স্বাধীনতা

নিশ্চয়ই টিকে থাকবে। একে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। তবে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারলে এ স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।"

৮। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। যতদিন বাংলার স্বাধীনতা থাকবে, যতদিন বাংলার মানুষ থাকবে, ততদিন এই রাজারবাগের ইতিহাস লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। (১৯৭১-এর) ২৫শে মার্চ রাতে যখন ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে (সশস্ত্র) আক্রমণ করে, তখন তারা চারটি জায়গা বেছে নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালায়। সেই জায়গা চারটি হচ্ছে রাজারবাগ, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আমার বাড়ী। একই সময়ে তারা এই চার জায়গায় (সশস্ত্র) আক্রমণ চালায়। রাজারবাগের পুলিশেরা সেদিন সামান্য অস্ত্র নিয়ে বীর বিক্রমে সেই সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করেন। কয়েক ঘন্টা তুমুল যুদ্ধ করেন। ...পুলিশ বাহিনীর অনেক কর্মী এখানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাস্তায় নেমে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন নয় মাস পর্যন্ত। যাঁরা পুলিশ বাহিনীর বড় বড় কর্মচারী ছিলেন, তাদেরও অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।"

৯। পুলিশ বাহিনীর বিদ্যমান নানান অসুবিধার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু অতঃপর বলেন, "আমার মনে আছে যেদিন আমি জেল থেকে বের হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসি, সেদিন দেখেছিলাম আমাদের পুলিশ বাহিনীর না আছে কাপড়, না আছে জামা, না কিছু। অনেককে আমি ডিউটি করতে দেখেছি লুঙ্গি পরে। একদিন রাত্রে তারা আমার বাড়ী গিয়েছিল। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি, গায়ে (গেঞ্জি) জামা, হাতে বন্দুক। ...৭০ থেকে ৮০টা থানা হানাদার বাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল । সেগুলো নতুন করে আমরা গড়তে চেষ্টা করছি। অনেকগুলো গড়া হয়েছে, অনেকগুলোর কাজ চলছে। আপনাদের কিছুই ছিল না। আজ আস্তে আস্তে কিছু কিছু হতে চলেছে। একদিনে কিছু হবে না।"

১০। অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্বের প্রতি সচেতন থাকার আহবান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এই কথা (সর্বদা) মনে রাখতে হবে। আমি বা আপনারা সবাই মৃত্যুর পর সামান্য কয়েক গজ কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিয়ে যাবো না। তবে কেন আপনারা মানুষকে শোষণ করবেন, মানুষের ওপর অত্যাচার করবেন? গরীবের ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে। তাই শুধু আপনাদের নয়, সমস্ত কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে, তাদের সেবা করুন। যাদের জন্য, যাদের অর্থে আজকে আমরা চলছি তাদের যাতে কষ্ট না হয় তার দিকে খেয়াল রাখুন। যারা অন্যায় করবে, আপনারা অবশ্যই তাদের কঠোর হস্তে দমন

করবেন। কিন্তু সাবধান, একটা নিরপরাধ লোকের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। (কারণ) তাতে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। আপনারা সেদিকে খেয়াল রাখবেন। আপনারা যদি অত্যাচার করেন, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আল্লাহর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আমি আপনাদের জাতির পিতা, আমি আপনাদের প্রধানমন্ত্রী, আমি আপনাদের নেতা।"

১১। ১৭ই জানুয়ারী তারিখে স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওপেক-এর মধ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সাহায্য-সহযোগিতা চুক্তি। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে কাপড় ও সুতার মূল্য শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২০শে জানুয়ারী তারিখে স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার তিনটি চুক্তি।

১২। ২০শে জানুয়ারী তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণ দেন (তৎকালীন) রাষ্ট্রপতি জনাব মুহম্মদুল্লাহ। ইতিপূর্বে , ১৮ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক। এই বৈঠকেই বঙ্গবন্ধু সংসদ সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্কীমের রূপরেখা। উক্ত সভায় তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "শতাব্দীর জীর্ণ ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণ এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক প্লাটফরমের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রয়াস ছাড়া সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। খণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত এবং অসংলগ্ন পরস্পর বিরোধী কর্মতৎপরতা নয়—আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির নিবিড় একাত্মতা এবং ঐক্যবদ্ধ ও গঠনমূলক সর্বাধিক কর্মপ্রয়াস। কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থার অধীনেই তা সম্ভবপর।" উল্লেখ্য, ১৯৭৪-এর জুলাইয়ের ৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সংসদীয় দলের যৌথ বৈঠকে 'শোষিতের গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে' প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল। ১৯৭৪-এর জুলাই মাসের ১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গদলসমূহের এক সপ্তাহব্যাপী জরুরী সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধুর প্রতি 'শোষিতের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' জন্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরূপ অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এসব প্রস্তাবসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ই জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখের সভায় বঙ্গবন্ধু নতুন সিস্টেম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন।

১৩। আওয়ামী লীগের একটি অংশ বঙ্গবন্ধুর এই স্কীমের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। এই গ্রুপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, নূরুল

ইসলাম মনজুর, নূরে আলম সিদ্দিকী, ব্যারিস্টার মইনূল হোসেন প্রমুখ। জেনারেল (অবঃ) ওসমানী ও নূরে আলম সিদ্দিকী আওয়ামী লীগের ১৮ই জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখের বৈঠকে একদলীয় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জেনারেল (অবঃ) ওসমানী তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, "আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিবুর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাই না।" জেনারেল (অবঃ) ওসমানী যখন এই মন্তব্য করেছিলেন বঙ্গবন্ধু তখন মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে জেনারেল (অবঃ) ওসমানীকে তাঁর কাছে ডেকে বঙ্গবন্ধু বলেন "Don't be excited my old friend, people are fed up with fiery speeches. They want some revolutionary changes in the social, political and economic system।" ২১শে জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয় সর্বসম্মতিক্রমে। এরপর বঙ্গবন্ধু দ্রুত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন প্রবর্তনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৪। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে আমি সকাল সাড়ে আটটার দিকে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এবং বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে মামাশ্বশুর জনাব মঈনুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমার দাপ্তরিক বিষয়ে আলাপ করতে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসায় যাই। সেখানে পৌঁছে দেখি যে, তিনি শেখ কামালের সঙ্গে আলাপ করছেন। শেখ কামাল তাঁর কাছে গিয়েছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে উচ্ছেদকৃত লোকজন ও বস্তিবাসীদের মীরপুরে পুনর্বাসন করার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। উল্লেখ্য, ঐ সমস্ত লোকজন অনধিকার ও অননুমোদিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় বসবাস করতো। মঈনুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ শেষে কামাল চলে যাওয়ার সময় তিনি ওকে জিজ্ঞেস করেন, "আগামীকাল (২৫শে জানুয়ারী) থেকে তোর আব্বা (বঙ্গবন্ধু) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। অতএব এর পর তোরা রাষ্ট্রপতির বঙ্গভবনে না ধানমন্ডিস্থ তোদের নিজেদের বাসায় অবস্থান করবি"? এর জবাবে শেখ কামাল বলে, "না, নানা, আমরা কোন অবস্থাতেই বঙ্গভবনে যাবো না। আমরা ধানমন্ডির নিজেদের বাসাতেই থাকবো।" অতঃপর শেখ কামাল চলে যায়। আমি মঈনুল ইসলাম সাহেবকে উক্ত ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে আমাকে জানানোর অনুরোধ জানালে তিনি বলেন, "তুই, দেখছি এ ব্যাপারে কিছুই জানিস না। আগামীকাল থেকে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে এবং তোর শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। সংবিধানের প্রস্তাবিত পরিবর্তনে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথাও উল্লেখ করা থাকবে।" অতঃপর মঈনুল ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ শেষ করে আমি সরাসরি আমার আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিসে চলে যাই।

১৫। ২৪শে জানুয়ারী তারিখে আমি বিকেল পাঁচটার দিকে অফিস ত্যাগ করি। আমি গাড়ী চালিয়ে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই। বাড়ীর গেটের কাছে পৌছে দেখি গেটের দরজা বন্ধ। গেটের দরজা খুলতে বললে সেখানে প্রহরারত নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা আমাকে জানায় যে, বাইরের কারোরও গাড়ী নিয়ে বাড়ীর ভেতর যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন লক্ষ্য করলাম যে, ঐদিন থেকে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পুলিশের অতিরিক্ত হিসেবে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক সদস্যকেও ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। আমি নিজের পরিচয় জানালেও তারা আমাকে গাড়ী নিয়ে বাড়ীর ভেতর যেতে দিতে সম্মত হলো না। অতঃপর আমার বাসা বঙ্গবন্ধুর বাসার অতি নিকটে হওয়ায় আমি আমার গাড়ীটি আমার বাসায় রেখে আসি। গেটের পকেট দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ঢোকার সময় দেখি খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে সেখানে এসে পৌঁছেছেন। "কাকা, আসসালামু আলাইকুম" বলে আমি তাঁকে সালাম জানানো সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব কোন কিছু না বলে গেটের বাইরে চলে গেলেন। এর অব্যবহিত পরই খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব আবার গেটের ভেতরে এসে আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, "বাবা ওয়াজেদ, আমি দুঃখিত যে আমি তোমার উপস্থিতি খেয়াল করতে পারিনি।" অতঃপর খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব আমাকে গেটের নিকটস্থ আম গাছটির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আগামীকাল তোমার শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) সংবিধানের যে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন, তা করা হলে সেটা শুধু একটি মারাত্মক ভুলই হবে না, এর ফলে দেশে এবং বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিও অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এক্ষুণি বাড়ীর তেতলার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার শ্বশুরকে এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করানোর চেষ্টা করো। আমি আমার শেষ চেষ্টা করে বিফল মনোরথে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে যাচ্ছি।" এই কথাগুলো বলেই খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে চলে গেলেন। উপরোক্ত কথাগুলো আমাকে বলার সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেবকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আমার মনে হলো যে, ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্ভবতঃ তাঁর ভীষণ তর্কাতর্কি ও ঝগড়াঝাটি হয়েছে।

১৬। সেদিন আমি সোজা বাসায় তিন তলায় চলে যাই। বঙ্গবন্ধুর বাসার তিন তলায় রয়েছে একটি ছোট বৈঠকখানা ও তৎসংলগ্ন বাথরুম, একটি ছোট তোষাখানা এবং সংযুক্ত বাথরুমসহ শেখ কামালের শয়নকক্ষ। বঙ্গবন্ধু তখন সেখানের বৈঠকখানায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, ঐ দুইজন মুরুব্বী ব্যক্তির উপস্থিতিতে রাজনৈতিক বিষয়ে আমি কখনোও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলিনি। অতএব আমি সেখানে পায়চারী করতে থাকলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবরা কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায়। এভাবে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা কেটে যায়। অতঃপর আমি কামালের শয়নকক্ষে শুয়ে আরও প্রায় পৌনে

এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। এর পরেও তারা চলে যাচ্ছেন না লক্ষ্য করে আমি স্থির করলাম যে, রাতে খাবারের পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবো। অতঃপর আমি দোতলায় হাসিনাদের কাছে চলে যাই। হাসিনাকে প্রথমেই বলে রাখলাম যে, ঐ রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একত্রে খাবো। ঐ সময়ে কোন এক ফাঁকে বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে কোথায় যেন চলে যান। সে রাতে বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরেন সাড়ে দশটার দিকে। রাত এগারটার দিকে হাসিনা ও আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে খেতে বসি। সে সময় বঙ্গবন্ধু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে অতি দ্রুত তাঁর খাবার শেষ করে শয়নকক্ষে চলে যান। ঠিক ঐ মুহূর্তে শেখ ফজলুল হক মণি বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে ঢুকেই ছিটকানি লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষের দরজা ছিটকানি লাগিয়ে বন্ধ করে, বিশেষ করে, আমার শাশুড়ীকে শয়নকক্ষের বাইরে রেখে শেখ মণিকে ইতিপূর্বে কখনোও তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) সঙ্গে আলাপ করতে দেখিনি। রাত প্রায় পৌনে একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ততক্ষণেও শেখ মণির বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ শেষ হলো না। অতঃপর হাসিনা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের বাসায় চলে যাই রাত একটার দিকে।

১৭। পরদিন, অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সংসদে পেশ করেন সংবিধান চতুর্থ সংশোধন বিল। তখনকার সংবিধানে উল্লেখিত দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য পেশকৃত প্রস্তাবনাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেন বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে। অতি স্বল্প আলোচনা এবং প্রায় বিতর্কহীন পরিবেশে সংসদে পাস হয়ে যায় চতুর্থ সংশোধন বিল। রাষ্ট্রপতি জনাব মুহম্মদুল্লাহ তখন তাঁর সংসদ ভবন অফিসে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত চতুর্থ সংশোধন বিলটি সংসদে পাস হওয়ার অব্যবহিত পর রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহ তাতে স্বাক্ষর করেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই তা বলবৎ হয়ে যায়। এই চতুর্থ সংশোধনী বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নতুনভাবে প্রবর্তিত হলো রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীতে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ রাখা হয় এবং তৎসংক্রান্ত বিধানটি নিম্নরূপঃ "(১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিসমূহের কোন একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, রাষ্ট্রে শুধু একটা রাজনৈতিক দল (অতঃপর জাতীয় দল নামে অভিহিত) থাকিবে। (২) যখন (১) দফার অধীন কোন আদেশ প্রণীত হইবে, তখন রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল গঠন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। (৩) জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচী, সদস্যভূক্তি, সংগঠন, শৃংখলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে। (৪)-(৩) দফার অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।" ....সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আজকে এমেন্ডেড কনস্টিটিউশনের (মাধ্যমে) যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি এটাও গণতন্ত্র—শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। আমাদের শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনদিন আসতে পারবে না—আমরা এলাউ করবো না। বাংলাদেশকে ভালোবাসবো না, বাংলার মাটিকে ভালোবাসবো না, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসবো না, বাংলার কালচারকে ভালোবাসবো না, তা মানবো না। আর এখন পর্যন্ত, বিকজ (কারণ) আমি ফ্রি স্টাইল দিয়ে দিয়েছিলাম—যার যা ইচ্ছে তাঁরা তা লেখেন, কেউ এই নামে বাংলাদেশকে ডাকেন, ও নামে বাংলাদেশকে ডাকেন। বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে যাঁরা লজ্জাবোধ করেন, তাঁদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার। যেমন নাই চোরাকারবারী, ঘুষখোরদের, যেমন নাই দুর্নীতিবাজদের, তেমন নাই ওই সমস্ত সন্ত্রাসবাদী যাঁরা মনে মনে ভুলে যান, ভুলে যান বাংলার মাটি।"

২১। ...অতঃপর পরিবর্তিত সংবিধানের অধীনে এবং নতুন ব্যবস্থায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার ও মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "স্পীকার সাহেব, এজন্যে আজ আপনার মাধ্যমে যাঁরা যেখানে আছেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, সকলকে আমি আহবান করবোঃ আসুন দেশ গড়ি, আসুন দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটাই, আসুন আমরা দেশের মানুষের দুঃখ দূর করি। তা না করতে পারলে ইতিহাস আমাদের মুখে কলঙ্ক লেপন করবে।" ...এরপর নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমাকে তাঁরা প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন এবং আজকে নতুন সিস্টেমে সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। সিস্টেম পরিবর্তন করেই আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো না। যদি আপনারা চেষ্টা না করেন এবং আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে-যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বছর সংগ্রাম করেছিলেন—সেই সংগ্রাম আপনারা না করেন, অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে গঠনমূলক কাজে, দেশ গড়ার কাজে, উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে, তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি এ অনুরোধ করবোঃ চলুন আমরা অগ্রসর হই—বিসমিল্লাহ করে আল্লাহর নামে অগ্রসর হই। ইনশাল্লাহ, আমরা কামিয়াব হবো।" ...বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ সমাপ্ত হওয়ার পর জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু পরিবর্তিত সংবিধানের অধীনে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন সংসদ কক্ষেই।

২২। ঐ দিন যথারীতি বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ বাসায় দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে আমি জরুরী ভিত্তিতে মধ্যাহ্ন সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। বঙ্গবন্ধু সেদিন দুপুরে বাসায় খেতে এলেন

না। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যা রাফিয়া আখতার ডলী ও হাসিনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক পর্যায়ে আমি রাফিয়া আখতার ডলীকে প্রশ্ন করে বসি, "আপনারা এটা কি করলেন?" আমার প্রশ্নের জবাবে রাফিয়া আখতার ডলী বললেন, "আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে তাঁর পেশকৃত প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করার প্রশ্নই ওঠে না।"

২৩। সেদিন অফিসের কাজকর্ম শেষে আমি সোজাসুজি বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে। বাসার দোতলায় উঠে দেখি যে, শাশুড়ী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রেহানা ও রাসেলকে রূঢ়ভাবে বকাবকি করছেন। এক পর্যায়ে রেহানা ও রাসেলকে উদ্দেশ্য করে শাশুড়ী বলেন, "তোদের আচার-আচরণ ও মেজাজ তো এখন এরকম হবেই। কারণ তোরা তো এখন পে-সিডেন্টের ছেলে-মেয়ে।" শাশুড়ী "প্রেসিডেন্ট" শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃত করে উচ্চারণ করলেন বলে আমার মনে হলো। উক্ত কথাগুলো বলতে বলতেই শাশুড়ী রাসেলের খেলনার জিনিসপত্রে ভর্তি বাক্সটি ঘরের বাইরে ফেলে দেন। আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলাম শুধু, কোন কিছু বলার সাহস পেলাম না। বরঞ্চ, শাশুড়ীর এহেন আচরণ দেখে আমি কিছুটা হতভম্ব ও বিস্মিত হলাম। কারণ আমি শাশুড়ীকে ইতিপূর্বে কখনও তাঁর ছেলেমেয়েদের কাউকে এরকম ক্রুদ্ধ ও রূঢ়ভাবে বকাবকি করতে দেখিনি। সেদিন বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে। তার সঙ্গে দোতলায় উঠে আসেন জাতীয় সংসদ ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন মধ্যবয়সী ও তরুণ সদস্য। বঙ্গবন্ধু হাতমুখ ধুয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে তাঁর শয়ণকক্ষের সামনের লবিতে এসে বসতে না বসতেই শাশুড়ী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সংবিধানের এত ব্যাপক পরিবর্তন, বিশেষ করে একদলীয় (রাজনৈতিক) ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে সে সম্পর্কে তুমি আমাকে একটুও আভাস দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে না। আর তোমার তক্ষুণি সংসদকক্ষেই দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার কি প্রয়োজন ছিল? দু'চার দিন দেরী করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? যাহোক, স্পষ্ট বলে রাখছি যে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে তোমার সরকারী রাষ্ট্রপতি ভবনে যাচ্ছি না।" শাশুড়ীর এই কথাগুলো বলার সময় বঙ্গবন্ধু মিটমিট করে হাসছিলেন। অতঃপর শাশুড়ীর প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, "আমি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তোমাকে সবকিছু বলতে পারি না।"

২৪। সে রাতে হাসিনা ও ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে আমি একটু তাড়াতাড়িই আমাদের বাসায় চলে আসি। অতঃপর আমি হাসিনাকে সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী, বিশেষ করে এক দলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত করার ফলাফল এবং পরিণতি সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করি। আমি হাসিনাকে বললাম, "বঙ্গবন্ধু দেশের জনগণ ও বিদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত একজন জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল মধ্যপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই।

তিনি জাপানসহ পাশ্চাত্যের উন্নত, ধনী ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে এত সম্মান, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন অনেকটা তাঁর এসব গুণাবলী ও রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্যেই। অতএব একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শ সম্পর্কে এ সমস্ত দেশের নেতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শুধু বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হবে না, তাঁর ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হবে মারাত্মকভাবে। এর ফলে এ সমস্ত দেশের সরকার ও দাতাসংস্থাগুলো বঙ্গবন্ধু সরকারকে অর্থ , প্রযুক্তি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সাহায্যে শুধু ইতঃস্ততই করবে না, এদের কেউ কেউ তা একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানিসম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিখাতে যথাযথ উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের শিল্পায়ন ও অন্যান্য সমস্যা মোকাবেলা করার জন্যে জাপানসহ পাশ্চাত্যের সহযোগিতা, অনুদান ও সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দেশের তথা বঙ্গবন্ধুর সার্বিক স্বার্থেই এবং দেশের একজন সচেতন, শুভাকাঙক্ষী ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে আমার তোমাদের সকলকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করি যে, তাঁর দেশে এক দলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা কোনমতেই সমীচীন, যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হবে না। কাজেই সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর উচিৎ হবে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি না করা।" সে রাতে মনে হলো যে, হাসিনা আমার এই কথাগুলো গভীর মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে শুনলো।

২৫। পরদিন অতি প্রত্যুষে হাসিনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় চলে যায়। মাত্র আধা ঘণ্টা পরেই হাসিনা হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের বাসায় ফিরে এসে বলে, "তুমি গতরাতে যেসব কথা বলেছিলে তা এতক্ষণ আব্বাকে বিস্তারিতভাবে বললাম। আব্বা সবকিছু চুপচাপ শুনলেন এবং কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তোমাকে জানানোর জন্যে বললেন যে, দেশের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা শুধু স্বল্পকালের জন্য। আব্বা আরও বলেছেন যে, তুমি যেন এ ব্যাপারে অযথা উত্তেজিত না হও এবং দুশ্চিন্তা না করো. আব্বার এই কথাগুলো যেন কারোরও কাছে জানাজানি না হয়ে যায় সে জন্য তিনি তোমাকে সর্বদা সংযত ও হুঁশিয়ার থাকতে বলেছেন অন্যের সঙ্গে তোমার কথাবার্তায়।"

২৬। ২৬শে জানুয়ারী অর্থাৎ তাঁর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন বিকালে বঙ্গবন্ধু ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ১৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। এই মন্ত্রী পরিষদে আওয়ামী লীগের খন্দকার মোশতাক আহমদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দু'জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও ডঃ এ. আর. মল্লিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্টপতি মুহম্মদুল্লাহ উক্ত মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

এবং তাঁকে ভূমি সংস্কার ও প্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উক্ত মন্ত্রী পরিষদে তাজউদ্দিন আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২৭। ২৬শে জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে গ্রেফতার হন মাওবাদী চরমপন্থী নেতা ক্যাপ্টেন আলতাফ। ২৭শে জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি পৃথক জেলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম ইউরোপের ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিউনিটি বাংলাদেশের জন্য ১ লাখ টন খাদ্যশস্য প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগের জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদে জাতীয় সংসদ সদস্যের পদ থেকে ইস্তফা প্রদান করেন।

২৮। ১২ই ফেব্রুয়ারী আশুগঞ্জ সার কারখানা প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বাংলাদেশকে ২২ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী পল্লী কবি জসীমউদ্দিন সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর প্রতিবাদে বাংলা একাডেমী প্রদত্ত সম্মান পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী খুলনার দৌলতপুরের ৪টি পাটগুদাম দুষ্কৃতকারীদের কারসাজিতে অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের তাঁদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির হিসাব দাখিল করার জন্যে প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন।

২৯। ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সীর সঙ্গে পত্রালাপে চূড়ান্তভাবে স্থির করা হয় যে, আমি (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী কার্লসরুয়েস্থ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে পোস্ট ডক্টরাল কাজের উদ্দেশ্যে ১২ই মার্চ তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করবো। তখন যে কোন সরকারী, আধা–সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কিংবা দাপ্তরিক যে কোন ব্যাপারে বিদেশে যাওয়ার জন্যে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ছিল। একদিন আমার জার্মানী যাওয়ার ব্যাপারটি বঙ্গবন্ধুকে জানালে তিনি একটু চিন্তা করে বলেন, "কাজের জন্যে তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু হাসিনাকে সঙ্গে নিতে পারবে না। কারণ এক বছর দেশের বাইরে থাকলে ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা বিঘ্নিত হবে। অতএব আপাততঃ তুমি একাই চলে যাও। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আমি জ্যামাইকার কিংস্টনে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্যে বিদেশ যাওয়ার সময় হাসিনা ও তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পথে তোমার ওখানে রেখে যাবো। অতঃপর মাস দু'য়েক তোমার সঙ্গে কাটিয়ে ওরা দেশে ফিরে আসবে। এর ফলে একদিকে যেমন হাসিনার লেখাপড়ার বিশেষ ব্যাঘাত হবে না অপরদিকে তেমনি তোমার ছেলেমেয়েদের খুব বেশী দিন আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে না। যাহোক, তুমি তো জানোই তোমার জয় ও পুতুলিকে না দেখে তোমার শাশুড়ী একদিনও স্থির থাকতে

পারে না।" উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম, এ, ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল।

৩০। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) একীভূত হয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। অতঃপর বঙ্গবন্ধুকে এই দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি সংবিধান চতুর্থ সংশোধনীর বিধি বিধান অনুযায়ী এই দলকে 'জাতীয় দল' বলে আখ্যায়িত করে একটি আদেশ জারি করেন। 'জাতীয় দল' গঠিত হওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ, কমরেড মণি সিং-এর নেতৃত্বাধীন 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ-এর সদস্যগণ সামগ্রিকভাবে 'বাকশালে' যোগদান করেন। ব্যক্তিগতভাবে এবং গ্রুপ ভিত্তিতেও বিভিন্ন মহলও 'বাকশালে' যোগদানের জন্য এগিয়ে আসে। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের ৮ জন বিরোধী সদস্যের ৪ জন প্রবীণ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবদুল সাত্তার, মিষ্টার খোয়াই বেয়োজর এবং সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালাউদ্দিন 'বাকশালে' যোগদান করেন।

৩১। ৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী (আই, ডি, এ) বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে ১২ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বাংলাদেশের আশুগঞ্জ সার কারখানা প্রকল্পের জন্যে আই. ডি. এ. পৃথকভাবে ২৪ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ৬ই মার্চ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। ১২ই মার্চ আই. ডি. এ. বাংলাদেশের কয়েকটি কর্মসূচীতে আড়াই কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে।

৩২। ১২ই মার্চ বিকেল চারটার দিকে আমি (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। প্রথমে ঢাকা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ইতিপূর্বে সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এ. রাজ্জাকের সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিষয়াদি সম্পর্কিত বিভাগের মহাপরিচালক জনাব রেজাউল করিমের অফিসে। সেদিন তিনিও একই ফ্লাইটে দিল্লী যাচ্ছিলেন। দিল্লী থেকে তিনি তখন তেহরান হয়ে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহমে ফেরার জন্য বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্লেনটি সেদিন প্রায় ফাঁকা ছিলো। পরবর্তীতে, আমি তাঁর পাশের সীটে গিয়ে বসি। কুশলাদি বিনিময় এবং এটাসেটার ব্যাপারে আলাপের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল' গঠনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জনাব রাজ্জাক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ডঃ ওয়াজেদ, পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে নানান ধরণের প্রশ্ন করেন। বিশেষ করে, তাঁরা এই একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আসল কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে

তথ্য জানতে চান। আমি বিশেষ সদুত্তর দিতে পারিনি। তাই ঢাকা এসেছিলাম এ ব্যাপারে আমাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ ব্রীফ নিতে।" অতঃপর তিনি জানতে চান যে, আমার এবিষয়ে কোন তথ্য জানা আছে কি না। তখন আমি তাঁর কাছে বঙ্গবন্ধু হাসিনাকে এব্যাপারে যেসব কথা বলেছিলেন তার পুনরুল্লেখ করে বলি যে, এর বেশি আমার আর কিছু জানা নেই। নয়াদিল্লী পৌঁছে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব এ. এইচ. এস. আতাউল করিমের বাসস্থানে চলে যান তাঁর পরবর্তী ফ্লাইটের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্যে। সেখানেও বঙ্গবন্ধু কর্তৃক একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে আমি জনাব রাজ্জাককে এব্যাপারে যে কথা বলেছিলাম সেখানেও তার পুনরুল্লেখ করি। অতঃপর রাত বারোটার দিকে তাঁরা দু'জনে আমাকে নয়াদিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে পৌঁছে দেন।

৩৩। লুফথানসার ফ্লাইটে আমি (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাংফুর্টে পৌঁছাই ১৩ই মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে। ইতিপূর্বে আমি কার্লরুয়েস্থ পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে তখন কর্মরত আমার সহকর্মী ডঃ সৈয়দ রেজা হোসেনকে আমার জার্মানী পৌঁছানোর সময়সূচী সম্পর্কে অবহিত করেছিলাম। ডঃ রেজা হোসেন সেখানে প্রশিক্ষণরত আমাদের কনিষ্ঠ সহকর্মী জনাব আমিরুল ইসলামকে নিয়ে ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। তাঁরা ছাড়াও, আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে গাড়ী নিয়ে এসেছিলেন পশ্চিম জার্মানীতে বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন সেকেন্ড সেক্রেটারী জনাব আমজাদুল হক। যাহোক, সকলে মিলে তাঁরা আমাকে কার্লরুয়ে পৌঁছে দেন। ঐ দিনই সকাল এগারোটার দিকে আমাকে অফিসের গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় কার্লরুয়ে শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে জার্মানীর প্রসিদ্ধ ব্ল্যাক ফরেস্টের কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত আমার জন্যে নির্ধারিত কর্মস্থল কার্লরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে। প্রথমে উক্ত কেন্দ্রের প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগের পরিচালক ডঃ এইচ. জে. লাওয়ের অফিসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানের দাপ্তরিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমাকে নেওয়া হয় আমার কর্মস্থল হিসেবে নির্ধারিত উক্ত কেন্দ্রের নিউট্রন ফিজিক্স ও পরমাণু চুল্লী বিষয়ক ইন্সটিটিউটে। এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং ডেপুটি পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ কে হুর্যিট্জ (Writz) ও মিস্টার কুখলে (Kuchle)। তাঁদের দু'জনের সঙ্গে আমার সেখানের গবেষণার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপের সময় আমি জানতে পারি যে, তাঁরা দু'জনেই ইতিপূর্বেই অবহিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা। আমার জন্যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কার্লরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে। কার্লরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্লরুয়ে শহরের বিরাট এলাকাবিশিষ্ট একটি পুরাতন প্রাসাদ চত্বরের এক কোণায় অবস্থিত। ঐ প্রাসাদ চত্বরে রয়েছে

ফুলের বাগান, লেক, গল্ফ ফিল্ড, নার্সারী এবং মনোরম ফরেস্ট। এক কথায় প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্য ও সৌন্দর্যে ভরা ঐ প্রাসাদ চত্বর।

৩৪। (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী পৌঁছার পর থেকেই সেদেশের রাজধানী বনস্থ বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে আমাকে নিয়মিত একটি ইংরেজী পত্রিকা সরবরাহ করা হতো। পত্রিকার মাধ্যমে নিয়মিত বাংলাদেশের খবরাখবর পেতাম। ১৩ই মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদ সদস্যদের তাঁদের স্ব স্ব বিষয়-সম্পত্তির হিসাব দাখিলের জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন। ১৬ই মার্চ (১৯৭৫) তারিখে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে দুষ্কৃতকারীদের বোমা-বাজিতে ১ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়। ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সরকার বাংলাদেশের ৩৯ জন আদর্শ কৃষককে পুরস্কার প্রদান করে। ১৮ই মার্চ বাংলাদেশ, জাপান, কুয়েত ও সুইডেন থেকে মোট ৬২ কোটি টাকার ঋণ সাহায্য লাভ করে। ২০শে মার্চ তারিখে কতিপয় সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী মেহেরপুর ট্রেজারী লুট করে এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে। একই তারিখে সৈয়দপুরে এগারো মেগাওয়াট শক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ২২শে মার্চ তারিখে মাওবাদী চরম বামপন্থী নেতা আলাউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার হন।

৩৫। ২৬শে মার্চ (১৯৭৫) তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' বেশ কিছু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। প্রায় সোয়া ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "...একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার (দেশের) জায়গা হলো (মাত্র) ৫৫ হাজার বর্গমাইল। যদি আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর ৩০ লক্ষ (লোক) বাড়ে তাহলে ২৫-৩০ বছরে বাংলায় কোন জমি থাকবে না চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সেজন্য আজকে আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। এটা হলো তিন নম্বর কাজ। এক নম্বর হলো, দুর্নীতিবাজ খতম করুন, দুই নম্বর হলো (কল) কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে প্রোডাকশন বাড়ান, তিন নম্বর পপুলেশন প্লানিং আর চার নম্বর হলো, জাতীয় ঐক্য। জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্যে একদল (গঠন) করা হয়েছে। যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন, এর আদর্শে বিশ্বাস করেন, চারটি রাষ্ট্রীয় (মূল) আদর্শ মানেন, সৎপথে চলেন, তাঁরা সকলেই এই (জাতীয়) দলের সদস্য হতে পারবেন। যাঁরা বিদেশী এজেন্ট, যাঁরা বহিঃশত্রুর কাছ থেকে পয়সা নেন, এতে তাদের স্থান নাই। সরকারী কর্মচারীরাও এই দলের সদস্য হতে পারবেন, কারণ তাঁরাও এই জাতির একটা অংশ। তাঁদেরও অধিকার থাকবে এই দলের সদস্য হওয়ার। এই জন্য সকলে যে যেখানে আছেন একতাবদ্ধ হয়ে কাজে লাগতে হবে।" অতঃপর একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় দলের সাংগঠনিক কাঠামোর সম্ভাব্য রূপরেখা বর্ণনা করে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই জাতীয় দলের আপাততঃ ৫টা ব্রাঞ্চ থাকবে। একটা

শ্রমিক ভাইদের অংগদল, কৃষক ভাইদের একটা, যুবক ভাইদের একটা, ছাত্রদের একটা এবং মহিলাদের একটা। এই পাঁচটা অংগদল মিলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। আমাকে অনেকে বলেন, কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ হলে আমাদের কি হবে। আমি বলি, আওয়ামী মানে তো জনগণ, (তাই) ছাত্র, যুবক, শিক্ষিত সমাজ, সরকারী কর্মচারী, সকলে মিলে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।"

৩৬। ....নতুন রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বলেন, "সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি, আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা–এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে যাচ্ছি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে—ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেবো না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাবো—তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান—এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদেরকে বিদায় দেয়া হবে। তা না হলে, দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে (এক) হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত কম্পলসারী কো-অপারেটিভ সদস্য হবেন। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, (কিছু) অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে (আর বাকী) অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। দ্বিতীয়তঃ থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। এই কাউন্সিলে রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারী যেই হোক, একজন তার চেয়ারম্যান হবেন। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারী কর্মচারী। তার মধ্যে আমাদের কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি থাকবে, যুবক প্রতিনিধি থাকবে, ব্যাংক প্রতিনিধি থাকবে—তারাই থানাকে চালাবে। আর জেলা থাকবে না—সমস্ত মহকুমা জেলা হয়ে যাবে। সেই মহকুমায় একটি করে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল হবে। তার চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী এক সঙ্গে তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিউপিলস্ রিপ্রেজেনটেশন থাকবে। পার্টি রিপ্রেজেনটেশন থাকবে। সেখানে তাঁরা সরকার চালাবেন। এইভাবে আমি একটা সিস্টেমের চিন্তা করছি এবং করবো বলে ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করেছি। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই।"

৩৭। ...নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের রূপরেখা উল্লেখ করে উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আর একটা কথা বলতে চাই, বিচার। বাংলাদেশের বিচার (ব্যবস্থা)

ইংরেজ আমলের বিচার (ব্যবস্থা)। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে প্রায় ২০ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে কেস দিয়ে যাই। ঐ মামলার ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিন্যাল কেস হয়, চার বা তিন বছরের আগে শেষ হয় না। এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে, থানায় ট্রাইব্যুনাল করার (ব্যবস্থা থাকবে) এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে।"

৩৮। ২৮শে মার্চ তারিখে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ৩০ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৯শে মার্চ বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বাংলাদেশের জন্য সাড়ে ১৫ লাখ মণ খাদ্যশস্য মঞ্জুর করে। ৩০শে মার্চ তারিখে হাসিনা আমাকে ফোনে জানায় যে, বঙ্গবন্ধুর আব্বা শেখ লুৎফর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। ১২ই মার্চ তারিখে আমার জার্মানী যাত্রার দিনে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিলেন। আমার শাশুড়ী সে সময় তাঁর নিরতিশয় সেবাশুশ্রুষা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আব্বার সঙ্গে আমার শাশুড়ীর (তাঁর বিয়ের পূর্বে) চাচার সম্পর্ক ছিল। ১৯৬৭ সালে হাসিনার সঙ্গে আমার বিয়ের পর দাদা আমার কাছে কতো না মজার মজার গল্প বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শৈশবকাল, শিক্ষাকাল, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ভূমিকা ও তৎসময়ে কারাবরণ এবং রাজনৈতিক জীবনের বহু ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর আব্বা আমাকে অনেক তথ্য দিয়েছিলেন। ঐ সব ঘটনার কথা সেদিন বারংবার মনে হয়।

৩৯। ১লা এপ্রিল তারিখে দু'দেশের সমুদ্রসীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এবং ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যবনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বৈঠক। ৩রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের গুপ্ত সশস্ত্র সমাজবিরোধীদের প্রতি ১৫ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য নির্দেশ দেন। ৫ই এপ্রিল তারিখে কুমিল্লার পালপাড়া খেয়াঘাটে স্টেনগানসহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে একশত টাকার নোট অচল ঘোষণা করে। ৮ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার অচল টাকার নোট জমা গ্রহণে কারচুপির অভিযোগে ৪ জন ব্যাংক ম্যানেজারসহ ১৬ ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে চাকুরী থেকে অপসারণ করে। ১৪ই এপ্রিল কতিপয় দুষ্কৃতকারীর কারসাজিতে ক্রিসেন্ট জুটমিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং এতে বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়। ১৬ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ জারি করে।

৪০। ১৬ই এপ্রিল (১৯৭৫) তারিখে ঢাকায় ভারতের ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে শুরু হয় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা বৈঠক। ১৮ই এপ্রিল তারিখে গঙ্গা নদীতে ভারতের ফারাক্কা বাঁধ চালু করার ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর ৫৫

হাজার কিউসেক পানির মধ্যে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি বাংলাদেশের জন্য সুনিশ্চিত করে ভারতকে মাত্র ১১ হাজার কিউসেক পানি ফারাক্কা বাঁধ হতে প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

৪১। ১৯শে এপ্রিল সরকার বাংলাদেশের দুটো সংবাদ সংস্থা বি. এস. এস. ও বি. পি. আই.-কে একত্রীভূত করে। ২১শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তব্যে অবহেলার দায়ে মাওরার লাংগলবাঁধ ফাঁড়ির সকল পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২৫শে এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার একটি অধ্যাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করে।

৪২। ইতিপূর্বে হাসিনা আমাকে ফোনে জানায় যে, বঙ্গবন্ধু ২৬শে এপ্রিল জ্যামাইকার কিংস্টনে ২৯শে এপ্রিল থেকে ৬ই মে অনুষ্ঠেয় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে কিছু সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করবেন। ঐ সুযোগে বঙ্গবন্ধু আমাদের শিশু জয় ও পুতলীসহ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি সেই মোতাবেক ফ্রাংফুর্ট শহরে পৌঁছাই ২৬শে এপ্রিল সকালে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দাপ্তরিক ব্যাপারে সাক্ষাৎ করার জন্যে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতবর্গ। পশ্চিম জার্মানীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী ও তাঁর অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, বাংলাদেশ বিমানের একমাত্র বোয়িং বিমানটি আগের দিন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী বিমানবন্দরে আটকে পড়ায় বঙ্গবন্ধু পরদিন সকালে ফ্রাংফুর্ট পৌঁছাবেন জার্মানীর লুফথানসার একটি ফ্লাইটে।

৪৩। অতঃপর বঙ্গবন্ধু ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে পৌঁছান ২৭শে এপ্রিল সকালে। এর কিছু সময় পর তিনি লুফথানসার অপর একটি ফ্লাইটে জ্যামাইকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বিধায় তাঁর জন্য উক্ত বিমানবন্দরের ভি.ভি.আই.পি লাউঞ্জেই ব্যবস্থা রাখা হয়। উক্ত লাউঞ্জে গিয়ে অবগত হই যে, হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আসেনি। মনে মনে আমি একটু ক্ষুব্ধ হই। ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধুর সফর সঙ্গীর একজন আমাকে একজন সুন্দরী তরুণীর একটি বড় আকারের ফটো প্রদান করে জানিয়ে ছিলেন যে, উক্ত মেয়েটির সঙ্গে শেখ কামালের বিবাহ স্থির হয়েছে। মেয়েটির নাম সুলতানা খুকী। ওর আব্বা দবিরউদ্দিন আহমদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ছিলেন। যাহোক, কুশলাদি বিনিময়ের পর বঙ্গবন্ধু আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আব্বা তাঁর মৃত্যুর একদিন আগে বংশের বড় নাতী-বৌ দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় অত্যন্ত তড়িঘড়িতে কামালের বিয়ে স্থির করতে হয়। এর পরদিন আব্বা ইন্তেকাল করেন। বিবাহ অনুষ্ঠান আগামী জুলাই মাসের কোন এক তারিখে আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে ঐ সময় তোমাকে অবশ্যই ঢাকায় যেতে হবে। ঐ

অনুষ্ঠানের পর তুমি নিজেই হাসিনা ও তোমার ছেলেমেয়েদেরকে সঙ্গে করে জার্মানী নিয়ে আসবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমার পোল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী সফরে আসার কর্মসূচী রয়েছে। সুতরাং ঐ সময়ে হাসিনারা আমার সঙ্গে ঢাকায় ফিরে যাবে।" অতঃপর কামালের বউকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না বঙ্গবন্ধুর এই প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, "কামালের সঙ্গে খুকীর খুব ভাল মানাবে"। এর একটু পর আমি বঙ্গবন্ধুকে বললাম যে, জার্মানীর যে পরমাণু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আমি কর্মরত রয়েছি তার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আগ্রহশীল। আমার এই কথার জবাবে বঙ্গবন্ধ বললেন, "মে মাসের ৮/৯ তারিখে আমি জ্যামাইকা থেকে লন্ডনে পৌছাবো। তুমি প্রস্তাবিত সহযোগিতা চুক্তির খসড়া নিয়ে ঐ তারিখে লন্ডনে আমার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলো"। অতঃপর বঙ্গবন্ধু সেখানে উপস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতবর্গকে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে ডেকে পাঠান।

৪৪। ঐ দিন বঙ্গবন্ধুর জ্যামাইকার উদ্দেশ্যে ফ্রাংকফুর্ট ত্যাগ করার পর সেখানের হোটেলের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর কক্ষে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণ সমবেত হন। এটা-সেটা বিষয়ে কথাবার্তার পর তাঁরা সবাই বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে এক দলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চান। আমি পূর্বের মতো ঐসম্পর্কে বঙ্গবন্ধু হাসিনাকে যে সব কথা বলেছিলেন তা তখন পূর্বাপর উল্লেখ করি। তাঁরা আমার কথাগুলো গভীর মনোযোগে শোনেন। অতঃপর তাঁরা শুধু একটু মাথা নাড়লেন, কিন্তু কোন কিছুই বললেন না।

৪৫। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ফেনীতে ১৩২ কে. ভি. গ্রীড ষ্টেশনের উদ্বোধন করা হয়। ৩রা মে তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার বাংলাদেশের জয়দেবপুরস্থ নির্মাণাধীন মেশিন টুলস্ কারখানার জন্যে এক কোটি ডলার সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করে। ৬ই মে তারিখে কুষ্টিয়া-কুমারখালী ৩৩ কিলোভোল্ট ট্রান্সমিশন লাইনের উদ্বোধন করা হয়।

৪৬। ৮/৯ই মে তারিখে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে আমি লন্ডন পৌছাই ৬ই মে সকালে। লন্ডনের রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছেই আমি সেখানের বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর নূরুল মোমেন খান, মিহির ভাইকে ফোন করি। তিনি আমাকে সোজা তাঁর বাসায় চলে আসতে বলেন। অতঃপর একটি ট্যাক্সি করে আমি তাঁর ফিঞ্চলী এলাকার গ্র্যানভিল রোডস্থ বাসায় গিয়ে উঠি। সেদিনটি ছিলো রোববার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। পরদিন, অর্থাৎ ৭ই মে মিহির ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর অফিসে যাই। সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাসের হাই কমিশনার সৈয়দ আব্দুস সুলতান এবং ডেপুটি হাই কমিশনার ফারুক আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আমার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁরা দু'জনেই আমার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে

জানতে চান। আমি আগের মতোই তৎসম্পর্কে হাসিনাকে বলা বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো পূর্বাপর উল্লেখ করে বললাম যে, এটা হয়তো স্বল্পকালীন ব্যবস্থা মাত্র। কারণ আর একটা রাষ্ট্রপতির আদেশ জারির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পুনরায় বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে পারেন। এর জন্যে সংসদের নতুন করে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা দু'জনেই আমাকে বলেছিলেন, " Let us hope so।"

৪৭। পরদিন, অর্থাৎ ৮ই মে সকালে শেখ জামাল মিহির ভাইয়ের বাসায় আসে দুটো সুটকেস সঙ্গে নিয়ে। এর আগে মিহির ভাই আমাকে বলেছিলেন, "বাংলাদেশে এখন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি যা, তাতে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জামাল স্যানহার্স্টে সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েশন প্রশিক্ষণ কোর্স সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছে। আমি ওকে বলেছিলাম যে, ওর উচিৎ হবে আর এক বছর সেখানে থেকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন প্রশিক্ষণ কোর্সটিও শেষ করা। এর জন্যে শেখ নাসের (বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই) সাহেব আমাদের হাই কমিশনারের নিকট প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জমা রেখেছেন। কিন্তু জামাল আমার কথা কিছুতেই শোনে না। সে অতি শিগগির দেশে ফেরার জন্যে ওর মালপত্র নিয়ে আসবে। আপনাকে যেভাবেই হোক জামালকে আর এক বছর স্যানহার্স্টে থাকার জন্য সম্মত করাতে হবে। স্যানহার্স্টের উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরু হয় আগস্টের ১লা তারিখ থেকে। জুলাই মাসে শেখ কামালের বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে জামাল লন্ডন চলে আসতে পারে।"

৪৮।সেদিন মিহির ভাইয়ের কথাগুলো জামালকে বলে আমি আরও উল্লেখ করি যে, আমিও জার্মানীতে পোস্টডক্টরাল কাজ করছি। সুতরাং স্যানহার্স্টে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করলে তা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরীতে পদোন্নতির ব্যাপারে অনেক সহায়ক হবে। জামাল আমার কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে শুনে বলে, "দুলাভাই, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত তবে আমার একটি শর্ত আছে। আপনি যদি আপনার সেই সহকর্মীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের বন্দোবস্ত করার আশ্বাস দেন তাহলে আপনার প্রস্তাব আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেবো।" এর উত্তরে আমি জামালকে জানাই, "আমি ইতিপূর্বে জার্মানীর হ্যানোভার শহরে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন সেখানে স্বামীর সঙ্গে অবস্থানরত আমার উক্ত সহকর্মীর মেয়ের খালাতো বোনের সঙ্গে আমার ঐবিষয়ে কিছুটা আলাপ হয়েছিলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিবাহের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হবো।" এর জবাবে জামাল আমাকে বলে, "তাহলে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আগামীকাল এ কথাগুলো বলে আব্বাকে রাজি করানোর সম্পূর্ণ ভার আপনার। তবে সত্যি কথা কি দুলাভাই, মা-কে ছেড়ে এতদূরে থাকতে আমার ভীষণ কষ্ট হয়।"

৪৯। ৯ই মে সকালে মিহির ভাই, জামাল ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে। একটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের নিয়মিত ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধু যথাসময়ে লন্ডন

পৌঁছান। লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কর্মী এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রায় সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার হিথরো বিমান বন্দরে 'ক্যুইনস' লাউঞ্জ হিসেবে অভিহিত সুরক্ষিত সুরম্য ভি.ভি.আই.পি বিশ্রামাগারে ব্যবস্থা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্বল্প সময়ের যাত্রাবিরতির জন্যে। প্রথমেই জামাল, বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান ও আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। কুশলাদি বিনিময়ের পর বঙ্গবন্ধু আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ওয়াজেদ, বিদেশ সফরে গিয়েও আমি কোন কেনাকাটা করতে পারি না। তোমার ছেলে জয়ের জন্য তো আমি কিছুই কিনতে পারিনি। ওর জন্যে কোনকিছু না নিলে তো তোমার শাশুড়ী আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলবে"।

৫০। বঙ্গবন্ধুর এ কথার জবাবে আমি তাঁকে জানাই যে, জার্মানী থেকে জয়ের জন্য একটি অত্যাধুনিক সাইকেল সঙ্গে নিয়ে এসেছি। অতঃপর বঙ্গবন্ধু সেখানে উপস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর নূরুল মোমেন খান সাহেবকে সাইকেলটি বিমানে উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেন। এরপর বঙ্গবন্ধু জামালের কাছ থেকে জানতে চান যে, সে কবে নাগাদ দেশে ফিরবে এবং দেশে পাঠানোর জন্যে তার মালপত্রগুলো বিমানবন্দরে আনা হয়েছে কি না? জামাল বলে, "আব্বা, আমার মালপত্রগুলো তো এনেছি, কিন্তু দুলাভাই এ ব্যাপারে আমাকে অন্য প্রস্তাব দিয়েছেন।" অতঃপর বঙ্গবন্ধু ঐব্যাপারে আমার মতামত চাইলে আমি জামালের স্যানহার্স্টে আর এক বছর থেকে তথাকার পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন কোর্সটি সম্পন্ন করা সমীচীন হবে বলে মতামত ব্যক্ত করি। বঙ্গবন্ধু অতঃপর ঐবিষয়ে নূরুল মোমেন খান সাহেবের মতামত চাইলে তিনিও আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। আমাদের কথা শোনার পর বঙ্গবন্ধু কিছুক্ষণ চিন্তা করে জামালের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোকে বিদেশে রেখে তোর মা স্থির থাকতে পারে না। তুই তোর মালপত্রগুলো বিমানে উঠিয়ে দে। ভবিষ্যতে অনেক স্কলারশিপ পাওয়া যাবে। তখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন কোর্স সম্পন্ন করার জন্যে আবার স্যানহ্যার্স্টে চলে আসবি।" এরপর বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জামাল ও আমি মিহির ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাই আমাদের মালপত্রগুলো বিমানে উঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে। উল্লেখ্য যে, এরপর বঙ্গবন্ধু ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) তারিখে নিহত হওয়ার পূর্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

৫১। ১১ই মে তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে আড়াই হাজার অগভীর ও গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়নের ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৪ই মে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের কয়েক ধরনের সুতা ও কাপড়ের ওপর হতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯শে মে বাংলাদেশ ও গণচীনের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক। ২২শে মে বাংলাদেশ বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের

সদস্য নির্বাচিত হয়। ২৫শে মে কতিপয় দুষ্কৃতকারীর গুলিতে নিহত হন মাদারীপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ২৭শে মে ভেড়ামারায় ৪০ মেগাওয়াট প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ৩০শে মে বঙ্গবন্ধুর সরকার কতিপয় ভোগ্যপণ্য ও শিল্প পণ্যের শুল্ক হ্রাস করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৫২। ৩রা জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের বেসরকারী এজেন্সীগুলোকে আন্তর্জাতিক রুটে জাহাজ ভাড়া করার অনুমতি প্রদান করে। ৪ঠা জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে শিল্পায়ন সহজতর ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী সংস্থা আদেশ প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করে। ৫ই জুন বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে ১৫ কোটি ডলার ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৬ই জুন বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে ১২০ কোটি ডলার সাহায্য ঋণদানের জন্যে কনসোর্টিয়াম দেশসমূহের প্রতি আবেদন জানায়।

৫৩। ৭ই জুন (১৯৭৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করা হয়। উক্ত গঠনতন্ত্রে চারটি রাষ্ট্রীয় মূল আদর্শের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই বাকশালের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। 'বাকশালের' সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম, মনসুর আলী এবং অপর তিনজন সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন সর্বজনাব জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি ও আবদুর রাজ্জাক। একই সঙ্গে 'বাকশালের' ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। 'বাকশালের' কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন– রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, জনাব আব্দুল মালেক উকিল, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, শ্রী মনোরঞ্জন ধর, ডঃ মোজাফফার আহমদ চৌধুরী, জনাব জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, শেখ আব্দুল আজিজ এবং গাজী গোলাম মোস্তফা। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, জনাব তাজউদ্দিন আহমদকে 'বাকশাল' কার্যনির্বাহী কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটির কোনটাতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জাতীয় দল, 'বাকশালের' রাজনৈতিক প্লাটফরমে দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পত্রিকা সম্পাদক এবং সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিডিআর ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর প্রধানদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই আদেশে 'বাকশালের' পাঁচটি অংগদলের নাম এবং সেগুলোর প্রধানদের নাম ঘোষণা করা হয়। জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জাতীয় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে জনাব তোফায়েল আহমদ, জাতীয় মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকার

পদে বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং জাতীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে শেখ শহিদুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয়।

৫৪। জাতীয় দল 'বাকশাল' গঠিত হওয়ার পর থেকেই উক্ত দলে যোগদানের জন্যে দেশের বিভিন্ন মহল উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিভিন্ন সরকারী দফতরের চাকুরীজীবীদের অনেকেই বাকশালে যোগদানের জন্যে আবেদন করেন। হাজী মোহাম্মদ দানেশের মতো প্রবীণ নেতাসহ এককালে বঙ্গবন্ধুর বিরোধী ছিলেন এমন অনেকে 'বাকশালে' যোগদান করেন। ২৩শে মে ঢাকার ২২৪ জন সাংবাদিক, ২রা জুন ঢাকার দুইজন পত্রিকা সম্পাদক এবং ৪ঠা জুন ঢাকার আরও ৩০২ জন সংবাদপত্রসেবী 'বাকশালে' যোগদানের জন্যে আবেদনপত্র পেশ করেন।

৫৫। ৯ই জুন ঢাকা জেলার সাভারে দেশের ৪৮তম টেক্সটাইল মিলের উদ্বোধন করা হয়। ১০ই জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার ঢাকায় বাজার বিপণী নির্মাণে ৪ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করে। ১২ই জুন বঙ্গভবনে জাতীয় দল, বাকশালের সভাপতি এবং রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত দলের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা। ১৩ই জুন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘোড়াশাল সার কারখানা সুদীর্ঘ ১০ মাস ধরে মেরামত করে পুনরায় চালু করা হয়। একই তারিখে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম জেলার বেতবুনিয়ায় উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র। ১৬ই জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশ জারি করে। উক্ত আদেশবলে চারটি দৈনিক পত্রিকা ও ১২৪টি সাময়িকী ব্যতীত দেশের অন্যান্য সকল পত্র-পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং একই সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস সরকারী মালিকানাভুক্ত করা হয়।

৫৬। ১৯শে জুন (১৯৭৫) তারিখে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় দল 'বাকশালের' কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক। উক্ত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, এর আদর্শ, লক্ষ্য এবং তাঁর সরকারের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সুদীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টার ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু দেশে এক দলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে বলেন, "...আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল (লোক) বলেন, আমরা পলিটিশিয়ান (আর) একদল (লোক) বলেন, আমরা ব্যুরোক্রেট। তাঁদের (ব্যুরোক্রেটদের) মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা হলো রাজনীতিবিদদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকা। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকতো। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং (তা) দূর করে—সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং (এর) মঙ্গল চায়— এটা প্রমাণ করতে হবে। আমার সমাজে যে সমস্ত গুণী-জ্ঞানী লোক আছেন ও অন্য ধরনের যত লোক আছেন, তাঁদের নিয়ে আমার একটা পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে

পারি, যদি আমি নতুন একটা সিস্টেম চালু করি এবং একটা নতুন (রাজনৈতিক) দল সৃষ্টি করি—'জাতীয়দল' যার মধ্যে একমত, একপথ, একভাব (এবং) এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যাঁরা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, তাঁরা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যেতে পারেন। এ জন্যে আজকে এটা করতে হয়েছে।"

৫৭। ...অতঃপর দেশের ভবিষ্যত প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "(বাংলাদেশকে) ভাগ করা হবে ষাটটি জেলায়। প্রত্যেক জেলার জন্যে একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তাঁর অধীনে এসপি থাকবেন। দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা থাকবেন। (ডিস্ট্রিক্ট) কাউন্সিলে সরকারী কর্মচারীরাও থাকবেন। প্রত্যেক জেলায় অর্থাৎ বর্তমান মহকুমাসমূহে একটি করে এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে এবং তার একজন গভর্নর থাকবেন। তিনি (গভর্নর) স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন। শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জেলা গভর্নরের কাছে যাবে আমার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা। তাঁর কাছে যাবে আমার খাদ্যসামগ্রী। তাঁর কাছে যাবে আমার টেস্ট রিলিফ, লোন, বিল ও সেচ প্রকল্পের টাকা। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ও ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরিচালিত হবে। তবে কি—ব্রিটিশ আমলারা বলে গেছেন সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে হবে, এস. ডি. ও. সাহেব যা করবেন সেটাই হবে ফাইনাল কথা, সি. ও সাহেব শাসন করবেন থানায় বসে—সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাখতে হবে? এতে দেশের মঙ্গল হবে না। কারণ আমি যে টাকা দেবো থানায় সেই টাকা দেবো সি. ও সাহেবকে। এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ বেটার দ্যান এনি সি.ও ইফ দ্য পলিটিক্যাল ওয়ার্কার ইজ সিনসিয়ার। অন্যথায় ক্যাশের টাকা সেখান থেকে লুট হয়ে যাবে"। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আমি অর্ডার দিয়েছি—আজকে অর্ডার হয়ে গেছে। ১৫ই জুলাই থেকে এই ৬০ জন গভর্নরকে ট্রেনিং দেয়া হবে। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে (মহকুমাগুলো) ডিস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে। এক বছরের মধ্যে থানা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল করতে হবে। সেখানে 'বাকশালের' রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, কৃষকের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, শ্রমিকের (রিপ্রেজেন্টেটিভ) থাকবে, যুবকের (রিপ্রেজেন্টেটিভ) থাকবে, মহিলাদের (রিপ্রেজেন্টেটিভ) থাকবে। একজন গভর্নর থাকবেন যিনি হবেন হেড অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেখানে মেম্বার অব পার্লামেন্ট গভর্নর হতে পারেন। সেখানে পার্লামেন্টের মেম্বার নন, এমন পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হতে পারেন। সেখানে সরকারী কর্মচারী—যাঁকে বিশ্বাস করি তিনিও হতে পারেন। আবার নাক উঁচু করা চলবে না। পার্টির মেম্বার হওয়ার পরে দে উইল টেক (ওভার) রেসপনসিবিলিটিজ অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন।"

৫৮। ...এরপর উক্ত ভাষণে আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজকে এই যে নতুন এবং পুরানো যে সমস্ত সিস্টেমে

আমাদের দেশ চলছে, এর জন্য আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। আত্ম-সমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না। আমরা ভুল করেছিলাম। আমাদের বলতে হয় যে, ভুল করেছি। আমি যদি ভুল করে না শিখি, ভুল করে শিখবো না, সে জন্য—আমি সবই ভুল করলে আর সকলেই খারাপ কাজ করবে- তা হতে পারে না। আমি ভুল নিশ্চয়ই করবো—আমি ফেরেস্তা নই, শয়তানও নই। আমি মানুষ, আমি ভুল করবোই। আমি ভুল করলে আমার মনে রাখতে হবে, আই ক্যান রেকটিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেকটিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না, আমি যেটা করেছি সেটাই ভাল—দ্যাট কানট বি হিউম্যান বিইং। ফেরেস্তা হইনি যে সবকিছু ভাল হবে। হতে পারে, ভাল হতে পারে। উই উইল রেকটিফাই ইট। এই সিস্টেম ইনট্রোডিউস করে যদি দেখা যায় যে, খারাপ হচ্ছে, অল রাইট রেকটিফাই ইট। কেন না আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে।”

৫৯। ...তাঁর ভাষণের আর এক পর্যায়ে দেশের রাজনৈতিক 'ইজম' সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, "তবে, এখানে যে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি, সে অর্থনীতি আমাদের, সে ব্যবস্থা আমাদের। (অন্য) কোন জায়গা থেকে হায়ার করে এনে, ইমপোর্ট করে এনে কোন 'ইজম' চলে না- এ দেশে, কোন দেশেই চলে না। আমার মাটির সঙ্গে, আমার মানুষের সঙ্গে, আমার কালচারের সঙ্গে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে, আমার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে। কারণ আমার দেশে অনেক অসুবিধা আছে। কারণ, আমার মাটি কি, আমার পানি কতো, আমার এখানে মানুষের কালচার কি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তা না জানলে হয় না। ফান্ডামেন্টালী আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই, আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই। বাট দ্যা সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডু নট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়্যার ইন দ ওয়ার্লড। এটা আমার মত, পার্টির মত। ”

৬০।...অতঃপর দেশে এক দলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে, নতুন সিস্টেমে আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স, সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী কর্মচারী, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার (চিকিৎসাবিদ), ইঞ্জিনিয়াস—যদ্দুর সম্ভবপর—(জাতীয় দল, বাকশালে) এদের রাখার চেষ্টা করেছি। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড—আমার পুরানো বন্ধুরা আছেন যাঁরা আগে আমার সঙ্গে ছিলেন। কিছুদিন ডিফারেন্ট পার্টি করেছেন। আগে আমরা এক জায়গায়ই ছিলাম। মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম—এটা সব জায়গায় হয়। আমরা আবার এক হয়েছি। সেকেন্ড রেভল্যুশন ইজ নট দ্যা এন্ড। সেকেন্ড রেভল্যুশন যে করেছি আমি, চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি, এটাই শেষ নয়। শেষ কথা নয়, এটা হলো স্টেপ। ডেভেলপমেন্ট, মোর প্রোডাকশান, ফাইট এগেইনস্ট করাপশান, ফর ন্যাশনাল ইউনিটি

এ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এগুলো করলে আমরা একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে পারবো—যেখানে মানুষ সুখে সাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে। এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভল্যুশনের মূল কথা—এ জন্যই আমি সেকেন্ড রেভল্যুশনের ডাক দিয়েছি।"

৬১। ২০শে জুন বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু পরিবহনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য স্থল ও নৌবাহিনী নিয়োগ করে। ২১শে জুন তারিখে মিশরের সরকার বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশকে সুয়েজ খালের তীরে একটি ভূমিখন্ড দান করে। ২২শে জুন তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার সারাদেশে ৬০টি জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা করে। একই তারিখে প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম, মনসুর আলী জাতীয় সংসদে জাতীয় দল, 'বাকশালের' সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৪শে জুন তারিখে বাংলাদেশ এবং কাবুল সরকারদ্বয়ের মধ্যে একটি কারিগরী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই তারিখে বাংলাদেশ এবং (তৎকালীন) সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৫শে জুন বৃটেন ও বেলজিয়াম সরকারদ্বয় বাংলাদেশের জন্য পণ্য ও ঋণ সাহায্য মঞ্জুর করে। ২৭শে জুন তারিখে ঢাকা ও কাবুলের মধ্যে একটি বিমান চলাচল সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮শে জুন তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড গঠন করে।

৬২। ইতোপূর্বে (জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে) আমি শাশুড়ীর কাছ থেকে ১৫ই জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিতব্য শেখ কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ সম্বলিত একটি টেলিগ্রাম পাই। অতঃপর আমি উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আগ্রহ ব্যক্ত করে তদুদ্দেশ্যে স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে কার্লসরুয়ের আমার ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডঃ হুইর্টজ (Writz)-কে পত্র লিখি। প্রফেসর হুইর্টজ তখন তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল এবং আরও কয়েকটি শহরে ছয় সপ্তাহের সফর কর্মসূচী শেষে দেশে ফিরেছেন। আমার উক্ত চিঠি পাওয়ার দুই-তিন দিন পর প্রফেসর হুইর্টজ আমাকে মৌখিকভাবে জানান, "নির্ধারিত কর্মসূচীর ব্যাঘাত ঘটায় এমন প্রস্তাবে আমরা সাধারণতঃ সম্মতি দিই না। যাহোক, যেহেতু আপনি আপনার শ্বশুরের একমাত্র জ্যেষ্ঠ জামাতা, সুতরাং আমরা আপনাকে তদুদ্দেশ্যে আনঅফিসিয়াল অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এবিষয়ে আপনার স্কলারশিপের উদ্যোক্তা, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সীকে অবহিত করা যাবে না। আর একটা কথা। যেহেতু বাংলাদেশে যাওয়ার ফলে আপনার এখানের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী বিঘ্নিত হবেই, সুতরাং আপনি সেখানে সম্পূর্ণ আগস্ট মাস কাটিয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে এখানে অনুষ্ঠিতব্য আণবিক শক্তি চুল্লী বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য উক্ত তারিখের মাত্র দিন দুয়েক আগে ফিরবেন। যেহেতু আপনাকে অফিসিয়াল ছুটি দেওয়া হবে না, অতএব আপনার স্কলারশিপ উক্ত সময়কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হবে না। আপনার স্কলারশিপের টাকা নিয়মিত

আপনার ব্যাংক-এ জমা দেওয়া হবে। আর একটা শর্ত এই যে, সেপ্টেম্বর মাসে এখানে ফিরে আসার সময় আপনি আপনার পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবেন না।"

৬৩। প্রফেসর হুইর্টজের উপরোক্ত শর্তে তখন কামালের বিবাহ উপলক্ষে দেশে ফিরলে আমার ৮ সপ্তাহের কর্মসূচী ব্যাহত হবে। তবুও ছেলেমেয়েদের দেখার ইচ্ছা সম্বরণ করতে না পেরে সাময়িকভাবে দেশে ফেরার জন্য আমি মনস্থির করি। অতঃপর জুন মাসের চতুর্থ সপ্তাহের শেষের দিকে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পাই। তখন তিনি ঢাকায় ছুটিতে ছিলেন। উক্ত টেলিগ্রামে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি ও বেগম মুজিবের গভীর কামনা যে আমি যেন যেকোনোভাবে কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য স্বল্পকালের জন্য হলেও ঐ সময়ে ঢাকায় চলে যাই। তখন আমি আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি এজেন্সীর স্কলারশিপ সম্পর্কিত শর্তগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করি। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সীর সম্মতি ব্যতিরেকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচীর কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটানো হলে স্কলারশিপ বাতিল করা হতে পারে। অতঃপর এতদবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রফেসর হুইর্টজের কাছ থেকে সাময়িকভাবে দেশে ফেরার জন্য লিখিত অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি লিখিত অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। অতএব বাধ্য হয়েই আমি সাময়িকভাবে দেশে ফেরার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করি এবং তার কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে শাশুড়ীকে চিঠি লিখি। জুন মাসের শেষের দিকে জার্মানীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী আমজাদুল হক আমাকে জানায় যে, শেখ কামালের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জোর পরামর্শ দিয়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁদেরকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এবং তিনি ঐবিষয়ে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। জনাব আমজাদুল হককে আমি সবকিছু বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। এর পর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর নূরুল মোমেন খান (মিহির ভাই)-এর কাছ থেকে টেলিফোন পাই। তখন বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসের (কাকা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি ফোনে তাঁকেও ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। অতঃপর নাসের কাকা আমাকে বলেন যে, সবকিছু সত্ত্বেও যদি আমার পক্ষে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমি যেন নূরুল মোমেন খান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তিনি এব্যাপারে সবকিছু বন্দোবস্ত করে দেবেন। পরে জনাব নূরুল মোমেন খান সাহেবও আমাকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু প্রফেসর হুইর্টজের অনমনীয় ও অনড় অবস্থান নেওয়ার কারণে আমি আমার তখন দেশে না ফেরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁকে জানিয়ে দিই।

৬৪। ৪ঠা জুলাই তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশে ৩৩টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরকারী সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ বহির্ভূত ঘোষণা করে। ৭ই জুলাই (১৯৭৫) তারিখে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয়। একই

তারিখে সরকার একটি রাষ্ট্রপতির আদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠন করে। ৮ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিভিন্ন জেলার ৫৫ জন নেতার সমভিব্যাহারে সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খোন্দকার নাসির উদ্দিন বাকশালের সেক্রেটারী জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাছে ৪৯,০৫১ জন মাদ্রাসা শিক্ষকের 'বাকশালে' যোগদান করার সিদ্ধান্ত সম্বলিত আবেদনপত্র পেশ করেন। ৯ই জুলাই তারিখে জাতীয় সংসদ বাংলাদেশ জেলা পুনর্গঠন বিল অনুমোদন করে। সুদীর্ঘকাল পর মেরামত কাজ সম্পন্ন হওয়ায় বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর হার্ডিঞ্জ রেলওয়ে ব্রিজ পুনরায় চালু ঘোষণা করা হয় ১০ই জুলাই তারিখে। ১২ই জুলাই তারিখে গোয়ালন্দে দেশের ৪৯তম টেক্সটাইল মিলের উদ্বোধন করা হয়। একই তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার শেরপুরকে দেশের ৬১তম জেলা হিসেবে ঘোষণা করে। ১৪ই জুলাই তারিখে সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৫টি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে। ১৪ই জুলাই তারিখে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ বনবিভাগ মাত্র ১২ দিনে রাজধানী ঢাকা নগরীতে ৯৬ হাজার চারাগাছ রোপণ কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। ১৬ই জুলাই তারিখে বঙ্গবন্ধুর সরকার একটি রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশের ৬১টি জেলার জন্য গভর্নর নিয়োগ করে তাদের নাম প্রকাশ করে।

৬৫। ১৭ই জুলাই বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমি অফিস থেকে কার্লরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসের আমার কক্ষে পৌঁছাই। ঠিক ঐ মুহূর্তে আমাকে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আমার সঙ্গে কথা বলবেন। অতঃপর ফোন এলে আমি উদ্বিগ্নাবস্থায় টেলিফোন রিসিভ করি। ফোনে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ শুনে আমি "আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন" বলি। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলেন না বলে লন্ডনের লাইনে তিনি পুনরায় ফোন করবেন বলে আমাকে জানান। এর একটু পরে আবার বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ফোন আসে। বুঝা গেল এবার তিনি আমার কণ্ঠ পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছেন। তিনি কেমন আছেন আমি জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু একটু ক্লান্তস্বরে টেনে টেনে বললেন, "বা-বা, ভাল আছি।" তাঁর শরীর কেমন আছে আমি জানতে চাইলে তিনি আবারোও টেনে-টেনে বললেন যে শারীরিকভাবে তিনি সুস্থ, হাসিনা, আমার ছেলেমেয়ে, শাশুড়ী, কামাল, জামাল, রেহানা ও রাসেলসহ বাড়ীর সবাই ভাল আছে। অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে জানান যে, কামালের বিয়েতে আমি উপস্থিত না হওয়ায় শাশুড়ী ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন। আমি তখন ভীষণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে পরিস্থিতির কারণে দেশে ফিরতে পারিনি তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে জানাই এবং আরও বলি যে, আমি বিস্তারিত জানিয়ে অনেক আগেই শাশুড়ীকে চিঠি দিয়েছি। আমার এ কথার উত্তরে বঙ্গবন্ধু বললেন যে, শাশুড়ী আমার কোন চিঠিপত্র পাননি। অতঃপর বঙ্গবন্ধু আমাকে জানান যে, ১৮ই

জুলাই তারিখে এ. টি. এম. সৈয়দ হোসেন সাহেবের তৃতীয় কন্যা পারভীন রোজীর সঙ্গে শেখ জামালের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে আরও জানান যে, রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে হাসিনা আমাদের ছেলেমেয়েদেরসহ জুলাই মাসের শেষের দিকে জার্মানী চলে আসবে। আর কয়েক মাস পর আমি দেশে ফিরতে পারি বিধায় হাসিনার অতো টাকা পয়সা খরচ করে তখন জার্মানী চলে আসা সমীচীন হবে না, আমি একথা বললে বঙ্গবন্ধু বলেন, "তোমার ছেলে জয়কে কিছুতেই বুঝানো যাচ্ছে না। ও সারাক্ষণ তোমার কথা বলে, তোমার খোঁজ করে এবং তোমার কাছে যেতে চায়। অতএব, তুমি আর কোন আপত্তি ওঠাইও না।" এ কথাগুলো বলে বঙ্গবন্ধু আমাকে তখন হাসিনার সঙ্গে কথা বলতে বলেন। হাসিনাকেও আমি একই কথা বলি। হাসিনাও আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো বলে। হাসিনা আমাকে এও বলে যে, আমি যতোই আপত্তি করি না কেন সে জার্মানী চলে আসবেই। এই কথোপকথনে প্রায় বিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়। এরপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমি ফোনের রিসিভার রেখে দিই।

৬৬। ১৯শে জুলাই রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন একান্ত সচিব জনাব মশিয়ুর রহমান আমার অফিসে ফোন করে আমাকে জানান যে, হাসিনারা ২৫শে জুলাই তারিখে প্যানএ্যামের একটি ফ্লাইটে ফ্রাংফুর্ট পৌছাবে। তিনি আমাকে উক্ত ফ্লাইটের নম্বর ও সময়সূচীও জানান। ২০শে জুলাই তারিখে জনাব মশিয়ুর রহমান সাহেব আবার অফিসে ফোন করে আমাকে জানান যে, হাসিনারা উক্ত ফ্লাইটে যাচ্ছে না কারণ সেটি করাচী হয়ে ফ্রাংফুর্ট যায়। তিনি আমাকে আরও জানান যে, পরিবর্তিত সফরসূচী অনুযায়ী হাসিনারা লুফথানসার একটি ফ্লাইটে ৩০শে জুলাই সকালে ফ্রাংফুর্ট পৌছাবে। তিনি আমাকে উক্ত ফ্লাইটের নম্বর ও সময়সূচীও অবহিত করেন। তিনি আরও বললেন যে, যথাসময়ে তৎসম্পর্কে আমার নিকট তারবার্তাও পাঠানো হবে।

৬৭। ২১শে জুলাই তারিখে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নবনিযুক্ত গভর্নরদের জন্য আয়োজিত ২১ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন প্রায় সোয়া ঘণ্টা ধরে। উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও, তিনি দেশে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন উক্ত ভাষণে। সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধু তার সরকারের ভবিষ্যৎ আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর রূপরেখা প্রদান করেন উক্ত ভাষণে। উক্ত ভাষণের এক পর্যায়ে নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রদত্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, "গভর্নরশীপের যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি, তা কম নয়। আমরা সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জেলার কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার, থানার সঙ্গে ইউনিয়নের কানেকশন রাখতে হবে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন। যে ক্ষমতা আইনে গভর্নরদের দেওয়া

হয়েছে, তা আগে একজন ডিসস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ভোগ করেন নাই। তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা আপনাদের দেওয়া হয়েছে। আপনাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পার্টি থাকবে। পার্টির (স্থানীয়) সেক্রেটারী থাকবেন, আপনার চেয়ে তার ক্ষমতা কোন অংশে কম থাকবে না। একদিকে আপনি যেমন রেসপনসিবল ফর দ্যা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারী থাকবেন তিনিও রেসপনসিবল সমস্ত পার্টির জন্য। যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবেন, তখন (পার্টির) সেক্রেটারী সেখানে উপস্থিত হবেন। আবার, যখন (পার্টির) সেক্রেটারী সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন, তখন গভর্নর সাহেব তাঁর সামনে গিয়ে বসবেন।"

৬৮।...অতঃপর প্রশাসনে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "যাঁরা পার্লামেন্টের মেম্বার, তাঁদের কাজ হলো, ...তাঁরা এ্যাসেমব্লীতে আইন পাস করে বাড়ী যাবেন, দেখবেন, শুনবেন ...(শুধু তা নয়)। কিন্তু এখানে আপনাদের রেসপনসিবিলিটি দিয়েছি। কারণ, দেখা যায় বাংলার জনগণ পার্লামেন্টের মেম্বারদের এই আশায় ভোট দেন যে, তাঁরা সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু (বর্তমানে) আইন পাস করা ছাড়া তাঁদের রেসপনসিবিলিটি এমন কিছু নাই। কিন্তু লায়াবিলিটি তাঁদের বেশী। তাঁদের গালাগালি খেতে হয়। কিন্তু শাসন তাঁরা চালাতে পারেন না। সেই জন্য আমি নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি। আপনারা রেসপনসিবিলিটি নিন, আইনও পাস করুন। মাঠে ময়দানে কাজ করলে আপনারা সবই বুঝতে পারবেন।"

৬৯। এরপর নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য গভর্নরদের পরামর্শ দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন,..."আপনাদের কেউ কেউ এমন জেলায় গভর্নর হয়েছেন, যেখানে আপনাদের নিজেদের বাড়ী ঘর, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের পার্টি রয়েছে। তাঁরা সাবধান। তাঁদের স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে, (সর্বপ্রকার) দুর্নীতির উর্ধ্বে উঠতে হবে, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য কবার উর্ধ্বে উঠতে হবে। তাঁদের একটা রিস্ক আছে।"...গভর্নরদের দায়িত্ব কিছুটা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "আপনাদের চার্জ দেওয়া হয়েছে। আপনারা এবার কর্মস্থলে গিয়ে কাজ করুন। ল এ্যান্ড অর্ডার আপনাদের দেখতে হবে। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস আপনাদের দেখতে হবে। জিনিসপত্র বিদেশ থেকে যা আসে, তার ডিসট্রিবিউশন ঠিক মত হচ্ছে কিনা (আপনাদের) দেখতে হবে। পাবলিসিটি আপনাদের দেখতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। খাল কাটা হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। ঘুষ খাওয়া বন্ধ হচ্ছে কিনা, আপনাদের দেখতে হবে। থানার মধ্যে করাপশন আছে কিনা আপনাদের দেখতে হবে। আপনাদের সঙ্গে থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট, আপনাদের সঙ্গে থাকবেন এস. পি। আপনাদের সঙ্গে থাকবেন জয়েন্ট এস. পি (ক্রাইম)। আপনাদের সঙ্গে থাকবেন সমস্ত অফিসার, আপনাদের সঙ্গে থাকবেন রাজনৈতিক কর্মীরা। আপনাদের একটি কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলকে আপনাদের কনফিডেন্সে নিতে হবে।

কাউন্সিলকে বাদ দিয়ে নিজে সব সময় ডিকটেটরশীপ করতে যাবেন না। কাউন্সিল ডেকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে।"

৭০। অতঃপর সংসদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "কিন্তু আজকে মেম্বার সাহেবদের একটি বড় ভয়ের ব্যাপার আছে। বাংলাদেশের জনগণ সাংঘাতিক রি-এ্যাক্ট করে, এটা মনে রাখবেন। সারা জীবন সাধনা করবেন, তারপর একটা অন্যায় করবেন, তার ফলেই মুছে যাবেন বাংলাদেশ থেকে। এইটেই বাংলাদেশের নিয়ম। সারা জীবন সাধনা করবেন, তারপর একটা অন্যায় করলে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের মুছে দেবে। আপনারা যাঁরা যেখানে লোকালি থাকবেন, সেখানে পারমানেন্টলি থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে হবে। দেখতে হবে, যে নতুন সিস্টেম আমরা করতে যাচ্ছি, তাতে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি কিনা। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ—এ ব্রিজ বিটুইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট এ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া। অন্যান্য দেশ যতো বড়ই হোক না কেন, ভবিষ্যতে তাঁরা আমাদের ফলো করবেন, যদি আমাদের সিস্টেম সাকসেসফুল হয়। এটা মনে রাখা দরকার। আর তা যদি না হয়, ইতিহাস থেকে আপনারা মুছে যাবেন।"

৭১। তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে থানার ভবিষ্যৎ প্রশাসনের রূপরেখা ও দায়িত্ব সম্পর্কে একটু আভাস দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আজ আমি কেবল গোড়ায় হাত দিয়েছি। এখন ডিসস্ট্রিক্ট করেছি। এক বছরের মধ্যে আমি থানায় যাচ্ছি। থানায় আমি এ্যাডমিনিসট্রেটিভ কাউন্সিল করছি। থানায় যিনি হেড হবেন, তার নাম হবে থানা প্রশাসক। তিনি এম,পি হতে পারেন, গভর্নমেন্ট অফিসার হতে পারেন, বাইরের মানুষ হতে পারেন। সেখানেও হাই অফিসিয়াল থাকবেন। এইভাবে এ্যাডমিনিসট্রেশন চলবে। এমনি করে লোকাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, (ট্যাক্স) কালেকশন—সব কাজই চলবে। ভবিষ্যতে আরও অনেক কাজই করতে হতে পারে। এই যে আমাদের ডিস্ট্রিক্টগুলো হয়েছে , যখন আমরা সেগুলোর অবস্থাও জানতে পারবো, তখন প্রোকিউরমেন্টের অবস্থা জানতে পারবো, ডিসট্রিবিউশনের অবস্থাও জানতে পারবো। তখন সেখানকার ফুল রেসপনসিবিলিটি তাঁদের নিতে হবে। ভবিষ্যতে সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হবে।"

৭২। ঐ ভাষণের আর এক পর্যায়ে তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎ আর্থসামাজিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, ফ্যামিলি প্লানিং আর আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের যে চারটি প্রোগ্রাম আছে, সেগুলোও আপনারা করুন। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য পাম্প পেলাম না এটা পেলাম না—এসব বলে বসে না থেকে জনগণকে মবিলাইজ করুন। যেখানে খাল কাটলে পানি হবে, সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। (মোটকথা) মবিলাইজ দ্যা পিউপল। পাম্প যদি পাওয়া যায় ভালো। যদি না পাওয়া যায়, তবে স্বনির্ভর হোন। বাঁধ বেঁধে পানি আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান। আমাদের দেশে আগে কি পাম্প ছিলো? দরকার হয়, কূয়া কেটে পানি আনুন। আমাদের দেশে পাঁচ হাত, সাত হাত,

আট হাত কূয়া কাটলেই পানি ওঠে। সেখানে অসুবিধা কি আছে? যে দেশে পানি আটকে রাখলে পানি থাকে, সেখানে ফসল করবার জন্যে চিন্তার কি আছে? আর, এখন থেকে যে সমস্ত সার থানায় যাবে, তা যেন রেগুলারলি গরীব-দুঃখীরা পায়।"

৭৩।...এরপর বঙ্গবন্ধু আরও বলেন,.."স্কুল-কলেজ আছে—সেখানে গভর্নমেন্ট টাকা দেন। প্রাইমারী স্কুলে আমরা টাকা দিয়েছি। অনেকে স্কুল করে না, অনেকে পড়ায় না, স্কুলেও যায় না। সেখানে লোকে গরু-ছাগল বেঁধে রাখে। টাকাও পায়, আবার রেশনও দেই। সেগুলি ওয়াচ করবেন। আপনি না পারেন, আপনার একজন অফিসার পাঠিয়ে দেবেন। ডিসট্রিক্ট অফিসার, স্কুল অফিসার এই সমস্তকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসুন। তাঁরা এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে আসবেন। যদি দেখেন কোন টিচার কাজ করছে না, তাঁকে বদলি করে দিন। তাঁরা সরকারী কর্মচারী এখন। টাকা যা পাঠানো হয়, (তা তাঁরা) খেয়ে ফেলেন। সাবধান। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সবগুলিরই ব্রাঞ্চ সব ডিসট্রিক্টে থাকবে। ওভারঅল রেসপনসিবিলিটি আপনাদের। ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। বাংলাদেশে এখানে বসে যে কাজ হয়, (তার) পাবলিসিটি এই ডিপার্টমেন্ট দেয়। প্রত্যেক ডিসট্রিক্টে, সাব ডিভিশনে এর ব্রাঞ্চ আছে। আল্লার মর্জি সেখানকার লোক কয়েকখানা কাগজ দরজায় লাগিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকেন আর বাকী কাগজ সের দরে বিক্রি করে দেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিতে হবে, কত কাগজ এলো। গ্রামে গ্রামে যান, পাবলিসিটি করুন।" পরিশেষে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এতে কিন্তু একটা কমপিটিশন আছে। এই সিস্টেমে গভর্নমেন্ট অফিসার আছেন, আর্মি অফিসার আছেন, পলিটিশিয়ানরা আছেন, আর এম,পি আছেন, নন এম,পি আছেন। ভালো কমপিটিশন হবে।"

৭৪। ২২শে জুলাই কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে ১ কোটি ১০ লাখ ডলার ঋণ সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৩শে জুলাই জনাব কে. এম. কায়সার জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ২৪শে জুলাই বঙ্গবন্ধু সরকার, দেশের বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকার বাইরে প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মাসে ৩৫ সের গম বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৫শে জুলাই 'বাকশালে' সদস্যপদ লাভের জন্যে দলের সম্পাদক এডভোকেট জিল্লুর রহমানের কাছে ২০ জন ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনপত্র পেশ করেন। ২৬শে জুলাই ন্যাপ (ভাসানী)-এর ১৬ জন নেতা ও কর্মী, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৮৩ জন, বাংলাদেশ পশু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের ২২ জন এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৬৮ জন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা 'বাকশালে' যোগদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আবেদনপত্র দাখিল করেন। ২৮শে জুলাই ১ লক্ষ সরকারী চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী 'বাকশালে' যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে দরখাস্ত পেশ করেন। একই তারিখে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশকে ৭৫ কোটি টাকা ঋণ সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৭৫। ২৯শে জুলাই সন্ধ্যায় ফ্রাংফুর্ট শহরে গিয়ে একটি হোটেলে উঠি যাতে পরের দিন, অর্থাৎ ৩০শে জুলাই যথাসময়ে ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে পারি। আমার সঙ্গে ছিলেন (পশ্চিম) জার্মানীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী, জনাব আমজাদুল হক। আমরা দু'জন ভোর সাড়ে সাতটার দিকে ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে পৌছাই। ঐ দিনে লুফথানসার ফ্লাইটটির ল্যান্ড করার কথা ছিল সকাল সোয়া আটটায়। কিন্তু সেটি নির্ধারিত সময়সূচীর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে পৌছে যায়। যাহোক, আমজাদুল হক ও আমি তাড়াতাড়ি সেখানের ভি. আই. পি. লাউঞ্জে চলে যাই। এর কয়েক মিনিট পূর্বে জার্মান কর্তৃপক্ষের লোকজন হাসিনা-রেহানাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। যাহোক, আমাকে দেখে বাচ্চারা ভীষণ খুশী হয়। ওদের মালপত্র সেখানে নিয়ে আনার পর দেখি যে, হাসিনা তার নামের সঙ্গে আমার নাম সংযোজন করে নতুন পাসপোর্ট ইস্যু করে নিয়েছে। নতুন পাসপোর্টে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, "হাসিনা শেখ ওয়াজেদ" বলে। উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্রেও তার নাম রয়েছে 'হাসিনা শেখ' বলে। ১৯৬৯-এ আমার সঙ্গে ইটালী যাওয়ার সময় তার জন্য এই শেষোক্ত নামেই পাসপোর্ট ইস্যু করে নেওয়া হয়েছিলো। এ ব্যাপারে আমি হাসিনাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, "তুমি যদি বিমান বন্দরে না আসো সেজন্য ইচ্ছা করেই এই পাসপোর্টে তোমার নাম সংযোজন করে নিয়েছি যাতে কার্লসরুয়ে শহরে গিয়ে সহজেই তোমাকে খুঁজে বের করা যায়। স্মরণ রাখবা, তুমি যেমন বুনো ওল আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল।" যাহোক, একটু চা-নাস্তা খাওয়ার পর আমজাদুল হকের গাড়ীতে আমরা কার্লসরুয়ে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

৭৬। ১লা আগস্ট তারিখে এডভোকেট আবেদুর রেজা খানের নেতৃত্বে ঢাকা বার সমিতির ১৯৩ জন, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব এ. এইচ. এম. কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে উক্ত ব্যাংকের ৪১২ জন, বাংলাদেশ বিমান বন্দর উন্নয়ন সংস্থার ৩৩৩১ জন এবং বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ সংস্থার ১৫৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী 'বাকশালে' যোগদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আবেদনপত্র পেশ করেন। একই তারিখে বাংলাদেশ দমকল বাহিনী, আনন্দবাজার বণিক সমিতি এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথ সমিতির পক্ষ থেকে 'বাকশালের' সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। ২রা আগস্ট বিশিষ্ট ন্যাপ (ভাসানী) নেতা জনাব আজাদ সুলতানের নেতৃত্বে উক্ত পার্টির ৪৫০ জন নেতা ও কর্মী ঢাকার সার্কিট হাউস রোডস্থ 'বাকশালের' কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়ে দলের অন্যতম সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণির কাছে 'বাকশালে' যোগদান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আবেদনপত্র দাখিল করেন। ৩রা আগস্ট বাংলাদেশের আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও জামালপুরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে তদঞ্চলে ১৩২ কিলো ভোল্ট লাইনের উদ্বোধন করা হয়। ৪ঠা আগস্ট রাষ্ট্রপতি ও বাকশালের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু দেশের ৬১টি জেলার বাকশালের শাখার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকদের

নাম ঘোষণা করেন। ৬ই আগস্ট কতিপয় দুষ্কৃতকারীর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনে হাতবোমা নিক্ষেপের ঘটনায় ৩ ব্যক্তি নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। ৮ই আগস্ট প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করার সংবাদও দ্রুত জানাজানি হয়ে যায়। ঐদিন বিকেলে হাসিনা, রেহানা ও বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কার্লসরুয়ে শহরের প্রধান বিপণী কেন্দ্র পরিদর্শনে যাই। প্রথমে এদের সবার জন্য কিছু জামা-কাপড় কেনা হয়। অতঃপর একটি জুতোর দোকানে গিয়ে দেখি সেখানে হ্রাসকৃত মূল্যে সুন্দর সুন্দর জুতো পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকের জন্য জুতো নির্বাচন করার সময় হাসিনা জয়ের জুতোর একই ডিজাইন ও রংয়ের এক জোড়া জুতো নেয় রাসেলের জন্য।

৭৭। ৯ই আগস্ট (১৯৭৫) তারিখে (পশ্চিম) জার্মানীস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বিশেষ আমন্ত্রণে আমি রেহানা-হাসিনাদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানী বনে যাই। রাষ্ট্রদূতের অফিসিয়াল বাসভবনে আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বনের কনিংসউইটারস্থ একটি টিলার ওপর অবস্থিত তাঁর তিনতলা বাসভবনটি। তাঁর ছেলেমেয়েরা লন্ডনে পড়াশুনারত থাকায় বাসাটির কয়েকটি শয়নকক্ষ খালি ছিল তখন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাদের পরামর্শ দেন ঐ সময়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস ও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস বেড়িয়ে আসার জন্য। সেই মোতাবেক তিনি বেলজিয়ামস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব সানাউল হকের সঙ্গে আলাপ করেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সানাউল হক সাহেবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অতএব তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। ১০ই আগস্ট তারিখে সংযুক্ত সরকারী কর্মচারী পরিষদের ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সদস্য 'বাকশালে' যোগদান করেন। ১১ই আগস্ট সন্ধ্যায় হাসিনা ঢাকায় ওর মা'র সঙ্গে ফোনে কথা বলে। অতঃপর হাসিনা আমাকে জানায় যে, সেদিন ওর মা'র মন ভীষণ খারাপ ছিল। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর একমাত্র বোনের ছেলে শেখ শহীদের বিয়েতে তাঁকে যেতে না দেয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। হাসিনা আমাকে আরও বলে, "জয়ের এবং উক্ত ঘটনার কথা বলতে বলতে মা ভীষণ কাঁদছিলেন।"

৭৮। ১২ই আগস্ট সকালে আমরা ব্রাসেলসের উদ্দেশে রওনা হই এবং সেখানে পৌঁছাই বিকেল একটার দিকে। রাষ্ট্রদূতের বাসার তিনতলার দুটো কক্ষে আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ১৩ই আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবের হল্যান্ডের রাজধানী হেগ-এ যাওয়ার কথা ছিল সে দেশের সঙ্গে গুঁড়া দুধ সরবরাহ সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে। এই সুবাদে ১৩ই আগস্ট তারিখে তিনি আমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যান। হেগ শহরের কাছেই আমস্টারডাম শহরের একটি হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত করে তিনি সে দিনই ফিরে যান ব্রাসেলসে বঙ্গবন্ধুকে উক্ত চুক্তির বিষয়ে অবহিত করার জন্যে। ১৪ই আগস্ট বিকেলে আমরা আমস্টারডাম থেকে ব্রাসেলসে ফিরে যাই। ১৫ই আগস্ট সকালে আমাদের প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেয়ার কথা ছিল। এই কারণে ১৪ই আগস্ট রাতে সানাউল হক সাহেবের বাসায় আমাদের জন্যে আনুষ্ঠানিক ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক

বেলজিয়ান নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিতা এক বাঙালী মহিলা বিজ্ঞানী ও তাঁর বিজ্ঞানী স্বামীকেও দাওয়াত করা হয়েছিল উক্ত ডিনারে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় রাত দশটার দিকে। এরপর ব্রাসেলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী আনোয়ার সাদাত আমাদেরকে নিয়ে যায় তার বাসায় রাত সাড়ে দশটার দিকে। সেখানে পৌঁছে হাসিনা বুঝতে পারে যে, আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী ওর স্কুলের সহপাঠিনী ছিল। রাত সাড়ে বারোটার দিকে আমরা আনোয়ার সাদাতের বাসা থেকে রাষ্ট্রদূত সানাউল হক সাহেবের বাসায় ফেরার জন্য উক্ত বাসার দোতলা থেকে নীচে নেমে আসি। যদিও আমি গাড়ীর সামনের আসনে বসেছিলাম, কিন্তু রেহানা-হাসিনারা পেছনের আসনে উঠে দরজা বন্ধ করার সময় আমার বাঁ হাতের সবক'টি আঙুল উক্ত দরজার ফাঁকে আটকে পড়ে মারাত্মকভাবে পিষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনায় আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে এটাসেটা ভাবতে থাকি। এক পর্যায়ে পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট তারিখে প্যারিস যাওয়ার কর্মসূচী বাতিল করার প্রস্তাব করি। কিন্তু রেহানা ও হাসিনা আমার প্রস্তাবে রাজি হলো না।

৭৯। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) শুক্রবার সকাল সাড়ে ছয়টায় ঘুম ভাঙ্গে ম্যাডাম রাষ্ট্রদূতের ডাকে। তিনি জানান যে, জার্মানীর বন থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাদের জন্য ফোন করেছেন। প্রথমে হাসিনাকে পাঠিয়ে দিই তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে হাসিনা আমাকে জানায় যে , হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। হাসিনাকে তখন ভীষণ চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল। আমি দ্রুত নীচে দোতলায় চলে যাই। তখন সেখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় মাথা হেঁট করে রাষ্ট্রদূত সাহেব ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। আমাকে দেখেও তিনি কোন কথা বললেন না। ফোনের রিসিভারটি ধরতেই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন, "আজ ভোরে বাংলাদেশে 'ক্যু-দে-টা' হয়ে গেছে। আপনারা প্যারিস যাবেন না। রেহানা ও হাসিনাকে এ কথা জানাবেন না। এক্ষুণি আপনারা আমার এখানে বনে চলে আসুন।" "প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে" একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এর বেশী আপাততঃ আমি আর কিছুই জানি না।" একথা বলেই তিনি আমাকে ফোনের রিসিভারটি সানাউল হক সাহেবকে দিতে বলেন। অতঃপর আমি আস্তে আস্তে তিনতলায় আমাদের কক্ষে চলে যাই। সেখানে পৌঁছাতেই হাসিনা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে আমার কাছ থেকে জানতে চায় হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কি বলেছেন। তখন আমি শুধু বললাম যে, তিনি আমাদেরকে প্যারিস যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেদিনই বনে ফিরে যেতে বলেছেন। একথা বলেই আমি বাথরুমে ঢুকে পড়ি। সেখানে এটাসেটা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকটা সময় কাটাই। ততক্ষণে রেহানা সজাগ হয়ে আমাদের কামরায় চলে আসে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই রেহানা ও হাসিনা দু'জনেই কাঁদতে কাঁদতে বলে যে, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে যা আমি তাদেরকে বলতে চাই না। তারা আরও বলে যে, প্যারিসে না যাওয়ার কারণ

তাদেরকে পরিষ্কারভাবে না বলা পর্যন্ত তারা ঐ বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। অতএব, বাধ্য হয়েই আমি তাদেরকে বলি যে, বাংলাদেশে কি একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে যার জন্য আমাদের প্যারিস যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। একথা শুনে তারা দু'বোন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাদের কান্নায় ছেলেমেয়েদেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়।

৮০। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমরা বনের উদ্দেশে ব্রাসেলস ত্যাগ করি। পথে রেহানা ও হাসিনা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করে। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আমরা বনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় পৌছাই। সেদিন বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন যুগোশ্লাভিয়ায় সফর শেষে বাংলাদেশে ফেরার পথে ফ্রাংফুর্টে যাত্রা বিরতি করে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের বাসায় উঠেছেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী, ডঃ কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তিনজন মিলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া রেহানা ও হাসিনাকে ধরাধরি করে বাসার ভেতর নিয়ে যান। ড্রইংরুমে এভাবে কিছুক্ষণ কাটানোর পর হুমায়ুন রশীদ সাহেবের স্ত্রী হাসিনাদের ওপর তলায় নিয়ে যান।

৮১। তখন ড্রইং রুমে ডঃ কামাল হোসেন, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও আমি ভীষণ উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকি। এরই এক ফাঁকে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই। নিরাপদ স্থানে না পৌছানো পর্যন্ত হাসিনাদের আমি কোন কিছু জানতে দেবো না, এই শর্তে তিনি আমাকে বললেন, "বিবিসি-এর এক ভাষ্যানুসারে রাসেল ও বেগম মুজিব ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই।" এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোথায় আশ্রয় নেয়া নিরাপদজনক হবে, তাঁর কাছ থেকে একথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, "উদ্ভুত পরিস্থিতিতে একমাত্র ভারত ছাড়া আর কোন দেশ আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।"

৮২। পরদিন অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট সকাল আটটার দিকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য ডঃ কামাল হোসেন বনস্থ বিমান বন্দরে যাবেন বলে আমাকে জানানো হয়। ডঃ কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও গাড়ীতে উঠে বসি। বিমান বন্দরে ডঃ কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দু'জনে একত্রে কিছু গোপন আলাপ করেন। অতঃপর আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে আমি ডঃ কামাল হোসেন সাহেবের হাত ধরে তাঁকে বললাম, "খন্দকার মোশতাক আহমদ খুব সম্ভবত আপনাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাখার চেষ্টা করবেন। অনুগ্রহ করে আমার কাছে ওয়াদা করুন যে, আপনি কোন অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে আপোষ করে তাঁর মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করবেন না।"

আমার এই প্রশ্নের জবাবে ডঃ কামাল হোসেন আমাকে বললেন, "ডঃ ওয়াজেদ, প্রয়োজন হলে বিদেশেই মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছি। কিন্তু কোন অবস্থাতেই খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আপোষ করে আমি দেশে ফিরতে পারি না।" এই কথাগুলো বলেই তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে যান।

৮৩। বিমান বন্দর থেকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বাসায় ফিরে হাসিনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইতিপূর্বে লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মোমিনুল হক খোকা (কাকা) ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি আমাদেরকে লন্ডনে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এক সময়ে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ছোট ভাই কায়সার রশীদ চৌধুরী তাঁকে ফোন করেন। এই পরিস্থিতিতে খন্দকার মোশতাক আহমদের বিরুদ্ধে কোন কিছু না করার জন্য কায়সার চৌধুরী তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেন। কায়সার রশীদ চৌধুরী, রেহানা ও হাসিনার সঙ্গেও কথা বলে তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, রেহানা, হাসিনা ও আমাকে বলেন যে, লন্ডনে চলে যাওয়া সাব্যস্ত করলে আমরা সেখানে তাঁর বাসায় গিয়ে উঠতে পারি। তবে তিনি আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে, সেখানে মাত্র একটি সমস্যা আছে। ঐ বাসার নীচ তলায় কায়সার রশীদ চৌধুরী বসবাস করে এবং সে ভুট্টোর অন্ধ ভক্ত। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৫ই আগস্ট তারিখে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে তৎব্যাপারে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য। যাহোক, ঐদিনই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে কার্লসরুয়ে পাঠালেন সেখান থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য।

৮৪। আমি সেদিন কার্লসরুয়ে গিয়ে বনে ফিরে আসি রাত সাড়ে দশটার দিকে। কিন্তু সেদিন সাপ্তাহিক ছুটির কারণে অফিস বন্ধ থাকায় আমি কোন বইপত্র বা অন্য কোন জিনিসপত্র সঙ্গে আনতে পারিনি। রাত এগারোটার দিকে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী তাঁর স্ত্রী ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজে গাড়ী চালিয়ে বাড়ীর বাইরে যান। পথে তিনি বলেন যে, একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ভারতীয় দূতাবাসের তাঁর পরিচিত একজন অফিসিয়াল আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাকে তাঁদের স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাহোক, উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌছার পর ভারতীয় সেই অফিসিয়ালের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমাকে তাঁর কাছে রেখে দ্রুত বাসায় ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষে রওনা হওয়ার সময় আমি যেন তাঁকে ফোনে অবহিত করি।

৮৫। অতঃপর ভারতীয় ঐ অফিসিয়ালের সঙ্গে আমি তাঁদের রাষ্ট্রদূতের বাসায় যাই। তখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন মুসলমান জার্নালিস্ট। একটু ভয়ে ভয়ে আমাদের বিপর্যয়ের কথা আমি তাঁকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। আমার কথা শোনার পর তিনি

আমাকে লিখে দিতে বলেন যে, আমরা ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে কি চাই। অতঃপর তিনি সাদা কাগজ ও একটি কলম আমার হাতে তুলে দেন। তখন মানসিক দুশ্চিন্তা ও অজানা শংকায় আমার হাত কাঁপছিলো। যাহোক, অতিকষ্টে রেহানাসহ আমার পরিবারবর্গের নাম উল্লেখপূর্বক সকলের পক্ষ থেকে আমি লিখলাম, "শ্যালিকা রেহানা, স্ত্রী হাসিনা, শিশু ছেলে জয়, শিশু মেয়ে পুতলি এবং আমার নিজের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও প্রাণ রক্ষার জন্য ভারত সরকারের নিকট কামনা করি রাজনৈতিক আশ্রয়।"

৮৬। ১৭ই আগস্ট রোববার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সারাক্ষণ বাসায় ছিলেন। ঐ দিন লন্ডন থেকে আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা ও বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় রেহানা ও হাসিনাকে ফোন করেন। এক সময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পত্নী আমাদেরকে ফোন করে জানান যে, তিনি ঢাকায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইতিপূর্বে কথা বলেছেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। রাতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, তিনি আমাদেরকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কি না। আমি তাঁকে জানাই যে, হাসিনারা প্রত্যেকে মাত্র পঁচিশ ডলার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কার্লসরুয়ে গেস্ট হাউসে আমি রেহানার জন্য একটি পৃথক কক্ষ ভাড়া নিয়েছি। অতঃপর আমি তাঁকে হাসিনার সঙ্গে ঐবিষয়ে আলাপ করার জন্য পরামর্শ দিই। তখন হাসিনার সঙ্গে আলাপ করে আমরা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে জানাই যে, মাত্র হাজারখানেক জার্মান মুদ্রা দিলেই আমরা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবো।

৮৭। ১৬ই আগস্ট ডঃ কামাল হোসেন লন্ডন চলে যাওয়ার পর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী দেশের কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট আমলার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক গোপন ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমাকে শোনান। তিনি বলেন যে, তাঁর ছোট ভাই, কায়সার রশীদ চৌধুরী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর একান্ত সচিব ছিলেন যখন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্ত্রী পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ঐ সময় জুলফিকার আলী ভুট্টোর অনেক অপকর্ম ও কুকর্মে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিলো কায়সার রশীদ চৌধুরীর। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে অনেক কাহিনী শোনান। তিনি তখন দিল্লীস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসে কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণার পূর্বে তাঁকে দাফতরিক কাজে করাচী হয়ে ইসলামাবাদ যেতে হয়েছিল কয়েকবার। তখন পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতো। ১৯৭১-এর আগস্ট মাসে দিল্লী থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফর শেষে ফেরার পথে করাচী বিমান বন্দরে তাঁকে গ্রেফতার করারও নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য

ইসলামাবাদ থেকে তদুদ্দেশে প্রেরিত টেলেক্স বার্তাটি করাচীস্থ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় তিনি সেবার ভাগ্যক্রমে রেহাই পান। অতঃপর দিল্লী পৌঁছেই হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পাকিস্তানী পক্ষ পরিত্যাগ করে তৎকালীন বাংলাদেশ বিপ্লবী সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে আরও জানান যে, ১৯৭১-এ কোলকাতায় খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে তৎকালীন আওয়ামী লীগের জহিরুল কায়উম, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান হোসেন আলীসহ কতিপয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপন্থী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জোর গোপন তৎপরতা চালিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত ও নস্যাৎ করার জন্য।

৮৮। ১৯৭৫-এ আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধু ইতিপূর্বে ডঃ কামাল হোসেন ও হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের যথাক্রমে দলপতি ও সচিব নিযুক্ত করেছিলেন। যে কারনে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী নিউইয়র্ক ও লিমায় হোটেলও রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করায় তাঁর লিমা সম্মেলনে যোগদান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, খন্দকার মোশতাক আহমদ তাঁকে কোন অবস্থাতেই লিমা সম্মেলনে যেতে দেবেন না। কিন্তু তখন স্বল্প সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ক ও লিমাস্থ হোটেলসমূহে তার পূর্ব নির্ধারিত রিজার্ভেশন বাতিল করা সহজ হবে যদি তিনি লন্ডন যান। সেই মোতাবেক হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৮ই আগস্ট তারিখে সপত্নীক লন্ডন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

৮৯। ১৮ই আগস্ট সোমবার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরেন দুপুর বারোটার দিকে। তিনি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাওয়ার সময় আমাদেরকে কার্লসরুয়ে শহরে পৌঁছেই যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেসম্পর্কে আমাকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। এর এক ফাঁকে তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতীকস্বরূপ তিনি হাসিনাকে এক হাজার জার্মান মুদ্রা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও আমাদের তাঁর সাধ্যমত টাকা-পয়সাসহ সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। অতঃপর কার্লসরুয়ের উদ্দেশে রওনা হওয়ার মুহূর্তে ঘরের বাইরে এসে দেখি যে, হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী তাঁর সরকারী রাষ্ট্রদূতের গাড়ীটি আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাকে এও বলেন যে, কার্লসরুয়ে আমাদের জরুরী কাজগুলো সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন ঐ গাড়ীটিকে সেখানে রেখে দেই। তাঁর এই সহমর্মিতা ও মহানুভবতায় আমি আবেগে এত অভিভূত হয়ে যাই যে, তখন আমার দু'চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়ার

অন্য কোন ভাষা খুঁজে না পেয়ে আমি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

৯০। ১৮ই আগস্ট বন থেকে ৩৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ করে আমরা নিরাপদে কার্লসরুয়ে পৌঁছাই সন্ধ্যা সাতটার দিকে। আমাদের কার্লসরুয়ে পৌঁছার সংবাদ পেয়ে সেখানে ছুটে আসে কার্লসরুয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য তখন গবেষণারত শহীদ হোসেন এবং কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত আমার কনিষ্ট সহকর্মী আমিরুল ইসলাম। অতঃপর হাসিনাদের গেস্ট হাউসে রেখে আমি শহীদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কার্লসরুয়েতে উপস্থিতির কথা রিপোর্ট করার জন্য যাই সেখানকার বিশেষ নিরাপত্তা বিষয়ক দফতরে। ১৯শে আগস্ট আমি কার্লসরুয়ে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র থেকে আমার বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসি এবং অন্যান্য জরুরী কাজকর্ম সম্পন্ন করি উক্ত গাড়ীটি ব্যবহার করে। ২০শে আগস্ট তারিখে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের ঐ গাড়ীটি ফেরত পাঠিয়ে দিই। শোক ও শঙ্কায় তখন আমরা এত মূহ্যমান হয়ে পড়ি যে, আমাদের দেখাশুনার ভার নিতে হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামকে। গেস্ট হাউসে আমাদের কক্ষ দু'টির পাশের কক্ষটি ভাড়া নেয়া হয় শহীদ হোসেন ও আমিরুল ইসলামের জন্য।

৯১। ২২শে আগস্ট বন থেকে হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সাহেব আমাকে ফোন করে ওদের (ভারতীয় দূতাবাসের) কেউ আমার সঙ্গে কার্লসরুয়েতে যোগাযোগ করেছেন কি না সেসম্পর্কে জেনে নেন। ২৩শে আগস্ট সকালে বনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আমাকে ফোনে জানান যে, সেদিনই তাঁর অফিসের একজন ফার্স্ট সেক্রেটারী কার্লসরুয়েতে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। বিকেল ২টার দিকে ঐ কর্মকর্তা ঐ গেস্ট হাউসে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি আমাকে এও জানান যে, তিনি পরদিন অর্থাৎ ২৪শে আগস্ট সকাল ৯টার দিকে আমাদেরকে ফ্রাংফুর্ট বিমান বন্দরে নিয়ে যাবেন। পরদিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঐ ভদ্রলোক উক্ত গেস্ট হাউসে পৌঁছান। অতঃপর মালপত্রসহ দুটো ট্যাক্সিতে আমরা কার্লসরুয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাই ফ্রাংফুর্ট শহরে যাওয়ার জন্য। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমি শহীদ হোসেনকেও সঙ্গে নেই। বিমান বন্দরের বহির্গমন হলে প্রবেশ করার মুহূর্তে শহীদ হোসেনের নিকট হতে বিদায় নেয়ার সময় তাকে শুধু আকার-ইঙ্গিতে জানাই যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। উল্লেখ্য, ভারতীয় ঐ কর্মকর্তা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উক্ত ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য। শহীদ হোসেনও তখন মুখে কিছু বললো না। সে আমাকে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকলো। তখন আমাদের জন্য সহমর্মিতা ও সমবেদনায় তাঁর দু'চোখ ছিল অশ্রুতে ভরা।

৯২। আমরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি জাম্বো বিমানে (পশ্চিম) জার্মানীর ফ্রাংফুর্ট থেকে দিল্লীস্থ পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করি ২৫শে আগস্ট সকাল সাড়ে আটটার দিকে। 'আগমন হলে' কাউকেও দেখলাম না আমাদের খোঁজ করতে। দেখতে দেখতে ঐ বিমানে

আগত প্রায় সব যাত্রিই চলে যান। মেরামত ও নবরূপায়ণ কাজের জন্য উক্ত হলটির শীতলীকরণ সিস্টেম বন্ধ ছিল। নানান দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা এবং আগস্ট মাসের প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার কারণে তখন আমার শরীর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিলো। যাহোক, সেখানের এক কর্মকর্তার অফিস থেকে ফোনে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে কিন্তু কাউকে পেলাম না। ফলে, আমার দুশ্চিন্তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় উক্ত অফিস থেকে হল ঘরে এসে হাসিনাদের সেখানে দেখতে না পেয়ে ভীষণ শঙ্কিত হয়ে পড়ি। যাহোক, এর একটু পরেই একজন শিখ কর্মকর্তা পাশের বিশ্রাম কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আমি উক্ত দুই মহিলার সহযাত্রী কি না। আমি তাদের সফরসঙ্গী জেনে শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ঐ যুবতী মহিলাদ্বয়কে ঐ দুই বাচ্চাসহ ভিআইপি হিসেবে এই বিমান বন্দর হয়ে যেতে দেখেছিলাম। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, আজকে তাঁদের কি নিদারুণ করুণ অবস্থা। এটা একেবারেই একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য।"

৯৩। প্রায় আধঘন্টা পর ঐ শিখ কর্মকর্তাটি আমাকে জানান যে, কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অতি শিগগির সেখানে পৌছবেন আমাদের ব্যাপারে কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য। এরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দুইজন কর্মকর্তা এলেন আমাদের খোঁজে। তাঁদের একজন নিজেকে ভারত সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব বলে পরিচয় দিলেন। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর ঐ দুই কর্মকর্তা আমাদেরকে দুটো ট্যাক্সিতে বিমান বন্দর থেকে নয়াদিল্লীর ডিফেন্স কলোনীর একটি বাসায় নিয়ে যান। তখন ভারতীয় সময় দুপুর ১টা। সুদীর্ঘ চার ঘন্টা বিমান বন্দরে অপেক্ষা, দিল্লীর প্রচণ্ড আবহাওয়া, পারিবারিক শোক, নিজেদের নিরাপত্তা এবং নানান দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আমি তখন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে দারুণভাবে বিপর্যস্ত।

৯৪। ডিফেন্স কলোনীর বাড়ীটির নীচতলায় ডাইনিং-কাম-ড্রইংরুম এবং প্রত্যেকটি সংযুক্ত বাথরুমসহ দুটো শয়নকক্ষ। এর ছাদে সংযুক্ত বাথরুমসহ একটি শয়নকক্ষ যা তখন গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দুপুরের খাবার ও বিকেলের চা-নাস্তা খাওয়ার পর ঐ দুই কর্মকর্তা চলে যান। ঐ বাড়ীর জানালায় কোন গ্রীল ছিলো না। নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই রাতে রেহানাসহ সবাই মিলে একই শয়নকক্ষে থাকার। পরদিন অর্থাৎ ২৬শে আগস্ট উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ঐ বাসায় আসেন আমাদের খবরাখবর জানার জন্যে। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দেন সবকিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক জার্মানীর আমার ঐ স্কলারশিপটি কয়েক মাসের জন্য সংরক্ষিত রাখার অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে। অতঃপর ২৭শে আগস্ট তারিখে আমি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ঐমর্মে পত্র পাঠাই।

৯৫। ঐ বাড়ীর চত্বরের বাইরে না যাওয়া, সেখানকার কারোরও নিকট আমাদের পরিচয় না দেওয়া কিংবা দিল্লীর কারোও সঙ্গে যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলো আমাদের সকলকে। অতএব নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঐ বাড়ীর অতি ক্ষুদ্র চত্বরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি আমরা সকলেই। আমি রাতে শুয়ে সারাক্ষণ জেগে থাকতাম এক রকম নিরাপত্তা প্রহরীর মত। মাঝে মাঝে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকাতাম। রাতে কয়েক ঘন্টা পর পর গেটে প্রহরারত দারোয়ানের সঙ্গে বাইরের লোকের ফিসফিস কথা বলা সন্দেহের উদ্রেক করতো। এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মাঝে মধ্যে হাসিনাকে সজাগ করতাম। সারা ভারতে তখন জরুরী অবস্থা আইন বলবৎ ছিল। সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কোন সংবাদ প্রকাশিত হতো না। কাজেই তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এভাবেই অতিবাহিত হয় সপ্তাহ দুয়েক।

৯৬। ইতোমধ্যে রেহানাসহ বাচ্চারা চক্ষুপীড়ায় (কনজাংটিভাইটিসে) আক্রান্ত হয়। এমন সময়ে একদিন ভারত সরকারের উক্ত যুগ্ম সচিব হাসিনা ও আমাকে জানান যে, ঐ রাতে আটটায় আমাদের দু'জনকে অন্য এক বাসায় নেওয়া হবে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য। সে রাতে সেই বাসায় যাওয়ার পথে অপর একটি গাড়ীতে আমাদের সংগে যান একজন অতি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। সেখান থেকে মিনিট পনের জার্নি করার পর আমরা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে পৌছাই। অতঃপর অতি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ঐ কর্মকর্তা আমাদের দু'জনকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের একটি মাঝারি ধরনের বৈঠকখানায় নিয়ে যান। একটি লম্বা সোফায় হাসিনাকে বসানো হয় আর আমাকে আর একটি লম্বা সোফায়। এর প্রায় মিনিট দশেক পর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে হাসিনার পাশে বসেন। সামান্য কুশলাদি বিনিময়ের পর ইন্দিরা গান্ধী আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, আমরা ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত রয়েছি কি না। এর জবাবে আমাদের জার্মানীর বনে থাকাকালীন সময়ে ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী আমাকে 'রয়টার' পরিবেশিত এবং ঢাকাস্থ বৃটিশ মিশন কর্তৃক প্রচারিত যে দুটো ভাষ্যের কথা বলেছিলেন আমি তার পুনরুল্লেখ করি। অতঃপর ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ঐ কর্মকর্তাকে ১৫ই আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষপ্রাপ্ত তথ্য জানাতে বলেন। তখন উক্ত কর্মকর্তা দুঃখভারাক্রান্ত মনে ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই। এই সংবাদে হাসিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধী তখন হাসিনাকে জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টায় বলেন, "তুমি যা হারিয়েছো তা আর কোনভাবেই পূরণ করা যাবে না। তোমার একটি শিশু ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এখন থেকে তোমার ছেলেকেই তোমার আব্বা এবং মেয়েকে তোমার মা হিসেবে ভাবতে হবে। এ ছাড়াও তোমার ছোট বোন ও তোমার স্বামী রয়েছে তোমার সঙ্গে। এখন তোমার ছেলে-মেয়ে ও বোনকে মানুষ করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অতএব এখন তোমার কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে

পড়লে চলবে না।" উল্লেখ্য, ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতা থাকাকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এটাই ছিল আমাদের একমাত্র সাক্ষাৎকার।

৯৭। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঐ সাক্ষাৎকারের তিন-চার দিন পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে নয়াদিল্লীস্থ ভারতের স্বাধীনতায় যারা আত্মাহুতি দিয়েছে তাঁদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ 'ইন্ডিয়া গেটে'-এর নিকটবর্তী পান্ডারা রোডস্থ প্রতিতলায় দু'টি ফ্লাটের একটি সরকারী দোতলা বাড়ীর উপর তলার একটি ফ্ল্যাট আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ফ্লাটগুলোতে দু'টো করে শয়নকক্ষ। এ ফ্লাটটিতে তখন কোন আসবাবপত্র ছিঁলো না। যাহোক, আস্তে আস্তে বাজার থেকে ভাড়ায় কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়। অতঃপর ১লা অক্টোবর সাময়িক ও দৈনিক ভিত্তিতে ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশন থেকে আমার জন্য একটি পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশীপের বন্দোবস্ত করা হয়। ঐ ফেলোশীপের শর্তানুসারে বাসা ও অফিসে যাতায়াতের সুবিধাদির অতিরিক্ত আমাকে দৈনিক প্রদান করা হতো বাষট্টি রুপী (ভারতীয় মুদ্রা) পঞ্চাশ পয়সা মাত্র। ঐ বাসাতেও আমাদেরকে একই নিয়ম পালন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাইরের কারোও নিকট আমাদের পরিচয় না দেওয়া, কারোও সংগে কোনরূপ যোগাযোগ না করা এবং নিরাপত্তা প্রহরী ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব বলে আমাদের সকলকে স্মরণ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সময় কাটানো ও নিজেদের ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের বাসায় সরবরাহ করা হয় একটি ভারতীয় 'সাদাকালো' টেলিভিশন। এ ছাড়া আমার একটি নিজস্ব ট্রানজিসটারও ছিলো। ঐ বাসায় কোন টেলিফোন সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশ সম্পর্কে খবরাখবর রাখার আমাদের একমাত্র উপায় ছিলো আমার ঐ ব্যক্তিগত ট্রানজিসটার।

৯৮। ৩রা অক্টোবর (১৯৭৫) তারিখে আমি ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের অধীন আণবিক খনিজ বিভাগের দিল্লীস্থ কেন্দ্রে যোগদান করি। উক্ত কেন্দ্রের প্রায়োগিক পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সঙ্গে আমাকে সংযুক্ত রাখা হয়। তখন এবং ভারতে আমার সারা অবস্থানকালে উক্ত কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন শ্রী জি. আর. নারায়ণ দাস। উক্ত অফিস প্রধান এবং পদার্থ বিজ্ঞান শাখার বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট আমার পরিচয় না দেওয়ার জন্য আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। শুরুতেই, উক্ত কেন্দ্রের খরচে পরমাণু চুল্লীর তাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কিত ১০-১৫টি পুস্তক আমাকে সরবরাহ করা হয়। একই সংগে দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (IIT)-এর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে আমাকে সংযুক্ত করা হয়। তখন ঐ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক এম. এস. সুডা (Sodha)।

৯৯। ইত্যবসরে বাংলাদেশের কিছু কিছু খবর আমার গোচরীভূত হয়। খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র জাতীয় সংবিধান ও এতে উল্লেখিত চারটি মূল রাষ্ট্রীয় নীতি

অপরিবর্তিত এবং জাতীয় সংসদ বহাল রেখে রাষ্ট্রপতির নিকট যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে জারি করে একটি বিশেষ অধ্যাদেশ। ২৩শে আগস্ট তারিখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও খুনী মেজর চক্রের নির্দেশে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান, আব্দুস সামাদ আজাদ, শেখ আব্দুল আজিজ, এম কোরবান আলী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, হাশেম উদ্দিন পাহাড়ী ও গাজী গোলাম মোস্তফা (গামা)সহ ২৬ জন 'বাকশালের' বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। একই তারিখে খন্দকার মোশতাক আহমদ ও খুনী মেজর চক্র সারাদেশে সামরিক বিধি জারিপূর্বক এর আওতায় কয়েকটি বিশেষ সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করে। ২৪শে আগস্ট তারিখে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফের পদ হতে অপসারিত করে তাঁর স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নিয়োগ করা হয়। একই তারিখে জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির (খন্দকার মোশতাক আহমদের) সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ২৭শে আগস্ট তারিখে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শফিউল আজমকে বাংলাদেশ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়। ২৮শে আগস্ট তারিখে একটি সরকারী আদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের দেশে ৬১টি জেলা গঠন এবং সেসবের জন্য গভর্নর নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হয়। ৩০শে আগস্ট তারিখে একটি সরকারী আদেশে সারাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩১শে আগস্ট তারিখে এই প্রথম গণচীন খন্দকার মোশতাক আহমদ ও খুনী মেজর চক্রের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১০০। ১লা সেপ্টেম্বর এক সরকারী আদেশে বঙ্গবন্ধুর কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করা হয়। ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফাকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'বাকশালের' এডভোকেট জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়। একই তারিখে ঘোষণা করা হয় যে, পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় বেআইনী অস্ত্র জমা দেবেন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঝালকাঠির সংসদ সদস্য এবং 'বাকশালের' সদস্য আমির হোসেনকে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'বাকশালের' কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মহিউদ্দিন আহমদ খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো গমন করেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে ইস্তফা প্রদানে বাধ্য করে। একই তারিখে ডঃ মযহারুল ইসলামকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর স্থলে সৈয়দ আলী আহসানকে নিয়োগ করা হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউইয়র্কে খুনী

খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র কর্তৃক নিযুক্ত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিকটতর আত্মীয়স্বজনের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডসহ ১৫ই আগস্টের 'ক্যু-দে-টা'-এর সংগে যাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা এর দায় থেকে যাতে অব্যাহতি পেতে পারেন, যাতে তাঁদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয় তজ্জন্য খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে জারি করেন একটি ক্ষমা প্রদর্শন (ইনডেমনিটি) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সালের ১৯ নম্বর অর্ডিন্যান্স)। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে, ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫)-এর পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত কারোরও বিরুদ্ধে এ ব্যাপারে দেশের কোন আদালতে কোন অভিযোগ পেশ করা যাবে না। ৩রা অক্টোবর তারিখে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে ১৯৭৭ সানের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় সংসদের জন্য দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন। ৫ই অক্টোবর তারিখে খুনী চক্রের সরকার জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে দেশের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১০১। আরও খবর পাওয়া যায় যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের নামে সমগ্র দেশে সৃষ্টি করে এক ত্রাসের রাজত্ব। তন্ন তন্ন করে খুঁজে গ্রেফতার করা হয় হাজার হাজার বঙ্গবন্ধুর অনুসারীকে। গ্রেফতারকৃতদের ওপর চালানো হয় অমানবিক দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। খুনী চক্রের এহেন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শত শত বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ও 'বাকশালের' কর্মী ও নেতা গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। এদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর তিন ভাগ্নে, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও শেখ ফজলুর রহমান মারুফ, যুবলীগের ওবায়েদুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, রবিউল আলম মোক্তাদীর চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, মোস্তফা মহসিন মন্টু এবং 'বাকশালের' আনোয়ার চৌধুরী, সামসুদ্দিন মোল্লা, সিদ্দিক হোসেন, নুরুল ইসলাম ভান্ডারী, পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য, এস. এম. ইউসুফ, শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, লতিফ সিদ্দিকী, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, পংকজ ভট্টাচার্য, খোকা রয়, ডাঃ এস. এ. মালেক প্রমুখ। আরও খবর পাওয়া যায় যে, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তার অনেক অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে আগস্ট মাসের শেষের দিকে ভারতের মেঘালয়ে আশ্রয় নিয়ে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে উৎখাতের অভিযান শুরু করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর তরুণ ভক্ত ও অনুসারীদের প্রতি আহ্বানও জানান তাঁর প্রতিরোধ সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধুর শত শত তরুণ ভক্ত ও অনুসারী সাড়াও দিয়েছিলো তাঁর উক্ত আহবানে।

১০২। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর আমলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, পাকিস্তানের দালালী ও স্বাধীনতা-বিরোধী, সন্ত্রাসবাদ, নাশকতা, গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র তাদের পাইকারী হারে মুক্তি দেয়। ফলে, অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও উগ্র বামপন্থীদের শুরু হয় উদগ্র আস্ফালন। আবার বাংলাদেশের দিকে ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাষ্প। খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতাকে তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান সৌদি আরব ও পাকিস্তানে। একই সময়ে পি. ডি. পি. , মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে খুনী খন্দকার মোশতাক আমহদ চক্রের চলতে থাকে দেন-দরবার । এই সমস্ত দেন-দরবারে আলোচিত হয় (১) বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নিয়ে কনফেডারেশন গঠন, (২) বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা, (৩) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিবর্তন এবং (৪) বাঙ্গালী ও পাকিস্তানীদের ডবল নাগরিকত্ব প্রদানের প্রশ্নসমূহ। এই দেন-দরবার চলাকালেই 'বাংলাদেশের ভাইদের জন্য পাকিস্তানী ভাইদের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ' চাউল ও কাপড় নিয়ে একটি পাকিস্তানী জাহাজ এসে পৌঁছায় চট্টগ্রাম বন্দরে। একটি নাগরিক কমিটি গঠন করে উক্ত পাকিস্তানী জাহাজকে স্বাগত জানানো হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানী 'জাহাজ বরণের' সেই দৃশ্য ঘটা করে টেলিভিশনেও প্রদর্শিত হয় বলে জানা যায়।

১০৩। ইত্যবসরে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ জাতীয় সংসদ সদস্যদের সঙ্গে ১৬ই অক্টোবর তারিখে একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৫ই অক্টোবর সংসদ সদস্যরা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পরের দিনের বৈঠক সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলোচনাকালে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ আহূত বৈঠকে যোগদান করা না করা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ১৬ই অক্টোবর সকালে এম. পি. হোস্টেলে সংসদ সদস্যরা পুনরায় একটি পূর্ণাংগ বৈঠকে মিলিত হন। জানা যায় যে, এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁর আদর্শে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অবিচল থাকার শপথ ঘোষণার পর মুহূর্তেই সংসদ সস্যরা 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিয়ে সোজাসুজি বঙ্গভবনে চলে যান খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে পূর্বে আহূত বৈঠকে যোগ দিতে। তা সত্ত্বেও, উক্ত বৈঠকে কুমিল্লার এডভোকেট সিরাজুল হক খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যেহেতু আপনি বৈধভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হননি, সেইহেতু আমার বক্তৃতায় আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্বোধন না করে, প্রিয় মোশতাক ভাই হিসেবে সম্বোধন করতে চাই।" অন্যান্য বক্তারাও তাঁদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

উক্ত বৈঠকের দু'দিন পরেই সরকারী পত্রিকা বাংলাদেশ টাইমস জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী জানায়।

১০৪। ১৬ই অক্টোবর তারিখে এয়্যার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকারকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধানের পদ হতে অপসারিত করে তাঁর স্থলে এয়্যার ভাইস মার্শালের পদমর্যাদায় পাকিস্তানপন্থী এম. জি. তোয়াবকে নিযুক্ত করা হয়। ২১শে অক্টোবর তারিখে দেশের প্রত্যেক জেলা সদর দফতরে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করা হয়। ২৩শে অক্টোবর শ্রমিক নেতা সায়েদুল হক সাদুকে সামরিক আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২৯শে অক্টোবর সরকার ৭টি সাপ্তাহিকী ও সাময়িকীর ডিক্লারেশন পুনর্বহাল করে। একই তারিখে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্র বঙ্গবন্ধুর জীবিত আত্মীয়-স্বজনের কাউকে কোন সংবাদ না দিয়ে, এমনকি তাঁদের অনুপস্থিতিতে ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর সড়কস্থ তাঁর নিজস্ব বাড়ীতে প্রাপ্ত সম্পত্তির হিসেব প্রকাশ করে।

১০৫। ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের খাঁটি ভক্ত ও অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ ও আলোচনার পর গঠন করে 'জাতীয় সংগ্রাম পরিষদ'। ২০শে অক্টোবর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের একটি মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ও অন্যান্য শ্লোগান দেয়। পরদিন পুনরায় অনুরূপ মিছিল বের হলে ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীদের ওপর হামলা চালায় খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্রের ছাত্র নামধারী ভাড়াটে লোকজন। ফলে, বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ও অনুসারীদের অনেকেই আহত ও গ্রেফতার হয়। ২২শে অক্টোবর ছাত্রলীগ কর্মীরা আরো সংগঠিত হয়ে পুনরায় মিছিল বের করে। সেদিন সরকারের দালালরা হামলা চালালে তারা তার সমুচিত জবাব প্রদান করে। ছাত্রসমাজ তাদের আন্দোলনকে ব্যাপকতর করা এবং জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশে ৪ঠা নভেম্বর শোকদিবস পালন ও শোক মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১০৬। ইতিপূর্বে আরও খবর পাওয়া যায় যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে খুনী মেজর চক্রের বিরুদ্ধে সঞ্চার হয়েছিল তীব্র অসন্তোষ। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব ও কলংকের অংশগ্রহণে অনীহা ছাড়াও আরেকটি কারণ ছিলো এই অসন্তোষের পেছনে। উক্ত কারণটি ছিল সশস্ত্র বাহিনীর শৃংখলা ও মর্যাদার প্রশ্ন। সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার চক্রটি সেনাবাহিনীর ভেতরের একটি ক্ষুদ্রাংশ কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের সহায়তায় ট্যাংক বহর বের করে নিয়ে যেভাবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদেরকে যেভাবে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে, তা ছিল সামগ্রিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও শৃঙ্খলার প্রতি আঘাতস্বরূপ। ফলে, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তারা তো বটেই, সাধারণভাবেই সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা ঐ খুনী

মেজর চক্রটির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ঐ খুনী মেজর চক্রটির ক্ষমতার দাপট যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁদের বিরুদ্ধে এই অসন্তোষও ততোই বাড়তে থাকে। এই বিক্ষোভ চরমে ওঠে যখন সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে সেখানে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাদের পদস্থ করা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সূত্রে আরও জানা যায় যে, অচিরেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নজমুল হুদা, ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান, কর্নেল শাফাত জামিল, কর্নেল হায়দার প্রমুখ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পদচ্যুত করা হবে।

১০৭। ৩রা নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটার দিকে রেহানা, হাসিনা ও আমাকে জানায় যে, বাংলাদেশ রেডিও থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমরা তিনজন মিলে চেষ্টা করতে থাকি বাংলাদেশ রেডিওর ঢাকা স্টেশন ধরার। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা চেষ্টাতেও কোন ফল হলো না। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বাংলাদেশ রেডিওর ঢাকা স্টেশনের অনুষ্ঠান ধরা পড়ে। তখন উক্ত রেডিও স্টেশন থেকে ঘন ঘন বলা হচ্ছিল যে, খালেদ মোশাররফকে ব্রিগেডিয়ারের পদ হতে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। রাত সাড়ে আটটার দিকে ঐ রেডিও স্টেশন থেকে আরও বলা হয় যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চারজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিহত হয়েছেন। ৪ঠা নভেম্বর সকালে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন চীপ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছে। ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে আরও বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির মন্ত্রী পরিষদ থেকে চারজন প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, যাদের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঐ দিনই ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে প্রথম জানানো হয় যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২রা অক্টোবর দিবাগত রাতে নিহত চারজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান। রাত ১০টার দিকে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে আরও বলা হয় যে, কারাগারে নিহত চার নেতার মরদেহ তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। রাত এগারটার দিকে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে আরও এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা হয়েছে। ঢাকা রেডিও স্টেশনের একই ঘোষণায় ৫ই নভেম্বরে পূর্ব আহূত হরতালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, "দেশে সামরিক আইন বলবৎ রয়েছে এবং সামরিক আইন চালু থাকাকালে কোনরকম হরতাল বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাবে না।"

১০৮। ৫ই নভেম্বর রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি সামরিক বিধি সংশোধন করে তাঁর উত্তরাধিকার নিয়োগের বিধান সৃষ্টি

করেছেন এবং তদনুসারে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব এ.এস.এম. সায়েমের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পরদিন, অর্থাৎ ৬ই নভেম্বর নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম। ঐ তারিখ রাত আটটার দিকে প্রেসিডেন্ট সায়েম বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতীয় সংসদ বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উক্ত ভাষণে তিনি আরও বলেন যে, তাঁর সরকার একটি 'নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় সরকার' এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই তাঁর সরকারের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনভাবেই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জড়িত নয় এবং উক্ত নেতাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

১০৯। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সূত্রে বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে খুনী মেজর চক্রের একটি দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যায়। কারাগারের ভেতর প্রবেশ করতে চাইলে জেলর তাদের ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানান। খবর পেয়ে কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেলও আইনগত বিধিনিষেধ উল্লেখ করে একইভাবে তাদের কারাগারের ভেতরে প্রবেশে বাধাপ্রদান করেন। এক পর্যায়ে জেলের পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে জেলরক্ষীরা জোর করে কারাগারে প্রবেশোন্মুক খুনী মেজর চক্রের ঐ দলকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন খুনী মেজর চক্রের ঐ দলটি জেলরকে জানায় যে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তারা সেখানে এসেছে কতিপয় রাজবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করার জন্য। এই পর্যায়ে জেলর বঙ্গভবনে ফোন করেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য। তখন খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ফোনে জেলরকে বলেন, "আমার নির্দেশেই তারা সেখানে গিয়েছে।" তাদেরকে কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে জেলর জানতে চাইলে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ, "হ্যাঁ, আমি তাদের এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছি" বলেই ফোনের রিসিভারটি রেখে দেন। খন্দকার মোশতাক আহমদের ফোনের ঐ কথাবার্তাগুলো খুনী মেজর চক্র টেপ করেছিল বলে জানা যায়। অতঃপর খুনী মেজর চক্রের ঐ দলটিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। তারা তখন কারাগারের বিভিন্ন কক্ষ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে এনে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে স্টেনগানের ব্রাশ ফায়ার এবং বেয়নেটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

১১০। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ এবং খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্রকে উৎখাতের উদ্দেশে ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে যে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল তাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঢাকাস্থ পদাতিক ডিভিশন এবং বিমান বাহিনীর একটি অংশ অংশগ্রহণ করেছিল। অভ্যুত্থানকারীরা খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের অবস্থানস্থল বঙ্গভবন অবরোধ করে ফেলেন, ঢাকা রেডিও স্টেশন দখল করেন, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসভবন অবরোধ করেন এবং খুনী মেজর চক্রকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু ট্যাংক বাহিনীর পাকিস্তানপন্থী সদস্যদের সমর্থনপুষ্ট খুনী মেজর চক্রটি আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানায়। এই পর্যায়ে একটি জীপে সাদা পতাকা উড়িয়ে সেখানে হাজির হন জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী। তিনি খালেদ মোশাররফ এবং খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও মেজর চক্রকে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনায় একটি পরস্পর গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার প্রস্তাব দেন। দুই পক্ষই উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। ৩রা নভেম্বর সারাদিন অতিবাহিত হয় উক্ত আলাপ-আলোচনায়। অবশেষে, নিরাপদে বাংলাদেশের বাইরে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হবে, এই শর্তে খুনী মেজর চক্রটি আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। অতঃপর ৩রা নভেম্বর রাত আটটার দিকে খুনী মেজর চক্রটির লোকজনদের বাংলাদেশ বিমানের একটি বিমানে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে পৌছেই খুনী মেজর চক্রটির নেতা (তথা) লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের হত্যা করার কথা স্বীকার করেন। খুনী লেঃ কর্নেল ফারুকের সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা তখন ব্যাংককে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন (১) লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশিদ, (২) মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম, (৩) মেজর (অবঃ) আজিজ পাশা, (৪) মেজর (অবঃ) মহিউদ্দিন, (৫) মেজর (অবঃ) শাহরিয়ার, (৬) মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা, (৭) মেজর (অবঃ) রাশেদ চৌধুরী, (৮) মেজর (অবঃ) নূর, (৯) মেজর (অবঃ) শরফুল হোসেন, (১০) লেফটেন্যান্ট (অবঃ) কিসমত হোসেন, (১১) লেঃ খায়রুজ্জামান, (১২) লেঃ (অবঃ) আব্দুল মাজেদ, (১৩) হাবিলদার (অবঃ) মোসলেউদ্দিন, (১৪) নায়েক মারফত আলী এবং (১৫) নায়েক (অবঃ) মোঃ হাশেম।

১১১। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৪ঠা নভেম্বর সকালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ শোক মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র, বাকশাল ও যুবলীগের নেতা ও কর্মী, শ্রমিক ও জনতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা হতে নীরব শোক মিছিলটি ধানমন্ডীর ৩২ নম্বর রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাওয়ার পথে নীলক্ষেত পুলিশ ব্যারাকের কাছে পৌছলে পুলিশ প্রথমে বাধা প্রদান করে। পরে অবশ্য পুলিশ মিছিলকারীদের পথ ছেড়ে দেয় এবং বঙ্গবন্ধুর বাসভবন পর্যন্ত মিছিলটিকে অনুসরণ করে। উক্ত মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে পৌছলে সেখানে

এক অবর্ণনীয় শোকাবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বাড়ীর ফটক ছিল তালাবদ্ধ। সশস্ত্র পুলিশ ছিলো পাহারায়। মিছিলের কাউকেই বাড়ীর চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়েই মিছিলকারীদের বঙ্গবন্ধুর বাসার অলিন্দে পুষ্পবর্ষণ করতে হয়। জনতার বিপুল অংশের মধ্যে তখন কান্নার রোল। সকলের দু'চোখ মর্মবেদনার অশ্রুতে ভরে ওঠে। বেতার ও সংবাদপত্র নীরব থাকলেও সেদিন লোকমুখে সারা ঢাকা শহরে প্রচারিত হয়ে যায় যে, খুনী মেজর চক্রের লোকজন ৩রা নভেম্বর রাতে দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। অতএব ছাত্র-যুব নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের এবং 'বাকশালের' চার জাতীয় নেতার হত্যার প্রতিবাদে ৫ই নভেম্বর দুপুর বারোটা পর্যন্ত হরতাল পালন এবং ঐ দিন দুপুর ১টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাংগণে মরহুমদের 'গায়েবানা জানাজা' অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১১২। আরও জানা যায় যে, ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যায় খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের সুনিশ্চিত পতনের মুখে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহম্মদুল্লাহ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাইকারী পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁরা সকলে একত্রে বঙ্গভবনে গমন করেন। খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে সেখানে তাঁদের বৈঠক চলাকালেই বঙ্গভবনে গিয়ে পৌছেন (তখন) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফাত জামিল। কর্নেল শাফাত জামিল খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "জাতির জনককে, দেশের প্রেসিডেন্টকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে আপনি প্রেসিডেন্ট সেজে বসেছেন। আপনাকে এর পরিণাম ভোগ করতে হবে"। তখন বঙ্গভবনে উপস্থিত জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী খন্দকার মোশতাক আহমদের সমর্থনে কিছু বলতে চেষ্টা করেন। কর্নেল জামিল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "আপনি দয়া করে থামুন, আপনি সব সময়ই খুনীদের পক্ষ সমর্থন করেন।" সে রাতে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রীদের রাত তিনটা পর্যন্ত বঙ্গভবনে আটকে রাখা হয়। রাত তিনটার পর সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যাওয়ার অনুমতি পান। কিন্তু খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ অঘোষিত বন্দী অবস্থায় বঙ্গভবনেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন।

১১৩। ৩রা নভেম্বরের (১৯৭৫) অভ্যুত্থানের পরে 'রক্তপাত পরিহার করার উদ্দেশে' আপোষ আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ চক্র এবং খালেদ মোশাররফের বিরোধী অন্যান্য শক্তি দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে দ্রুত যোগাযোগ করে পাল্টা অভ্যুত্থানের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। জানা যায় যে, জনৈক বাচ্চু করিম পাকিস্তান প্রত্যাগত পাকিস্তানপন্থী সিপাহীদের, জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত প্রাক্তন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের এবং কর্নেল (অবঃ) তাহের সেনাবাহিনীতে জাসদপন্থী সিপাহীদের এ জাতীয় অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই সময় মার্কিন-গণচীন-পাকিস্তানপন্থী শক্তিগুলো সর্বাত্মক অপপ্রচার তৎপরতায় লিপ্ত হয়। জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক দলও (জাসদ) এই প্রচার অভিযানে সামিল হয়। ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শহর ও বন্দরে তাঁরা একটার পর একটা প্রচারপত্র বিতরণ করে প্রচার করতে থাকে যে, ভারতের প্ররোচনা ও অর্থেই খালেদ মোশাররফ সামরিক অভ্যুত্থান করেছেন। এমনও প্রচার করা হয় যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে 'বাকশাল' নেতারা ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা থেকে প্রেরিত খবরের বরাত দিয়ে মার্কিন ও বৃটিশ পত্র-পত্রিকা প্রচার করতে থাকে যে নিহত হওয়ার পূর্বে জেলখানায় আটক নেতারা খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটানোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ডেকে এনে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন। লন্ডনের 'অবজারভার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়, "বাংলাদেশে মুজিব হত্যার পেছনে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ ছিল না। কিন্তু ৩রা নভেম্বরে খন্দকার মোশতাক আহমদ বিরোধী অভ্যুত্থানে বিদেশী হস্তক্ষেপ ছিল এবং এই অভ্যুত্থানের সমর্থনে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের চার মাইল ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।"

১১৪। বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব খবরাখবর বি. বি. সি. এবং ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। দেশী-বিদেশী সুপরিকল্পিত এই সমস্ত প্রচারাভিযানের মোকাবেলায় রাজনৈতিক লক্ষ্য ও সম্পর্কহীন খালেদ মোশাররফ এবং তাঁর সমর্থকদের কার্যকরী কোন প্রচার তৎপরতাই ছিল না। ফলে, জনগণ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে একতরফা প্রচারণায় স্বভাবতঃই সৃষ্টি হয় মারাত্মক বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তির সুযোগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সুপরিকল্পিত উদ্দ্যোগ নিয়ে মঞ্চে ও নেপথ্যে সর্বাত্মক তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। জাসদের গণবাহিনী প্রধান কর্নেল তাহেরের সহায়তায় তাঁরা সেনাবাহিনীর 'শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের' মন্ত্র ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে, বিশেষতঃ সিপাহীদের যেসব অভাব-অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া ছিলো জাসদ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করে। সিপাহীদের অবহেলিত অনুভূতিকে উস্কে দিয়ে তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট ও ব্যারাকে প্রচারপত্র বিলি করে তাদের প্রতি সংগ্রামের আহবান জানায় জাসদ। এমন একটি প্রচারপত্রে বলা হয়, "অফিসাররা ক্ষমতা ও পদের লোভে অভ্যুত্থান ঘটাচ্ছে। আর প্রাণ দিচ্ছে সাধারণ সিপাহীরা। নিগৃহীত, অধিকারবঞ্চিত সিপাহীরা আর কামানের খোরাক হবে না। সিপাহী-জনতার ভাগ্য এক। তাই সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে। সুতরাং বিপ্লবের জন্য, শ্রেণী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হউন।"

১১৫। ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিভিন্ন সূত্রে এই মর্মে খবর পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশের যশোর, কুমিল্লা ও রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজার হাজার সিপাহী খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঢাকার দিকে চলে যায়। ৭ই নভেম্বর ভোরে ঢাকা রেডিও স্টেশন

থেকে ঘোষণা করা হয়, "বীর বিপ্লবী সিপাহী, জনতা, কৃষক, শ্রমিক, বি, ডি, আর, পুলিশ, বিপ্লবী গণবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়েছে। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে বেতার ভাষণ দেবেন।" অতঃপর সকাল আটটার দিকে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট সায়েমের নিকট দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রথমে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং পরে প্রেসিডেন্ট এ. এস. এম. সায়েম বাংলাদেশ বেতারে ভাষণ দেন।

১১৬। ঐ দিন রাতে বিভিন্ন সূত্রে ৬ই নভেম্বর রাতে বাংলাদেশে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লব সম্বন্ধে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়। ৬ই নভেম্বর মধ্যরাত্রির পরে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিপাহীরা অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে তুলে নেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেন বাংলাদেশের অন্যান্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত সিপাহীরা। এমন কি খালেদ মোশাররফের সমর্থনে ব্রিগেডিয়ার নজমূল হুদার নেতৃত্বে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের যে সব সিপাহী ঢাকা এসেছিলেন তারাও খালেদ মোশাররফবিরোধী সিপাহীদের সংগে যোগদান করেন। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) থেকে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েনকৃত ট্যাংকগুলো ৩রা নভেম্বরের পরে স্বল্পকালের জন্য ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলেও ৬ই নভেম্বর রাতে সেগুলো আবার রাজপথে নেমে আসে। ৬ই নভেম্বর মধ্যরাত্রির পর ঢাকা নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়। এ সময় খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে খালেদ মোশাররফ ব্রিগেডিয়ার নজমূল হুদা ও কর্নেল হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে শেরে বাংলা নগরে অবস্থানরত রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগত সেনা ইউনিটের নিকট চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর বিদ্রোহী সিপাহীর গুলিতে খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নজমূল হুদা এবং কর্নেল হায়দার নিহত হন। প্রায় একই সময়ে বঙ্গভবনে কর্নেল শাফাত জামিল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেফতার হন এবং ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন।

১১৭। সেদিন মধ্যরাত্রির পর ভারী ও হাল্কা সকল ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ করতে করতে সিপাহীরা দলে দলে রাজপথে নেমে আসেন। বিনা বাধায় তাঁরা ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেন এবং 'জাসদের' বিপ্লবী গণবাহিনী প্রধান কর্নেল (অবঃ) তাহের সাময়িকভাবে উক্ত বেতার ভবনের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। সে রাতে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যখন গোলাগুলি চলছিল, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপদ জায়গায় সমবেত পাকিস্তানপন্থী উল্লসিত জনতা তখন সমানে শ্লোগান দিয়ে

যাচ্ছিল। ট্রাকে ট্রাকে সোল্লাসে ভ্রমণরত সশস্ত্র সিপাহীরাও বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগান দেন। এই সব শ্লোগানের মধ্যে ছিলো, ''নারায়ে তকবির– আল্লাহু আকবর, সিপাহী–জনতা এক হও, স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে, গণরাজ কায়েম হয়েছে, বিপ্লবী গণবাহিনী জিন্দাবাদ, কমরেড সিরাজ ভাই, লও সালাম", ইত্যাদি। আরও খবর পাওয়া যায় যে, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের নামে পাকিস্তানপন্থী সিপাহী এবং সেনাবাহিনীতে জাসদের গণবাহিনীর সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের। ৭ই নভেম্বরের ক্ষমতার পটপরিবর্তনকে পরাধীনতার পরিসমাপ্তি হিসেবে অভিহিত করে এনায়েতুল্লাহ খান সম্পাদিত সরকারী পত্রিকা বাংলাদেশ টাইমস ঘোষণা করে, "Bangladesh Wins Freedom"।

১১৮। ৮ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ. এস. এম. সায়েম একটি আদেশে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তিনজন স্টাফ প্রধানকে উপসামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ১০ই নভেম্বর উপসামরিক প্রশাসকদের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ১১ই নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রেডিও–টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৩ই নভেম্বর বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১৫ই নভেম্বর ফখরুদ্দিন আহমদকে পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করে বাংলাদেশের একটি বৈদেশিক মিশনে পদস্থ করা হয় এবং তাঁর স্থলে পাকিস্তানপন্থী তোবারক হোসেনকে নিয়োগ করা হয়। ২০শে নভেম্বর ভারতে বিশেষ উচ্চ প্রশিক্ষণ শেষে তৎকালীন মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ২৫শে নভেম্বর রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে জাসদের মেজর (অবঃ) এম. এ. জলিল, আ. স. ম. আব্দুর রব ও গণবাহিনী প্রধান কর্নেল (অবঃ) তাহেরসহ ১৯ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ. এস. এম. সায়েম তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে তাঁদের মধ্যে সরকারী দফতরের দায়িত্ব বন্টন করেন। ঐ দিন সকালে তৎকালীন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী সমর সেনকে সশস্ত্র হামলায় অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়। উক্ত ঘটনায় শ্রী সমর সেন গুলিবিদ্ধ হন এবং ভারতীয় হাই কমিশনের সম্মুখে জাসদের চারজন কর্মী নিহত হন এবং দুই জন আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। ২৮শে নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৯ম ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করেন। ৫ই ডিসেম্বর বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নয়া দিল্লী সফরে যান। একই দিনে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বাংলাদেশে ৭ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আব্দুস সাত্তার নয়া দিল্লীতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার বেসরকারী খাতে পুঁজি বিনিয়োগ ৩ কোটি টাকা হতে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার জনাব এম. খুরশীদকে বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। ১১ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একজন ভক্ত ও অনুসারী আলহাজ্ব জহিরউদ্দিনকে পাকিস্তানে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে।

১১৯। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হাসিনাদের ফুফাতো ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও শেখ ফজলুর রহমান মারুফ প্রথম দিল্লী আসে। তাঁদের আমাদের বাসায় আনার জন্য আমি নয়াদিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে যাই। তখন তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শেখ সেলিম প্রায় মাসদেড়েক আমাদের সঙ্গে থেকে পুনরায় কোলকাতায় ফিরে যান। পক্ষান্তরে, শেখ মারুফ অসুস্থতার কারণে আমাদের সঙ্গে দুই মাসেরও অধিককাল থাকেন। শেখ মারুফ, বিশেষতঃ শেখ সেলিমের কাছ থেকে জানতে পাই ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫)-এ সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেক তথ্য। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর পূর্বানুমোদিত কর্মসূচী অনুসারে ১৪ই আগস্ট (১৯৭৫) রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ আর্মড কোরের প্রায় ৪০০ জন সৈন্যের একটি দল সামরিক মহড়া-কাম-প্রশিক্ষণের জন্যে জয়দেবপুরের দিকে গিয়েছিল। এই দলের নেতৃত্বে ছিল লেঃ কর্নেল ফারুক। লেঃ কর্নেল রশিদ ও আটজন মেজরও এই দলটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাঁদেরকে প্রদান করা হয়েছিল সীমিত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। সঙ্গে তিনটি ট্যাংক নেওয়ারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল এই দলটিকে। কিন্তু ঐ ট্যাংকগুলোয় কোন গোলাবারুদ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। জয়দেবপুরে মহড়া ও প্রশিক্ষণ শেষে এই দলটি (তৎকালীন) কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে এসে সমবেত হয় রাত সাড়ে তিনটার দিকে। তখন লেঃ কর্নেল ফারুক সমবেত সৈন্যদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে লেঃ কর্নেল ফারুক বঙ্গবন্ধু সরকারের তীব্র সমালোচনা করে উপস্থিত সৈন্যদেরকে ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সম্মত করায়। কিন্তু তখন সৈন্যদের বলা হয়নি যে, বঙ্গবন্ধু বা তাঁর পরিবারবর্গের কোন সদস্য কিংবা আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হবে। ঐ সময়ে মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম সামরিক পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাদের দলে যোগদান করে। উল্লেখ্য যে, মেজর (অবঃ) ডালিম বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কতিপয় সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতো। তার শাশুড়ি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘোর সমর্থক এবং তিনি ঘন ঘন বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে শেখ রেহানার বিছানায় শুয়ে থাকতেন। মেজর (অবঃ) ডালিমের স্ত্রী নিম্মি ছিল রেহানার স্কুলের সহপাঠিনী। তার মা বেঁচে ছিলেন না এই দুঃখ প্রকাশ করে মেজর (অবঃ) ডালিম আমার শাশুড়িকে 'মা' বলে সম্বোধন করার অনুমতি নিয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধুর বাসায় এলে সে তাঁকে 'মা' বলেই সম্বোধন করতো। কিন্তু ইতিপূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অন্যান্য অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় মেজর ডালিমকে সেনাবাহিনী থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছিল।

১২০। যাহোক, সে রাতে আর্মড কোরের ঐ ক্ষুদ্র দলটিকে পাঁচটি উপদলে বিভক্ত করা হয়। ২০–২৫ জনের একটি গ্রুপকে একজন মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন জামাই ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের মিন্টোরোডস্থ বাসায়। ১৫–২০ জনের অপর একটি গ্রুপকে অপর একজন মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় শেখ ফজলুল হক মণির ধানমন্ডির ১৩/১ (পুরাতন) রোডস্থ বাসায়। ৩০–৪০ জনের তৃতীয় গ্রুপটিকে মেজর (অবঃ) ডালিমের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয় শাহবাগস্থ ঢাকা বেতার ভবনে। একটি ট্যাংক চালিয়ে কর্নেল ফারুক নিজে প্রায় ১০০ জন সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দর ও কুর্মিটোলা বিমান বন্দর এলাকার বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নির্ধারণে ব্যাপৃত হয়। অবশিষ্ট ১০০–১২৫ জনের পঞ্চম গ্রুপটিকে দু'জন মেজরের নেতৃত্বে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধুর বাসা ঘেরাও করার জন্য। ১৫–২০ জনের একটি বিশেষ টাস্কফোর্সকে হাবিলদার মোসলেহউদ্দিনের নেতৃত্বে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি ও বঙ্গবন্ধুর বাসায় বিশেষ কাজের জন্য গোপনে ব্রীফ করে পাঠানো হয়। ১৫ই আগস্ট ভোর রাত সাড়ে চারটার মধ্যেই উপরোল্লিখিত গ্রুপ তিনটি যথাক্রমে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি ও বঙ্গবন্ধুর বাসা ঘেরাও করে সেখানের বিভিন্ন কৌশলগত জায়গায় অবস্থান নেয়। ভোর পাঁচটার দিকে আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় চারদিক থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়। অতঃপর একজন মেজর, একজন নায়েক ও কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ উক্ত বাসার ভেতরে প্রবেশ করে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের উক্ত বাসার নীচ তলার ড্রইং রুমে জড়ো করে। উল্লেখ্য, আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল হাসনাত আব্দুল্লাহ তখন উপরতলার একটি ষ্টোররুমে লুকিয়েছিল। খুনী মেজর চক্রের লোকেরা তাঁকেও ধরার জন্য ঐ বাড়ীর সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিল। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে দু'জন সৈন্য ষ্টেনগান হাতে টলতে টলতে উক্ত ড্রইংরুমের দরজার কাছে এসেই সেখানে জড়োকৃত সবার ওপর ব্রাশ ফায়ার করে চলে যায়। আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের বেঁচে যাওয়া সদস্যরা জানান যে, ঐ সময় উক্ত দু'জন সৈন্যকে নেশাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। প্রায় একই সময়ে দু'জন সৈন্য শেখ ফজলুল হক মণির বাসার উপরতলায় উঠে শেখ মণি ও তাঁর পাশে দাঁড়ানো তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ষ্টেনগানে পরপর দু'দফায় ব্রাশ ফায়ার করে।

১২১। ১৫ই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসা চতুর্দিক থেকে গোলাগুলিতে আক্রমণ করা হয়। প্রায় মিনিট বিশেক গোলাগুলির পর দু'জন মেজর কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যসহ বঙ্গবন্ধুর বাসার ভেতরে প্রবেশ করে। তখন সেখানে কর্তব্যরত একজন কর্মকর্তা ও দু'জন পুলিশের সদস্য তাদেরকে বাধা দিলে তারা ঐ তিন ব্যক্তিকে গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত করে। ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ ও আহত পুলিশের আর্তচীৎকার শুনে শেখ কামাল নীচের অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে পৌঁছামাত্রই তারা তাকেও ব্রাশ

ফায়ারে হত্যা করে। অতঃপর ঐ দু'জন মেজর কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় দোতলায় উঠে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুকে পদত্যাগ করার প্রস্তাব করে। এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, "যে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশের ও সেনাবাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা ও সংবিধান লংঘন করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাসায় গোলাগুলিতে আক্রমণ করতে পারে আমি তার রাষ্ট্রপতি থাকতে চাইনা। তবে তোমাদের মত অধস্তন কর্মকর্তাদের নিকট আমি পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারি না। অতএব সেনাবাহিনীর চীফ ও ডেপুটি চীফদেরকে এখানে নিয়ে এলে আমি তাঁদের নিকট আমার ইস্তফা প্রদান করবো।"

১২২। এর পর ঐ দু'জন মেজর বঙ্গবন্ধুকে বলেন যে, সেক্ষেত্রে তাঁকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে গিয়ে বেতারে তাঁর পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে। একটু ইতস্তত করে তখন বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে বলেন যে, তিনি বেতার কেন্দ্রে যেতে সম্মত রয়েছেন কিন্তু শেখ কামালকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিতে হবে। অতঃপর ঐ দুই মেজর বঙ্গবন্ধুকে ঘেরাও করে উপরতলার প্রধান প্রবেশ দরজার নিকট নিয়ে আসে। ঐ সময় হাবিলদার মোসলেহউদ্দিন অপর দুই বাসায় হত্যাযজ্ঞ শেষ করে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ঢুকে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে পৌছয়। বঙ্গবন্ধু যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে উদ্যত হয়েছিলেন ঠিক ঐ মুহূর্তে হাবিলদার মোসলেহউদ্দিন তাঁকে তাক করে ব্রাশ ফায়ার করে। বুলেটে ক্ষতবিক্ষত বঙ্গবন্ধুর দেহ তক্ষুণি সিঁড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর দু'জন মেজর ও হাবিলদার মোসলেহউদ্দিন আমার শাশুড়িসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এক এক করে ঠাণ্ডা মাথায় গুলিতে হত্যা করে। এরই এক ফাঁকে রাসেল দৌড়ে নীচে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো বাড়ীর কাজের লোকজনদের নিকট আশ্রয় নেয়। তাঁকে দীর্ঘকাল যাবত দেখাশুনার ছেলে আব্দুর রহমান রমা তখন রাসেলের হাত ধরে রেখেছিল। একটু পরেই একজন সৈন্য রাসেলকে বাড়ীর বাইরে পাঠানোর জন্য রমার কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে নেয়। রাসেল তখন ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, "আল্লাহর দোহাই, আমাকে জানে মেরে ফেলবেন না। বড় হয়ে আমি আপনাদের বাসায় কাজের ছেলে হিসেবে থাকবো। আমার হাসু আপা দুলাভাইয়ের সঙ্গে জার্মানীতে আছেন। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানীতে হাসু আপা ও দুলাভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিন।" তখন উক্ত সৈন্যটি রাসেলকে বাড়ীর গেটস্থ সেন্ট্রিবক্সে লুকিয়ে রাখে। এর প্রায় আধঘন্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাঁকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে তার (রাসেলের) মাথায় রিভলভারের গুলীতে।

১২৩। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫)-এর ভোরে বঙ্গবন্ধুর ধনমন্ডির (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বাসায় আর যাঁরা খুনী মেজর চক্রের গুলিতে নিহত হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ (১) বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (রেনু), (২) বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, (৩) শেখ কামালের নববিবাহিতা স্ত্রী, সুলতানা কামাল (খুকী), (৪) বঙ্গবন্ধুর মেজো পুত্র শেখ জামাল, (৫) শেখ জামালের নববিবাহিতা স্ত্রী পারভীন জামাল (রোজী), (৬) বঙ্গবন্ধুর ১০ বছরের

সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, (৭) বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোটভাই শেখ নাসের এবং (৮) কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডি. এস. পি.। বঙ্গবন্ধুর বাসায় সৈন্যদের গোলাগুলিতে গুলিবিদ্ধ হয় কাজের ছেলে আব্দুল। বঙ্গবন্ধুর বাসায় সশস্ত্র হামলার খবর শুনে রাষ্ট্রপতির মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল জামিল নিজে গাড়ী চালিয়ে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের দিকে আসছিলেন। পথে সোবহানবাগ কলোনীর মসজিদের নিকট খুনী মেজর চক্রের লোকেরা তাঁকে বাধা দেয়। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাসার দিকে পুনরায় যাত্রা করতে উদ্যত হলে সেখানে উপস্থিত একজন মেজর ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে তাঁকে হত্যা করে। মিন্টোরোডের সরকারী বাসায় যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁরা হলেনঃ (১) বঙ্গবন্ধুর ছোট বোনজামাই ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, (২) আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ১৪ বছর বয়স্কা কন্যা মিস বেবী, (৩) তাঁর ১২ বছর বয়স্ক পুত্র আরিফ, (৪) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল হাসনাত আবদুল্লাহর ৪ বছর বয়স্ক পুত্র বাবু, (৫) আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের একজন মধ্যবয়সী ভাতিজা, (৬) তাঁর একজন কিশোর ভাগিনা নান্টু, (৭) তাঁর বাসায় আগত তিনজন অতিথি এবং (৮) তাঁর বাসায় কর্মরত চারজন কাজের লোক। আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় আরও পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়। এরা হলো তাঁর বিশ বছর বয়সী যুবতী কন্যা হামিদুন্নেছা বিউটি, দশ বছর বয়সী কন্যা কামরুন্নেছা রিনা, চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছেলে আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ খোকন, তাঁর পত্নী ও বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন বেগম আমিনা সেরনিয়াবাত এবং তাঁর বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর পত্নী সাহানারা বেগম। মিস হামিদুন্নেছা বিউটির তলপেট ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা হয়। তাঁদের বাঁচার কথাই ছিল না। ৭/৮ বছর ধরে তার চিকিৎসা করাতে হয়। পাঁচবার অস্ত্রোপচার করার পরও সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। এই আধাপংগুত্ব অবস্থায় সারাটা জীবন কাটাতে হবে এমন একটি সুন্দরী তরুণীকে। শেখ ফজলুল হক মণি গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্তেকাল করেন। গুলিতে মারাত্মকভাবে আহত তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী শামছুন্নেসা আরজুকে শেখ মণির ছোট ভাই শেখ ফজলুল করিম সেলিম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই আরজু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১২৪। উল্লেখ্য, আর্মির যে দলটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় আক্রমণ চালিয়েছিল তার একটি অংশ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ ৩ নম্বর বাড়ীর আমাদের ফ্ল্যাটেও ভীষণ গোলাগুলি করে। প্রাণ রক্ষায় উক্ত বাড়ীর মালিক আইনুল হক সাহেব, তাঁর পরিবারবর্গ ও অন্যান্য লোকেরা বাথরুম ও চৌকির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হাসিনা জার্মানী যাওয়ার সময় বাড়ীর মালিক আইনুল হক সাহেবের ছোট ভাইকে আমাদের ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিল। গোলাগুলির পর একজন মেজর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটের কক্ষগুলোয় তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায় আমাদের খোঁজে। হাসিনা ছেলেমেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইতিপূর্বে আমার

উদ্দেশে জার্মানী চলে গেছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল উক্ত মেজর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সেখান থেকে চলে যায়।

১২৫। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে খুনী মেজর চক্র, তাঁদের দেশী-বিদেশী প্রভু-সহযোগী, স্বাধীনতার আদর্শ-চেতনা বিরোধী মহল ও ব্যক্তিত্বরা ব্যাপক প্রচার অভিযান চালায় বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি, সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্যে। এ কথা বলা নিষ্প্রোয়োজন যে, তাঁদের সে হীন চক্রান্ত ধোপে টেকেনি, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ তাঁদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। খুনীরা বাংলাদেশের জনগণের কাছে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও স্বাধীনতার স্থপতির খুনী, দেশের কলঙ্ক ও ঘৃণার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল। পক্ষান্তরে, বঙ্গবন্ধুর নিখুঁত চরিত্র, খাঁটি দেশপ্রেমিকতা এবং দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য অকৃত্রিম গভীর দরদ, অনুভূতি ও ভালোবাসার কথা বাংলাদেশের জনগণের অন্তরের গভীরে রয়েছে ও থাকবেও চিরঅম্লান। এ দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুকে একজন দলনেতা হিসেবে যেমন অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতে দেখেছেন, বঙ্গবন্ধুর পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে দেশের অবিসংবাদিত নেতা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হবার পরও তারা তার কোনও পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেননি। বঙ্গবন্ধুর কি বেশভূষা, কি আচার-আচরণ, কি বসবাসের অবস্থা, কি বাড়ীর খাবার-দাবার, কোন কিছুর কোনও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি কোনদিন। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর রোডস্থ বাড়ীরও হয়নি কোন পরিবর্তন। তাঁর ঐ বাড়ীর কোনও কক্ষে ছিল না কোন কার্পেট, এয়ারকন্ডিশনার বা শীতলীকরণ ব্যবস্থা। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও ছুটির দিনে কিংবা অবসর সময়ে বঙ্গবন্ধু কতদিন না তাঁর কার্পেটবিহীন শয়নকক্ষের মেঝেতে শুয়ে কত খেলা করেছেন তাঁর তখন শিশু নাতী জয় ও নাতনী পুতলীকে বুকে-পিঠে নিয়ে। সরকারী কর্মকর্তাদের বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও কোনও দামী-সৌখিন চেয়ার-সোফা, আসবাবপত্র, কার্পেট কিংবা এয়ারকন্ডিশনার নেয়া সম্ভব হয়নি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর নিজস্ব বাড়ীতে। এসব ও আরও অনেক গুণাবলীর জন্য বঙ্গবন্ধুর দেশের জনগণের কাছে এবং ইতিহাসে হয়ে আছেন ও থাকবেন একজন মহান ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর ভিন্নতা দেশের অন্য নিকট-অতীত ও সাম্প্রতিকালের রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীদের থেকে। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর স্থান রয়েছে সবার উর্ধ্বে এবং তা নিঃসন্দেহে থাকবেও চিরকাল।

১২৬। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের ও তাঁর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের চার নেতাকে হত্যা করার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা এবং এই সব হত্যাকান্ডে কে বা কারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল সে সমস্ত বিষয়ে ১৯৭৫ সালেই আমার বাংলাদেশের ও ভারতের অনেক প্রবীণ সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-

আলোচনা হয়। তাঁদের প্রত্যেকের অভিমত এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, লক্ষ্য, মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনাকে বিনষ্ট করাই ছিল এই সব হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অফিসার ও অন্যান্য সদস্য কোনভাবেই এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত ছিল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী অতি মুষ্টিমেয় ও নগণ্য সংখ্যক অফিসার ও সাধারণ সৈনিক কতিপয় দেশী ও বিদেশী মহলের এজেন্ট হিসেবে এ সমস্ত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীনতা তাঁদের ষড়যন্ত্রের কার্যকরণকে সহজতর করেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ফলাফলকে পাকিস্তানের মিলিটারীর একটি অংশ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো, মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর কতিপয় নেতা কোনক্রমেই মেনে নেননি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই সেই সমস্ত পাকিস্তানী ব্যক্তিত্ব এই ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তায় রেখে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে তেরজন জুনিয়র কর্মকর্তা এবং চার জন ননকমিশন্ড কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের এবং আওয়ামী লীগের চারজন প্রবীণ নেতার হত্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে, তারা সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী এবং পাকিস্তানপন্থী। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহারের জন্য এ জাতীয় ব্যক্তিদের অনেককেই পাকিস্তানের মিলিটারীর এজেন্ট হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ১৯৭১-এ তৎকালীন বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে। খুনী মেজর চক্রের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ব্যাকগ্রাউন্ড পর্যালোচনা করলেই এই অভিমতের সত্যতা সহজেই প্রমাণিত হয়।

১২৭। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই পাকিস্তান মিলিটারীর ঐ অংশটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চিহ্ন (অর্থাৎ হত্যা) করার পরিকল্পনা করে। এদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে চিশ্চিহ্ন করতে পারলেই হয় পাকিস্তানের ১৯৭১-এর পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা নতুবা বাংলাদেশ ও বর্তমান পাকিস্তানের মধ্যে একটি কনফেডারেশনের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও শক্তিধর দেশগুলো বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে যতোদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সাহায্য প্রদান করছিল, পাকিস্তানের ঐ মহলটি ততোদিন পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পায়নি। ১৯৭৫-এর জানুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধুর দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন পাকিস্তানের ঐ মহলটির হাতে সে সুযোগ তুলে দেয় বললেই চলে। কারণ এর ফলে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ দেশগুলো বঙ্গবন্ধুর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয় এবং আস্থা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন, বিশেষতঃ

সি. আই. এ.-এর কাছ থেকে সবুজ সংকেত এবং লিবিয়ার প্রশাসন, বিশেষতঃ এর রাষ্ট্র প্রধান কর্নেল (অবঃ) গাদ্দাফীর সম্মতি পাওয়ার পর পাকিস্তানের মিলিটারীর ঐ অংশটি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে তাদের দীর্ঘ চার বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে তাদের এজেন্ট, গোড়া পাকিস্তানপন্থী ও সাম্প্রদায়িক সদস্য এবং পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বিশিষ্ট নেতা ও আওয়ামীবিরোধী অন্যান্য মহল ও ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার ও নিকটতর আত্মীয়-স্বজনের সদস্যদের এবং ৩রা নভেম্বরে আওয়ামী লীগের চারজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট নেতা যথা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমদ ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে হত্যা করে। পাকিস্তানের বাংলাদেশী এজেন্টদের মধ্যে মাত্র অতি সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকেই যথা খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, লেঃ কর্নেল ফারুক, লেঃ কর্নেল রশিদ, মেজর (অবঃ) ডালিম এবং জনাকয়েক হাবিলদার ও (সুবেদার) নায়ককে অবহিত করা হয়েছিল যে (১৯৭৫-এর) ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গের সদস্যদের হত্যা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের, আওয়ামী লীগের চার নেতা ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে স্বাধীনতার পক্ষের অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সদস্যকে হত্যা নতুবা ক্ষমতা থেকে অপসারণের মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরাসরি নেতৃত্বে গৃহীত ও পরিচালিত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর ঐ অংশের উক্ত পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের সময় আলজিরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিনের সঙ্গে আলাপরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৩ সালের ৮ই জুন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ কুদরত-ই-খুদার নিকট থেকে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণকালে বঙ্গবন্ধু।
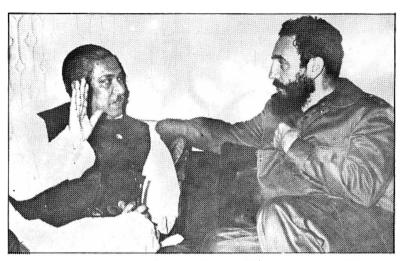
১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের সময় কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে আলাপরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের সময় সৌদি আরবের বাদশা ফয়সালের সঙ্গে আলাপরত বঙ্গবন্ধু।
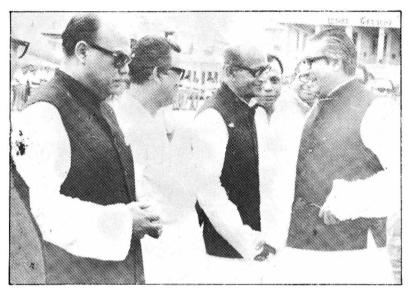
১৯৭৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৪ সালের ১১ই মার্চ কুমিল্লায় বাংলাদেশের প্রথম সামরিক একাডেমীতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধুঃ পেছনে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান, কর্ণেল খুরশিদ ও ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহ্।

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৪ সালে ঢাকায় এক ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে ভাষণদানরত বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ তাঁর জন্মদিনে নাতনী পুতলি, নাতী জয়, কন্যা হাসিনা ও বেগম মুজিবের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৫ সালের ৮ই জুন টাঙ্গাইলের 'কাগমারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ' সরকারীকরণ অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু।

ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকাকালীন ১৯৭৭ সালে ছয় বছরের পুত্র জয়কে কোলে নিয়ে লেখক এবং সাড়ে চার বছরের কন্যা পুতলিকে কোলে নিয়ে স্ত্রী হাসিনা।

নবম পরিচ্ছেদ

১৯৭৬–১৯৮১ সাল

১। ১৯৭৬ সালের গোড়া থেকেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজের অবস্থান ও ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত এবং বিশেষ মহল ও জনগণের কাছে স্বীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জনসমাবেশ ও জনসভার আয়োজন করেন। একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সরকারী ও বেসরকারী গণমাধ্যমগুলোকে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি এবং তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে। একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েই তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যান। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার উল্লেখযোগ্য ছিল ঃ (১) সামরিক বাহিনীতে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সুসংহত করা, (২) বিদেশী, বিশেষতঃ জাপানসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাশ্চাত্যের ধনী ও সমৃদ্ধ দেশগুলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নেতৃবর্গের আস্থা ও সমর্থন লাভ করা এবং (৩) দেশে প্রগতিশীল, বিশেষ করে, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী রাজনৈতিক দলগুলোকে দুর্বল করা যাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা তাদের পক্ষে দুষ্কর ও দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেন ডানপন্থী, সাম্প্রদায়িক,. পাকিস্তানপন্থী এবং মাওবাদী রাজনৈতিক দল, বঙ্গবন্ধু বিরোধী বিভিন্ন কায়েমী মহল ও ব্যক্তিত্বদের। তাঁর শাসন আমলে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডেই প্রকাশ পায় তাঁর এ সমস্ত পরিকল্পনা।

২। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি তৎকালীন বিমান বাহিনী চীফ ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব লিবিয়া সফরে যান। ঐ সময় বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত খুনী চক্রের লেঃ কর্নেল ফারুক, লেঃ কর্নেল রশিদ এবং মেজর (অবঃ) ডালিম ত্রিপোলীতে তাওয়াবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অতঃপর ২৩শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর তৎকালীন এডজুটেন্ট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নূরুল ইসলাম

শিশুকে লিবিয়ার বেনগাজীতে পাঠান। তখন নূরুল ইসলাম শিশু প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং পরে একত্রে খুনী মেজর চক্রের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি খুনী চক্রের সদস্যদের বাংলাদেশের যে কোন দূতাবাস বা মিশনে চাকুরী প্রদানের প্রস্তাব দেন। খুনী চক্রের অন্যান্য সকলেই উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হলেও লেঃ কর্নেল ফারুক ও লেঃ কর্নেল রশিদ রাজি হয়নি।

৩। ১৯৭৬ সালের মার্চের ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় সিরাতুন্নবী সম্মেলন। তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব গোলটুপি মাথায় দিয়ে এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে সংবিধান পরিবর্তন করে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করারও প্রস্তাব করেন।

৪। ১৯৭৬-এর মার্চ মাসে তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে সফরে যান। ঐ সময়ে লন্ডনে ৩০ ও ৩১শে মার্চ তারিখে খুনী লেঃ কর্নেল ফারুক তাওয়াবের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত বৈঠকগুলোয় খুনী লেঃ কর্নেল ফারুক এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবের কাছ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তার সমর্থক, বিশেষতঃ বেঙ্গল ল্যান্সারের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে উক্ত বেঙ্গল ল্যান্সার গ্রুপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পাঁচশত সৈনিক ও চৌদ্দটি ট্যাংকের সমন্বয়ে গঠন করা হয় প্রথম ক্যাভালরী এবং এই অংশকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে স্থানান্তর করে সাভারস্থ ক্যান্টনমেন্টে প্রেরণ করা হয়। বেঙ্গল ল্যান্সারের অবশিষ্ট অংশকে বগুড়াস্থ ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তর করা হয়।

৫। ১২ই এপ্রিল (১৯৭৬) খুনী লেঃ কর্নেল ফারুক ইটালীর রাজধানী রোমে যান। রোম থেকে ফারুক সিংগাপুরে অবস্থানরত খুনী চক্রের অপর তিন সদস্য যথা হাবিলদার মোসলেহ উদ্দিন, নায়েক মারফত আলী ও নায়েক মোঃ হাশেমদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। অপরদিকে খুনী লেঃ কর্নেল রশিদ লিবিয়া থেকে লন্ডনে চলে যান। ১৩ই এপ্রিল (১৯৭৬) রশিদ খুনী মেজর (অবঃ) ডালিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত তাঁর শ্বশুর আর. আই. চৌধুরীর বাসায়। ১৬ই এপ্রিল (১৯৭৬) তারিখে খুনী রশিদ সিংগাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করেন। রোম বিমান বন্দরে উক্ত ফ্লাইটে ওঠেন খুনী ফারুক ও তাঁর তিনজন সহযোগী সিংগাপুরের উদ্দেশ্যে। খুনী রশিদ ব্যাংকক থেকে ঢাকা পৌছান ২০শে এপ্রিল (১৯৭৬)। খুনী ফারুক তার সঙ্গীদের নিয়ে ঢাকা পৌছায় ২৩শে এপ্রিল (১৯৭৬)। খুনী ডালিম ঢাকা পৌছায় ২৫শে এপ্রিল (১৯৭৬)। এদিকে একই বিমানে ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তৎকালীন চীফ ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াব। ২৭শে এপ্রিল (১৯৭৬) বগুড়ায় বেঙ্গল ল্যান্সারদের মধ্যে গোলমাল দেখা দেয়। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও

অন্যতম উপপ্রধান সামরিক প্রশাসক মেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান খুনী ফারুককে বগুড়ায় পাঠান সেখানে বেঙ্গল ল্যান্সারদেরকে শান্ত করার জন্যে এবং একই সঙ্গে তিনি আরিচা ফেরীঘাটে পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করেন। ২৭শে এপ্রিল (১৯৭৬) খুনী রশিদ ও ডালিমকে গ্রেফতার করে একটি নির্ধারিত ফ্লাইটে ব্যাংককে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে ঢাকায় ফিরে আসার কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও খুনী ফারুক বগুড়ায় বেঙ্গল ল্যান্সারদের ট্যাংক নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন। তখন কর্নেল হান্নান শাহর নেতৃত্বে ৬ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট ল্যান্সারদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়। সাভারেও একই অবস্থা বিরাজ করে। সেখানে মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড বেঙ্গল ক্যাভালরিকে ঘিরে থাকে। একই সঙ্গে বগুড়ায় ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমর্থনে রংপুর থেকে বগুড়ার পথে মেজর জেনারেল লতিফের নেতৃত্বে ১১ পদাতিক ডিভিশন রওনা হয়। অতঃপর অবস্থা বেগতিক দেখে খুনী ফারুক আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তীতে খুনী ফারুককেও একটি বিমানে ব্যাংককে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

৬। বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীগুলোর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী সদস্যরা এয়ার ভাইস মার্শাল তাওয়াবকে কেন্দ্র করেই সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাওয়াব খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। ঐ সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ সদ্য স্বদেশ প্রত্যাগত খুনী মেজর চক্রটিকে নিয়ে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন গ্রুপ ও মহলের ঘন ঘন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তাঁর আগামসিহ লেনস্থ বাসায়। এই পটভূমিতেই ১৯৭৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. এ. জি. তাওয়াবকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর তাঁকে একটি লন্ডনগামী বিমানে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ সময় লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক সংবাদে বলা হয়, "ঢাকায় সদ্য প্রত্যাগত (খুনী) মেজর চক্রের সহযোগিতায় তাওয়াব ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন।"

৭। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থীদের উপরোল্লিখিত বিপর্যয়ের কয়েক ঘন্টা পরেই তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যোগদান করেন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাওবাদী বামপন্থীদের ১লা মে (১৯৭৬) দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসমাবেশে। উক্ত সমাবেশের ভাষণে জিয়াউর রহমান সাহেব প্রথমবারের মত বঙ্গবন্ধুর সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, তখনকার সামরিক শাসনের পূর্ববর্তী সরকারের আমলে জনগণকে অবাধে ধর্মকর্ম পালন করতে দেয়া হয়নি। এর দু'দিন পরে অর্থাৎ ৩রা মে (১৯৭৬) একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নম্বর

অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।" ৩রা মে (১৯৭৬) তারিখে জারিকৃত উপরোক্ত সংবিধান সংশোধনীর ফলে মুসলিম লীগ, পি. ডি. পি., জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। একই তারিখে সামরিক সরকার বিমান বাহিনী প্রধান এবং উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে জনাব কে. এম. বাশারকে। একই সঙ্গে তাঁকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

৮। সংবিধানের উক্ত বিধানকে সংশোধন করে জারিকৃত প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অধ্যাদেশকে মওলানা ভাসানী স্বাগত জানান। তিনি বলেন, "সুখের বিষয় যে, সরকার দেশের রাজনীতিতে সকল নাগরিকের অংশ গ্রহণের সমান অধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।" তবে তিনি একই সঙ্গে বলেন, "আমি রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনার বিরোধী। ধর্মের অপব্যবহারের জন্য এ অঞ্চলের জনগণ অনেক দুঃখভোগ করেছেন।" উপরোক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়ার পর কট্টর সাম্প্রদায়িক নেতা মাওলানা সিদ্দিক বলেন, "বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফল। সংবিধানের চারটি রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাস করি না"। মুসলিম লীগের খান আব্দুস সবুর খান বলেন, "জাতি ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৭১ সালে বিরাট ভুল করেছে।"

৯। ১৯৭৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন দিল্লীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের তৎকালীন হাই কমিশনার শামসুর রহমান (জনসন) সাহেব প্রথমবারের মত আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সেখানে আমাদের পান্ডারা রোডস্থ ফ্ল্যাটে। উল্লেখ্য, জনাব শামসুর রহমান সাহেবের বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলো ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তিনি বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাও ছিলেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন আইয়ুব খানের সরকার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যে ৩৫ ব্যক্তিকে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে জনাব শামসুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জানা যায় যে, ১৯৬৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারীতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবী ঘোষণা দেওয়ার পেছনে জনাব শামসুর রহমান সাহেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। হাসিনারা জনাব শামসুর রহমানকে 'কাকা' এবং বেগম শামসুর রহমানকে 'চাচী' বলে সম্বোধন করে। যাহোক, শামসুর রহমান সাহেবের সঙ্গে এই সাক্ষাতের সময় রেহানা, হাসিনা ও শামসুর

রহমান সাহেব নিজে ১৯৭৫–এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু, আমর শাশুড়ী, কামাল ও কামালের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী সুলতানা খুকী, জামাল ও জামালের স্ত্রী পারভীন রোজী ও কিশোর রাসেলের মর্মান্তিক হত্যার কথা স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন আমাদের সঙ্গে তাঁর আর কোন বিষয়ে আলাপ হয়নি। এটা ছিলো আমাদের সঙ্গে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১০। ৮ই মে বাংলাদেশের সামরিক সরকার সারা দেশে নয় জন আঞ্চলিক প্রশাসক নিয়োগ করে। ১৬ই মে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঙ্গা নদীতে ভারত কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে উক্ত বাঁধ অভিমুখে মিছিল করার ঘোষণা দেয়া হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের মাদ্রাসা ময়দানে মিছিলকারীরা ফারাক্কা বাঁধে পৌঁছার জন্যে শপথ গ্রহণ করেন। এদিকে ভারত সরকার ফারাক্কা বাঁধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। যাহোক, মিছিলকারীরা তখন ভারতে প্রবেশ করেনি। ১৪ই জুন বাংলাদেশের সামরিক সরকার রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নামে জারিকৃত একটি আদেশে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গঠন করে বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল।

১১। ১৯৭৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ কোলাবোরেটর্স (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি. ও—৮ নম্বর আদেশ) বাতিল করে দেন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বা. স. স.) পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৭৬ সালের বাংলাদেশ কোলাবোরেটর্স (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) বাতিল অধ্যাদেশ নামে অভিহিত এই অধ্যাদেশটিতে বলা হয়েছে যে, উক্ত আদেশটি বাতিল হওয়ায় কোন ট্রাইব্যুনাল, ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত সমীপে ঐ আদেশ বাতিলের অব্যবহিত পূর্বে মূলতবি থাকা সমস্ত বিচারকার্য বা অন্যান্য মামলা এবং উক্ত আদেশ পরিচালিত সমস্ত তদন্তকার্য বা অন্যান্য মামলা বাতিল হয়ে যাবে এবং সেগুলোর (কর্মকাণ্ড) আর চালানো যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত আদেশবলে কোন ট্রাইব্যুনাল, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন দণ্ড বা সাজার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন আপীল ব্যাহত হবে না। প্রেসিডেন্ট সায়েমের উক্ত অধ্যাদেশটিতে আরও বলা হয় যে, উপরোল্লিখিত আদেশ (নং পি. ও—৮, ১৯৭২) বাতিল হওয়ায় মূলতবি থাকা বিচার, তদন্ত ও অন্যান্য মামলা রদ হওয়া ছাড়া ১৮৯৭ সালের সাধারণ উপধারা আইন (১৮৯৭ সালের দমন আইন)–এর ৬ নম্বর ধারার প্রয়োগও ব্যাহত হবে না।

১২। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একদিন বিকেলে জনাব শামসুর রহমান সাহেব তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে পুনরায় আমাদের পান্ডারা রোডস্থ ফ্ল্যাটে আসেন। সেদিন চাচী (বেগম শামসুর রহমান) রেহানা ও হাসিনার কাছে তাঁর সমবেদনা ও সহানুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি ওদের অনেক আদর ও দোয়া করেন। ইতিপূর্বে আমার মা'র নিকট আমাদের গ্রামের বাড়ীর ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠানোর জন্যে আমি

আমার ঢাকাস্থ ব্যাংককে কয়েকবার পত্র লিখেছিলাম। কিন্তু উক্ত ব্যাংক থেকে আমি তখনও কোন উত্তর পাইনি। একথা শোনার পর তখন শামসুর রহমান সাহেব পরবর্তীতে ঢাকায় গেলে আমার মার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর সেদিনকার মত তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। পরবর্তীতে শামসুর রহমান সাহেব আমাকে জানান যে, তিনি বাংলাদেশে আমার মার জন্যে দুই হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। দিল্লীতে আমি উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে চাইলে তিনি তা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানান। আমি আজ পর্যন্ত উক্ত টাকার জন্যে তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী।

১৩। এদিকে ১৯৭৬ সালের ২১শে জুন ঢাকায় বিশেষ সামরিক আদালতে 'সরকার উৎখাত ও সেনাবাহিনীকে বিনাশ করার চেষ্টা চালানোর' অভিযোগে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১৯ জন নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। উক্ত মামলায় আসামী পক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও প্রাজ্ঞ আইনজ্ঞ এডভোকেট আতাউর রহমান খান। ১৭ই জুলাই (১৯৭৬) বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল উক্ত তথাকথিত 'ষড়যন্ত্র মামলার' রায় ঘোষণা করে। উক্ত রায়ে কর্নেল (অবঃ) তাহেরের প্রাণদণ্ড এবং জাসদের মেজর (অবঃ) এম. এ. জলিল, আ. স. ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, জাসদের আদর্শিক গুরু সিরাজুল আলম খান প্রমুখ ব্যক্তিদের যাবজ্জীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জনাব আতাউর রহমান খান সাহেবের মতে, বিশেষ সামরিক আদালতে ঐ রায় পক্ষপাতদুষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ সরকার পক্ষের কৌসুলি ষড়যন্ত্র প্রমাণে যে যুক্তি আদালতে পেশ করেছিল তা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সরকার দাবী করেছিল যে, জাসদের নেতারা একদিন রাতে এর অন্যতম নেতা প্রফেসর আখলাকুর রহমানের বাসায় মিলিত হন। অতঃপর প্রফেসর আখলাকুর রহমান ফোনে ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ব্রিগেডিয়ার ভোরাকে উক্ত বৈঠকে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান। এর কিছুক্ষণ পর ব্রিগেডিয়ার ভোরা প্রফেসর আখলাকুর রহমানের বাসায় অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন। অতঃপর ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে উক্ত তথাকথিত ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে সরকার পক্ষ দাবী করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রফেসর আখলাকুর রহমানের বাসায় তখন কোনও টেলিফোন সংযোগ ছিল না। কাজেই, বিশেষ সামরিক আদালতের উক্ত রায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অতঃপর এ সমস্ত ত্রুটি উল্লেখ করে উচ্চ আদালতে আপীল করা হলেও কোন ফল হয়নি।

১৪। জনাব আতাউর রহমান খান সাহেব তখন কর্নেল তাহেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে রাষ্ট্রপতির 'ক্ষমা' প্রার্থনা করে আবেদন করতে। কিন্তু কর্নেল (অবঃ) তাহের সে প্রস্তাবে রাজি হননি। অবশেষে, কর্নেল তাহেরের পত্নী কর্নেল তাহেরের পক্ষে তৎমর্মে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বিচারপতি সায়েম কর্নেল তাহেরের উক্ত আবেদন নাকচ করে দেন।

অতঃপর ২১শে জুলাই (১৯৭৬)-এর ভোরে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। জনাব আতাউর রহমান খানের মতে উক্ত ফাঁসি প্রদানও আইনসিদ্ধ ছিল না। কারণ একজন পঙ্গু ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া আইনে নিষিদ্ধ এবং কর্নেল (অবঃ) তাহেরের একটি পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ ছিলো না বলে তিনি ছিলেন পংগু ব্যক্তিদের পর্যায়ভুক্ত। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে, (তৎকালীন) সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে কর্নেল (অবঃ) তাহের মুক্ত ও রক্ষা করেছিল ৭ই নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে সংঘটিত মিলিটারী অভ্যুত্থানে সৈন্যদের হাতে তাঁর বন্দীদশা থেকে, অথচ সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে তাঁকেই (কর্নেল তাহেরকে) এমন নিঃসহায় অবস্থায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হলো। কর্নেল (অবঃ) তাহেরের এই ফাঁসির সংবাদে আমি একাধারে হতভম্ব ও মর্মাহত হই দারুণভাবে।

১৫। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচাপতি এ. এস. এম. সায়েম এক আদেশে প্রেসিডেন্টের বিশেষ গার্ড রেজিমেন্ট গঠন করেন ২৪শে জুলাই (১৯৭৬)। ২৮শে জুলাই সামরিক সরকার একটি রাজনৈতিক বিধি জারি করে। ৩০শে জুলাই (১৯৭৬) সামরিক সরকার একটি আদেশে সামরিক শাসন প্রয়োজনানুসারে কিছুটা শিথিল করতঃ ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদান করে। ৪ঠা আগস্ট (১৯৭৬) সামরিক সরকার একটি আদেশে দেশে রাজনৈতিক দল গঠনের বিস্তারিত নীতিমালা ঘোষণা করে। ১৭ই আগস্ট (১৯৭৬) একটি সামরিক আদালত দুর্নীতির দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরীকে দণ্ডিত করে। ২৪শে আগস্ট (১৯৭৬) সামরিক সরকার জাতিসংঘের অধিবেশনে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রশ্ন বিবেচনার জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন পেশ করে। ২৯শে আগস্ট (১৯৭৬) ঢাকায় পি. জি. হাসপাতালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। উল্লেখ্য, ইতিপুর্বে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৬) তারিখে সরকার কবি নজরুল ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছিল। ৩০শে আগস্ট (১৯৭৬) তারিখে কবি নজরুল স্মরণে সাধারণ ছুটি ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

১৬। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) তারিখে এক মর্মান্তিক বিমান মহড়া দুর্ঘটনায় বিমান বাহিনী প্রধান ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল কে. এম. বাশার নিহত হন। একই দুর্ঘটনায় আরও নিহত হন স্কোয়াড্রন লীডার মফিজুল হক। অনেকে এই দুর্ঘটনাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নির্মূল করার পাকিস্তানপন্থী বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) তারিখে এয়ার কমোডর এ. জি. মাহমুদকে নতুন বিমান বাহনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) তারিখে বিমান বাহনী প্রধান এ. জি. মাহমুদকে অন্যতম উপপ্রধান

সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) সামরিক সরকার বাংলাদেশের ১৮টি মহকুমায় সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) সামরিক সরকার দেশের আরও ২৭টি মহকুমায় সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করে।

১৭। ৪ঠা আগস্টে দেশে রাজনৈতিক দল গঠনের নীতিমালা প্রকাশ হওয়ার পর পরই উক্ত নীতিমালা অনুসারে দরখাস্তের রাজনীতির হিড়িক পড়ে যায়। অর্ধ শতাধিক প্রস্তাবিত দল সামরিক সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্যে আবেদন পেশ করে। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) চারটি রাজনৈতিক দল, যথা ন্যাপ (ভাসানী), মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ এবং পিপলস লীগ সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) সরকারী অনুমোদন লাভ করে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ। ৯ই অক্টোবর (১৯৭৬) বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। ১২ই অক্টোবর আরও দুটো রাজনৈতিক দল সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ১৩ই অক্টোবর (১৯৭৬) সামরিক সরকার অনুমোদন প্রদান করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এবং মোঃ তোয়াহার সাম্যবাদী দলকে।

১৮। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) তারিখে প্রথম দলের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচী সরকারের নিকট পেশ করে। এর পর, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ৮ই অক্টোবর (১৯৭৬) তারিখে পুনরায় আওয়ামী লীগের সংশোধিত দলিলপত্র সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু সামরিক সরকার আওয়ামী লীগের এই আবেদন নাকচ করে দেয়। ১৮ই অক্টোবর (১৯৭৬) তারিখের একটি চিঠিতে আইন ও সংসদ মন্ত্রণালয় তৎকালীন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরীকে জানান যে, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলবিধির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত চিঠিতে আরও জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগের দাখিলকৃত দলিলপত্রের বক্তব্য ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির ১০ নম্বর ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উক্ত চিঠিতে আওয়ামী লীগের দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের প্রস্তাবনার এক জায়গায় 'বঙ্গবন্ধু' নামের ব্যবহারকে দলবিধি আইনের পরিপন্থী বলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, "জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির পূজার উদ্রেক করে বা ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম প্রচার অথবা বিকাশে সহায়তা করে এমন বিষয় " নিষিদ্ধ করা হয়েছে ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির ১০ নম্বর ধারায়। উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিতে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর (১৯৭৬) তারিখে ঢাকায় জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর 'স্ট্রাটেজিক কারণে' বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দিয়েই আওয়ামী লীগের দলিলপত্র সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে কাগজপত্র পুনরায় দাখিল করায় সামরিক সরকার ৪ঠা নভেম্বর তারিখে আওয়ামী

লীগকে অনুমোদন প্রদান করে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে প্রফেসর মোজাফফর আহমদের ন্যাপ এবং কমরেড মণি সিং-এর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের অনুমোদন লাভ করেছিল।

১৯। সামরিক সরকারের নির্দেশে ৭ই নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ৯ই নভেম্বর (১৯৭৬) তারিখে বিমান বাহিনী প্রধান ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এ. জি. মাহমুদকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। ১৬ই নভেম্বর সামরিক সরকার ১৯৭৭ সালের জানুয়ারীতে সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষাণা করে। ১৭ই নভেম্বর (১৯৭৬) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (৯৬ বছর বয়সে) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে সামরিক সরকার এক সপ্তাহব্যাপী জাতীয় শোক পালনের ঘোষণা দেয়। ১৮-ই নভেম্বর (১৯৭৬) তারিখে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় টাংগাইলের সন্তোষে মাওলানা ভাসানীর দাফনকার্য সম্পন্ন করা হয়।

২০। এদিকে সামরিক সরকার কর্তৃক দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক শক্তিগুলো সরকার সমর্থক ও সরকার বিরোধী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর এই দুই শিবিরের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। একদিকে, আওয়ামী লীগ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অপরদিকে, সরকারের সমর্থক জনসমর্থনহীন ডানপন্থী, পাকিস্তানপন্থী, ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক এবং মাওবাদী বামপন্থী দলগুলো নির্বাচনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। ২১শে নভেম্বর (১৯৭৬) তারিখে ফেনী টাউন হলে আওয়ামী লীগের এক কর্মী সম্মেলনে ভাষণ প্রদানকালে জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার জনাব আব্দুল মালেক উকিল বলেন, "আমরাই তো সত্যিকারের সরকার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দেশ শাসন করার অপচেষ্টা নিতান্তই বৃথা। জনগণের সরকার পুনরায় কায়েম করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সংঘবদ্ধ হতে হবে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে।"

২১। কিন্তু ঘরোয়া রাজনীতির সীমিত সুযোগটুকু সদ্ব্যবহার করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার আগেই 'নিয়মতান্ত্রিক' রাজনীতির উপর নেমে আসে এক অবাঞ্ছিত আঘাত। ২১শে নভেম্বর (১৯৭৬) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে নিহত হওয়ার পর তখন ক্ষমতা দখলকারী খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশে সাধারণ নির্বাচনের এই ওয়াদা দিয়েছিলেন। ৬ই নভেম্বর (১৯৭৫) তারিখে দেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হওয়ার পর

বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম সর্বপ্রথম যে ভাষণটি দেন, তাতেও তিনি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারীতেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসে ১৯৭৬ সালের ২১শে নভেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম বলেন, "জাতীয় জীবনের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে নির্বাচন জাতীয় সংহতি বিপন্ন করবে বিধায় পূর্বঘোষিত সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হচ্ছে না। এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক নেতার মতে দেশের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জাতীয় নিরাপত্তাকে নির্বাচনের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জনগণও এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন চায় না। ক্রমবর্ধমান সীমান্ত গোলযোগ আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তার ওপরে ফারাক্কা সমস্যা অর্থনীতির ওপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এই মুহূর্তে নির্বাচন জাতীয় ঐক্যের অন্তরায় হতে পারে। বৈদেশিক শক্তির যোগসাজশে মুষ্টিমেয় বিপথগামী যুবক দেশের অভ্যন্তরে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। পরস্পর বিরোধী ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠেছে। অর্ধ শতাধিক রাজনৈতিক দল অনুমোদন প্রার্থী। অনেক নেতা তাঁদের সাবেক দল ছেড়ে নতুন দল পত্তন করছেন। এটা রাজনৈতিক অনৈক্যেরই প্রতিফলন। এই পটভূমিতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তবে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আগামী জানুয়ারীতেই অনুষ্ঠিত হবে। এই সব নির্বাচন স্থানীয় প্রশাসনের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ প্রশস্ত করবে।"

২২। দেশে ঐ সময় সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণাকে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল অভিনন্দন জানালেও এর ফলে আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শিবিরে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার দাবী জানান। এমনকি খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদও দেশে সাধারণ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার সিদ্ধান্তকে 'অপ্রত্যাশিত' বলে আখ্যায়িত করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অবাধ রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দেশে সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ দাবী করা হয়। তৎকালীন সামরিক সরকার এই সব দাবীর জবাব দেয় ২৯শে নভেম্বর (১৯৭৬) তারিখে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। এই দিন জাতীয় সংসদের সাবেক স্পীকার জনাব আব্দুল মালেক উকিল, দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরী, জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব আব্দুল মোমেন তালুকদার, জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিনে গ্রেফতার করা হয় ন্যাপের

(মোজাফফর) বেগম মতিয়া চৌধুরীকে। সামরিক সরকার একই দিনে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং তার সহযোগী জনাব ওবায়েদুর রহমান, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন এবং শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকেও গ্রেফতার করে। এর আগে, ২৬শে নভেম্বর (১৯৭৬) আত্মগোপনকারী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের দার্শনিক গুরু জনাব সিরাজুল আলম খানকে গ্রেফতার করা হয়।

২৩। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আটক ছিলেন আওয়ামী লীগের সর্বজনাব কোরবান আলী, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, এম. মতিয়ার রহমান, এডভোকেট জিল্লুর রহমান, শেখ আব্দুল আজিজ, এম. নূরুল হক, সরদার আমজাদ হোসেন, এম. শামসুজ্জোহা, গাজী গোলাম মোস্তফা, এম. এ. মান্নান, আমির হোসেন আমু, এম. এ. জলিলসহ বিপুলসংখ্যক নেতা ও কর্মী। ঐ সময়ে প্রকাশিত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৭৬ সালের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের কারাগারসমূহে আটক রাজবন্দীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৩০ হাজার। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বিপুল সংখ্যক রাজবন্দীর অধিকাংশই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুসারী এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর লোক। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে ক্রমবর্ধিতহারে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি পাকিস্তানপন্থী দালালদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জেলে ঢোকানো হয়েছে। এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু আমলের বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী এবং প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী ও ডঃ মযহারুল ইসলামের মতো শিক্ষাবিদরাও ছিলেন।

২৪। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম দেশে সাধারণ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণার কাজটি সমাধা করার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যে নেমে আসে এক বিপর্যয়। ২৯শে নভেম্বর (১৯৭৬) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম এক ঘোষণায় 'জাতীয় স্বার্থে' প্রধান সামরিক প্রশাসকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। তখন দেশে যেহেতু সামরিক শাসন বিদ্যমান, সুতরাং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম কার্যতঃ 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত হন। প্রেসিডেন্ট সায়েমের উক্ত পদক্ষেপ প্রসংগে ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭৬) তারিখে লন্ডনে গার্ডিয়ান পত্রিকায় বলা হয়, "প্রশাসন ক্ষেত্রে (প্রেসিডেন্ট) সায়েমের কোন ভূমিকা ছিল না এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শও করা হতো না। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন এবং শাসন-ক্ষমতা থেকে সামরিক বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার জন্য তিনি ঘরোয়াভাবে শলাপরামর্শ শুরু করেছিলেন। এখন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। সায়েমকে অসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে এতদিন রাখা হয়েছিল (মেঃ জেঃ) জিয়ার সামরিক শাসনের চেহারা ঢেকে রাখার জন্য।"

২৫। ৭ই ডিসেম্বর সামরিক সরকার দেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৭৬) সামরিক সরকার সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের সময়সূচী ঘোষণা করে। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৭৬) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় একজন ছাত্র নিহত হয়। এই কারণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৭৬) তারিখে সামরিক সরকার খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের বিরুদ্ধে দুইটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করে।

২৬। জাতীয় সংসদের জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখা হলেও ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসেই সারাদেশে সাড়ে চার সহস্রাধিক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ঘটে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের বিপুল বিজয়। তখন আওয়ামী লীগের অনেক সদস্য উক্ত নির্বাচনে কারাগার থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে একতরফা অপপ্রচারের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে এমন একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল যে, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু দেশে ইউনিয়ন পরিষদের উক্ত নির্বাচনে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা সম্ভব হলেও তাঁর রাজনৈতিক সংগঠনকে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ৬৮ হাজার গ্রাম নিয়ে যে বিস্তীর্ণ গ্রামবাংলা তার গভীরে প্রোথিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভিত্তি।

২৭। ১৯৭৭ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ঢাকার ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করেন মরহুম তাজউদ্দিন আহমদের পত্নী বেগম জোহরা তাজউদ্দিন। শুরুতে, সম্মেলন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বেগম মনসুর আলী এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মোল্লা জালাল উদ্দিন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর সভামঞ্চে রক্ষিত বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব এম. মনসুর আলী ও জনাব এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন সেসময় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অপর যুগ্ম আহবায়ক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। অতঃপর পবিত্র কোরান তেলাওয়াত এবং গীতা ও বাইবেল পাঠ করা হয়। সভার শুরুতে এক শোক প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন, ৩রা নভেম্বরে (১৯৭৫) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত আওয়ামী লীগের চার বিশিষ্ট ও প্রবীণ নেতা এবং ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রায় ১৪ শত কাউন্সিলর এবং ১৪ শত ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনকে উপলক্ষ করেই দীর্ঘ এক বছর সাড়ে সাত মাস পর প্রথম ঢাকার সংবাদপত্রে ছাপানো হয় বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও সহকর্মীর ছবি।

২৮। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বেগম জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, "স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি আমার স্বামী এবং তাঁর তিনজন সহকর্মী আর আজ (বেঁচে) নেই। তাই আওয়ামী লীগের (নেতৃবৃন্দের) কাছে প্রত্যাশা, তাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন এবং (রাষ্ট্রীয়) চারনীতি কায়েম, জনগণের অধিকার ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেশের সামরিক সরকারকে নিজেদের নির্দলীয় প্রমাণ করার আহবান জানান। অতঃপর তিনি আরও বলেন, "নেতা চলে গেলেও কর্মী রেখে গেছেন। যদি কোনদিন দেশে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষেই সেই সরকার গঠন করা সম্ভব।" সভাপতির ভাষণে মোল্লা জালাল উদ্দিন বলেন, "বর্তমান (সামরিক) সরকার নিজেদের নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বলে ঘোষণা করেছেন এবং (দেশে) গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, দেশে নির্বাচন (অনুষ্ঠান) করার মতো পরিবেশ ছিল। কাজেই (সামরিক) সরকারের নিরপেক্ষতা এবং উদ্দেশ্যের সাধুতা প্রমাণ করতে হলে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে হবে।"

২৯। ১৯৭৭ সালের ৩-৪ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের উক্ত কাউন্সিল সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটি মূলনীতিকে সামনে রেখে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ সৃষ্টি, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে অবিলম্বে বাস্তব কর্মসূচী ঘোষণা, রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী ব্যক্ত করেন। উক্ত সম্মেলনে দলের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে দলীয় কর্মকর্তা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বেগম তাজউদ্দিনকে দলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আওয়ামী লীগের আহবায়িকা নিযুক্ত করা হয়। তখন জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ছিলেন উক্ত পদের সবচেয়ে বেশী দাবীদার। কিন্তু প্রবীণ জননেতা শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার, জনাব জহিরুল কাইয়ুম এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের উদ্যোগে কৌশলগত কারণে মরহুম তাজউদ্দিন আহমদের পত্নী বেগম জোহরা তাজউদ্দিন অস্থায়ীভাবে দলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন।

৩০। ২১শে এপ্রিল (১৯৭৭) তারিখে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. এস. এম. সায়েম তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। অতঃপর ২২শে এপ্রিল (১৯৭৭) তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হবে। উপরন্তু, তাঁর ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্যে ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে অনুষ্ঠিত হবে দেশব্যাপী 'গণভোট'। ২২শে এপ্রিল তারিখে সামরিক সরকার একটি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে ১৯৭২ সালে গৃহীত দেশের সংবিধানের কতিপয় সংশোধনীসহ উক্ত সংবিধানে বর্ণিত চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন করে। এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রশ্নে 'গণমনে অসন্তোষ' থাকার দরুনই এটা করা হয়েছে। উক্ত অধ্যাদেশবলে ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানের যে সব সংশোধন (ও পরিবর্তন) করা হয় তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ঃ (১) সংবিধানের শিরোনামের নীচে ''বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম" সংযোজন, (২) সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতে পূর্ববর্ণিত "জাতীয় মুক্তির জন্যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের" কথাগুলোর পরিবর্তে "জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের" কথাগুলো প্রতিস্থাপন, (৩) চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে পূর্ববর্ণিত "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা" কথাগুলোর পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার" কথাগুলো প্রতিস্থাপন এবং (৪) সংবিধানে "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সুসংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন" কথাগুলো উল্লেখপূর্বক একটি উপধারা সংযোজন। ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানের উপরোল্লিখিত সংশোধনীগুলোর মধ্যে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তনে সমাজে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে "ধর্মনিরপক্ষতাকে" বাতিলকরণের বিরুদ্ধে সমাজে উত্থিত হয় তীব্র মতভেদ, আপত্তি ও প্রতিবাদ যা এখনও দৃশ্যমান। উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বার বার বলতেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, (এর অর্থ) মানুষের যে কোন ধর্ম–কর্ম পালন ও আদর্শ চর্চার অবাধ অধিকার এবং মানুষের ধর্মানুভূতি ও মতাদর্শের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাশীলতা।"

৩১। ৩০শে এপ্রিল (১৯৭৭) তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সামরিক সরকার এক সরকারী আদেশে মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রাশেদ চৌধুরী এবং মেজর নূরকে সেনাবাহিনীতে পুনর্বহাল করে। শরিফুল হক ডালিম, রাশেদ চৌধুরী এবং নূর সেনাবাহিনীর নিয়ম–শৃঙ্খলা ও আইন অবমাননা ও ভঙ্গের দায়ে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন ১৯৭৪ সালের জুন মাসে। ঐ সময়ে মেজর শাহরিয়ার নিজেই সেনাবাহিনী ছেড়ে দেন। দীর্ঘ তিন বছর পর ঐ মেজরদের সেনাবাহিনীতে প্রত্যাবর্তন এক নজিরবিহীন ঘটনা। উপরন্তু, তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার খুনী মেজর চক্রের ১৬ জন সদস্য যাঁরা ১৯৭৫–এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও নিকটতর আত্মীয়–

স্বজনদের হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে নিজেরাই স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে লেঃ কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান এবং লেঃ কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ বাদে অন্যান্য সবাইকে বাংলাদেশের বিদেশস্থ বিভিন্ন দূতাবাস ও মিশনে চাকুরী প্রদান করে। ৩০শে মে (১৯৭৭) তারিখে দেশে অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্যে তৎসম্পর্কিত 'হ্যাঁ'-এর গণভোট। সরকারী ভাষ্য ও তথ্য অনুযায়ী উক্ত গণভোটে শতকরা ৮৮.৫ ভোটদাতারা অংশগ্রহণ করেন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের ওপর আস্থাসূচক 'হ্যাঁ ' ভোট পড়ে বলে দাবি করা হয়।

৩২। সশস্ত্র বাহিনীর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দল এবং বঙ্গবন্ধুবিরোধী মহল ও ব্যক্তিদের ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৭) বিমান বাহিনী দিবসে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আর এক পরিকল্পনার খবর পাওয়া যায়। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৭) তারিখে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ডি. সি-৮ বিমান ১৫৬ জন যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে ভারতের বোম্বে বিমান বন্দর ত্যাগ করার পর পরই হাইজ্যাক হয়। পাঁচ সদস্যের এই বিমান ছিনতাইকারীরা ছিলেন জাপানী রেড আর্মীর 'হিদাকা কম্যান্ডো ইউনিটের' সদস্য। ছিনতাইকারীরা উক্ত বিমানটিকে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করায়। অতঃপর তাঁরা যাত্রীদের জিম্মী করে ৬ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ এবং জাপানের কারাগারে বিভিন্ন মেয়াদে আটক তাদের নয় জন সহযোগীর মুক্তি দাবী করে। তখন ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আপোষ রফার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ও অন্যতম উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মর্শাল এ. জি. মাহমুদকে। তিনি ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে অবস্থান নিয়ে ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনায় নিয়োজিত থাকেন। উক্ত আলোচনায় তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সেখানে উপস্থিত থাকেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং আরও দুইজন সিনিয়র সিভিল অফিসার। উক্ত ঘটনার কারণে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের বিমান বাহিনী দিবসের সকল অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। এই কারণে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৭) তারিখে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনাও পরিবর্তন করা হয়।

৩৩। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৭) তারিখে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহীরা। তারা দুইজন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং ৯৩ ব্রিগেড কমান্ডারসহ আরও কয়েকজন অফিসারকে বন্দী করে রাখে। অতঃপর তারা ১৯৭৬ সালের সিপাহী বিদ্রোহে সাজাপ্রাপ্ত ১৭ জন সৈনিককে জেলখানা থেকে মুক্ত করে আনে। এদিকে ঢাকাস্থ আর্মি ফিল্ড সিগন্যাল ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা সিগন্যালম্যান শেখ

আব্দুল লতীফের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিগন্যাল সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেয় বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের কুর্মিটোলা এয়ার বেইসের সিপাহীরা। প্রায় ৭০০ সৈনিক এই অভিযানে যোগ দেয়। তারা সিপাহী বিপ্লবের ঘোষণা দিয়ে অফিসারদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। ভোর পাঁচটায় সাতটি ট্রাক ভর্তি সিপাহী ঢাকা রেডিও ষ্টেশন দখল করে। অতঃপর তারা রেডিওতে সিপাহী বিপ্লবের ঘোষণা দেয় এবং একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়েছে বলে দাবী করে। এয়ারফোর্সের সার্জেন্ট আফজাল নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা দেয় এবং নিজেকে বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রধান বলে দাবী করে। এর অল্পসময়ের মধ্যে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অফিসার নিধন শুরু হয়। বিমান বন্দরের হ্যাংগারের বাইরে প্রথমেই বিমান বাহিনীর দুইজন পাইলটকে হত্যা করা হয়। কয়েকশত সিপাহী এয়ারপোর্ট বিল্ডিং দখল করে নেয় এবং সেখানে নয় জন অফিসারকে হত্যা করে। দৈবক্রমে বিমান বাহিনী প্রধান এ. জি. মাহমুদ বেঁচে যান। জানা যায় যে, তখন তিনি লুংগি ও শার্ট পরে সেখানে আত্মগোপন করেছিলেন। অপরদিকে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অনুগত ও সমর্থকরা পাল্টা অভিযান চালায়। সকাল সাতটার দিকে মেজর মোস্তফার নেতৃত্বে এক কোম্পানী সৈনিক আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহীদের ২০ জনকে হত্যা করে এবং অপর ৬০ জনকে গ্রেফতার করে। ২৯ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য একটি দল রেডিও ষ্টেশন পুনর্দখল করে। এই রেজিমেন্টের সৈন্যরা ঢাকার ফার্মগেটের কাছে প্রায় ২০০ বিদ্রোহীকে পরাজিত করে এবং তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। দিনের মধ্যভাগে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঢাকা রেডিও ষ্টেশনে যান এবং রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, "সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সৈনিক সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেয়েছিল। তাদের দমন করা হয়েছে।"

৩৪। উপরোল্লিখিত ঘটনার পর সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সশস্ত্র বাহিনীগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের দমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি তৎকালীন ডিফেন্স ফোর্সেস ইনটেলিজেন্সের প্রধান এয়ার কমোডোর ইসলামকে বরখাস্ত করেন। তিনি এই বিদ্রোহে এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ জড়িত ছিলেন বলে সন্দেহ করেছিলেন। কিন্তু এতদব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে গঠিত তদন্ত কমিশন বিমান বাহিনী প্রধানের উক্ত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজে পায়নি। তাসত্ত্বেও, ১৯৭৭ সালের ৮ই ডিসেম্বরে তৎকালীন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। একই তারিখে এয়ার কমোডোর সদরুদ্দিনকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর যে সকল সৈনিক উক্ত বিদ্রোহে জড়িত ছিল বলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সন্দেহ করেছিলেন তাদের অনেককেই চরম শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এক

সরকারী হিসেব অনুযায়ী সে সময় ১১৪৩ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল এবং আরও কয়েকশত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছিল বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ড।

৩৫। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রেহানা লন্ডন থেকে দিল্লী আসে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্যে। ইতিপূর্বে রেহানা ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মুমিনুল হক খোকা কাকার নিকট চলে যায়। ২৪শে জুলাই (১৯৭৭) তারিখে সেখানে ঢাকার আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে শফিক সিদ্দিকের সঙ্গে রেহানার বিবাহ হয়। শফিক সিদ্দিক তখন লন্ডনে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের কারোরই তখন ভারত থেকে লন্ডনে গিয়ে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। অতঃপর হাসিনা ও আমি আগস্ট (১৯৭৭)-এর শেষের দিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তাঁর ১ নম্বর সফদরজংগ রোডস্থ বাসভবনে। শ্রী মোরারজী দেশাইয়ের অনুমতিক্রমে তখন রেহানাকে কিছুদিনের জন্যে লন্ডন থেকে দিল্লীতে আমাদের কাছে আনার বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য, যখন রেহানা হাসিনার সঙ্গে (১৯৭৫-এর ৩০শে জুলাই) পশ্চিম জার্মানী যায়, তখন সে ছিলো উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষার পরীক্ষার্থী। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক ঘটনার কারণে রেহানা উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। অতঃপর ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে রেহানার জন্যে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি নিকেতনে ভর্তি হওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। এমন কি এতদুদ্দেশ্যে রেহানার জন্যে কিছু কিছু কেনাকাটাও করা হয়েছিলো। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিরাপত্তার কারণে তখন রেহানার শান্তি নিকেতন যাওয়া বাতিল করা হয়। এর ফলে, রেহানা ওর ভবিষ্যৎ, বিশেষ করে, লেখাপড়ার চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৭৬-এর ডিসেম্বর মাসে রেহানা লন্ডনে গিয়ে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩৬। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭৭) রাতে জাতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তি, মহল ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক 'ফ্রন্ট' গঠনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। অতঃপর তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের মতো জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দল (জাগদল) গঠন করেন। জেনারেল আইয়ুব খান তখন যেমন নিজে তাঁর দলের প্রধান না হয়ে দলপতি করেছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে, তেমনিভাবে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজে 'জাগদলের' আহ্বায়ক না হয়ে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন তাঁরই ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে। অতঃপর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পক্ষে 'জাগদলকে' সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯শে ডিসেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান দুই দিনের সফরে দিল্লী যান। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিন বিকেলে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ২২শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) জিয়াউর রহমান সাহেব দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তান যান। ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

৩৭। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের ৩ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় আহবান করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (BAL)-এর দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু নিহত (assassinated) হওয়ার পর এটাই ছিল, বি. এ. এলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রথম দ্বিবার্ষিক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। বি. এ. এলের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। একমাত্র এই দলেরই রয়েছে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সংগঠন, পাড়ায় পাড়ায় নিষ্ঠাবান কর্মী এবং বলতে গেলে ঘরে ঘরে সমর্থক। বি. এ. এলের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনের দলীয় নীতির পুনঃঘোষণা প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়, "সামরিক শাসন বা যে কোন রকম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষের প্রশ্নই ওঠে না। বি. এ. এল অবিচল থাকবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, অটল থাকবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে জাতির জনকের নির্দেশিত পথে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।" বি. এ. এলের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান এবং বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতাদের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী ঘোষণা করা হয়। বি. এ. এলের উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে দেশে সাধারণ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণারও দাবী জানানো হয়। তিন দিনব্যাপী উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে পরবর্তী দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হয়। জনাব আব্দুল মালেক উকিল দলের সভাপতি এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৩৮। বি. এ. এলের ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন থেকে ফিরে গিয়ে নেতারা স্ব স্ব এলাকার কর্মীদের নিয়ে নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাংগঠনিক তৎপরতায়। পূর্ব প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতির পাশাপাশি চলতে থাকে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার নীরব প্রস্তুতি। উল্লেখ্য,

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে (১৯৭৭-এর জানুয়ারীতে) অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং তৎপরবর্তীতে অনুষ্ঠিত পৌরসভার নির্বাচনে বি. এ. এলের সমর্থকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ এটাই সুস্পষ্ট করে তুলেছিল যে, ঘাতকের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (গোপালগঞ্জের) টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত হলেও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি জীবন্ত, দীপ্তিমান। একই সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, দেশে সংসদীয় পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বি. এ. এলই জয়লাভ করবে। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে বি. এ. এল শিবিরে যখন ক্রমবর্ধমান কর্মচাঞ্চল্য, বিরোধী শিবিরে যখন আতংক এবং সারাদেশের জনগণ যখন পূর্বপ্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের নিকট সামরিক সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ, ঠিক সেই সময় মার্চ মাসের শেষের দিকে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আকস্মিকভাবে সকলকে হতচকিত করে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, জুন (১৯৭৮)-এর প্রথম সপ্তাহেই প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে দেশের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩৯। ৫ই এপ্রিল (১৯৭৮) তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে প্রণীত বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন সংশোধনপূর্বক একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এর ফলে, বিদেশে, বিশেষ করে পাকিস্তানে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ও স্বাধীনতা নস্যাৎ করার কাজ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্বের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাদের পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ও পথ সুগম হয়। ৯ই এপ্রিল (১৯৭৮) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রী দলে (জাগদলে) যোগদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৮ই এপ্রিল (১৯৭৮) তারিখে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। ২১শে এপ্রিল জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ৩রা জুন (১৯৭৮) দেশে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করে। ২২শে এপ্রিল (১৯৭৮) জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার ১লা মে (১৯৭৮) তারিখ থেকে দেশে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। ২৮শে এপ্রিল (১৯৭৮) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেবের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার পূর্বজারিকৃত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স সংশোধনপূর্বক একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই সংশোধনীতে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেবলমাত্র সেনাবাহিনী প্রধান রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়াসহ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। ১লা মে (১৯৭৮) তারিখে জাগদল,

ভাসানী ন্যাপের মশিউর রহমান গ্রুপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর–হালিম গ্রুপ, মুসলিম লীগ, জাগমুই এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টির সমন্বয়ে একটি ছয়–দলীয় 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন করা হয় এবং তৎকালীন সরকারী চাকুরীরত সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উক্ত ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

৪০। ১৯৭৮ সালে দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণার দিন এবং নির্বাচনের দিনটির মধ্যে ব্যবধান ছিলো মাত্র মাস দুয়েকের। গৌরী সেনের অঢেল টাকার অধিকারী ক্ষমতাসীন দল ছাড়া অন্য কোন দলের পক্ষেই এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশব্যাপী জনসংযোগ স্থাপন করে প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেওয়া ছিলো দুঃসাধ্য ব্যাপার। উপরন্তু, বি. এ. এলের দাবী ছিলো সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা। তবুও, "কোন কিছুতেই বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না" বলে ঘোষণা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বি. এ. এল, ন্যাপ (মোজাফফর), সি. পি. বি., জনতা পার্টি, পিপলস লীগ এবং গণআজাদী লীগ নিয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের' পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে মনোনীত করা হয় ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর প্রধান ও পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম সদস্য জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানীকে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের আমলে, ওসমানীর ভূমিকা ছিল বিতর্কিত, যে কারণে তাঁর মনোনয়নও সর্বজন সমর্থিত ছিল না। তবুও তাঁকে মনোনীত করা হয় কতকগুলো কৌশলগত কারণে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের প্রধান নির্বাচনী শ্লোগান ছিল দেশে সামরিক শাসনের অবসান, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

৪১। ২রা মে (১৯৭৮) তারিখে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানীর এবং জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তৎকালীন সরকারী চাকুরীরত সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের মনোনয়ন পেশ করা হয়। এই দুই জন ছাড়াও, আরও ৯ জন নির্দলীয় ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থিতার আবেদন জানিয়ে মনোনয়ন পেশ করেন। উল্লিখিত মনোনয়ন বাছাইয়ের পর নির্বাচিত কমিশন জেনারেল (অবঃ) ওসমানী ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানসহ সর্বমোট ১০ জনের মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করে। এই ১০ জন বৈধ প্রার্থীর সকলেই ৩রা জুন (১৯৭৮)–এর রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

৪২। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন তারিখে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতি দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়। একদিকে ১৯৭১–এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিবাহিনীর প্রধান জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী আর অপরদিকে তাঁরই

তৎকালীন অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। জেনারেল (অবঃ) ওসমানীর সমর্থন ও শক্তির উৎস ছিল মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ও মহল। অপরদিকে, তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সমর্থন ও শক্তির উৎস ছিলো, মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ, মুসলিম লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মহল এবং পিকিং (বর্তমানে বেইজিং)-পন্থী শিবির ও বিভিন্ন মহল। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের মূল নির্বাচনী শ্লোগান ছিলো রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার কায়েম এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করা। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট জোর গলায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের কথা বললেও এর অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল।

৪৩। নির্বাচনের কিছুদিন আগেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জিয়াউর রহমান সাহেব নির্বাচনে জিতবেনই। গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের ভাষায় নির্বাচনের সময় ভয়ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন ও চাপ সৃষ্টি এবং সরকারী প্রভাব, ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহারের মাধ্যমে এই বিজয় সুনিশ্চিত করে তোলা হয়। ৩রা জুন (১৯৭৮) তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পান শতকরা ৭৬.৭ ভাগ ভোট এবং জেনারেল (অবঃ) ওসমানী পান শতকরা ২১.৭ ভাগ ভোট। ৪ঠা জুন (১৯৭৮)-এর সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল (অবঃ) ওসমানী উক্ত নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন, সরকারী প্রভাব, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহার এবং কারচুপি করার অভিযোগ করেন। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বার্থেই তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নেন এবং পরে টেলিফোনে জিয়াউর রহমান সাহেবকে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান।

৪৪। ২৯শে জুন (১৯৭৮) সেনাবাহিনী প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ২৮ জন মন্ত্রী ও ২ জন প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে তাঁর মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ১৪ই জুলাই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশের ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৯ই আগস্ট (১৯৭৮) তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে একটি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বাজাদল-BNP) গঠন করে তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট

জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার 'মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্র' শীর্ষক পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৪৫। এদিকে শ্রী মোরারজী দেশাই ১৯৭৭-এর গোড়াতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের ওপর নানানভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে আমরা ভারত ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। ১৯৭৮ সালের গোড়া থেকে এই চাপ ও হয়রানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে আমাদের দিল্লীর পান্ডারা রোডস্থ ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিসিটি ও পানির বিল পরিশোধ করা বন্ধ করে দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে, আমার অফিসে যাতায়াতে অফিসের গাড়ী ব্যবহারের সুবিধাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অতঃপর সাধারণ পরিবহনে আমি অফিসে যাতায়াতে ব্যবহার করতে বাধ্য হই। ইতিপূর্বে সুদীর্ঘ নয় মাস অপেক্ষা করার পর ১৯৭৬-এর ২৭শে মে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) আমার তৎকালীন পশ্চিম জার্মানীর ফেলোশীপ বাতিল করে। উল্লেখ্য, ভারত ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালেই আমি দীর্ঘমেয়াদী চাকুরীর জন্যে আবেদন জানিয়ে প্রথমে চিঠি লিখি ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার পি. এইচ. ডি-এর সুপারভাইজার প্রফেসর ই. জে. স্কয়ার্সের কাছে এবং পরবর্তীতে (তৎকালীন) পশ্চিম জার্মানীর বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৭৬) তারিখে আমি চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করি তৎকালীন ইরানের আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট। অতঃপর ১৯৭৮-এর ৭ই জুনে আমি চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত করি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আর. জে. ইলিয়টের কাছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, তাঁদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে চাকুরী প্রদানে তাদের অপারগতা ব্যক্ত করেন।

৪৬। পূর্ব অনুসৃত নিয়ম-রীতি অনুসারে ১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে গোড়াতেই আমার ভারতের পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশীপ ১লা অক্টোবর থেকে আর এক বছরের জন্যে নবায়ন করার আবেদন জানিযে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ব্যক্তিগতভাবে পেশ করি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদ বিভাগীয় সচিব এন. কে. মুখার্জী (আই. সি. এস)-এর কাছে। পরবর্তীতে, আমার নিকট হতে আরও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চাওয়া হলে আমি সেগুলোও যথাসময়ে তাঁকে প্রদান করি। এরপর তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমার ফেলোশীপ নবায়িত না হওয়ায় এবং অর্থ সংকটের কারণে নভেম্বর (১৯৭৮)-এর মাঝামাঝি একদিন আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাইয়ের অফিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেদিন তাঁর সঙ্গে বেশ দীর্ঘ বিতর্ক হয়। যাহোক, এর দিন সাতেক পর আমার ভারতীয় ফেলোশীপ ১লা অক্টোবর (১৯৭৮) থেকে আর এক বছরের জন্যে নবায়িত করা হয়েছে বলে তৎমর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অফিস স্মারক পাই।

৪৭। এদিকে বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশন ৩০শে নভেম্বর (১৯৭৮) তারিখের এক ঘোষণায় ১৯৭৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ নির্ধারণ করে দেশে জাতীয় সংসদের

সাধারণ নির্বাচনের জন্যে। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) তারিখে প্রধান সামরিক প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এক ফরমান জারি করে দেশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। এর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে প্রবর্তিত এক দলীয় সরকার ব্যবস্থা রহিত করা হলেও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিকে শুধু বহালই রাখা হয়নি বরং রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে স্বৈরশাসকে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৭৮) নির্বাচন কমিশন পূর্ব ঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৭৯-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্যে পুনঃনির্ধারণ করে। সবশেষে, ৫ই জানুয়ারী (১৯৭৯) বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশন ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখ দেশের জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে। ১৫ই জানুয়ারী (১৯৭৯) তারিখে বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশন ৩০টি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ করে। ১৬ই জানুয়ারী (১৯৭৯) তারিখে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে বলা হয় যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ২,৩৪৮ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন।

৪৮। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বাজাদল-বি. এন. পি.) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতোই জোর-জবরদস্তি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, সরকারী প্রভাব, ক্ষমতা ও অর্থ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের 'উপঢৌকন' হিসেবে 'মিত্রতুল্য' বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের আপোষে বেশ কয়েকটি সংসদের আসন ছেড়ে দেন জিয়াউর রহমান সাহেব। উক্ত নির্বাচনে মূল লড়াই হয় নিপীড়ন ও আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বাজাদল-বি. এন. পি.) -এর মধ্যে। মাত্র কিছু সংখ্যক আসন বাদে সবগুলোতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ভোটে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) জয়লাভ করে মাত্র ৩৯টি আসন। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বাজাদল-বি. এন. পি.) একাই জয়লাভ করে ৩০০টি আসনের ২০৭টি আসন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব আব্দুল মালেক উকিলের ভাষায় "গোটা পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একটি পূর্ব পরিকল্পিত নীলনক্সা অনুসারে। কোন্ দলকে কয়টি আসনে জয়লাভ করতে দেওয়া হবে, কোন্ কোন্ বিশিষ্ট প্রার্থীকে যে কোন ভাবে হোক হারিয়ে দিতে হবে, তাও আগে থেকেই ঠিক কের রাখা হয়।" উল্লেখ্য যে, তখনও সারাদেশে সামরিক আইন বহাল ছিল এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন একাধারে সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি।

৪৯। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৯) তারিখে তৎকালীন বি. এন. পি.-এর সরকার ঢাকার শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সচিবালয় নির্মাণ কর্মসূচী অনুমোদন করে। ৯ই মার্চ (১৯৭৯) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেবের মন্ত্রী পরিষদের সিনিয়র মন্ত্রী মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অতঃপর সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ১১ই মার্চ (১৯৭৯) তারিখে তাঁর অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। ১২ই মার্চ তারিখে মশিউর রহমান (যাদু মিয়া) ইন্তেকাল করেন। ৩১শে মার্চ (১৯৭৯) মীর্জা গোলাম হাফিজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হন। একই দিনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের দালালী করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং পাকিস্তানপন্থী শাহ্ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন।

৫০। ৫ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী বিল। ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে উক্ত সংশোধনী বলবৎ হয়। সংবিধানের (পঞ্চম সংশোধন) আইন (১৯৭৯ সালের ১ নং আইন)-এ বলা হয় ঃ "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানে যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা এবং অনুরূপ কোন ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতাবলে অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, আদেশকৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কর্মধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐ সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"

৫১। ৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) সারাদেশ হতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইস্যু করা হয় কয়েকটি অস্বাভাবিক সরকারী গেজেট নোটিফিকেশন। ১৯৭৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭/৮/১৭৫-১৬০ অনুযায়ী তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান নিজেকে মেজর জেনারেলের পদ হতে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। ১৯৭৯ সালের

৯ই এপ্রিল তারিখের গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭/৮/১৭৫/২৭০ অনুযায়ী পূর্ব-ইস্যুকৃত নোটিফিকেশন বাতিল করতঃ জিয়াউর রহমান সাহেব পুনরায় নতুনভাবে নিজেকে মেজর জেনারেলের পদ হতে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করেন, যা ১৯৭৮ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। সর্বশেষে, ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের অন্য একটি গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭/৮/১৭৫-২৭০ অনুযায়ী জিয়াউর রহমান সাহেব লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যা ১৯৭৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। এসব কার্যকলাপের কোন সুস্পষ্ট কারণ জানা না গেলেও এটা সুস্পষ্ট যে, জিয়াউর রহমান সাহেব ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক অফিসার অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। 'ব্যাক ডেটে' নিজের পদোন্নতি এবং অবসর গ্রহণ ঘোষণা করে জিয়াউর রহমান সাহেব এটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে 'ব্যাক ডেটে' নিজের যোগ্যতা নির্ধারণ করা শুধু নৈতিকতা বিরোধীই নয়, বেআইনীও বটে। কাজেই তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন তারিখে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচিত ঘোষণা করা সাংবিধানিকভাবে বৈধ ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কি-না, সে সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

৫২। ১৯৭৯ সালের ১৫ই এপ্রিলের দিনটি ছিল বাংলা নববর্ষ। ঐদিনে জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর একটি ৪২ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ১৬ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই দুই দিনের সফরে ঢাকা আসেন। ১৭ই এপ্রিল (১৯৭৯) তারিখে জিয়াউর রহমান এবং মোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় শীর্ষ বৈঠক। ঐ দিনেই শ্রী মোরারজী দেশাই দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ৪ঠা নভেম্বর (১৯৭৯) তারিখে কমোডর মাহবুব আলী খান নতুন নৌবাহিনী চীফ নিযুক্ত হন। ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৭৯) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল) নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন ইন্তেকাল করেন।

৫৩। ১৯৮০ সালের শুরুতেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন। ৮ই জানুয়ারী (১৯৮০) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেব নির্বাচনে সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। ২১শে জানুয়ারী জিয়াউর রহমান সাহেব এক দুইদিনব্যাপী ইউনিডোর সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে দিল্লী যান। ২২শে জানুয়ারী (১৯৮০) তারিখে তিনি ইউনিডোর সম্মেলনে ভাষণ দেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮০) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেবের সরকার বাংলাদেশে ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা চাকুরীজীবীদের দুই বছরের সিনিয়ারিটি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

৫৪। ১৯৮০ সালের জুন মাসে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার ও নিকটতর আত্মীয়-স্বজনের সদস্যদের হত্যাকারী খুনী মেজর চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী ও পাকস্তানপন্থী সশস্ত্র বাহিনীর কিছু সদস্য এবং পাকিস্তানের দালাল-দোসর রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিদের সহায়তায় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রয়াস চালান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের মে মাসে তখন তুরস্কের বাংলাদেশ দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োজিত খুনী লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যান। তখন ইসলামাবাদের বাংলাদেশ দূতাবাসে সেকেন্ড সেক্রেটারী ছিলেন খুনী মেজর বজলুল হুদা। লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশার পত্নী হলেন মেজর বজলুল হুদার আপন বোন। যাহোক, পরে তারা তখন পিকিং (বর্তমানে বেইজিং)-এর বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত খুনী মেজর ডালিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খুনী মেজর ডালিম অতঃপর স্বল্প সময়ের জন্য ইরানের তেহরানে যান এবং তখন সেখানের বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত খুনী মেজর নূরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তারা অনেক পরিকল্পনার পর তখন বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত আর্টিলারীর অফিসার দিদারুল আলম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লেঃ কর্নেল নূরুন্নবী খানকে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। অতঃপর উপরোক্ত খুনী মেজর চক্রটি ১৯৭৯ সালের ২৬-২৯শে ডিসেম্বরে মিলিত হয় তুরস্কের আংকারাতে। লিবিয়া থেকে খুনী লেঃ কর্নেল রশীদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশের জেলে বন্দী থাকায় খুনী লেঃ কর্নেল ফারুক উক্ত বৈঠকে যোগদান করতে পারেননি।

৫৫। এর পাঁচ মাস পর উক্ত খুনী চক্রটি পুনরায় আর একটি বৈঠকে মিলিত হয়। ইতিপূর্বে জিয়াউর রহমানের সরকার খুনী লেঃ কর্নেল ফারুককে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে লিবিয়ায় ফেরত পাঠানোর ফলে তিনিও উক্ত বৈঠকে যোগদান করতে পেরেছিলেন। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একটি সিপাহী বিদ্রোহ ঘটানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার। এরপর ১৯৮০ সালের ১৭ই জুনে বাংলাদেশে কতিপয় সিপাহীরা ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সশস্ত্রবাহিনীর সংশ্লিষ্ট অফিসাররা এতে রাজি না হওয়ায় সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে দিদারুল আলম প্রথমে ভারতের কোন এক এলাকায় আত্মগোপন করেন। পরে ১১ই নভেম্বর (১৯৮০) বাংলাদেশে ফেরার প্রাক্কালে কুষ্টিয়ার এ্যাম্বাসেডর হোটেল থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একই সময়ে লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশাকে আংকারা থেকে ঢাকাতে ডেকে পাঠানো হয়। ১৮ই নভেম্বর (১৯৮০) তারিখে ঢাকায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে, সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় সশস্ত্র বাহিনীর আরও কতিপয় সদস্যকে। শেষমেষ , সর্বমোট পাঁচজনকে সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এরা ছিলেন, লেঃ কর্নেল দিদারুল আলম, লেঃ কর্নেল

নূরুন্নবী খান, তখন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রশিক্ষণরত অফিসার মোশাররফ হোসেন, লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশা এবং মেজর কাজী নূর হোসেন। তখন সরকার পক্ষের কৌসুলী অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু বিচার শেষে দিদারুল আলমকে ১০ বছরের, মোশাররফ হোসেনকে দুই বছরের এবং নূরুন্নবী খানকে ১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিচার শেষে , লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশা ও মেজর কাজী নূর হোসেনকে তাঁদের পূর্বের স্ব স্ব কর্মস্থল যথাক্রমে বাংলাদেশের আংকারাস্থ ও তেহরানস্থ দূতাবাসে ফেরত পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় লেঃ কর্নেল আনোয়ার আজিজ পাশা এবং মেজর কাজী নূর হোসেন তাঁদের সমস্ত দোষ স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন।

৫৬। এদিকে হাসিনা শিশু জয় ও পুতলীকে সঙ্গে নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল (১৯৮০) তারিখে দিল্লী থেকে লন্ডন চলে যায় রেহানার কাছে। তখন রেহানা সন্তানসম্ভাবা ছিল। অতঃপর ২১শে মে (১৯৮০) তারিখে সিজেয়্যারিয়্যান অস্ত্রোপচারে রেহানার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় 'ববি'। ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৮০) তারিখে জিয়াউর রহমান সাহেব আঞ্চলিক কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দিল্লী যান। ১২ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশের খুলনার কারাগারে কয়েদীরা ডেপুটি জেলারসহ ২৪ জন ব্যক্তিকে জিম্মি হিসেবে আটক করে। ২১শে অক্টোবর (১৯৮০) তারিখে পুলিশ বাহিনীর একটি অভিযান চালানো হয় খুলনা কারাগারে উপরোক্ত জিম্মিদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। উক্ত সশস্ত্র অভিযানে ২৪ জন জিম্মিকে উদ্ধার করা হয় ৩৫ জন কয়েদীকে হত্যা ও আরও অনেককে আহত করে। ২৬শে অক্টোবর (১৯৮০) তারিখে সুদীর্ঘ সাড়ে ছয় মাস লন্ডনে রেহানার সঙ্গে কাটিয়ে হাসিনা শিশু জয় ও পুতলীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরে আসে।

৫৭। উল্লেখ্য, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং জনাব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ তাঁদের স্ব স্ব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কোলকাতায় নিয়ে আসেন ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝিতে। শেখ সেলিমের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন তাঁর আম্মা (বঙ্গবন্ধুর বড় বোন), স্ত্রী, এক শিশু কন্যা এবং নাবালিকা ছোট বোন রেখা। জনাব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ-এর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন তাঁর আম্মা (বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন), স্ত্রী, একটি কিশোরী কন্যা (কান্তা), একটি শিশু ছেলে, দুই বোন (তাদের মধ্যে খুনী মেজরদের ব্রাশফায়ারে মারাত্মকভাবে আহত যুবতী বিউটি ও বুলেট বিদ্ধ কিশোরী রিনা) এবং ছোট ভাই। ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে এঁদের সকলে দিল্লী চলে আসেন আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্যে। ১৩ই আগষ্ট (১৯৭৬) তারিখে আমরা সবাই মিলে আজমীর শরীফ যাই সেখানে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর মাজার জিয়ারত এবং ১৯৭১-এর ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও নিহত আত্মীয় স্বজনের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনায় মিলাদ মাহফিল ও কাঙ্গালী ভোজ অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে। অতঃপর সেখান থেকে

দিল্লী ফিরে আসি ১৭ই আগস্টে। এ সময় ফুফু আম্মারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দিল্লীতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় মাস দুয়েক। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবছর ফুফু আম্মারা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে আগস্ট মাসে দিল্লীতে আমাদের কাছে আসতেন একই উদ্দেশ্যে এবং ঐ সুবাদে মাসাধিককাল ধরে আমাদের দিল্লীস্থ পান্ডারা রোডের ফ্ল্যাটে থাকতেন। ১৯৭৮-এর মাঝামাঝি চাচী (বেগম শেখ নাসের) তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লী আসেন আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে। এর ফলে হাসিনা ও আমাদের ছেলেমেয়েরা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গ পাবার সুযোগ পায়।

৫৮। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ এই দু'বছরে কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা দিল্লী আসেন আমাদের খোঁজখবর ও কুশলাদি জানার জন্যে। ১৯৭৯ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্যে কোলকাতা থেকে দিল্লীতে প্রথম আসেন হাসিনার সম্পর্কে ভগ্নীপতি ডাঃ শেখ আব্দুল মালেক। ডাঃ এস. এ. মালেক পেশায় একজন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ মেডিক্যাল ডাক্তার। ১৯৭৩ সালে তিনি রাজবাড়ী থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ডাঃ মালেক তখন মাসখানেক কাটিয়ে কোলকাতায় ফিরে যান। এর কয়েক মাস পর ডাঃ এস. এ. মালেক বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৯ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক তখন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে যাওয়ার পথে দিল্লীতে যাত্রাবিরতি করেছিলেন আমাদের খোঁজখবর ও কুশলাদি জানার জন্যে। অতঃপর কাবুল থেকে ফেরার পথেও তিনি দিল্লীতে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর কয়েক মাস পর আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা এডভোকেট জিল্লুর রহমান তার পত্নী বেগম আইভি রহমানকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী আসেন আমাদের খোঁজখবর ও কুশলাদি জানার জন্যে। ঢাকা থেকে ডাঃ এস. এ. মালেক প্রথমবার দিল্লীতে আমাদের কাছে আসেন ১৯৮০-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে কাটানোর পর তিনি ঢাকা ফিরে যান ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮০)। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ দিল্লীতে আসেন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও কুশলাদি জানার জন্যে। তাঁর ঢাকা ফেরার পর আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব এম. কোরবান আলী দিল্লী আসেন আমাদের কুশলাদি জানার জন্যে। ডাঃ এস. এ. মালেক ঢাকা থেকে পুনরায় দিল্লীতে আমাদের কাছে আসেন ১৯৮০-এর ২৭শে অক্টোবরে। ২০শে নভেম্বর (১৯৮০) তারিখে তিনি ঢাকায় ফিরে যান। তৎকালীন যুবলীগ নেতা আমির হোসন আমু দিল্লীতে আমাদের কাছে আসেন ১৯৮০-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝির দিকে। প্রায় সপ্তাহখানেক আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান। তৎকালীন আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী দিল্লীতে আমাদের কাছে আসেন ১৯৮১ সালের ১৬ই জানুয়ারীতে। তিনি আমাদের জন্যে সঙ্গে এনেছিলেন

(ভাজা) কইমাছ যা দিল্লীতে পাওয়া যায় না। হাসিনা তাঁকে ফুফু বলে সম্বোধন করে। বেগম সাজেদা চৌধুরী ঢাকায় ফিরে যান ২৬শে জানুয়ারী (১৯৮১) তারিখে।

৫৯। আওয়ামী লীগের উপরোল্লিখিত নেতৃবৃন্দের দিল্লীতে আমাদের কাছে আসার অন্যতম কারণ ছিল ঢাকায় ১৯৮১ সালের ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের ব্যাপারে হাসিনার সঙ্গে মতবিনিময় করা। এদের সবাই এবং হাসিনার চাচী (বেগম নাসের), ফুফু আম্মারা এবং ফুফাতো ভাইয়েরা চাচ্ছিলেন যেন হাসিনা আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়। আমি এ প্রস্তাবে কখনই সম্মত ছিলাম না। আমি তাঁদের সকলকেই বলেছিলাম যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অকল্পনীয় মর্মান্তিক ঘটনার পর বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়-স্বজনদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)-এর নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিৎ হবে না অন্ততঃ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত। তাছাড়া কোন সিদ্ধান্ত দলের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাও অগণতান্ত্রিক। সুতরাং, আরও কয়েক বছর বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়-স্বজনদের রাজনীতি থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় হবে। অতঃপর সাব্যস্ত হয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠনে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে বি. এ. এলের তৎকালীন গঠনতন্ত্র কিছুটা সংশোধন করে ১০-১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম গঠন করা হবে। দলীয় প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে উক্ত প্রেসিডিয়ামের যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সদস্য সচিব হবেন। উক্ত প্রেসিডিয়ামের দায়িত্ব হবে জরুরী ইস্যু ও বিষয়াদি সম্পর্কে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংবিধানিক এবং অন্যান্য জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণে দলের সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর নীতি নির্ধারক বডি যথা কেন্দ্রীয় কমিটি ও দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করা। আরও সাব্যস্ত হয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলনের সদস্যরা যদি একান্তই চান তাহলে হাসিনাকে উপরোল্লিখিত প্রেসিডিয়ামের কেবলমাত্র অন্যতম সদস্য নির্বাচিত করা যেতে পারে।

৬০। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের নিকট প্রদত্ত আমার উপরোল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐকমত্য ব্যক্ত করেছিলেন তৎকালীন ঢাকার দৈনিক মর্নিং নিউজের সুদীর্ঘকালের নিউজ এডিটর, একজন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট জনাব এ. এল. খতিব। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দিল্লীতে পদস্থ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৬ সালে তাঁর উক্ত নিয়োগ বাতিল করা হয়। তাঁর আদি আবাসস্থল ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে। প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অর্থকষ্টজনিত কারণে তাঁর পরিবারকে মহারাষ্ট্রের গ্রামে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠিয়ে

দেন। ১৯৭৬ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি প্রায় প্রতিদিন আমাদের বাসায় আসতেন। বলতে গেলে, দিল্লীতে স্থায়ীভাবে তিনিই ছিলেন আমাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও পরামর্শদাতা। হাসিনা তাঁকে আংকেল বলে সম্বোধন করতো। আমার ছেলে ও মেয়েকে তিনি ভীষণ আদর করতেন। কালক্রমে, তিনি দিল্লীতে আমার পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন আমাদের সকলের কাছে। তিনি ১৯৮১ সালের মাঝামাঝিতে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, "Who Killed Mujib" শিরোনামে । বাংলাদেশে উক্ত পুস্তকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালের শেষের দিকে খতিব সাহেব কোলকাতায় গিয়েছিলেন তাঁর উপরোক্ত পুস্তকটি বাংলায় সংস্করণের জন্যে। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি আমাকে শেষ চিঠি লিখেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে তিনি কোলকাতায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার দিন দুয়েক পর উক্ত চিঠিটি আমার নিকট পৌঁছায়। তাঁর উক্ত চিঠিটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার 'বিশেষ চিঠি-পত্রাদি বিষয়ক' নথিতে।

৬১। হাসিনার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করে এবং ওর সম্মতি নিয়ে আমি আলজিরিয়ায় শিক্ষকতার চাকুরী ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন জানিয়ে তৎকালীন দিল্লীস্থ আলজিরিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব রউফ বোদজাকজী (Raouf Boudjakdji)-এর নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করি ১৯৮১ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে। ফেব্রুয়ারী (১৯৮১) মাসের প্রথম সপ্তাহে রেহানা ওর শিশু সন্তান ববিকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন থেকে দিল্লী আসে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮১) তারিখের সকালে লন্ডন থেকে ফোনে সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)-এর ১৩-১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮১) তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে হাসিনাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর ঢাকা থেকে শেখ সেলিমও হাসিনাকে ফোনে একই সংবাদ দেন। এর পর ঢাকা ও লন্ডন থেকে আরও অনেকে টেলিফোনে হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। পরের দিন দিল্লীস্থ অনেক সাংবাদিক হাসিনার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে হাসিনার মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮১) তারিখে ঢাকা থেকে আওয়ামী লীগের আব্দুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন, এডভোকেট জিল্লুর রহমান, আব্দুল মান্নান, আব্দুস সামাদ, এম. কোরবান আলী, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, স্বামী গোলাম আকবার চৌধুরীসহ বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, বেগম আইভি রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিল্লী পৌঁছান। ডাঃ এস. এ. মালেক ইতিপূর্বেই ঢাকা থেকে দিল্লী পৌঁছেছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হাসিনার সভাপতিত্বে ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮১) পর্যন্ত কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হন। অতঃপর ডঃ কামাল হোসেন এবং বেগম সাজেদা চৌধুরী বাদে আর সকলেই ঢাকায় ফিরে যান।

৬২। ডঃ কামাল হোসেন এবং বেগম সাজেদা চৌধুরীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল আমাদের পারিবারিক ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করে হাসিনার ঢাকা ফেরার তারিখ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করার জন্যে। ১লা মার্চ (১৯৮১) রাতে ডঃ কামাল হোসেন ও বেগম সাজেদা চৌধুরী ১৭ই কিংবা ২৬শে মার্চ (১৯৮১) তারিখে হাসিনার ঢাকা ফেরার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের জবাবে আমি তাঁদের জানাই যে, ২৯শে এপ্রিল আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলের পরীক্ষা শেষ হবে এবং তারপর যে কোন তারিখে হাসিনা বাংলাদেশে ফিরতে পারে। আমি তাঁদের আরও অবহিত করি যে, যেহেতু এর আগের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সালে হাসিনা ছেলেমেয়েদের লন্ডনে সাড়ে ছয় মাস অবস্থান করায় তাদের স্কুলের পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়েছে, অতএব ২৯শে এপ্রিল তারিখের পূর্বে হাসিনার ঢাকা ফেরা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। অনেক বিতর্কের পর তাঁরা সবাই আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। এর দুই-তিন দিন পর ডঃ কামাল হোসেন ও বেগম সাজেদা চৌধুরী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

৬৩। মার্চ (১৯৮১) মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি যে, জয় বসার ঘরের জানালার পাশে বসে চিড়িয়াখানার মডেল বানানোয় নিমগ্ন। হাসিনা তখন বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিল। পুতলি পাশের একটি শয়নকক্ষে (রেহানার কক্ষে) রেহানার কাছ থেকে গল্প শুনছিল। এই সুযোগে আমি জয়কে উদ্দেশ্য করে বললাম, "আব্বু জয়, তুমি তো অনেক কিছু দেখলে। এখন বলো, তুমি তোমার আম্মার সঙ্গে ঢাকায় যাবে, না মুন্নার (রেহানার) সঙ্গে লন্ডনে যাবে?" এই কথা শোনার পর জয় আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "এর আগে জার্মানী গিয়েছিলাম। তার পর ঢাকায় কত কি ঘটে গেল। এর আগে আমাদের বাসায় তো এত লোক আসেনি? হঠাৎ আম্মুর কি যেন হয়ে গেল। আমার মনে হয় আম্মুর ঢাকায় ফেরার পর সেখানে কিছু একটা ঘটবেই। কাজেই আমি আম্মুর সঙ্গে ঢাকায় যাবো না। আমাকে মুন্নার (রেহানার) সঙ্গে লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।" এই মুহূর্তে মেয়ে পুতলি সেখানে উপস্থিত হয়। ও কোথায় যেতে চায় সে সম্পর্কে আমি ওর মতামত জানতে চাইলে পুতলি বলে, "আব্বু, আমি ইংরেজী ভুলে যাচ্ছি। আমাকেও মুন্নার (রেহানার) সঙ্গে লন্ডনে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।" পরদিন ছিলো শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে হাসিনা আস্তে আস্তে বলে, "ইতিমধ্যে পাকিস্তানপন্থী এবং জিয়ার রাজনৈতিক দলেরা সারা বাংলাদেশে লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিলি করে আমার ঢাকায় ফেরা যেকোনভাবেই প্রতিরোধ করার ডাক দিয়েছে। আমার মনে হয় জয়-পুতলিকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঢাকায় ফেরা সমীচীন হবে না। অতএব, ওদের জন্য তুমি পৃথক আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের ব্যবস্থা করো যাতে ওরা রেহানার সঙ্গে লন্ডন যেতে পারে।" রেহানাও এ ব্যাপারে ঐকমত্য ব্যক্ত করে।

৬৪। অতঃপর দিল্লীস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে জয় ও পুতলির জন্যে পৃথক আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ইস্যু করিয়ে নিই। এরপর একদিন সকালে দিল্লীস্থ বৃটিশ দূতাবাস থেকে জয় ও

পুতলির লন্ডন যাওয়ার ভিসার জন্যে ওদেরকে তাঁদের অফিসে নিয়ে যাই। তৎপর জয় ও পুতলিকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমি আমার অফিসে চলে যাই। ঐ দিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতেই ভীষণ উদ্বিগ্ন অবস্থায় রেহানা আমাকে জানায় যে, পুতলি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছে। এর কয়েক দিন পর রেহানা কেবলমাত্র জয়কে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন চলে যায়। লন্ডনে পৌঁছার কয়েক দিন পর রেহানা টেলিফোনে আমাদেরকে জানায় যে, তখন জয় ও ববিসহ সেও বসন্তরোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

৬৫। মে (১৯৮১) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে মেয়ে পুতলি যখন একটু সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন ঢাকায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ-আলোচনার পর তাঁর ১৭ই মে (১৯৮১) তারিখে ঢাকা ফেরার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর দিন কয়েক পূর্বে , আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ ও এম. কোরবান আলী সাহেবরা ঢাকা থেকে দিল্লী আসেন। ১৬ই মে (১৯৮১) সন্ধ্যায় হাসিনা ও পুতলিকে সঙ্গে নিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদ ও এম. কোরবান আলী সাহেবরা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটি বিমানে দিল্লী থেকে কোলকাতায় চলে যায়। ১৭ই মে (১৯৮১) তারিখ সন্ধ্যায় তাঁরা কোলকাতা থেকে ঢাকায় পৌঁছান। ঐদিন বিকেলে ঢাকায় একটু একটু ঝড়বৃষ্টি হয়। যাহোক, ঢাকায় পৌঁছেই রাত এগারোটার দিকে হাসিনা আমাকে টেলিফোনে জানায় যে, সেদিন সভাস্থল মানিক মিয়া এভিনিউ হতে তৎকালীন ঢাকা-কুর্মিটোলা বিমান বন্দর পর্যন্ত ছিল লোকে লোকারণ্য। ঐদিন তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে ১০-১২ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সূত্রে বলা হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের নেতা -কর্মীদের মতে ঐদিন ঢাকায় অন্যূন ১৫ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। আমি তখন হাসিনাকে বললাম, "১০-১৫ লাখ লোকের সমাগম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন থেকে তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দলীয় কাজকর্ম চালাতে হবে। অন্যের তোষামোদিতে তোমার মাথা যেন মোটা না হয়ে যায় তার জন্য তোমাকে এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে নিরন্তর।"

৬৬। ৩০শে মে (১৯৮১) তারিখে সকাল সাড়ে দশটার দিকে লন্ডন থেকে সুলতান শরীফ টেলিফোনে আমাকে জানান যে, জিয়াউর রহমান সাহেব বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহরস্থ সার্কিট হাউসে বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হয়েছেন। উক্ত ঘটনায় জিয়াউর রহমান সাহেবের ৮ জন দেহরক্ষীও নিহত হয়েছেন। অতঃপর দুপুর বারোটায় অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে উক্ত ঘটনার সংবাদ উল্লেখ করে আরও বলা হয় যে, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে করে সারা বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। রাতে বি. বি. সি., ভয়েস-অব-আমেরিকা, অল-ইন্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি প্রচার কেন্দ্র থেকে বলা হয় যে, বাংলাদেশে বিদ্রোহী সৈন্যরা চট্টগ্রামস্থ বেতার কেন্দ্র দখল করেছে। ৩১শে মে (১৯৮১) তারিখে তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বাংলাদেশ বেতারে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। উক্ত

ভাষণে তিনি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের সেনাবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল মনজুরসহ বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহবান জানান। ১লা জুন বাংলাদেশ বেতারে বলা হয় যে, চট্টগ্রামে সৈন্যদের বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত বেতারে আরও বলা হয় যে, মেজর জেনারেল মনজুরকে চট্টগ্রামের গ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে আসার সময় তিনি অন্য একদল বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের হাতে নিহত হন। ঐ দিন বাংলাদেশ বেতারে আরও বলা হয় যে, চট্টগ্রামের রাংগুনিয়া পাহাড় থেকে জিয়াউর রহমান সাহেবের মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২রা জুন (১৯৮১) তারিখে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে মরহুম জিয়াউর রহমানের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানের জাতীয় সংসদ ভবনের সন্নিকটস্থ স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। ঐ দিনই বাংলাদেশ সরকার জিয়াউর রহমানের হত্যার ব্যাপারে তদন্ত এবং উক্ত ঘটনায় জড়িত সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিচারের জন্যে গঠন করে 'তদন্ত আদালত ও কোর্ট মার্শাল'।

৬৭। চট্টগ্রাম শহরের সার্কিট হাউসে বিদ্রোহী সৈন্যদের হাতে জিয়াউর রহমান সাহেবের নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আরও অনেক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় ৩রা জুন (১৯৮১) তারিখে। ৩০শে মে (১৯৮১)-এর রাতে চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ষড়যন্ত্রকারী সদস্যরা শহরের নিকটবর্তী কালুরঘাট স্থানে পৌছতে থাকেন। সেখানে প্রথমে পৌছেন লেঃ কর্নেল মতিউর রহমান, মেজর মোজাফফর , ক্যাপ্টেন সৈয়দ এবং ক্যাপ্টেন এম. মুনির। এর কিছুক্ষণ পর একটি এক্স জীপ ও দুইটি এক্স পিকআপে ৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন এম. হোসেন খান, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ক্যাপ্টেন রফিকুল হোসেন খান, লেঃ মোসলেউদ্দিন আহমদ, সুবেদার সাফদার রহমান এবং ২১ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জামিল হককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌছেন ৬ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন। এঁদের পর, দুইটি এক্স জীপ ও একটি পিকআপে সেখানে পৌছেন ১৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার মেজর গিয়াসউদ্দিন, ২৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর কাজী মনিরুল হক এবং ১১ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন। সবশেষে, সেখানে পৌছান ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর এস. এম. খালেদ, ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ফজলুল হক এবং ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের স্টাফ ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন এবং ১ ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের এ্যাডজুটেন্ট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান।

৬৮। অতঃপর লেঃ কর্নেল মতিউর রহমানের নিকট হতে বিস্তারিত ব্রীফ নিয়ে বিদ্রোহীরা রাত সাড়ে তিনটার দিকে কালুরঘাট ত্যাগ করে শহরের সার্কিট হাউসের দিকে চলে যায়। তখন চট্টগ্রাম শহরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত ৪টার দিকে লেঃ কর্নেল মতিউর

রহমান কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে অতর্কিতে সার্কিট হাউসে প্রবেশ করে দ্রুত উক্ত বিল্ডিংয়ের উপর তলায় চলে যান। প্রথমে তাঁরা প্রেসিডেন্টের ৮ জন দেহরক্ষীকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এই পর্যায়ে জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁর কক্ষ থেকে বের হয়ে পাশের সিঁড়ি বেয়ে সার্কিট হাউসের ছাদে পলায়নে উদ্যত হন। ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত বিদ্রোহীদের কয়েকজন সদস্য তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে আহত জিয়াউর রহমান সাহেব তখন বারান্দার মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর বিদ্রোহীরা ষ্টেনগানের ব্রাশফায়ারের গুলিতে জর্জরিত করেন জিয়াউর রহমান সাহেবের সারা দেহ, মুখমণ্ডল ও মাথা। এ সমস্ত ঘটনা সম্পন্ন হয় প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে। এর পর তাঁরা দ্রুত চলে যান। সকাল ৮টার দিকে বিদ্রোহীরা পুনরায় পাঁচটি জীপে সার্কিট হাউসে এসে জিয়াউর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার লেঃ কর্নেল এহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ নিয়ে চলে যান। অতঃপর রাঙ্গুনিয়ার একটি পাহাড়ের পাদদেশে উক্ত লাশ তিনটি দাফন করা হয়। লাশগুলো দাফন করার সময় সেখানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিনজন ছাত্র তা দেখে ফেলে। উল্লেখ, ঐ রাতে সার্কিট হাউসের অপর একটি কক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.)-এর তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল ও জিয়াউর রহমানের মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। বিদ্রোহীরা তাঁর কোন খোঁজ করেনি। তিনি ঐ হত্যাকাণ্ডের সময় গোপনে সার্কিট হাউজ ত্যাগ করে ঢাকায় চলে যান।

৬৯। ৩০শে মে (১৯৮১) শনিবার ভোরেই বিদ্রোহীদের অপর একটি অংশ বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রামস্থ ষ্টেশন দখল করে। অতঃপর সকাল ১০টার দিকে তাঁরা চট্টগ্রাম বেতার ষ্টেশন থেকে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের সেনাবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল মনজুরের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠনের ঘোষণা দেয়। ঐদিন দুপুরের দিকে মেজর জেনারেল মনজুর চট্টগ্রাম শহরস্থ কোর্ট বিল্ডিংয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং তৎপর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে তিনি সরকারী, আধাসরকারী, কর্পোরেশন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও আইন প্রয়োগকারী বিভাগসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। অতঃপর, মেজর জেনারেল মনজুরের নির্দেশে ঢাকাতে তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ তৎকালীন সেনাবাহিনীর জেনারেল ষ্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল নুরুদ্দিনের নিকট মেজর জেনারেল মনজুরের পেশকৃত চার-দফা দাবীর কথা উল্লেখ করেন। এ দাবীগুলো ছিলঃ (১) সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা, (২) দেশে প্রধান বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা, (৩) জাতীয় সংসদ বাতিল করা এবং (৪) (বিদ্রোহীদের) বিপ্লবী পরিষদকে স্বীকৃতি প্রদান করা। উত্তরে তখন মেজর জেনারেল নুরুদ্দিন বলেন যে, কেবলমাত্র নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ ছাড়া সরকারের কাছে অন্য কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে যাতে পৌঁছতে না পারে সে জন্য

বিদ্রোহীরা তাঁদের সেনাবাহিনীর একটি দলকে যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মোতায়েন করেন শুভপুর ব্রিজের কাছে। কিন্তু ঐ দলটি বিদ্রোহীদের পক্ষ পরিত্যাগ করে সরকারী দলে যোগ দেন। ফলে সংশ্লিষ্ট দলের কমান্ডিং অফিসার ও অন্যান্য নেতারা দ্রুত চট্টগ্রামের সেনানিবাসে ফিরে যান। তাঁদের উক্ত ব্যর্থতার সংবাদে মেজর জেনারেল মনজুর চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

৭০। ৩১শে মে (১৯৮১) তারিখে রাত তিনটার দিকে মেজর জেনারেল মনজুর একটি জীপে তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং কর্নেল দেলওয়ারের স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামের পাইদং গ্রামে পৌছান। অতঃপর তাঁরা জীপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের দিকে যান এবং সেখানের খৈয়াপাড়া নামক একটি চা বাগানে গিয়ে জনৈক উপজাতীয় কুলির ঘরে আশ্রয় নেন। ১লা জুন (১৯৮১) বিকেলে হাটহাজারী থানার তৎকালীন সার্কেল ইন্সপেক্টর মোস্তফা গোলাম কুদ্দুস এন. এস. আই বিভাগের জনাব সাত্তার ও আজাদ এবং ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত চা-বাগানে গিয়ে ঐ কুলির ঘর থেকে মেজর জেনারেল মনজুর ও অন্যান্যদের গ্রেফতার করেন। ঐ দিন বিকেল পাঁচটার দিকে তৎকালীন মেজর জেনারেল মনজুরকে হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয়। এর পর রাত দশটার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল হাটহাজারী থানায় উপস্থিত হয়ে সেখান থেকে মেজর জেনারেল মনজুরসহ সকলকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দিকে চলে আসেন। উল্লেখ্য, ইত্যবসরে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমদ তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সাত্তারের নিকট থেকে নির্দেশ পেয়ে পুলিশকে বন্দীদের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার আব্দুল আজিজের নিকট হস্তান্তর করার নির্দেশ দেন। অতঃপর, পুলিশ হাটহাজারী থানা থেকে আসার পথে বন্দীদের ক্যাপ্টেন ইমদাদুল হকের নিকট হস্তান্তর করেন। তখন ক্যাপ্টেন ইমদাদুল হক মেজর জেনারেল (তখন বরখাস্তকৃত) মনজুরের হাত-পা দড়ি দিয়ে এবং চক্ষু একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলেন। অতঃপর একটি জীপে মহিলা ও শিশুদের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের মনজুরের বাসার নিকটস্থ ফ্লাগ হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অপর একটি জীপে মেজর জেনারেল মনজুরকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর জেনারেল মনজুরসহ জীপটি সেখানের সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্টাল শপের সামনের রাস্তার তেমাথার কাছে পৌছানো মাত্রই ২০-৩০ জন সশস্ত্র সৈনিকের অপর একটি দল সেটিকে থামিয়ে ঘেরাও করে। অতঃপর, ঐ ২০-৩০ জন সশস্ত্র সৈনিকের দলটি মেজর জেনারেল মনজুরকে উক্ত জীপটি থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে গুলী করে হত্যা করে। হাত-পা ও চক্ষু বাঁধানো মেজর জেনারেল মনজুরকে তখন কেন গুলী করে হত্যা করা হয় তার কারণ এখন পর্যন্তও উৎঘাটিত হয়নি।

৭১। ৪ঠা জুন (১৯৮১) তারিখে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সংবিধানের শর্তানুযায়ী দেশে ১৮০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পন্ন করার ঘোষণা দেন। ৭ই জুন (১৯৮১) জিয়াউর রহমানের ৩০শে মে তারিখের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্যে সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। ৯ই জুন (১৯৮১) তারিখে মেজর জেনারেল মীর শওকতকে পদোন্নতি দিয়ে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করা হয়। ১২ই জুন (১৯৮১) তারিখে সরকার হাসিনার নিকট বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীর (পুরাতন) ৩২ নম্বর (নতুন ১১ নম্বর) রোডস্থ বাড়ীটির দায়িত্ব হস্তান্তর করে। ২২শে জুন (১৯৮১) তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.) অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২৪শে জুন (১৯৮১) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল মতিন চৌধুরী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ২৯শে জুন (১৯৮১) তারিখে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের বৈধতা সম্পর্কে সংসদে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। ১লা জুলাই (১৯৮১) তারিখে সংসদে পেশ করা হয় সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী বিল। ৮ই জুলাই (১৯৮১) তারিখে জাতীয় সংসদে পাস হয় সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী। সংবিধান ষষ্ঠ সংশোধনী (১৯৮১)-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রীর ন্যায় যাতে কোন ব্যক্তি "কেবল রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি" হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য না হন তার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আইনগতভাবে যোগ্য করা হয়।

৭২। ১০ই জুলাই (১৯৮১) তারিখে জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম শহরস্থ সার্কিট হাউসে ৩০শে মে (১৯৮১) তারিখে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালে বিচার শুরু হয়। ১৭ই জুলাই (১৯৮১) তারিখে হাসিনা শিশু কন্যা পুতলিকে সঙ্গে নিয়ে বি. ও. এ. সি'র একটি বিমানে লন্ডনে রেহানার কাছে চলে যায়। সেখানে পৌঁছেই হাসিনা দিল্লীতে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলে। ২৩শে জুলাই (১৯৮১) তারিখে গ্রুপ ক্যাপ্টেন সুলতান মাহমুদকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ২৭শে জুলাই (১৯৮১) তারিখে এক ঘোষণায় নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করে ১৫ই অক্টোবর (১৯৮১) তারিখ। ৪ঠা আগস্ট (১৯৮১) তারিখে বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামে সেনা-বিদ্রোহ ও জিয়াউর রহমানের হত্যার ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ই আগস্ট (১৯৮১) তারিখে হাসিনা লন্ডন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। ১১ই আগস্ট (১৯৮১) তারিখে কোর্ট মার্শাল আদালত ৩০শে মে (১৯৮১) তারিখে চট্টগ্রামে বিদ্রোহের দায়ে ১২ জন সেনাবাহিনীর অফিসারকে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করে। ১৫ই আগস্ট (১৯৮১) তারিখে সরকার ৩০শে মে (১৯৮১) চট্টগ্রামে সেনাবিদ্রোহ ও জিয়াউর

রহমানকে হত্যা করার অভিযোগে সেনাবাহিনীর আরও ৩১ জন অফিসারকে অভিযুক্ত ঘোষণা করে। ২২শে আগস্ট (১৯৮১) তারিখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) তাওয়াবকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮শে আগস্ট (১৯৮১) তারিখে ঢাকা থেকে হাসিনা দিল্লীতে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলে। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তারিখ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ১২ জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদণ্ড মওকুফের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তারিখে নির্বাচন কমিশন দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ১৫ই অক্টোবর তারিখ পরিবর্তন করে পুনঃনির্ধারণ করে ১৫ই নভেম্বর (১৯৮১) তারিখ। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের বাসভবনে সংঘটিত হয় এক দুঃসাহসিক চুরি। এই সময় শাহ আজিজুর রহমানের বাসভবন থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা চুরি হয় এবং উক্ত ঘটনায় তাঁর এক ছেলে জড়িত ছিল বলে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন।

৭৩। ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তারিখে ১৬টি রাজনৈতিক দলের জোট, ন্যাশনাল ফ্রন্ট, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তারিখে সর্বমোট ৮৩ জন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৮১) তরিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে চট্টগ্রামে ৩০শে মে (১৯৮১) তারিখে বিদ্রোহ করার দায়ে অভিযুক্ত ১২ জন সামরিক অফিসারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এই তারিখে নির্বাচন কমিশনার দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সর্বমোট ৭২ জন ব্যক্তির মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে। ১৪ই অক্টোবর (১৯৮১) তারিখ ছিলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহরের শেষ দিন। ঐদিন নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সর্বমোট ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ৩১শে অক্টোবর (১৯৮১) তারিখে পরলোকগমন করেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

৭৪। ১৫ই নভেম্বর (১৯৮১) তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনের জন্যে ৩,৮৯,৫১,০১৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ভোট দেওয়ার যোগ্য হিসেবে ভোটার তালিকাভুক্ত হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৮৫,২২,৭১৭ বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)-এর মনোনীত প্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী মওলানা হাফিজ্জী হুজুর ৩,৮৭,২১৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর, জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী, মেজর (অবঃ) জলিল, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদসহ অন্যান্য প্রার্থীদের জামানত পর্যাপ্ত ভোট না পাওয়ার কারণে বাজেয়াপ্ত হয়। ২০শে নভেম্বর (১৯৮১) তারিখে বঙ্গভবনের দরবার হলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার নির্বাচিত

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। অতঃপর ২৪শে নভেম্বর (১৯৮১) তারিখে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তাঁর উপদেষ্টা ডঃ এম. এন. হুদাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। ২৭শে নভেম্বর (১৯৮১) প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার গঠন করেন ৪২ সদস্যের নতুন মন্ত্রী পরিষদ।

৭৫। ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অর্থ, প্রশাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার, ভীতি প্রদর্শন, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ইত্যাকার বিভিন্ন কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.) এবং মনোনীত প্রার্থী আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে। ২৫শে নভেম্বর (১৯৮১) তারিখে প্রধান নির্বাচনী কমিশনার বিচারপতি এ. কে. এম. নূরুল ইসলামের কাছে পেশ করা হয় উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ সম্বলিত অনেক দরখাস্ত। ডঃ কামাল হোসেনের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এক প্রেস ইশতেহারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্ডিন্যান্স লংঘন করার অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, উক্ত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ, গণনা ও নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করার ব্যাপারে উল্লিখিত অর্ডিন্যান্স অনুসরণ করা হয়নি।

৭৬। ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৮১) তারিখে সেনাভবনে জাতীয় পত্র-পত্রিকা ও সংবাদসংস্থা সমূহের সম্পাদকদের সমাবেশে এক বিবৃতি দানকালে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বলেন, "আমাদের সর্বস্তরের সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক এ্যাডভেঞ্চার কামনা করেন না, কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁরা রাজনৈতিক এ্যাডভেঞ্চার চান না। তাঁরা কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে কোন ভবিষ্যৎ (সামরিক) অভ্যুত্থানের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান।" অতঃপর তিনি ১৯৭১-সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সবশেষে তিনি বলেন, "উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যে তথা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠন করা দরকার এমন একটি দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' যার সদস্য থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও কতিপয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ছাড়াও তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ।" সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এরশাদ সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যে জনমনে সৃষ্টি হয় নানান জল্পনা-কল্পনা ও আশঙ্কা।

দশম পরিচ্ছেদ

১৯৮২–১৯৯০ সাল

১। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রীয় শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে বিভিন্ন মহল ও পত্র-পত্রিকায় চলতে থাকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান কথাবার্তা ও জল্পনা-কল্পনা। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দীর্ঘকাল যাবত নানান জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন। উপরন্তু, তখন তাঁর বয়সও পঁচাত্তর পেরিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁর বেশীদিন বাঁচার সম্ভাবনার ব্যাপারে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন দেশের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ব্যক্তিত্বরা। বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের মৃত্যু ঘটলে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নিতে পারবে বলে উক্ত মহলসমূহ সুনিশ্চিত হতে পারছিল না। কারণ বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের পরিবর্তে তাঁদের এমন কোন প্রার্থী ছিলেন না যাঁকে সম্ভাব্য নির্বাচনে জেতানোর জন্যে মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের ভাবমূর্তির প্রভাব খাটানো যাবে। বিশেষ করে, ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের প্রতি বিপুল গণসমর্থন প্রত্যক্ষ করে তাঁরা নিপতিত হন নিরতিশয় শংকা ও দুর্ভাবনায়। তাঁদের দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার আর একটি কারণ ছিল জিয়াউর রহমান সাহেবের অভাবে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বাজাদল-বি. এন. পি.)-এর নেতাদের মধ্যে কোন্দল ও দলাদলি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাদের মধ্যে কোন্দল ও দলাদলির অন্যতম কারণ ছিল আওয়ামী লীগ, বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের কি উপায়ে সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল প্রতিরোধ করা যায় তার কৌশলগত ব্যাপারে মতভেদ ও অনৈক্য। যাহোক, দেশের এই অস্থির রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে ব্যবহার করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে দেশের সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং আওয়ামী লীগবিরোধী গ্রুপ ও ব্যক্তিত্ব। এঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল

আওয়ামী লীগ, বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা যাতে অতি শিগগির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হতে পারে তার জন্যে বিভিন্ন কলা-কৌশল উদ্ভাবন করা। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীর কিছু স্বার্থান্বেষী ও উচ্চাভিলাষী উচ্চপদস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন সদস্য এবং আওয়ামী লীগ, বিশেষতঃ বঙ্গবন্ধুর আদর্শবিরোধী সুযোগ সন্ধানী ও ক্ষমতালিপ্সু গ্রুপ ও ব্যক্তিত্ব প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর তা দীর্ঘকাল নিজেদের কর্তৃত্বে রাখার দীর্ঘমেয়াদী নীলনক্সা ও পরিকল্পনাও তৈরী করে উক্ত মহলটি। এঁদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল নিজেদেরকে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার জন্যে দেশের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল.) এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি.) দুটির নেতাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। এই সমস্ত ধারণা ও মতামতের যথার্থতা পরিস্ফুটিত ও প্রতিভাত হয় দেশে ১৯৮২ সালে ও তৎপরবর্তী প্রায় ৮ বছরে সংঘটিত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকে।

২। ১লা জানুয়ারী (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এক অধ্যাদেশে একটি দশ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করেন। প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে উক্ত পরিষদে সদস্য রাখা হয় উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর তিন প্রধানকে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিডেন্টের তৎকালীন উপদেষ্টা দাউদ খান মজলিস বলেন, "জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবে।" তিনি আরও বলেন, "জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র বাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণের উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করবে। উক্ত পরিষদ এসব কাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিবেচিত হলে অন্য যে কোন বিষয়েও পরামর্শ দেবে।" পরবর্তীতে, 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের' সদস্যসংখ্যা দশ থেকে কমিয়ে ছয়ে আনা হয়। উক্ত পরিবর্তিত পরিষদে সদস্য থাকেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর তিন প্রধান। এই জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে দেশে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগসহ দেশে সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্ব 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠনকে সরকারের ওপর আর একটি সরকার বলে আখ্যায়িত করেন। এর জবাবে রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, "এর ভূমিকা হবে মামুলি উপদেশমূলক। মন্ত্রী পরিষদের চেয়ে শক্তিশালী তথাকথিত সংস্থা গঠনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে এরূপ কোন বিধান নেই।" পরবর্তীতে, রাষ্ট্রপতি সাত্তার আরও বরেন, "সেনাবাহিনী সরকারের একটি অংশ। তাদের কর্তব্য হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা ও

সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা। এর বাইরে এবং এর বেশী কোন কাজ করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।"

৩। দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ১৯৮১–এর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হাসিনা লন্ডন চলে যায় সেখানে রেহানা ও ছেলেমেয়ে জয় ও পুতলির সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্যে। ২রা জানুয়ারী (১৯৮২) তারিখে দিল্লী থেকে হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ওদের কুশলাদি জেনে নিই। তখন আমি হাসিনাকে আরও জানাই যে, ভারতে আমার বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম জানুয়ারী (১৯৮২)–এর মধ্যেই শেষ হবে। কাজেই আমি হাসিনাকে ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) মাসে দিল্লী আসার প্রস্তাব করি যাতে একত্রে দেশে ফিরতে পারি। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ ফেব্রুয়ারীতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর মে (১৯৮১)–এর ১৭ই তারিখে হাসিনা যখন দেশে ফিরে যায়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ ও ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্যে একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজে আমি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। ছয়শত পৃষ্ঠারও বেশী পাঠ্যপুস্তকটির প্রুফ দেখতে সময় লাগে প্রায় এক বছর। এই বিশেষ কারণেই ভারত সরকার হাসিনার দেশে ফেরার পরও আমাকে ভারতে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করে।

৪। এদিকে বাংলাদেশে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিজনিত নানান খবরাখবর প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায়। ১৬ই জানুয়ারী (১৯৮২) তারিখে ঢাকার তেজগাঁওস্থ পুরাতন বিমান বন্দরের গুদাম থেকে সুড়ঙ্গ পথে দেড় কোটি টাকার মালামাল লোপাট হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, ঢাকা, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কোন্দল ও সংঘর্ষের খবরাদিও পাওয়া যায়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে, তখন দেশের সেনাবাহিনীর কিছু স্বার্থান্বেষী ও উচ্চাভিলাষী উচ্চপদস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সদস্য কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের যোগসাজশে সারাদেশে অর্থনৈতিক সংকট ও অরাজকতাপূর্ণ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টির জন্যে দায়ী ছিল অনেকাংশে। এতদুদ্দেশ্যে চক্রান্তকারীদের সারাদেশে স্বার্থান্বেষী মহল বিশেষের মধ্যে কোটি কোটি টাকা বিতরণের খবরাদি পাওয়া যায় বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে।

৫। ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের সরকারী মিন্টো রোডস্থ বাসা ঘেরাও করে পুলিশ ঢাকার নাখালপাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামী এমদাদুল হক (ইমদু)কে গ্রেফতার করে। যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ আব্দুল মতিনের সঙ্গে আলোচনা করেই ইমদুকে গ্রেফতারের অনুমতি দেন। উল্লেখ্য, এককালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কর্মী ইমদু পরবর্তীতে বি. এন. পি'তে যোগদান করে। এর কিছুকাল পর, একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে ইমদু নাখালপাড়ার আলী হোসেন তালুকদারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। যাহোক, একজন মন্ত্রীর বাসভবনে

আশ্রয়লাভকারী এই ধরনের একজন খুনীকে গ্রেফতারের ফলে রাষ্ট্রপতি সাত্তারের মন্ত্রী পরিষদ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ও টিভি ভাষণে তার ৭৭ দিনের ৪২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদ ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। পরদিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী, রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার তাঁর ভাষায় 'সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও স্থবিরতা' থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গঠন করেন নতুন মন্ত্রী পরিষদ। উল্লেখ্য, এই নতুন মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পূর্ববর্তী মন্ত্রী পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। এই মন্ত্রী পরিষদে ছিলেন ১০ জন মন্ত্রী ও ৮ জন প্রতিমন্ত্রী। সর্বোপরি, শাহ আজিজুর রহমান নিযুক্ত হন এই মন্ত্রী পরিষদের প্রধানমন্ত্রী।

৬। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) রাতে হাসিনা লন্ডন থেকে দিল্লীতে টেলিফোনে আমাকে অবহিত করে ওর দিল্লী হয়ে বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত। অতঃপর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হাসিনা লন্ডন থেকে দিল্লী আসে। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা আজমীর যাই সেখানে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর কবর জিয়ারত ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করার জন্যে। সেখান থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করি ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। অতঃপর ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) দিল্লীর পান্ডারা রোডস্থ আমাদের সাড়ে ছয় বছরের সংসার গুটিয়ে থাই আন্তর্জাতিক বিমানে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেদিন উক্ত বিমানের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও তাঁর পত্নী। বিমানটি দিল্লী ছাড়ার কিছুক্ষণ পর হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও তাঁর পত্নী সাধারণ শ্রেণীতে এসে আমাদের পাশের সিটে আসন গ্রহণ করেন। তাঁরা সারা পথ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সুদীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর পর পারস্পরিক সাক্ষাতে আমরা খুশীতে অভিভূত হই। ঢাকা বিমান বন্দরে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা এবং আওয়ামী লীগ ও তার অংগদলের নেতা ও কর্মীরা সমবেত হয়েছিলেন হাসিনাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্যে। অতঃপর, বিমান বন্দর থেকে মিছিল করে আমাদের বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর রোডস্থ বাসায় নেয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর আমার মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা প্রকাশ করার কোন ভাষা নেই।

৭। তখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ঐ বাড়ীটি ছাড়া আমাদের আর কোন বাসা ছিল না। সংগত কারণে, বঙ্গবন্ধুর ঐ বাসায় অবস্থান নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই হাসিনার সম্মতিক্রমে আমরা তখন গিয়ে উঠি আমার ভাগ্নীজামাই সিদ্দিক হোসেন চৌধুরীর মোহাম্মদপুরের ১১/১২, ইকবাল রোডস্থ ফ্ল্যাটে। পরদিন অর্থাৎ ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) আমি আমার কর্মস্থল বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনে যোগদানপত্র পেশ করি। কিন্তু দুঃখজনক যে, কমিশন আমার যোগদানপত্র গ্রহণ না করে এবং আমাকে কোন দায়িত্ব না দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তৎব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্যে তা প্রেরণ করে। কমিশনের এই পদক্ষেপ গ্রহণে আমি শুধু মর্মাহতই নয় কিছুটা বিস্মিতও হই। কারণ, ইতিপূর্বে কমিশন

এক অফিস স্মারকে আমাকে এই মর্মে অবহিত করেছিল যে, ১লা মার্চ (১৯৮২) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে কমিশনে যোগদান না করলে আমার তখন ভারতে অবস্থান সংক্রান্ত লীয়েন বাতিল করা হবে। কমিশনের উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে আমাকে শুধু কোন দায়িত্ব পাওয়া থেকেই বঞ্চিত করা হলো না, সরকার কর্তৃক আমার যোগদানপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন থেকে আমার বেতন- ভাতাদি পাওয়ার কোন সুযোগ থাকলো না। তদুপরি কমিশনে আমার চাকুরীর ব্যাপারে আমি নিপতিত হই মানসিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায়।

৮। ১১ই মার্চ (১৯৮২) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হলে ২ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হয়। ১৬ই মার্চ (১৯৮২) তারিখে মংলা বন্দরে এক অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫ কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিচারপতি সাত্তারের সরকার ৩ জন সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করে দুর্নীতির মামলা। ১৯শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দিনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় দুর্নীতির মামলা। ২৩শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ডঃ এম. এন. হুদার পরিবর্তে মুহম্মদুল্লাহকে নতুন উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। ২৪শে মার্চ (১৯৮২) ভোরে রেডিও ও টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয় যে, সারাদেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। অতঃপর, সকাল এগারোটার দিকে রেডিও ও টেলিভিশনে এক ভাষণে বিচারপতি সাত্তার বলেন যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। উক্ত ভাষণে বিচারপতি সাত্তার মন্ত্রী পরিষদ ও জাতীয় সংসদ বাতিলের কথাও ঘোষণা করেন। তখন টেলিভিশনে বিচারপতি সাত্তারের চেহারা দেখে এবং বক্তব্য শুনে কারো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তাঁর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়েছে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি প্রদানের মাধ্যমে। তখন জনমনে এই ধারণা উপলব্ধি করেই এরশাদের সামরিক সরকার পুনঃ পুনঃ প্রচার করতে থাকে বিচারপতি সাত্তারের টেপে ধারণকৃত ঐ ভাষণ।

৯। ২৪শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে সামরিক শাসন জারি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পুনরায় শুরু হয় সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্যের পুরাতন কুটিল লীলাখেলা ও কূটক্রিয়াকলাপ। ২৫শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীকে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ২৭শে মার্চ (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা হয় প্রধান আইন প্রশাসকের আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে। অতঃপর, সামরিক সরকার দেশে গঠন করে ৩রা এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও পাঁচটি সামরিক আদালত এবং ৪ঠা এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে ২৩টি সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত।

২২শে এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে সামরিক সরকার দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি হাই কোর্ট বেঞ্চ এবং থানা সদরে একটি আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অতঃপর, ৮ই জুন (১৯৮২) তারিখে দেশে হাই কোর্ট ডিভিশনের চারটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয়।

১০। ১০ই জুন (১৯৮২) তারিখে হাসিনা লন্ডন যায় সেখানে রেহানা ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কয়েক মাস কাটানোর জন্যে। ইতিপূর্বে, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ডঃ কামাল হোসেন লন্ডন গিয়েছিলেন ৬ই এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে। মে (১৯৮২) মাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৮ই জুন (১৯৮২) তারিখে তিনি পুনরায় লন্ডন চলে যান। ডঃ কামাল হোসেন সেবার দেশে ফেরেন ২৭শে জুলাই (১৯৮২) তারিখে।

১১। জুলাই (১৯৮২)-এর শেষের দিকে একদিন আণবিক শক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ও অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ আমাকে তাঁর ক্যান্টনমেন্টস্থ বিমান বাহিনী দফতরে যেতে বলেন কমিশনে আমার যোগদানপত্রের ব্যাপারে আলাপের জন্যে। সেদিন তিনি আমার কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নেন আমি সাড়ে ছয় বছর ভারতে থাকাকালীন সময় কি কি কাজকর্ম করেছি। অতঃপর ভারতে অন্যান্য কাজকর্মের ফাঁকে আমার লেখা এবং Tata Mcgraw Hill Publishing Company কর্তৃক প্রকাশিত "Fundamentals of Electromagnetics" পাঠ্যপুস্তকটির একটি কপি আমি তাঁকে উপহার দিই। কথাবার্তায় এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে বিজ্ঞান অনুরাগী বলে মনে হলো। তিনি পুরো পুস্তকটির পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখে এর প্রশংসা করেন এবং সাফল্যজনকভাবে কাজটি সম্পন্ন করার জন্যে আমাকে মোবারকবাদ জানান। অতঃপর, কমিশনে আমার যোগদানের ব্যাপারে অতি শিগগির সিদ্ধান্ত প্রদানের আশ্বাস দিয়ে তিনি আমাকে বিদায় দেন। এর দিন দশ-বারো পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আমার ভারতে অবস্থানের সময়কালকে বেতনবিহীন ছুটি হিসেবে গণ্য করে আমাকে কাজে যোগদান করার অনুমতি প্রদানে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনকে নির্দেশ দেয়

১২। সেপ্টেম্বর (১৯৮২)-এর শেষের দিকে লন্ডন থেকে হাসিনা আমাকে চিঠিতে জানায় যে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সে ডিসেম্বরের মধ্যেই ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অতএব এর পূর্বেই ধানমন্ডী আবাসিক এলাকার আশেপাশে একটি অন্ততঃ তিন শয়ন কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার জন্যে হাসিনা আমাকে পরামর্শ দেয়। এর পর থেকে আমি ধানমন্ডী, কলাবাগান, লেকসার্কাস, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর ইত্যাদি এলাকায় একটি উপযুক্ত ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রায় ৫০-৬০টি ফ্ল্যাট দেখি কিন্তু দুঃখজনক যে, আমার পরিচয় জানার পর কোন বাড়ীওয়ালা আমাকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে রাজি হন না। অতঃপর নভেম্বর (১৯৮২) মাসের গোড়ার দিকে আণবিক শক্তি কমিশনের মহাখালীস্থ আবাসিক কলোনীর একটি দু'কক্ষবিশিষ্ট ফ্ল্যাট খালি হবে জেনে সেটিকে আমার জন্যে

বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে আমি কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত করি। কিন্তু সাড়ে ছয় বছর ভারতে বেতনবিহীন ছুটিতে থাকায় চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও মূল্যায়নের নিরিখে আমার সহকর্মী ডঃ আমির হোসেন খান উক্ত ফ্ল্যাটটি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। যাহোক, আমির হোসেন খান সদয় হয়ে তাঁর দাবী প্রত্যাহার করলে উক্ত ফ্ল্যাটটি আমার জন্যে বরাদ্দ করা হয়। অতঃপর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন তখন আমাদের বাসার আসবাবপত্রগুলো নিজেদের যত্নে রেখেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই পুরানো আসবাবপত্রগুলো নিয়ে মহাখালীস্থ কমিশনের উক্ত ফ্ল্যাটটিতে গিয়ে উঠি ডিসেম্বর (১৯৮২)-এর মাঝামাঝি সময়ে। এর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে হাসিনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা ফিরে উক্ত ফ্ল্যাটে অবস্থান নেয়। এর কিছুদিন পর ছেলেমেয়েদেরকে ভর্তি করে দিই ধানমন্ডীস্থ স্কলাসটিকা মাধ্যমিক স্কুলে।

১৩। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এন. পি"র অন্যতম অংগদল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে অনেক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) তারিখের সকালে একটি ছাত্র-মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল পেরিয়ে শিক্ষাভবনের নিকট পৌঁছলে সেখানে মোতায়েনকৃত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর লোকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জসহ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর হতাহতের খবর পাওয়া যায়। অতঃপর দুপুরে এক সরকারী ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। সেদিন রাতেই কতিপয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার কয়েকশত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোয় ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মমভাবে প্রহার ও নির্যাতন করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) তারিখে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং একই সাথে সহস্রাধিক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। সেদিন রাতেই আওয়ামী লীগের হাসিনা, বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ডঃ কামাল হোসেন, তোফায়েল আহম্মদ, আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, মোহাম্মদ নাসিম ,মোজাফফর হোসেন পল্টু ও ডাঃ এস. এ. মালেকসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১লা মার্চ (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকার দেশে রাজনৈতিক আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাদেরসহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান করে।

১৪। ১৪ই মার্চ (১৯৮৩) তারিখে সামরিক সরকার দেশের থানা দফতরগুলোর নাম পরিবর্তন করে উপজেলায় রূপান্তরিত করে। ২৫শে মার্চ (১৯৮৩) তারিখে তৎকালীন

সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এরশাদ এক রেডিও ও টিভি ভাষণে ১লা এপ্রিল (১৯৮৩) হতে দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অতঃপর ১লা এপ্রিল (১৯৮৩) থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। ২রা এপ্রিল (১৯৮৩) তারিখে অনুষ্ঠিত একটি তলবী সভায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি) নেতৃত্বের কোন্দলে দ্বিধা বিভক্ত হয়। ২৮শে এপ্রিল (১৯৮৩) তারিখে এরশাদ সাহেবের তৎকালীন জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এক আলাপ-আলোচনা বৈঠক। জুন (১৯৮৩) মাসের গোড়ারদিকে হাসিনার সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডীস্থ বাসভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক দু'দিনব্যাপী বর্ধিত সভা। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়। উক্ত সভার সমাপ্তি অধিবেশনের পূর্বে আমি সেখানে উপস্থিত হই। সমাপ্তি অধিবেশন শুরুর আগে আওয়ামী লীগের দুই প্রবীণ নেতা সর্বজনাব এম. কোরবান আলী ও আব্দুস সামাদ আজাদ হাসিনাকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, সে তার বক্তৃতায় এমন কিছু যেন না বলে যার ফলে দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অতঃপর দু'জনেই একত্রে উক্ত কক্ষ ত্যাগ করেন। এর অব্যবহিত পরেই জনাব কোরবান আলী দ্রুত উক্ত কক্ষে প্রবেশ করে বলেন, "সভানেত্রী, সামাদ সাহেবের উপস্থিতিতে আমি আপনাকে যে কথা বলেছি তা আমার মনের কথা নয়। অতএব, আপনার ভাষণে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন।"

১৫। ইতিপূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)-এর নেতৃত্বে একটি ১৫ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। এই জোট একটি ৯-দফার কর্মসূচী ঘোষণা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবী ছিলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বেকার ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং তদনুযায়ী অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি. এন. পি)-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় একটি ৭ দলীয় ঐক্যজোট। এই জোটের উল্লেখযোগ্য দাবী ছিলো তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

১৬। এদিকে জুলাই (১৯৮৩) -এর গোড়ার দিকে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক ইফতার পার্টিতে দাওয়াত করেন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের। ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের নেতৃবৃন্দ উক্ত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এরশাদ সাহেবের উক্ত ইফতার পার্টিতে উপস্থিত হন সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, টি. আলী, আমেনা বেগম, মাওলানা মতিন, শামসুল হুদা, সিরাজুল হক, কাজী কাদের, আলী আমজাদ খান, বি. এন. পি-এর শামসুল হুদা চৌধুরী, ডাঃ এম এ. মতিন, রিয়াজউদ্দিন আহমদ ভোলা মিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৭। ৮ই জুলাই (১৯৮৩) তারিখে এক বেতার ও টিভি ভাষণে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক অইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দেশে নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচী ঘোষণা করেন। ২রা আগস্ট আওয়ামী লীগ (হাসিনা) থেকে জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ও জনাব আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জন নেতাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ৫ই আগস্ট (১৯৮৩) সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভিত্তিতে তৈরী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২৮শে আগস্ট (১৯৮৩) বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বলে অভিযুক্ত মাহবুবুল আলম চাষী জেদ্দায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। ২২শে অক্টোবর (১৯৮৩) তারিখে জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে সভাপতি এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং ১৯৭৫ সালে তাঁর ঘোষিত আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কায়েম করা উক্ত 'বাকশালের' লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১লা নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের যৌথ আহবানে।

১৮। ১৪ই নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে পূর্বারোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ২৭শে নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে এরশাদ সাহেবের ইঙ্গিতে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীর সভপতিত্বে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে একটি কনফারেন্সে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট ও বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান, জনাব এ. আর. শামসুদ্দোহাকে সেক্রেটারী জেনারেল, ৭ জনকে ভাইস চেয়ারম্যান, ২ জন জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং ২০৮ জনকে সদস্য নির্বাচিত করে 'জনদল' গঠন করা হয়। কতিপয় পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী উক্ত দলে যোগদান করেন। অনেকে অন্য রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে 'দলছুট' হিসেবে জনদলে যোগ দেন। আবার কতিপয় নেতা তাদের স্ব স্ব গোটা দল নিয়েই উক্ত সরকারী দলে যোগদান করেন। সর্বোপরি, বিভিন্ন মামলার আসামী ও সাজাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি তড়িঘড়ি করে সরকারী 'জনদলে' যোগদান করেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে।

১৯। ২২শে নভেম্বর (১৯৮৩) ১৫ দল ও ৭ দল ঐক্যজোটদ্বয়ের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৩) তারিখে বাংলাদেশ সরকারের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালিত হয় ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের যৌথ আহবানে। হাজার হাজার নেতা, কর্মী ও জনগণের সঙ্গে সচিবালয়ের দু'পাশে অবস্থান নেন হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া। উক্ত অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সেদিন ঢাকায় সংঘটিত হয় ব্যাপক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা। অতঃপর রাতে এক রেডিও ও টিভির ঘোষণায় সারাদেশে সকল রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া সারা ঢাকায় পুনরায় সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়। ঐ রাতেই বেগম

খালেদা জিয়া ও হাসিনাকে তাঁদের যথাক্রমে ক্যান্টনমেন্টস্থ ও মহাখালীস্থ স্ব স্ব বাসস্থানে অন্তরীণ রাখা হয়। এ ছাড়াও অবস্থান ধর্মঘটের সময়ও ঐদিন রাতে অনেক নেতা, কর্মী ও সাধারণ লোককে গ্রেফতার করা হয়।

২০। ১১ই ডিসেম্বর (১৯৮৩) তারিখে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও গ্রহণ করেন। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, কেবল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে বিদেশ ভ্রমণে গেলে নানান জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষত উক্ত নামে গণতান্ত্রিক দেশে তাঁকে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানে নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাই তিনি নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন।

২১। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৮৩) তারিখে ২২শে ও ২৮শে নভেম্বরের ঘটনার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহারসহ উক্ত দিবসদ্বয়ে গ্রেফতারকৃতদেরকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৬শে ডিসেম্বর (১৯৮৩) তারিখে ইতিপূর্বে বহিষ্কৃত ৫ জন তৎকালীন সোভিয়েট কূটনীতিক ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৮৩) তারিখে দেশে শুরু হয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন।

২২। ২রা জানুয়ারী (১৯৮৪) ছিল সারাদেশে পৌরসভা নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের দিন। ৭ই জানুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার পুনরায় দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন দেয়। ঐ দিনই ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের বাইরে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা এরশাদ সাহেব কর্তৃক আহূত 'রাজনৈতিক সংলাপের' অংশ হিসেবে বঙ্গভবনে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ১০ই জানুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে দেশে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষকালব্যাপী নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ১২ই জানুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে বেগম জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.)-এর চেয়ারম্যান (চেয়ারপারসন) মনোনীত হন। ২৭শে জানুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে ১৫ ও ৬ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় উপজেলা নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে ঘোষণা করা হয় তখনকার রাজনৈতিক সংলাপের সমাপ্তি। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় দেশের ৭৮টি পৌরসভার নির্বাচন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে লন্ডনে ইন্তেকাল করেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিবাহিনীর প্রধান জেনারেল (অবঃ) এম. এ. জি. ওসমানী। অতঃপর তাঁর মরদেহ সিলেটে রাষ্ট্রীয় মর্যদায় দাফন করা হয় ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) ছিল উপজেলা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী(১৯৮৪) তারিখে ঢাকার নওয়াবপুর রোডে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের একটি মিছিলের ওপর পুলিশ গাড়ী চালিয়ে দিলে তার আঘাতে এবং চাকার নীচে পিষ্ট হয়ে দুইজন ছাত্র অকুস্থলেই প্রাণ হারায় এবং অনেক ছাত্র দারুণভাবে আহত হয়। ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার দেশে

২৬শে মার্চ (১৯৮৪) থেকে অবাধ রাজনীতির এবং ২৭শে মে (১৯৮৪) তারিখে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

২৩। ১লা মার্চ (১৯৮৪) ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহ্বানে সারাদেশব্যাপী পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। ৩রা মার্চ (১৯৮৪) তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানায় উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের। ৪ঠা মার্চ (১৯৮৪) উপজেলা নির্বাচনে ৭ শতাধিক প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। ১৮ই মার্চ (১৯৮৪) সামরিক সরকার উপজেলা নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করে। ২৪শে মার্চ (১৯৮৪) সামরিক সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পুনরায় সংলাপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ২৭শে মার্চ (১৯৮৪) তারিখে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতির মিলনায়তনে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মুসলিম লীগের বি. এ. সিদ্দিকী, খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান যোগদান করেন। তাঁর ভাষণে আতাউর রহমান খান বলেন, "এরশাদ গণতন্ত্রের শেষ হত্যাকারী।" ২৮শে মার্চ (১৯৮৪) রাতে আতাউর রহমান খান এরশাদ সাহেবের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁর ক্যান্টনমেন্টস্থ সেনাভবনে। ঐ দিন রাত ১১টার সংবাদে আতাউর রহমান খানের সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়। ৩০শে মার্চ (১৯৮৪) আতাউর রহমান খানকে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করান তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তখন চা-পানের সময় সাংবাদিকরা আতাউর রহমান খানকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি এরশাদ সাহেবকে গণতন্ত্রের হত্যাকারী বলার পর এখন কেন তার সঙ্গে যোগ দিলেন?" এ প্রশ্নের উত্তরে প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে বলেন, "গণতন্ত্রকে জীবিত করার জন্যেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম।"

২৪। ইত্যবসরে সামরিক সরকারের সঙ্গে পুনরায় শুরু হয় দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ। ৯ই এপ্রিল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ২০ জন সদস্য বঙ্গভবনে যান উপরোক্ত সংলাপ বৈঠকের উদ্দেশ্যে। আতাউর রহমান খানের উপস্থিতির ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁকে বেগম খালেদা জিয়া বেঈমান ও বিশ্বাস-ঘাতক বলেও উল্লেখ করেন। কারণ তিনি ইতিপূর্বে চলমান ৫ দফার আন্দোলন থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে প্রধানমন্ত্রীত্ব গহণ করেছেন। অতঃপর, আর অন্যকোন কথা না বলে ৩৩-দফা দাবীনামা পেশ করেই ৭ দলীয় ঐক্যজোটের নেতারা বঙ্গবভন ত্যাগ করেন। ১০ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সরকার পক্ষের সংলাপ বৈঠক।

২৫। ১১ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের ৩৮-জন নেতা বঙ্গভবনে যান এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক

সংলাপের উদ্দেশ্যে। উক্ত বৈঠকে হাসিনা ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষে দাবীনামা পেশ করেন। উক্ত দাবীনামায় অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ১৪ ব্যক্তির দণ্ড মওকুফের বিষয়ও। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে সরকার পক্ষ ও ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতাদের বাকবিতণ্ডা। অতঃপর আলোচনা মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

২৬। ১২ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বি. এন. পি-এর চেয়ারপারসন ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গভবনে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। ১৪ই এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের দ্বিতীয় দফা সংলাপ বৈঠক। ২০শে এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের তৃতীয় দফা সংলাপ বৈঠক। উক্ত বৈঠক চলে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে। ২৮শে এপ্রিল (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হয় এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক সরকার পক্ষের সঙ্গে খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে ১০ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের সংলাপ বৈঠক। ১লা মে (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গভবনে এরশাদ "জনদলের" নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ১৮ই মে (১৯৮৪) তারিখে পালিত হয় সাংবাদিকদের ২৪ ঘন্টার প্রতীক ধর্মঘট। ১০ই জুন (১৯৮৪) তারিখে এরশাদের সামরিক সরকার "দৈনিক দেশ" পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

২৭। জুন (১৯৮৪) মাসের শেষের দিকে একদিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া আমার আণবিক শক্তি কমিশনের অফিসে এসে আমার কাছ থেকে জানতে চান যে, তাঁদের দলনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার কোন আপত্তি আছে কিনা। বেগম জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার কোনরূপ আপত্তি নেই জেনে তিনি ঐব্যাপারে আমার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করবেন বলে চলে যান। উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া আশির দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এর আইন উপদেষ্টা হিসেবে। ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হয়। এরপর, কমিশনের কাজে আমাদের অফিসে এলে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার সঙ্গে দেখা করতেন। মাঝে মধ্যে এটাসেটা বিষয় ছাড়াও তিনি কিছু কিছু রাজনৈতিক বিষয়েও আমার সঙ্গে মতবিনিময় করতেন। বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথাবার্তা থেকে আমার ধারণা হয় যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক সংসদীয় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। যাহোক, উপরোক্ত ঘটনার দিন ছয়েক পর ব্যারিস্টার রফিকুর ইসলাম মিয়া আমাকে জানান যে, ঐ দিনই সন্ধ্যায় বেগম জিয়ার ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের জন্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতঃপর, ঐদিন যথাসময়ে আমার অফিসের গাড়ীতে ব্যারিস্টার রফিকের সঙ্গে বেগম

খালেদা জিয়ার বাসায় যাই। আমার জন্যে সময় রাখা হয়েছিল মাত্র আধাঘন্টা। কারণ ঐ রাতেই বি. এন. পি-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নির্ধারিত ছিলো ৭ দলীয় ঐক্যজোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা। যাহোক, সেদিন ব্যারিস্টার রফিকের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। বেগম খালেদা জিয়াকে স্বল্পভাষিণী বলে মনে হলো। কাজেই প্রায় সারাক্ষণ আমিই কথা বললাম। ১৯৭৪-এর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তৎকালীন সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার দু'বার যে দীর্ঘ আলাপ হয়েছিলো তার সম্পর্কে তখন বেগম খালেদা জিয়াকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। এ ছাড়াও আমার সপরিবারে দিল্লীতে থাকাকালীন ১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে জিয়াউর রহমান সাহেব ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব শামসুর রহমানের মাধ্যমে আমাকে যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক কাউন্সিলর নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎসম্পর্কেও বেগম জিয়াকে অবহিত করি। যাহোক, এ জাতীয় কথাবার্তার মধ্যদিয়ে সেদিনের সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হয়। এটাই বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার।

২৮। ৯ই জুলাই (১৯৮৪) তারিখে আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও হাসিনার অন্যতম পরামর্শদাতা এম. কোরবান আলী এরশাদের মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করেন। ১২ই জুলাই (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে কেবলমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৩০শে জুলাই (১৯৮৪) তারিখে এরশাদের মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করেন বি. এন. পি-এর অন্যতম প্রবীণ ও বিপ্লবী নেতা ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরী। এই দুই নেতার সামরিক জান্তার মন্ত্রী পরিষদে যোগদানে জনগণ শুধু বিস্মিতই নয়, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধও হন। কারণ, ইতিপূর্বে এই নেতৃদ্বয় সামরিক শাসন অবসানের দাবিতে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন এবং স্ব স্ব দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের কোন মতপার্থক্যের একটু আভাসও কোনভাবেই ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়নি। সুতরাং, তাঁরা যে গদি, ক্ষমতা ও অর্থের লোভে সামরিক জান্তার মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করেছিলেন সেসম্পর্কে জনমনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

২৯। ৪ঠা আগস্ট সামরিক সরকার প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়ায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করেন। এতে তাঁর কোন আন্তরিকতা বা কৃতজ্ঞচিত্ততা ছিল বলে আওয়ামী লীগের কেউই বিশ্বাস করেনি। ১৫ই আগস্ট (১৯৮৪) তারিখে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমাবাজি সংঘটিত হয়। এতে বেশ কিছু লোক কমবেশী আহত হয়। ১৮ই আগস্ট (১৯৮৪) তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রেডিও ও টিভি ভবনদ্বয়ের সামনে প্রদর্শিত হয় এক বিক্ষোভ মিছিল। ২৭শে

আগস্ট (১৯৮৪) তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। ৩০শে আগস্ট (১৯৮৪) তারিখে দেশের ডাক্তাররা পালন করেন ২৪ ঘন্টাব্যাপী ধর্মঘট। ১৪ই সেপ্টম্বর (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠিত সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবীদের সমাবেশে হাসিনা তাঁর ভাষণে ১৯৭৫ সালের পর সকল সরকারকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করে। এর ফলে বি. এন. পি-এর নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৮৪) তারিখে "দৈনিক দেশ" পত্রিকা প্রকাশের দাবীতে সারাদেশের সংবাদপত্রগুলো একদিনের জন্য বন্ধ থাকে।

৩০। ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৮৪) ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। এদিন কালিগঞ্জে প্রদর্শিত বিক্ষোভ মিছিলে সামরিক সরকারের গুণ্ডারা সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। এর ফলে উক্ত মিছিলে অংশগ্রহণকারী অনেক লোক আহত হয়। অতঃপর ছত্রভংগ মিছিল থেকে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও তৎকালীন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সমিতির চেয়ারম্যান জনাব ময়েজুদ্দিন আহমদ যখন আওয়ামী লীগ অফিসে ফিরছিলেন তখন গুণ্ডার সরদার আজম খানের নেতৃত্বে সামরিক সরকারের গুণ্ডা বাহিনী তাঁকে প্রকাশ্য দিবালোকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রতিবাদ বিবৃতি প্রদান ছাড়া তখন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আর কোন কর্মসূচী বা কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। এরশাদের মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম মন্ত্রী ও জনদলের তৎকালীন মহাসচিব মাহবুবুর রহমান উক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অনেককেই কানাঘুষা ও অভিযোগ করতে শোনা যায়।

৩১। ১লা অক্টোবর (১৯৮৪) তারিখে এরশাদ সাহেব মাহবুবুর রহমানকে একই সাথে মন্ত্রী পরিষদ এবং জনদলের মহাসচিবের পদ থেকে অপসারণ করেন। ঐদিনই মিজানুর রহমান চৌধুরীকে 'জনদলের' নতুন মহাসচিব নিযুক্ত করা হয়। ৩রা অক্টোবর (১৯৮৪) এরশাদের সামরিক সরকার সাপ্তাহিক 'ইত্তেহাদ' ও 'খবর' পত্রিকা দুটোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১১ই অক্টোবর (১৯৮৪) তারিখে ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিন্যুয়ে এরশাদ সাহেব জনসভায় ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে এরশাদ সাহেব বলেন যে, দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হলে তিনি তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেবেন। এরশাদ সাহেব আরও বলেন যে, মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করার পর তাঁর ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়। এদিকে জনদলের নতুন মহাসচিব মিজানুর রহমান চৌধুরী বিভিন্ন জনসভায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার আহবান জানান। কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের প্রধান শর্ত ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার। তখন সামরিক সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়, "ইতোপূর্বে সামরিক শাসনামলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাতে অংশগ্রহণ করেছে। অতএব এখন আপত্তি কেন ?"

৩২। ১৪ই অক্টোবর (১৯৮৪) ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় তাদের স্ব স্ব সমাবেশে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের সমাবেশে ৮ই ডিসেম্বরে ২৪ ঘন্টার হরতালসহ ২৭শে নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানানো হয়। অপরদিকে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের সমাবেশেও প্রায় অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু, ৭ দলীয় ঐক্যজোটের জনসভায় সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বলেন, "আমি এখনও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল রয়েছি।" উক্ত জনসভায় বি. এন. পি আমলের সংসদের স্পীকার মির্জা গোলাম হাফিজ বলেন, "আমি এখনও নির্বাচিত সংসদ স্পীকার। সুতরাং এরশাদের রাষ্ট্রপতি থাকার কোন বৈধ এখতিয়ার নাই।" এদিকে এরশাদ সাহেব নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন এবং বলেন, "বিরোধী (রাজনৈতিক) দলগুলো যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সামরিক শাসন অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হবে।"

৩৩। ২৭শে অক্টোবর (১৯৮৪) তারিখে সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ২৫শে নভেম্বর (১৯৮৪) তারিখে এরশাদ সাহেব সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে তাঁর চাকুরীর মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করেন। ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় ২৪ ঘন্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে এক বেতার ও টিভি ভাষণে এরশাদ সাহেব ৮ই ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন বাতিলের কারণ ব্যাখ্যা করে যথাশীঘ্র নির্বাচনের নতুন সময়সূচী ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেন। ইত্যবসরে, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে। এরই প্রেক্ষিতে ২০শে ডিসেম্বর (১৯৮৪) তারিখে সামরিক সরকার ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৮৪) দুই দিনের জন্য হরতালসহ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সামরিক সরকারের উক্ত ঘোষণা সত্ত্বেও সারাদেশে ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৮৪) বিরতিহীনভাবে পালিত হয় ৪৮ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরের শেষেরদিকে শফিক সিদ্দিক রেহানা ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে লন্ডন থেকে ঢাকায় চলে আসে কয়েক মাস তাঁর আব্বা-আম্মার সাথে কাটানোর জন্যে।

৩৪। ১৯৮৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় দেশে মন্ত্রী পরিষদ ও বিশেষ সামরিক আইন আদালতের বিলুপ্তি এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা পুনর্বহালের কথা বলা হয়। একই দিনে ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখ সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারণপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠানের নতুন তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৬ই জানুয়ারী (১৯৮৫) এরশাদ সাহেব ৭ জন নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। ১৯শে জানুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে আরও ৪ জন নির্দলীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ প্রদান করা

হয়। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে এক সরকারী ঘোষণায় আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দপ্তরের বিলুপ্তির কথা বলা হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাত সাড়ে এগারটার দিকে আততায়ীর গুলীতে ছাত্রনেতা রাউফুন বসুনিয়া নিহত হয়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে সরগরম হয়ে ওঠে। এহেন উত্তেজিত ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপ এবং বি. এন. পি-এর অংগদল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. রহমান ছাত্রাবাসে কে বা কারা অগ্নিসংযোগে উক্ত ছাত্রাবাসের অনেক ছাত্রের বিছানা-বইপত্রসহ বিপুল ক্ষতিসাধন করে। উক্ত ঘটনায় সামরিক সরকারের বিশেষ বিভাগের কতিপয় লোকের হাত ছিল বলে অনেককেই কানাঘুষা ও অভিযোগ করতে শোনা যায়। একই তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় সরকার ঘোষিত ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় আংশিক হরতাল পালিত হয় এবং সিলেটে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অফিসে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে এক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

৩৫। ১লা মার্চ (১৯৮৫) তারিখে তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও (স্বঘোষিত) রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রেডিও ও টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন যে, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতার কারণে প্রস্তাবিত ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখের সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর, তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্যে তিনি ২১শে মার্চ (১৯৮৫) তারিখে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এরশাদ সাহেব দেশে পুনরায় আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর এবং বিশেষ সামরিক আইন আদালত পুনর্বহালের কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং দেশে সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অতঃপর ২রা মার্চ (১৯৮৫) তারিখে নির্বাচন কমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচী বাতিল ঘোষণা করে।

৩৬। ৬ই এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) তারিখে উক্ত নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, তখন পর্যন্ত এরশাদ সাহেবের সমর্থক ও সহযোগিতাকারী জনদলের সাংগঠনিক অস্তিত্ব কিংবা জনসমর্থন বা জনপ্রিয়তা ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া তখন ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের দাবীর

প্রেক্ষিতে মন্ত্রী পরিষদ, আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর এবং বিশেষ সামরিক আইন আদালত বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সর্বোপরি, সংবিধানের মৌলিক ধারাসমূহও পুনর্বহাল করা হয়েছিল। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের তখন সংসদ নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্তকে অনেকেই রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা, অদূরদর্শিতা ও অবিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩৭। ইতিপূর্বে একদিন ছেলে জয় আমাকে কিছুটা অভিযোগের সুরে বলে, "আম্মু সারা দিনরাত রাজনীতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আমাদের জন্যে বিশেষ সময় দিতে পারে না। রোজ সকালে বেরিয়ে যায়। কোনদিন দুপুরে বাসায় ফেরে, আবার কোনদিন ফেরে না। কোনও দিন রাতে এগারো-বারোটার আগে বাসায় ফেরে না। তাছাড়া রাজনীতির কারণে আম্মুকে সরকার কয়েক মাস পরপরেই ঘরে বন্দী করে রাখে। এ অবস্থায় আমাদের লেখাপড়ার ভীষণ অসুবিধা হয়। কাজেই, আব্বু, আমাদেরকে ইন্ডিয়ার কোন বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করো।" হাসিনাও ছেলেমেয়েদের এই প্রস্তাবে রাজি হয়। অতঃপর, হাসিনা এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী জনাব আজিজ সাত্তারের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে। তাঁর কাছ থেকে ভারতের উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী শহর নৈনীতালস্থ স্কুলের ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর, ১২ই মার্চ (১৯৮৫) তারিখে রেহানা ও আমি ছেলে জয় ও মেয়ে পুতুলিকে নিয়ে দিল্লী হয়ে নৈনীতাল যাই। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন জনাব আজিজ সাত্তার, বেগম সাত্তার ও তাঁদের ছোট মেয়ে। তাঁদের সব ছেলে ও মেয়ে নৈনীতালস্থ মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেছে। সেবার, জনাব আজিজ সাত্তার কাকা জয় ও পুতলির নৈনীতালস্থ স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তা কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। উল্লেখ্য, নৈনীতালস্থ মিশনারী স্কুলগুলো অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ছেলেমেয়েদের মানুষ করা ও লেখাপড়া শেখানোই তাদের প্রধান ব্রত। প্রতি ছাত্রের জন্য খাওয়া-দাওয়া ,হোস্টেলভাড়া, বইপত্র, স্কুল ফি, চিকিৎসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির খরচ বাবদ প্রতিবছরে বিল হয় ভারতীয় মুদ্রায় পাঁচ হাজার রূপীর মতো। তাদের শুধু একটাই শর্ত। তা হচ্ছে, নাবালক ছেলেদের এবং বয়স নির্বিশেষে মেয়েদের শিক্ষাবর্ষের শুরুতে স্কুলে রেখে আসা এবং শিক্ষাবর্ষ শেষে স্কুল থেকে নেওয়ার সময় তাদের বাবা কিংবা মায়ের উপস্থিতির আবশ্যকতা।

৩৮। ২১শে মার্চ (১৯৮৫) তারিখে দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন সেনাবাহিনী চীফ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও (স্বঘোষিত) প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ওপর জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্যে। উক্ত গণভোটে এরশাদ সাহেব বিপুল আস্থাভোট পেয়েছিলেন বলে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে। ২৪শে মার্চ (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেবের মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ও তৎকালীন ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ৯ই

এপ্রিল (১৯৮৫) তারিখে নির্বাচন কমিশন ১৬ই ও ২০শে মে (১৯৮৫) তারিখে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ১৬ই মে (১৯৮৫) তারিখে প্রথম ২৫১টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশিষ্ট উপজেলাগুলোয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০শে মে (১৯৮৫ তারিখে। ২৫শে মে (১৯৮৫) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

৩৯। ৩রা জুলাই (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেব পুনরায় জনদলের নেতৃস্থানীয় ১১ জন নেতাকে তাঁর মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৯শে জুলাই (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেব আরও ১ জন মন্ত্রী, ১ জন উপমন্ত্রী ও ১ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। ২৩শে জুলাই (১৯৮৫) তারিখে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দীর্ঘ ৫ মাস বন্ধ থাকার পর পুনরায় ক্লাস শুরু করে। ২রা আগস্ট (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেব আরও ৪ জন মন্ত্রী নিয়োগ করেন। ৫ই আগস্ট (১৯৮৫) তারিখে এরশাদ সাহেবের মন্ত্রী পরিষদে যোগদান করেন বি. এন. পি-এর বিশিষ্ট নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। ১৬ই আগস্ট (১৯৮৫) তারিখে জনদল ভেঙ্গে দিয়ে এরশাদ সাহেব গঠন করেন পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি 'জাতীয় ফ্রন্ট'। ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) তারিখে সামরিক সরকার দেশে ১লা অক্টোবর (১৯৮৫) থেকে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৫ই অক্টোবর (১৯৮৫) তারিখে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ইন্তেকাল করেন। ১১ই নভেম্বর (১৯৮৫) তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৮৫) তারিখে এক রেডিও ও টিভি ভাষণে এরশাদ সাহেব দেশে ১লা জানুয়ারী (১৯৮৬) তারিখ থেকে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৪০। ১লা জানুয়ারী (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব নিজেকে (অঘোষিত) চেয়ারম্যান করে গঠন করেন 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল। ২রা মার্চ (১৯৮৬) তারিখে এক রেডিও ও টিভি ভাষণে এরশাদ সাহেব ২৬শে এপ্রিল (১৯৮৬) তারিখে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এর পর ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের পক্ষ থেকে হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহবান জানানো হয় প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে তাঁদের প্রত্যেকে ১৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। এরই প্রেক্ষিতে সামরিক সরকার সংসদ নির্বাচনে একজন প্রার্থীর একসঙ্গে ৫টির বেশী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সীমাবদ্ধতা আরোপ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ই মার্চ (১৯৮৬) তারিখে। ইত্যবসরে, ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় ঘোষণা দেয় ২২শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী।

৪১। ২১শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখ সন্ধ্যায় ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব জোটের আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। ঐদিনই রাত সাড়ে আটটায় এরশাদ সাহেব রেডিও ও টিভিতে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান। অন্যথায় সামরিক আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের হুঁশিয়ার করে দেন। সেদিন ১৫ দলের বৈঠক শেষে হাসিনা, আওয়ামী লীগের আব্দুল মান্নান, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমদ, আব্দুল জলিল, সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, প্রমুখ নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে করে আমাদের মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি আবাসিক কলোনীর ফ্ল্যাটে ফেরে রাত আড়াইটার দিকে। তাঁদের কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে, ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু পরদিন অর্থাৎ ২২শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখের সকালে রেডিওতে কেবলমাত্র ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়। সেদিন সারাদিন ৭ দলীয় ঐক্যজোট কিংবা অন্য কোন দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪২। ২২শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখে ছিলো ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের সকাল-সন্ধ্যা সারাদেশে হরতাল পালনের কর্মসূচী। কিন্তু উপরোল্লিখিত কারণে হরতাল পালনে আগের মতো তেমন কোন জোর তৎপরতা বা কর্মচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়নি। সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডস্থ বাসভবনে নির্ধারিত ছিলো ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতাদের আলোচনা বৈঠক। আমি সেখানে পৌছাই পৌনে আটটার দিকে। উক্ত সভা থেকে এক এক করে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন আওয়ামী লীগের আব্দুল জলিল, আমির হোসেন আমু এবং তৎকালীন বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। সবার শেষে আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন। প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে আমি তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে রাশেদ খান মেনন বলেন, "ওয়াজেদ ভাই, একথা সত্য যে, গতরাতে আমরা ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের নেতারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার। কিন্তু আজ দুপুরে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে টেলিফোনের আলাপে মনে হলো তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি নন। এই সভায় আসার আগেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি। কিন্তু তিনি ইতিবাচক কোন কথা দেননি। আমি জানি, বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আপনার সুসম্পর্ক রয়েছে। অতএব, আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝালে বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি হতে পারেন।" রাশেদ খান মেননের এ প্রস্তাবের জবাবে আমি তাঁকে বললাম, "এগুলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এ সমস্ত ব্যাপারে তোমাদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন হবে।" এর প্রায় দেড় ঘন্টা পর আমি সেখান থেকে চলে আসি। পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জানা

যায় যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের নির্মল সেন, রাশেদ খান মেনন, দিলীপ বড়ুয়ার তিনটি দলসহ মাওবাদী বামপন্থী পাঁচটি দল এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার। ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের অবশিষ্টাংশ, আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল এবং আরও বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ইত্যবসরে, সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৬শে এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ই মে (১৯৮৬) তারিখ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়।

৪৩। ২৩শে মার্চ (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেবের পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিরা তাঁর মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২রা এপ্রিল (১৯৮৬) তারিখে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল, প্রাজ্ঞ বিচারপতি মোহাম্মদ হোসেন ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা ব্যক্ত করেন। সেদিন আমিও মরহুমের বাসায় গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ২৯শে এপ্রিল (১৯৮৬) তারিখে সামরিক সরকার দেশে নির্বাচনবিরোধী যে কোন তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ঠা মে (১৯৮৬) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের সঙ্গে বি. এন. পি-এর অঙ্গদল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের সংঘর্ষ ঘটলে ছাত্রদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

৪৪। ৭ই মে (১৯৮৬) তারিখে দেশে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত নানান প্রকারের হিংসাত্মক ঘটনায় বহুলোক আহত এবং ১৯ জন নিহত হয়। ১০ই মে (১৯৮৬) তারিখ পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট বিপুলসংখ্যক আসনে অনেক ভোটের ব্যবধানে অগ্রগামী ছিল। এর পর, তিন-চার দিনের জন্যে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখা হয়। অতঃপর পুনরায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা শুরু করা হয় এবং তা শেষ হয় ১৯শে মে (১৯৮৬) তারিখে। ঐ দিনের রেডিও ও টিভির সংবাদে সরকারী দল জাতীয় পার্টি নির্বাচনে ১৫৮টি আসনে জয়লাভ করে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। উক্ত সংবাদ বুলেটিনে আরও বলা হয় যে, তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐকজোট ৯৬টি আসন, জামাতে ইসলামী ১০টি আসন, আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৪টি আসন এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দলগুলো ১০টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থীরা ২২টি আসনে জয়লাভ করে। ঐদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন যে, এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জালভোট প্রদান এবং সর্বোপরি, সরকারী

প্রশাসনিক যন্ত্রসহ নির্বাচন কমিশনকে ভীতি প্রদর্শনে সরকারের পক্ষে ব্যবহার করে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ৮ দল দলীয় ঐক্যজোটের (প্রকৃত) বিজয়কে নস্যাৎ করা হয়েছে।

৪৫। ১৫ই জুন (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব একটি অধ্যাদেশে গঠন করেন 'প্রেসিডেন্টের বিশেষ দেহরক্ষী বাহিনী'। ২৮শে জুন (১৯৮৬) তারিখে প্রবীণ রাজনীতিবিদ হাজি দানেশ ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ৭ই জুলাই (১৯৮৬) জাতীয় পার্টির ৩০ জন মহিলাকে সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। ৯ই জুলাই (১৯৮৬) এরশাদ সাহেব নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া, উক্ত মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্যরা ছিলেন জাতীয় পার্টির সদস্য। মিজানুর রহমান চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা নিযুক্ত করা হয়। জাতীয় পার্টির শামসুল হুদা চৌধুরী সংসদ স্পীকার নির্বাচিত হন। ১০ই জুলাই (১৯৮৬) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে এরশাদ সাহেব ভাষণ দেন। আ. স. ম. আব্দুর রবের জাসদ এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ব্যতীত সকল বিরোধী দলের সদস্যরা উক্ত অধিবেশন বর্জন করেন।

৪৬। ২০শে আগস্ট (১৯৮৬) তারিখে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ২৬শে আগস্ট (১৯৮৬) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় সংসদের ৮টি আসনের উপনির্বাচন। উক্ত উপনির্বাচনে প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ও সরকারী প্রার্থীদের পক্ষে জালভোট প্রদানের মাধ্যমে ৮টি আসনেই জাতীয় পার্টির প্রার্থীদেরকে জয়যুক্ত করা হয়। ২৮শে আগস্ট (১৯৮৬) তারিখে তৎকালীন মেজর জেনারেল আতিকুর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে নিজেকে তার চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব নিজেকে লেঃ জেনারেলের পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে, এক সরকারী ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে নির্ধারণ করা হয় ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখ।

৪৭। উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারণ করা হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৬)। মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখের চার-পাঁচ দিন আগে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ৭ দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। অপরদিকে, ৮ দলীয় ঐক্যজোট সিদ্ধান্ত নেয় এই মর্মে যে, বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলে ম্যাডাম হাসিনা হবেন এই ঐক্যজোটের প্রার্থী। মনোনয়ন দাখিলের আগের দিন সকাল ১০টার দিকে বি. এন. পি-এর অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া হাসিনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে আমাদের

মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি আবাসিক কলোনীর ফ্ল্যাটে আসেন। তাঁদের আলোচনার সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরশাদ যদি কোনক্রমে উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী হন তাহলে তিনি (এরশাদ) বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে বৈধভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। এর ফলে এরশাদের অবস্থান শুধু শক্তিশালীই হবে না, এরশাদবিরোধী আন্দোলনও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। অতএব, সাব্যস্ত হয় যে ,হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া এই দুই নেত্রীর কেউই প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। অতঃপর, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া আমাদের বাসা থেকেই টেলিফোনে বেগম খালেদা জিয়াকে তৎমর্মে অবহিত করেন। তখন তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে এও বলেন যে, উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আমার উপস্থিতিতেই।

৪৮। ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট, বি. এন. পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট, মাওবাদী বামপন্থী ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামাতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যাহোক, এরশাদসহ, খুনী লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফারুক, কয়েকটি ক্ষুদ্র ও নামসর্বস্ব দলের প্রার্থী এবং রাজনীতিতে অপরিচিত কয়েকজন প্রার্থীদের নিয়ে মোট ১৬জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন উক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের বিরোধিতায় সামরিক সরকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনবিরোধী যে কোন তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতঃপর, ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ঐ দিনই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল ও জামাতে ইসলামীর আহবানে সেদিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালিত হয়। ২৩শে অক্টোবর (১৯৮৬) তারিখে লেঃ জেনারেল (অবঃ) এইচ. এম. এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

৪৯। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর শুরু হয় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের জাতীয় পার্টির সদস্যভূক্ত করার লীলাখেলা। অতঃপর মন্ত্রিত্ব, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পদ ও অর্থের লোভে ২২ জন স্বতন্ত্র সদস্যের প্রায় সবাই জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। ১০ই নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখে সরকারী দল, আ. স. ম. আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ক্ষুদ্র দলের কয়েকজন সদস্য এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সহযোগিতায় সংসদে পাস করিয়ে নেয় সংবিধান সপ্তম সংশোধনী। উক্ত সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইনের ক্ষমতাবলে গৃহীত ও কৃত সকল পদক্ষেপ, ক্রিয়াকলাপ ও কার্যক্রমকে বৈধ করে নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধা ও তৎকালীন বাকশালের বিশিষ্ট নেতা লতিফ সিদ্দিকীর পত্নী ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য লায়লা সিদ্দিকী সপ্তম সংশোধনীর পক্ষে ভোট দেন। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয়

ঐক্যজোট এবং জামাতে ইসলামীর সংসদ সদস্যরা সপ্তম সংশোধনীর বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। যাহোক, ঐদিনই সারাদেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর ১৩ই নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখে ইতিপূর্বে সামরিক আদালতে ৪২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও তৎকালীন বাকশালের নেতা লতিফ সিদ্দিকীকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩০শে নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখে এরশাদ সাহেব তাঁকে এবং তাঁর দলকে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনদ্বয়ে বিজয়ী করার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্যে তাঁর (এরশাদের) কৃতজ্ঞতার প্রতীক স্বরূপ তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি নুরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন।

৫০। এদিকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের প্রধান হিসেবে ম্যাডাম হাসিনা সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী নির্বাচিত হন। অতঃপর আওয়ামী লীগের আব্দুল মালেক উকিলকে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা নিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট ঘোষণা দেয় যে, জোটের সংসদ সদস্যরা সংসদে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের জনস্বার্থবিরোধী, অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী কার্যক্রম ও ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করবেন। ৮ দলীয় ঐক্যজোট আরও ঘোষণা করে যে, তারা সংসদের বাইরে অন্যান্য সমমনা ও সমমতাবলম্বী দলগুলো ও জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক পন্থায় সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে যাবে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশে জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট জবাবদিহিমূলক দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার, শাসন ব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্যে। ৫ দলীয় পিকিং (বেজিং) পন্থী ঐক্যজোটও অনুরূপ ঘোষণা দেয়। অপরদিকে, বি. এন. পি. নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও জামাতে ইসলামী স্বৈরতন্ত্র তথা এরশাদ সরকারকে উৎখাত করার সংগ্রাম ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে।

৫১। ১লা জানুয়ারী (১৯৮৭) তারিখে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন শিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি. এ. এল)–এর তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, . . . "আমরা সুদীর্ঘকালের সংগ্রাম শেষে রক্ত দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, জীবন দিয়ে হলেও আমাদের সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে কোন মূল্যে চলমান গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশরূপে আমরা গড়ে তুলতে চাই।". . . এক পর্যায়ে দেশের সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্যে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "আওয়ামী লীগ যে কোন মূল্যে আমাদের জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেনাবাহিনীকে (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা দখলের হাতিয়ারে পরিণত না করে সংবিধানে

লিপিবদ্ধ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে পবিত্র দায়িত্ব সেনাবাহিনীর উপর অর্পিত (রয়েছে) তা রক্ষা করা এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় না করিয়ে জনগণের আস্থাভাজন সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো এবং তার সত্যিকার উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।" তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের শেষে হাসিনা ও বেগম সাজেদা চৌধুরী আওয়ামী লীগের যথাক্রমে সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

৫২। ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৭) তারিখে ঢাকায় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ২১শে এপ্রিল (১৯৮৭) সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ২১শে জুন (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে দেশব্যাপী পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ২৬শে জুন (১৯৮৭) তারিখে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ নেতৃত্বাধীন এবং বি. এন. পি. –এর অংগ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন দুই ছাত্র গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ১২ই জুলাই (১৯৮৭) তারিখে সরকার জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) সংশোধনী বিল তাড়াহুড়ো করে কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে নেয়। উক্ত বিলের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত করার ব্যবস্থা করা হয়। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের সংসদ সদস্যরা উক্ত বিল পাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ থেকে বেরিয়ে আসেন। পরদিন অর্থাৎ ১৩ই জুলাই (১৯৮৭) তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে উক্ত বিল পাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৪ই জুলাই (১৯৮৭) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপ এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের মধ্যে তুমুল সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে যার ফলে অনেক ছাত্র আহত ও দুই জন নিহত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ১৮ই জুলাই (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ঘোষণা করে জেলা পরিষদ বিল পাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ২২শে জুলাই (১৯৮৭) তারিখ থেকে সারাদেশে বিরতিহীন ৫৪ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচী। এই হরতাল কর্মসূচী সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়। ২৪শে জুলাই (১৯৮৭) তারিখে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় ৮ দলীয় ঐক্যজোট ৩০শে জুলাই (১৯৮৭) তারিখে সারা ঢাকায় বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচী ঘোষণা করে। বি. এন. পি. ৩০শে জুলাই (১৯৮৭) তারিখের কর্মসূচীতে যোগদান করে কিন্তু রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ঘেরাও করতে অস্বীকার করে। অতঃপর ১লা আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব বাধ্য হয়ে 'জেলা পরিষদ' বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্যে সংসদে ফেরত পাঠান।

৫৩। ১২ই আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে সারাদেশে পালিত হয় শ্রমিক–কর্মচারী ঐক্যপরিষদ আহূত ২৪ ঘন্টা হরতাল। ১৩ই আগস্ট (১৯৮৭) তারিখ সরকার দৈনিক 'বাংলার বাণী'

পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৬ই আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ঘোষণা করে ৭ই অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী। ২৮শে আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব এক ঘোষণায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে বঙ্গভবনে আলোচনা বৈঠকের আহবান জানান। ২৯শে আগস্ট (১৯৮৭) তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোট এরশাদ সাহেবের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোটও এরশাদ সাহেবের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় দেশে ভয়াবহ বন্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে 'ঢাকা অবরোধের' কর্মসূচী ৭ই অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখের পরিবর্তে ১০ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭ই অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলের উপনেতা আব্দুল মালেক উকিল ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে পালিত হয় শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ আহূত বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার হরতাল। ২১শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তাবিত ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর ব্যাপারে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক। ২৪শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে সরকার বিরোধী ঐক্যজোটত্রয়ের 'ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীকে' বেআইনী ঘোষণা করে। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট সরকারের এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইতিপূর্বে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ঘোষণা করে ২৬শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে উপজেলা সদরসমূহ এবং ১লা নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে জেলা সদরসমূহ ঘেরাও কর্মসূচী। ২৬শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে 'উপজেলা সদরসমূহ' ঘেরাও কর্মসূচী যথাযথভাবে পালিত হয়।

৫৪। ২৮শে অক্টোবর (১৯৮৭) তারিখে সন্ধ্যা ৬টার দিকে হাসিনা মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি কমিশনের আবাসিক কলোনীর ফ্ল্যাটে আমাকে টেলিফোনে জানায় যে, বেগম খালেদা জিয়া বি. এন. পি. -এর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যে ৭টার দিকে সেখানে আসবেন তাঁর ও আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্যে। হাসিনা আমাকে আরও বলে যে, আমি যেন আণবিক শক্তি কমিশনের গেস্টহাউসের বৈঠকখানাটি তদুদ্দেশ্যে বন্দোবস্ত করে রাখি। বেগম খালেদা জিয়া কয়েকজন বি. এন. পি.-এর শীর্ষস্থানীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আসেন রাত পৌনে সাতটার দিকে। হাসিনা তখনও সেখানে পৌঁছায়নি। অতএব আমি বেগম খালেদা জিয়া ও বি. এন. পি. -এর অন্যান্য নেতাদের আণবিক শক্তি কমিশনের গেস্টহাউসের বৈঠকখানায় নিয়ে যাই। অনেক সাংবাদিক ও বি. এন. পি.-এর কর্মীদের ভিড়ে সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় আমি বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দদেরকে গেস্টহাউসের একটি কক্ষে বসানোর ব্যবস্থা করি। হাসিনা আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে

পৌছায় সোয়া সাতটায়। কিছু কথাবার্তার পর নেতৃবৃন্দরা আমার ফ্ল্যাটের বৈঠকখানাটি সাব্যস্ত করেন আলোচনা বৈঠকের জন্যে। অতঃপর তাঁরা সবাই চলে আসেন আমার ফ্ল্যাটের বৈঠকখানায়। নেতা-নেত্রীদের অনুরোধে আমিও সেখানে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হই। প্রায় এক ঘন্টা ধরে আলোচনার পরও তাঁরা আন্দোলনের দাবীনামার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌছতে ব্যর্থ হলে আমি তাঁদেরকে সবিনয়ে বললাম, "আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাবেন শুধু এই মর্মে আজকের মতো একটি যৌথ ঘোষণা দিন। এর ফলে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সঞ্চারিত হবে দারুণ গতি ও শক্তি। ইত্যবসরে, বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনের দাবীনামা ও অন্যান্য কর্মসূচী সাব্যস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।"

৫৫। এরপর নেতৃবৃন্দ আরও কিছু কথাবার্তা বলে দুই নেত্রীর নামে একটি যৌথ ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তৎক্ষণাৎ একটি যৌথ ঘোষণাপত্র তৈরী করা হয়। অতঃপর নেতৃবৃন্দ পুনরায় গেস্টহাউসের বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের উক্ত ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান। উক্ত যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, "স্বৈরাচারী (এরশাদ) সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে আমরা ১লা ও ১০ই নভেম্বরসহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচীর সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবো। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১-এর চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য। এরশাদের (স্বৈরাচারী) সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা আহবান জানাই।" উল্লেখ্য, উক্ত ইশতেহার দুই নেত্রীর নামে ঘোষিত হলেও তাতে কেউই স্বাক্ষর করেননি। এই ঘোষণার মধ্যদিয়ে সেদিন সমাপ্ত হয় দুই নেত্রীর শীর্ষবৈঠক। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় বেগম খালেদা জিয়া কতিপয় সাংবাদিককে বলেন, "আজকের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করার জন্যে আমরা ডঃ ওয়াজেদকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।"

৫৬। ১লা নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের জেলা দফতরসমূহ ঘেরাও কর্মসূচী যথাযথভাবে পালিত হয়। ইতিপূর্বে উপজেলা দফতর ঘেরাও কর্মসূচী পালনের সময় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর বহু স্থানীয় নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২রা নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার চারজন সংসদ সদস্যসহ ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের দুইশতেরও বেশী নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে। ৮ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এক সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা শহরে পাঁচ বা ততোধিক লোকের মিছিল ও সমাবেশ ১৫ই নভেম্বর (১৯৮৭) পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐদিনই সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। ৯ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার দেশের কয়েকটি ফেরীঘাট ও ঢাকামুখী যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ করে দেয়।

৫৭। ১০ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর এরশাদ সরকার পদত্যাগের দাবীতে আহূত 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচী। সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা

ভঙ্গ করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। কয়েক স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিছিলকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলিবর্ষণ করে। এতে চারজন নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়। নিহতদের অন্যতম ছিল নূর হোসেন নামে এক বলিষ্ঠ সুঠামদেহী যুবক। নূর হোসেন তার জামাবিহীন শরীরের বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক' এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখিয়ে নিয়ে একটি ছাত্র-জনতার মিছিলের অগ্রভাগে ছিল। মিছিলটি গুলিস্তানস্থ 'গোলাপ শাহ' মাজার হয়ে জি,পি,ও-এর সম্মুখস্থ জিরো পয়েন্টে পৌছানোর পূর্বেই ঘাতকের বুলেট নূর হোসেনের বুক ভেদ করে বের হয়ে যায়। লুটিয়ে পড়ে নূর হোসেনের দেহ। অকুস্থানেই তাঁর মৃত্যু হয়। নূর হোসেনের শরীরের বুকে ও পিঠে লেখা 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক' ও 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' শ্লোগান সম্বলিত ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫৮। ১১ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী হাসিনা ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে তাঁদের স্ব স্ব বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখে। হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকার মিরপুর রোডের এক মিছিল থেকে এবং বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হয় ঢাকার হোটেল পূর্বাণীর একটি কক্ষ থেকে। ৯ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখ রাতে বেগম খালেদা জিয়া সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১২ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীগুলোকে 'দেখামাত্র গুলী করার' নির্দেশ দেয়। তা সত্ত্বেও ১২ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সারাদেশে পূর্ণ হরতাল পালনের সময় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকে। ১৪ থেকে ১৭ই নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে প্রতিদিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। এ সমস্ত দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার অনেক সংঘর্ষ হয়। এই সময় শত শত রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্র নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ২১শে ও ২২শে নভেম্বর(১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহ্বানে সারাদেশে পালিত হয় বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল। অতঃপর ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ২৫শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার ঢাকার কয়েকটি স্থানে সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২৬শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘটে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ২৭শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণাসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জে 'সান্ধ্য আইন' জারি করে।

৫৯। ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টিভি ভাষণে রাজনৈতিক সমস্যার নিরসনে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেন। ২৯শে, ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখগুলোয় ৮, ৭ ও ৫ দলীয়

ঐক্যজোটগুলোর আহবানে সারাদেশে বিরতিহীন ৭২ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে সরকার সাপ্তাহিক 'রোববার' পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৫ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে জামাতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য সংসদপদ থেকে ইস্তফা দেন। ইত্যবসরে, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের এক সভায় জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে এরশাদ সাহেব তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১০ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। একই দিনে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর ১৯ জন নেতাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১১ই ডিসেম্বর সরকার দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে সারাদেশে বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। অতঃপর ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে শুধু ঢাকা শহরে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে আওয়ামী লীগের আব্দুল মান্নানসহ মোট ৪ জন রাজনৈতিক নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

৬০। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখে তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার পর একদিন পরবর্তী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এরশাদ সাহেব বলেন, "সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর (১৯৮৭) তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যেই চতুর্থ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।" এদিকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনে এরশাদ সাহেব নতি স্বীকার করায় সরকারী 'জাতীয় পার্টির' নেতা ও কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে দারুণভাবে। একই সঙ্গে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী তখন জাতীয় পার্টির 'হাই কমান্ড'সহ নেতা ও কর্মীদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। এহেন পরিস্থিতিতে চতুর্থ সংসদের নির্বাচনে শোচনীয় বিপর্যয়ের আশংকায় জাতীয় পার্টির নেতা ও কর্মীরা নিপতিত হয় দারুণ দুশ্চিন্তায়। এই প্রেক্ষাপটে তখন বিভিন্ন মহল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর নেতৃবৃন্দের প্রতি আকার-ইংগিতে আহবান জানায় অন্ততঃ ন্যূনতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে চতুর্থ সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্যে। এদিকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের নেতৃবৃন্দও পৃথকভাবে আবার কখনো কখনো লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে যৌথভাবে বিভিন্ন সময়ে বৈঠকে মিলিত হন পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

৬১। ঐ সময় আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের কয়েকটি আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকি। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের অনেক নেতাই এই অভিমত ব্যক্ত

করেন যে, বেগম খালেদা জিয়ার ৭ দলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি হলেই কেবল ৮ দলীয় এক্যজোটের উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। ৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দও একই মত পোষণ করেন। উপরন্তু, তাঁরা ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর ন্যূনতম ঐকমত্য ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব করেন। চতুর্থ সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর নেতৃবৃন্দের যখন নিজেদের মধ্যে এসব আলাপ-আলোচনা বৈঠক চলছিল, তখন জানুয়ারী (১৯৮৮)-এর গোড়ার দিকে একদিন সন্ধ্যায় আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ধানমণ্ডিস্থ কার্যালয়ে যাই। তখন সেখানে বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দের আলোচনা বৈঠক চলছিল। বৈঠক শেষে, উক্ত কক্ষে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর আমি তাঁদের ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে একান্তে কিছু কথাবার্তা বলার প্রস্তাব করি। আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তখন ৭ দলীয় ঐক্যজোটের অন্যান্য নেতারা উক্ত কক্ষ ত্যাগ করেন। বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকেন বি. এন. পি.-এর প্রফেসর জাহানারা বেগম। অতঃপর আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দেওয়ার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তার কাছ থেকে জানতে চাই যে, ৭ দলীয় ঐক্যজোট চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি-না। এর জবাবে বেগম খালেদা জিয়া বললেন, "এরশাদের পদত্যাগের পূর্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের কোনও নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।" এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের ন্যূনতম ঐকমত্য ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বেগম খালেদা জিয়া কোন কথাই বললেন না। যাহোক, পুনরায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সেখান থেকে চলে আসি। এর কয়েক দিন পর ৮ই জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের লিয়াজোঁ কমিটি এক বৈঠকে এরশাদের অধীনে চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬২। ২০শে জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে সারাদেশে পালিত হয় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য-জোটগুলোর আহূত হরতাল। ২০শে জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য-জোটত্রয়ের আহূত হরতাল চলাকালে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে জাতীয় পার্টির মাস্তানদের সঙ্গে তাদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। ২৪শে জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে হাসিনা চট্টগ্রাম শহরের লালদীঘির ময়দানে পূর্বনির্ধারিত ৮ দলীয় ঐক্যজোটের জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সেখানে যায়। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের অনেক নেতৃবৃন্দই তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল ছাত্র-জনতা ভোর থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। সকাল সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে নেতৃবৃন্দ পৌঁছান এবং লালদীঘির ময়দানে মাত্র আধঘন্টার পথ যেতে তাদের সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘন্টা।

৬৩। বিকেল পৌনে ছ'টায় বিশাল মিছিলসহ হাসিনা একটি ট্রাকে কোর্ট রোডস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়ে পৌঁছায়। লালদীঘির ময়দানে ভাষণ দেওয়ার পূর্বে হাসিনার আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল সেখানের আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে। কিন্তু পুলিশ সেখানে মুসলিম হাই স্কুলের সামনের মোড়ে হাসিনার গাড়ীকে বাধা দেয়। তখন জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে হাসিনার বাকবিতণ্ডা চলাকালে হঠাৎ মুসলিম হাই স্কুলের সামনে থেকে কে বা কারা হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। তৎমুহূর্তে হাসিনাকে গুলীর মুখ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাঁচাতে গিয়ে সেই গুলীতে সেখানেই প্রাণ হারায় আবুল কাসেম নামে এক যুবক। এর পর শুরু হয় এক নারকীয় ঘটনা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলী বর্ষণে সেখানে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। এক পর্যায়ে আদালত ভবন থেকে কয়েকশত আইনজীবী মিছিল সহকারে সেখানে গিয়ে হাসিনাকে তার গাড়ীসহ আদালত ভবনে নিয়ে যান। এরপর শুরু হয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী সরকারের ভাড়াকরা সশস্ত্র মাস্তান-গুণ্ডাদের সঙ্গে ছাত্র-জনতা-শ্রমিকের তুমুল সংঘর্ষ। উক্ত ঘটনায় নিহত হয় ২৫/৩০ জন এবং আহত হয় বিপুল ছাত্র-জনতা। আহত ও নিহতদের চাপে হাসপাতাল ভরে যায়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৫শে জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে চট্টগ্রামে অর্ধদিবস এবং ২৬শে জানুয়ারী (১৯৮৮) তারিখে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

৬৪। চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ছিল ৩রা মার্চ (১৯৮৮) তারিখ। উক্ত নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ দেখানোর জন্যে এরশাদ সাহেব নিজেই অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর আ. স. ম. আব্দুর রবের নেতৃত্বে গঠন করান সম্মিলিত বিরোধী দল, COP (Combined Opposition party)। অপরদিকে, উক্ত নির্বাচন বর্জন করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে ইতিপূর্বে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ৩রা মার্চ সকাল ৬টা থেকে ৪ঠা মার্চ (১৯৮৮) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিরতিহীন ৩৬ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত হরতাল পালিত হয় যথাযথভাবেই যার ফলে নির্বাচনের দিনে জাতীয় ও COP-এর লোকেরা ছাড়া ভোট কেন্দ্রসমূহে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। এ সত্ত্বেও সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোয় ঘোষণা করা হয় যে, ৬০ শতাংশেরও বেশী ভোটার উক্ত নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন। প্রহসনমূলক উক্ত নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০ আসনের ২৫১টি এবং সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) ১৯টি, ক্ষুদ্র দলগুলো ৫টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫টি আসন পান বলে ঘোষণা করা হয়।

৬৫। ২১শে এপ্রিল (১৯৮৮) তারিখে আ. স. ম. আব্দুর রব কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্যকে সম্মিলিত বিরোধী দলে অন্তর্ভুক্ত করে চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত জনসভায় এরশাদ সাহেব বলেন যে, যেহেতু

বাংলাদেশের আশি শতাংশেরও বেশী লোক মুসলমান, সেহেতু 'ইসলাম ধর্ম'কে জাতীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা উচিৎ। ৩রা মার্চ (১৯৮৮) তারিখের সংসদের তথাকথিত নির্বাচনের পর বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি একই কথা বলেন। এরপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, এরশাদ সাহেবের ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক জাতীয় সংসদে পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থাদিসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তনপূর্বক 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করার পরিকল্পনা রয়েছে। অতঃপর ১১ই মে (১৯৮৮) তারিখে এরশাদের সরকার 'ইসলাম ধর্ম'কে জাতীয় ধর্মের মর্যাদাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করে একটি সংবিধান অষ্টম সংশোধন (১৯৮৮) বিল। ৭ই জুন (১৯৮৮) তারিখে জাতীয় সংসদে সংবিধান অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮) অনুমোদিত হয়। সংবিধানের এই অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়সহ সংবিধানে 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তাতে বলা হয়, "ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে।" সংবিধান অষ্টম সংশোধনীর এই বিষয় সম্পর্কে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের রীতিনীতি মেনে চলি।" অপরদিকে, বি. এন. পি. নেত্রী ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এরশাদ সাহেবের এই ঘোষণাকে একটি ভণ্ডামিমূলক প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, "এরশাদ বিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য।" ঐ সময়ে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সি. আর. দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বিল প্রত্যাহারের দাবীতে গঠিত হয় 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ'। উক্ত সভায় এই তিন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "এ প্রচেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে।" দেশের বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বে এরশাদের সরকার 'রাষ্ট্রীয় ধর্ম' বিল সংসদে পাস করিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৩ই জুন (১৯৮৮) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল।

৬৬। জুন মাসের পর ১৯৮৮ সালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এরশাদ বিরোধী কোন আন্দোলন সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ দেশের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বি. এন. পি.-এর মধ্যে আদর্শগত এবং রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ। এ ছাড়াও, এই দল দুইটির নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিককাল অধিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যে এরশাদ সাহেব এই বিষয়গুলোর শুধু ব্যবহারই করেননি, তিনি এই দুইটি দলের নেতৃত্বের

বিরোধকে আরও প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন সুচতুর কূটকৌশলে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর হতে এই দুইটি দলের নেতৃত্বদ্বয় যতোটা সময় ব্যয় করেন এরশাদ ও তাঁর সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতায়, তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করেন ও ব্যস্ত থাকেন পারস্পরিক সমালোচনায়। একদিকে ম্যাডাম হাসিনা জিয়াউর রহমান সাহেবের শাসন আমলে বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যা, জনগণের বাড়ীঘর, দোকানপাট ও কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর লোকদের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী শান্তিকমিটি, রাজাকার, [illegible]র, আল শামস, ইত্যাদি বাহিনীর নেতা ও কর্মী এবং স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতি[illegible] দলগুলোর নেতা-কর্মী ও স্বাধীনতাবিরোধী অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন এবং সর্বোপরি, বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের আত্মস্বীকৃত খুনী ফারুক-রশিদ-ডালিম চক্রের সদস্যদের চাকুরীতে পুনর্বহালপূর্বক বাংলাদেশের বিদেশস্থ দূতাবাস ও মিশনসমূহে পদস্থকরণের কথা উল্লেখ করে বি. এন. পি.-এর তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। অপরদিকে, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে বারংবার উল্লেখ, বঙ্গবন্ধুর একদলীয় (রাষ্ট্রপতি) সরকার ও শাসন প্রবর্তনের জন্য দোষারোপ এবং মুসলিম লীগ, পি. ডি. পি., জামাতে ইসলামী প্রভৃতি দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের মতো বঙ্গবন্ধুর সরকার ভারতের তল্পীবাহক ও তাঁবেদার সরকার ছিল বলে আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। দেশের এরশাদ ও তার সরকারবিরোধী এই দুইটির বৃহৎ দলের নেতৃত্বের এহেন বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদানে জনগণ শুধু হতাশাগ্রস্তই হয়নি, বিভ্রান্তও হন দারুণভাবে। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে এরশাদ ও তার সরকার শুধু লাভবানই হননি, নির্বিঘ্ন ও নির্ঝন্ঝাটে অতিবাহিত করেন ১৯৮৮ সাল।

৬৭। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এরশাদবিরোধী কোন গণআন্দোলন সংঘটিত করতে সমর্থ হয়নি। তিন বিরোধী ঐক্যজোটের এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কেও ইতোপূর্বে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তও প্রায় একই অবস্থা বিরাজিত ছিল। এই সময়কালে ঐক্যজোটগুলো পৃথক ও অসংলগ্নভাবে মাত্র কিছু কর্মসূচী পালন করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা এবং বি. এন. পি. নেত্রী ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে চলে বক্তৃতা ও বিবৃতির লড়াই। ১৯৮৯ সালেই ম্যাডাম হাসিনা বক্তৃতা-বিবৃতি দেন প্রায় ৩৫০টি এবং বেগম খালেদা জিয়া দেন প্রায় ৪০০টি। এগুলোর প্রায় সবগুলোতেই করা হয় পারস্পরিক সমালোচনা। এসব সমালোচনার ভাষা ছিলো শক্ত ও বিদ্বেষমূলক। আবার কখনো কখনো ঐক্যের আহবানও উচ্চারিত হয়। তবে ঐক্যের সব আহবানই ছিলো শর্তযুক্ত। শর্ত পূরণ করে না কেউই। তাই

দুই মেরুতেই অবস্থান করেন তাঁরা। একদিকে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "৭ দফার বিকল্প নেই। অতএব ঐক্য কেবল ৭ দফার ভিত্তিতেই হতে পারে।" অপরদিকে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "কেবল এক দফার (অর্থাৎ এরশাদের পদত্যাগের দাবীর) ভিত্তিতেই ঐক্য হতে পারে।" এরশাদকে কে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছেন তা নিয়েও বেশ উত্তপ্ত বিতর্ক হয় দুই নেত্রীর মধ্যে। দু'জনেই একে অপরকে স্বৈরাচারের দোসর বলে অভিহিত করেন। দেশের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রীর এহেন বিরোধের সুযোগে এরশাদ তাঁর অদৃশ্য মহল বিশেষের কারসাজিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ এবং বি. এন. পি.-এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। ফলে, উল্লিখিত সময়কালে দেশের এক শতকেরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষিত হয়। সর্বোপরি, এসব ছাত্র সংঘর্ষে অনেক তরুণ ছাত্র ও যুবক হয় হতাহত।

৬৮। ১১ই জানুয়ারী (১৯৮৯) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য কংগ্রেসম্যান এবং উক্ত পরিষদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান, স্টিফেন সোলার্জ ঢাকা আসেন। মিঃ সোলার্জ সাক্ষাৎ করেন ম্যাডাম হাসিনার সঙ্গে ঐদিনই এবং এরশাদ সাহেব ও বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ১২ই জানুয়ারী তারিখে। তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখতে আগ্রহী।" ২৪শে জানুয়ারী (১৯৮৯) তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোট ও জামাতে ইসলামীর আহবানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। এই হরতাল কর্মসূচী ছিল আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলার জন্য। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালের এই দিনে চট্টগ্রাম শহরে ম্যাডাম হাসিনা ও ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে হতাহত হয় অনেক লোক। ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও ১৩টি ছাত্রাবাস সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ ছাত্রাবাস সংসদ, বিশেষ করে ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' পূর্ণ প্যানেল। নির্বাচনের এই ফলাফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে বি. এন. পি.-এর ছাত্র সংগঠন জাতীয়তা-বাদী ছাত্রদলের একাংশ রোকেয়া হলের ছাত্রী মিছিলে হামলাসহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোলাগুলি চালিয়ে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করে। ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮৯) তারিখে বি. এন. পি. নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবী ব্যক্ত করে। ২১শে মার্চ (১৯৮৯) তারিখে আওয়ামী লীগ জাতীয় সরকার গঠনের দাবী করে। ৩রা জুন (১৯৮৯) তারিখে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে দেড় মাসব্যাপী সফর শেষে দেশে ফেরেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি সিনেটের কতিপয় সদস্যসহ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ২৮শে জুন (১৯৮৯) তারিখে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক

মূল্যবৃদ্ধি ও সরকারের বাজেটে করবৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল।

৬৯। ১০ই আগস্ট (১৯৮৯) তারিখে গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর রোডস্থ বাসায় কে বা কারা গ্রেনেড নিক্ষেপসহ সশস্ত্র হামলা চালায়। বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তখন ঐ বাসাতেই ছিলেন। ম্যাডাম হাসিনা এই ঘটনাকে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা বলে অভিযোগ করে এর জন্য ডানপন্থী 'ফ্রিডম পার্টির' খুনী ফারুক চক্রকে দায়ী করেন। ১৯শে আগস্ট (১৯৮৯) তারিখে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ম্যাডাম হাসিনার উক্ত প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদ জানানোর জন্য লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে ঢাকায় পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল।

৭০। ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবর (১৯৮৯) তারিখে শ্রমিক–কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় বিরতিহীন ৪৮ ঘন্টার সর্বাত্মক হরতাল। ২২শে অক্টোবর (১৯৮৯) তারিখে ছাত্র–সংগ্রাম পরিষদের ৯টি ছাত্র সংগঠন আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্ব পরিষদের কোনও অংগ সংগঠনের সঙ্গে আলাপ–পরামর্শ না করেই একতরফাভাবে ডাকসু অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি টাংগানোর প্রতিবাদে ছাত্র–সংগ্রাম পরিষদ ত্যাগ করে। ১লা নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে বেগম খালেদা জিয়া পালন করেন প্রতীক অনশন ধর্মঘট। ৫ই নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় সকাল–সন্ধ্যা হরতাল। ১১ই নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোট একতরফাভাবে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণায় ২০শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে সারাদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে সচিবালয়ের চারিদিকে অবস্থান ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। ১৯শে নবেম্বর (১৯৮৯) তারিখে সরকারী দল জাতীয় পার্টি ঢাকায় আয়োজন করে এক 'হরতাল বিরোধী' মিছিল। এরশাদ সাহেব নিজেও উক্ত মিছিলে শরীক হন। ২০শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ঢাকায় আয়োজিত এক জনসমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "এই সরকারকে হটাতে না পারলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ সেমিফাইনাল, ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে হবে ফাইনাল।" অপরদিকে, আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা জনগণের প্রতি আহবান জানান ২৯শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালনের জন্য। ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয়ের চারিদিকে অবস্থান ধর্মঘট ছিলো অনেকটা শান্তিপূর্ণ। ম্যাডাম হাসিনার ঘোষিত ২৯শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখের কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে বেগম খালেদা জিয়া বাধ্য হন ২৮শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে আয়োজিত এক সমাবেশে ২৯শে নভেম্বর তারিখে পূর্ণদিবস এবং ৩০শে নভেম্বর তারিখে অর্ধদিবস হরতাল পালনের আহবান

জানাতে। ৩০শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখ সকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কিছু সশস্ত্র নেতা ও কর্মী ডাকসু অফিস তছনছ করে এবং সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করে। ৩০শে নভেম্বর (১৯৮৯) তারিখে অর্ধদিবস হরতাল শেষে বিকেলে আয়োজিত আওয়ামী লীগের সভায় কে বা কারা হাতবোমা নিক্ষেপ করে। উক্ত ঘটনায় ১ জন নিহত ও ১২ জন দারুণভাবে আহত হয়। ২০শে ডিসেম্বর (১৯৮৯) তারিখে ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় সারা ঢাকায় আয়োজন করে এরশাদ সরকারবিরাধী বিক্ষোভ মিছিল।

৭১। ১০ই জানুয়ারী (১৯৯০) তারিখে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য প্রচারের দাবীতে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ৯টি ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশন ভবনদ্বয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে আওয়ামী লীগ এরশাদ সরকারী বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সারাদেশে উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী। ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র লীগ এবং বি. এন. পি.-এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে চলে দুই ঘন্টাব্যাপী প্রচণ্ড গোলাগুলি। এই সংঘর্ষে নিহত হয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ নেতা চুনু। এই ঘটনার অজুহাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে ঢাকায় ৭ দলীয় ঐক্যজোটের এক জনসমাবেশে "এরশাদ সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের (তাদের মতে) আঁতাত" প্রতিহত করার আহবান জানানো হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) তারিখে আওয়ামী লীগের আহবানে সারা ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৭ই এপ্রিল (১৯৯০) তারিখে দীর্ঘ ৪০ দিন বন্ধ রাখার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৭ই মে (১৯৯০) তারিখে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দেশে স্বৈরতন্ত্র অবসানের লক্ষ্যে ঘোষণা করে এক আন্দোলন কর্মসূচী।

৭২। ৬ই জুন (১৯৯০) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' ও ১৩টি হলের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে 'ডাকসু'সহ ১০টি হল সংসদে বি. এন. পি.-এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। ২৮শে জুন (১৯৯০) তারিখে এরশাদ সরকারের ঘোষিত বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ৩০শে জুন (১৯৯০) তারিখে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাকসু' সহ হলগুলোর ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। ঐদিন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পর আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ এবং বি. এন. পি.-এর অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে সংঘটিত হয় এক তীব্র সশস্ত্র সংঘর্ষ। উক্ত ঘটনার অজুহাতে এরশাদ সাহেবের সরকার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

৭৩। ১২ই জুলাই (১৯৯০) তারিখে এরশাদ সাহেব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সবার সঙ্গে আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব করেন। ১৩ই জুলাই (১৯৯০) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১লা আগস্ট (১৯৯০) তারিখে সরকার মেজর জেনারেল নূরুদ্দিনকে সেনাবাহিনীর এবং কমোডোর মোস্তফাকে নৌবাহিনীর নতুন প্রধান নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৩১শে আগস্ট (১৯৯০) তারিখে মেজর জেনারেল নূরুদ্দিন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইত্যবসরে, দেশের বিভিন্ন মহল থেকে পত্র–পত্রিকার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা এবং বি. এন. পি. নেত্রী ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পরামর্শ দেওয়া হয় একই মঞ্চ থেকে যৌথভাবে এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য। ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও মঞ্চের ঐক্যের কথা বলেন। কিন্তু ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "মঞ্চের ঐক্যের প্রয়োজন নেই, রাজপথের ঐক্যই স্বৈরাচারের পতন ঘটাবে।"

৭৪। ১৯৯০ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসদ্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বি. এন. পি.–এর অংগ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কলহের একাধিক ঘটনা ঘটে। তবে সেপ্টেম্বর (১৯৯০) মাসের শেষের দিকে 'ডাকসুর' উদ্যোগে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে একটি সফল ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অনেকাংশে অপসৃত হয়। এই কনভেনশন থেকে 'ডাকসু' এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করলে সারাদেশে সরকার বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে গণতন্ত্রমনা সকল ছাত্র সংগঠনের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র–বিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হয়। অতঃপর 'ডাকসুর' তৎকালীন সহসভাপতি আমানুল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ অন্যান্য গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

৭৫। ১০ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ছিলো ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচী। এই ঘেরাও কর্মসূচী চলাকালে সচিবালয় ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় পুলিশ ছাত্র–জনতা এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র–জনতাও পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপসহ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকাস্থ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার অফিসের অনেক গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। কয়েক ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষুব্ধ জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ। এ সমস্ত সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজের জেহাদসহ ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন পুলিশসহ তিন শতকেরও বেশী ছাত্র–যুবক আহত হয়। ঐ দিনই ২২টি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনার ঘোষণা দেয়।

৭৬। ১১ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ছিলো ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় আহূত সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ঐ দিন সকাল ১১টার দিকে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে একটি মিছিলসহ শাহবাগ চৌরাস্তার মোড়ে পৌছলে পুলিশ তাঁদের ওপর বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে, যার ফলে 'ডাকসুর' সহসভাপতি আমানউল্লাহ আমান, সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবির খোকন, আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র লীগের তৎকালীন সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, নাজিমুদ্দিন আলম ও গোলাম মোস্তাফা সুজনসহ শতাধিক ছাত্রনেতা ও কর্মী আহত হয়। পুলিশের এহেন নির্যাতনমূলক আচরণের প্রতিবাদে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৩ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ধর্মঘট পালনের আহবান করা হয়। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলীতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিউটিটের মনিরুজ্জামান মনিরসহ দুইজন ছাত্র নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। ঐ দিন দুপুরে মনিরুজ্জামান মনিরের লাশ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের চত্বরে নিয়ে আসে। অতঃপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখানে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে। ছাত্রদের সমাবেশ সমাপ্ত হওয়ার পর সরকারের কতিপয় সশস্ত্র গুণ্ডা-মাস্তান বিকেল আড়াইটার দিকে বাংলা একাডেমী ও টি. এস. সির মাঝখানে অবস্থিত আণবিক শক্তি কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে ঢুকে আটটি গাড়ী অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। অতঃপর তারা আড়াই ঘন্টা ধরে আণবিক শক্তি কমিশনের প্রশাসনিক অফিস, আণবিক শক্তি কেন্দ্রের অফিস ও ল্যাবরেটরীর সমস্ত দরজা ও জানালার কাঁচ টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলে। আণবিক শক্তি কেন্দ্র ক্যাম্পাসসহ ঢাকার অন্যান্য স্থানে সরকারের গুন্ডা-মাস্তান দল কর্তৃক ঘটানো এ সমস্ত ঘটনার অজুহাতে এরশাদের সরকার এক অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।

৭৭। নতুন আইনের আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা সর্বস্তরের ছাত্র সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। পাড়ায় পাড়ায় ও মহল্লায় মহল্লায় স্কুল ছাত্ররাও সরকার বিরোধী মিছিল সংঘটিত করতে শুরু করে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের কয়েকজন নেতা আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে আন্দোলনের একটা চরম মুহূর্তে ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাহাংগীর সাত্তার টিংকু, ফজলুল হক মিলন, নূর আহমদ বকুল, মোস্তফা ফারুক, শফী আহমেদ, অসীম কুমার উকিল, নাসিরু-উদ-দুজা, ফয়জুল হাকিম, আখতার সোবহান, মাশরুর কামাল হোসেন, আনোয়ার হোসেন মুকুল, প্রমুখ ছাত্রনেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় ১৪ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘটিত সংঘর্ষে ৫৫ জন ছাত্র-জনতা আহত হয়। ঐ দিনই অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাকে তার স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। ১৫ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ঢাকায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে

পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ঐদিন জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ ছাত্রদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে। একই দিনে ছাত্ররা ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ এবং রাজশাহীতে ট্রেন চলাচলে বাধা প্রদান করে। ঐ দিনই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা এবং উক্ত সভায় ছাত্ররা ১৫ দিনব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। অপরদিকে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্নে অভিন্ন মত ব্যক্ত করে পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করে। ১৬ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে এরশাদ সাহেবকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল। ঐ দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে রেললাইন উৎপাটন, রেল ষ্টেশনে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙ্চুর, ব্যারিকেড স্থাপন, ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামে জনতা–পুলিশ সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। ঐদিন বিকেলে ঢাকায় আয়োজিত ৮ দলীয় ঐক্যজোটের এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা ঘোষণা করেন, "রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা ঐক্য ভাঙার সাধ্য কারও নেই।" অপরদিকে, ঢাকায় আয়োজিত ৭ দলীয় ঐক্যজোটের অপর এক সমাবেশে বিএনপি নেত্রী ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্বস্তরের জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, "এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

৭৮। ১৭ই অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে এরশাদ সাহেবের সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। ঐদিনই ছাত্রনেতা আমানউল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, নাজিমুদ্দিন আলম, গোলাম মোস্তফা সুজনসহ অন্যান্য ছাত্রনেতারা ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এরশাদ সরকারের পতনের লক্ষ্যে পুনর্বার দৃপ্ত শপথ ব্যক্ত করে। ১৯শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' ঢাকার জিরো পয়েন্টে এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে কালো পতাকা উত্তোলন করে। ২০শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি. এস. সি. চত্বরে ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে পঞ্চাশ জনেরও বেশী ছাত্র ও নাট্যকর্মীকে গ্রেফতার করে। ২২শে অক্টোবর তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। উক্ত সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নতুন আইনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়, "ছাত্র–শিক্ষক সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেবে।" কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

৭৯। ২৩শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহবানে সারাদেশে সকাল–সন্ধ্যা হরতাল ও উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয়। ঐদিন দেশের

বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ছাত্র-জনতার মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে তিন শতাধিক ছাত্র-জনতা এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী আহত হন। ২৪শে অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আবেদন পেশ করা হয়। আদালত এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কারণ দর্শানোর রুলনিশি জারি করে। ২৭শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহবানে সারাদেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়। ২৮শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে সরকার ন্যাপ সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করে তাঁকে চার মাসের আটকাদেশে কারারুদ্ধ করে। ৩০শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক সভায় অবিলম্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার দাবি ঘোষণা করা হয়।

৮০। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে এরশাদ সাহেব, তাঁর গোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এক কুটিল খেলায় মেতে ওঠে। ভারতের 'বাবরি মসজিদ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে সে দেশের কয়েকটি শহরে উদ্ভুত সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সুযোগে এরশাদ সাহেব লেলিয়ে দেয় তাঁর গুণ্ডা ও মাস্তান বাহিনীকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরদ্বয়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণ ও তাদের বাড়ীঘর, দোকানপাট ও উপাসনালয় লুটপাট ও ধ্বংস করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা সৃষ্টিতে। এ সমস্ত ঘটনায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোকের প্রাণহানিসহ বিষয়-সম্পত্তি ও উপাসনালয়ের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই অজুহাতে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরদ্বয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কার্ফ্যু জারি করে ৩১শে অক্টোবর (১৯৯০) তারিখে। সরকারের এই হীন চক্রান্ত বুঝতে পেরে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার সরকারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করে ঘোষণা দেয় অভিন্ন কর্মসূচীর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করে জনসমাবেশ ও শান্তি মিছিল। যাহোক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, ছাত্রসমাজ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও পেশার প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক শক্তির সময়োচিত ও সক্রিয় হস্তক্ষেপে সরকারের এই হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১লা নভেম্বর (১৯৯০) তারিখের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়। ঐ দিনই সরকার ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্যকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। ৪ঠা নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' আহবানে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মিছিলসহ গোলাপ শাহ মাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি সমাবেশ। ঐদিন মিছিল ও সভা-সমাবেশে পুলিশের হামলায় ২০ জন আহত হয়। ৫ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের দেশে রেডিও-টেলিভিশনে বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক খবর ও তথ্য পরিবেশনের দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সভা-সমাবেশ। ঐ দিনই সারাদেশে মেডিকেল ডাক্তাররা ২৪ ঘন্টা ধর্মঘট পালন করে।

৮১। ৬ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে আনীত রীটের শুনানি শুরু হয়। ৮ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের' একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী পালিত হয়। ঐ দিন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ শেষে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল প্রেসিডেন্টের সচিবালয় অভিমুখে যাওয়ার সময় 'গ্রীনরোড-পান্থপথ মোড়ে' পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে দুই পক্ষের 'ধাওয়া-পাল্টা-ধাওয়ার' উত্তেজনা সারাশহরে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ায়-মহল্লায় সরকারের বিরুদ্ধে সৃষ্ট মিছিলসমূহ জঙ্গী আকার ধারণ করে। ঐদিন এই পর্যায়ে ঢাকায় একজন মন্ত্রীর বাড়ী বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার হামলায় আক্রান্ত হয়। ৯ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য' তৃতীয় ও শেষবারের মতো কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১০ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর আহবানে সারাদেশে পালিত হয় সকাল-সন্ধ্যা সার্বাত্মক হরতাল। ১১ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। ছাত্র-শিক্ষকের এই যৌথ উদ্যোগ চলমান আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অনেকের মতে উপরোক্ত ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অসহযোগ কার্যক্রম।

৮২। ১২ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' আহবানে সারাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় অনেক সভা-সমাবেশ। ১৩ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকার তেজগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত এক 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের আহবান ছিল, "যে কোন মূল্যে সরকার বিরোধী আন্দোলন সফল করতে হবে।" ঐদিনই সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে ঢাকায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকার টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত এক 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ এরশাদের সরকারের উৎখাতের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে আরও তীব্র ও গতিশীল করার শপথ নেয়। ১৬ই নভেম্বর (১৯৯০) নরসিংদীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, "রক্ত দিয়ে হলেও ১৯৯০ সালেই এরশাদের পতন ঘটানো হবে।" ঐদিনই নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ চত্বরে অনুষ্ঠিত 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' সভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আমানউল্লাহ আমান এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের হাবিবুর রহমান হাবিবকে এক সাথে সভামঞ্চে উপস্থিত দেখে ছাত্র জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এই সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, "জেহাদ-মণিরের লাশ ছুঁয়ে আমরা শপথ নিয়েছি। কাজেই এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না।"

৮৩। ১৭ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' সারাদেশে গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস পালনের আওতায় ছাত্রদের ঢাকায় 'মন্ত্রীপাড়া' (মন্ত্রীদের সরকারী বাসস্থানসমূহের এলাকা) ঘেরাওয়ের কর্মসূচী। এই দিন সরকারের ভাড়া করা কিছু লোক কাকরাইল মসজিদ এলাকাসহ ঢাকার ১৩টি স্থানে সভার আয়োজন করলেও, ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে তারা টিকতে পারেনি। এক পর্যায়ে ছাত্ররা শেরাটন হোটেল মোড়ে এরশাদ সমর্থকদের তৈরী একটি সভামঞ্চ ভেঙ্গে দেয়। উক্ত সময়ে পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় সরকারের ভাড়াটে কতিপয় গুণ্ডা-মাস্তান ছাত্রদের মিছিলে গুলী চালায়। ঐদিনই ছাত্রদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সরকার সমর্থকদের আয়োজিত এক সভাস্থল থেকে দুই জন মন্ত্রী পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঐদিনই সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডা-মাস্তান কর্তৃক আয়োজিত একটি সভায় এরশাদ সাহেব পূর্বের মতো বলেন, "অতীতের সব সরকারই অবৈধ। বাংলাদেশের শুরু হয়েছিল একটা অবৈধ সরকার দিয়ে।" 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' এই গণদুশমন প্রতিরোধ দিবসে ছাত্রদের মিছিলে সরকারী গুণ্ডা-মাস্তান ও পুলিশের হামলা-গুলীবর্ষণে ৬৩ জন আহত হয়। এরপর ছাত্রদের আন্দোলন আরও সংগঠিত হয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুরসহ দেশের সর্বত্র 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রদের নেতৃত্বে এরশাদ, তাঁর মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে ওঠে অসহযোগ আন্দোলন। এই দিন সরকার ছাত্র ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মাস্তান গোলাম ফারুক অভিকে হঠাৎ করে জেল থেকে মুক্তি দেয়।

৮৪। ১৮ই নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে সরকারের গুণ্ডা-মাস্তান বাহিনীর একটি দল পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় ঢাকার রায়ের বাজারে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে গুলীবর্ষণ করে। ঐদিনই মানিকগঞ্জে ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর সঙ্গে এরশাদের জাতীয় পার্টির গুণ্ডা-মাস্তান ও সমর্থকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ২৫ জন আহত হয়। ১৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল ও সভা-সমাবেশের কর্মসূচী। হরতালের সমর্থনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বগুড়াসহ নানাস্থানে আয়োজিত মিছিলসমূহে সরকারী গুন্ডা-মাস্তান ও পুলিশের হামলায় আহত হয় দুই শতকেরও বেশী লোক। ঐদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক জনসমাবেশে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ঘোষণা করে এরশদের সরকার উৎখাত আন্দোলনকে আরোও জোরদার, তীব্র ও গতিশীল করার লক্ষ্যে অভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা।

৮৫। তিন জোটের এরশাদ ও তাঁর সরকারের উৎখাত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত উক্ত ঘোষণায় বলা হয়- "(১) হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তাঁর সরকারের

শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পেঃ (ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ক(৩) ধারা এবং ৫৫ অনুচ্ছেদের ক(১) ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতঃ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিটক ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। (খ) এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ, নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। (২)-(ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ পদের জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। (খ) অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন। (গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃ স্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (ঘ) গণ-প্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক, দলের প্রচার-প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সাংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। (৪)-(ক) জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরংকুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবেনা। (খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। এবং (গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।”

৮৬। ২০শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিলো ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের সারাদেশে সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচী। হরতাল চলাকালে ঢাকায় ছাত্রনেতা

নাজমুল হক প্রধান আহত হয় সরকারী দলের অঙ্গদল যুব সংহতির সশস্ত্র হামলায়। এই খবর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদের জঙ্গী মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ২১শে নভেম্বর তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো ঘোষণা করে ১২ই ডিসেম্বর (১৯৯০) পর্যন্ত অভিন্ন কর্মসূচী। ঐদিন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও গঞ্জে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র–জনতার সংঘর্ষ ঘটে। ২২শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে পুলিশ ঢাকা কলেজ এলাকায় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' মিছিলে গুলীবর্ষণ করে। ২৩শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকায় পুলিশ মহানগর বি. এন. পি.–এর মিছিলে লাঠি চার্জ করে। ঐ সময় পুলিশ বি. এন. পি.–এর অংগ সংগঠন যুবদল নেতা মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার করে। ঐদিনই বি. এন. পি.–এর এক সভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা সানাউল হক নীরুসহ ৬ জনকে ছাত্রদল হতে বহিষ্কার করা হয়। ২৪শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকায় পুলিশ এক 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' মিছিলে লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই দিন সানাউল হক নীরুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কারামুক্ত নেতা গোলাম ফারুক অভিসহ কতিপয় ছাত্র নেতা, কর্মী ও বহিরাগত যুবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল–সমাবেশ করে এবং 'ডাকসু' অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। সমাবেশে এরা আমানউল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, নাজিমুদ্দিন আলম, প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরস্থ 'অপরাজেয় বাংলার' পাদদেশে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' এক পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ চলছিলো। এই সময় গোলাম ফারুক অভি আরও কয়েকজনসহ একটি এম্বুলেন্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বর প্রদক্ষিণ করে নিকটস্থ সূর্যসেন হলে অবস্থান নেয়। সমাবেশ শেষে , 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' একটি বিরাট মিছিল লেকচার থিয়েটারের কাছে পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই অভির নেতৃত্বে সূর্যসেন হল থেকে মিছিলটিকে লক্ষ করে গুলীবর্ষণ শুরু হয়। একদিকে অস্ত্রধারী কয়েকজন মাস্তান অপরদিকে হাজার হাজার ছাত্রের লড়াই এক ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রায় ১ ঘন্টা যাবত সংঘর্ষে ৭ জন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়। অতঃপর অভির নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র মাস্তানরা ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঐ দিনই গোলাম ফারুক ছাড়াও আরও ৬ জন ছাত্রনেতাকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৮৭। ২৬শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে অভি–নীরুর যৌথ নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র মাস্তান ফিল্মী কায়দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস–হামলা শুরু করে। এদের গুলীতে নিমাই নামক একজন যুবক পান দোকানদার নিহত হয়। অতঃপর ঢাকার জিরো পয়েন্টে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' সমাবেশ শেষে ছাত্রদের একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে আসার সময় বাংলা একাডেমীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাস থেকে সরকারী মদদপুষ্ট অভি–নীরুর নেতৃত্বাধীন মাস্তানরা উক্ত মিছিলে গুলী চালালে ৭ জন

ছাত্র নেতা ও কর্মী গুলীবিদ্ধ হয়। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আন্দোলনকারী শ্রমিকজনতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষও ছাত্রদের সহায়তা করার জন্যে ক্যাম্পাসে ছুটে আসে। অতঃপর ঐদিন 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

৮৮। ২৭শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখ ভোরে পুলিশ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যুবলীগের সভাপতি মোস্তফা মহসিনের এলিফ্যান্ট রোডস্থ বাসা ঘেরাও করে তাঁকে গ্রেফতার করে। এই দিন সকাল দশটার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বর ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবীতে বিভিন্ন সংস্থার লোকজনও মিছিল করে ক্যাম্পাসে আসে। এইদিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সিদ্ধান্ত ছিল লাঠি-মিছিল প্রদর্শন করার। বুয়েট-এর ছাত্রদের একটি লাঠি-মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে কয়েকবার কলাভবন প্রদক্ষিণ করে। ইত্যবসরে, অভি-নীরুর যৌথ নেতৃত্বাধীন সরকারী সশস্ত্র মাস্তানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অবস্থান নেয়। অতঃপর 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' একটি মিছিল শহীদুল্লাহ হলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে অভি-নীরুর মাস্তানরা উক্ত মিছিলে গুলী চালায়। ফলে, গুলীবিদ্ধ হয় তিনজন ছাত্র। সকাল সাড়ে এগারটার দিকে বুয়েট-এর ছাত্রদের মিছিলটি রোকেয়া হলের সামনের রাস্তা দিয়ে টি. এস. সি. অভিমুখে যাওয়ার সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানরা উক্ত মিছিলে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ঐ সময় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশ মেডিকেল সমিতি (বি. এম. এ.)-এর তৎকালীন মহাসচিব ডাঃ মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন এবং যুগ্মসচিব ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের তরুণ শিক্ষক, ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন একত্রে একটি রিক্সায় টি. এস. সি.-এর মোড় অতিক্রম করছিলেন। রিক্সাটি টি. এস. সি. এর মোড় অতিক্রম করার সাথে সাথেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানদের বুলেট ডাঃ মিলনের পিঠে বিদ্ধ হয়। মরণ যন্ত্রণায় রিক্সা থেকে ছিটকে পড়ে যান ডাঃ মিলন। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। ডাঃ মিলনের মৃত্যুর সংবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ছাত্র-শিক্ষক-ডাক্তারসহ সকল পেশাজীবী মানুষ ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় নেমে পড়েন। ডাঃ মিলন হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সারাদেশে ছাত্র-জনতার এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চরম জঙ্গী আকার পরিগ্রহ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল শিক্ষক ও ডাক্তাররা একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। অপরদিকে রাতে এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে সরাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন।

৮৯। ২৭শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখের রাতে দেশের জরুরী আইন ঘোষণা এবং ঢাকা শহরে কার্ফ্যু জারি করা হলেও ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থামেনি। জরুরী আইন উপেক্ষা করে মিছিল সমাবেশ বাড়তে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রাবাস ছাড়ল না। শিক্ষকরা পদত্যাগ ও আইনজীবীরা কোর্ট বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা এরশাদ সরকারের অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখেন। ২৮শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। জরুরী আইন ও কার্ফ্যু ভঙ্গ করে ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক-জনতা ও পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা নামলেন বিক্ষোভ মিছিলে। এই দিন বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালালো ধানমন্ডিস্থ সরকারের জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে গুলীবিদ্ধ হলো ৫ জন। ঢাকার ঝিকাতলায় শ্রমিকরা লড়লো বাঘের মতো। ঢাকার মালিবাগে রেলপথ বন্ধ করে দিলো শ্রমিক-জনতা। ডেমরার দিকে সংঘর্ষ হলো শ্রমিক-জনতা এবং পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে। এসব স্থানে গুলীবর্ষণে প্রাণ হারায় ৪ জন। গুলী চললো ময়মনসিংহে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা রেলপথ ভাঙচুর করে। খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, যশোরসহ দেশের অন্যান্য শহরেও চললো বিক্ষোভ মিছিল। এসব স্থানে পুলিশ ও অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংঘর্ষে বহুলোক গ্রেফতার ও আহত হয়। এহেন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাপান এরশাদ সরকারের দেশে জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত আইন জারির কঠোর সমালোচনা করে।

৯০। ২৯ শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখের মধ্যেই সরকরী মদদপুষ্ট অভি-নীরু বাহিনী ও মাস্তানদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকার সব চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরুদ্ধ হলো। তখন অভি-নীরুর নেতৃত্বাধীন গুণ্ডা-মাস্তানরা ঢাকার বাড়ীতে বাড়ীতে হামলা শুরু করে রাজনৈতিক এবং ছাত্রনেতা ও কর্মীদের সন্ধানে। সংবাদপত্র প্রকাশে সরকারের সকল চেষ্টা হলো ব্যর্থ। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক পদত্যগের ঘোষণা দেন। একই দিনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সকল শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা কার্ফ্যু উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। অতঃপর সরকার সেনাবাহিনীকেও পুলিশ ও বি. ডি. আরের পাশাপাশি মোতায়েন করে। সচিবালয়ের গেটে অবস্থান নেয় মন্ত্রীদের প্রাইভেট বাহিনী। ঢাকার শাহজাহানপুর ও খিলগাঁওয়ে সরকারের ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে নিহত হয় ৩ জন । এদিন ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে সারাদেশে পালিত হয় সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরেও সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং ছাত্র-শ্রমিক- জনতার। এ সমস্ত ঘটনায় বহুলোক আহত ও গ্রেফতার হয়।

৯১। ৩০শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখ ছিলো শুক্রবার। এদিন ঢাকায় জরুরী অবস্থা আইন উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হয় শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজার উদ্দেশ্যে। গায়েবানা জানাজা শেষে, জনগণ মিছিল করে কাকরাইলের দিকে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক নেতা–কর্মী এবং ছাত্র–শ্রমিক–জনতার বিশাল মিছিলটি কাকরাইল মোড়ে পৌছলে সরকারের ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা তার ওপর গুলী চালায়। এদিন রামপুরায় সরকারের ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ঘরে ঘরে গুলী চালালে বুকে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা নিয়ে নিহত হয় শিশুটির মা এবং আহত হয় অনেক লোক। এদিন ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশ আয়োজন করে 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। স্বনামধন্য কবি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে শত শত নারী রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে স্বৈরশাসক এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে। দেশের চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য শহরেও হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা–কর্মী এবং ছাত্র–শ্রমিক–জনতা গায়েবানা জানাজা শেষে বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে।

৯২। ১লা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' আহবানে সারাদেশে সর্বাত্মক সকাল–সন্ধ্যা হরতালের কর্মসূচী। এদিন ঢাকায় জরুরী অবস্থা আইন ও কার্ফ্যু উপেক্ষা করে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক এবং ছাত্র–শ্রমিক–জনতা রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ–মিছিল বের করে। কাজীপাড়া, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, গেন্ডারিয়া, সদরঘাট, খিলগাঁও, রামপুরা, মীরপুর, পল্লবীসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সরকারের ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর লেকেরা মিছিলের ওপর গুলীবর্ষণ করে। মীরপুরে সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডা–মাস্তান এবং সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা বাড়ী বাড়ী হামলা চালিয়ে লোকদের বেধড়ক মারধোর ও নির্যাতন করে। এ সমস্ত ঘটনায় বহুলোক আহত হয় এবং ৮জন প্রাণ হারায়। চট্টগ্রামের কালুরঘাট, নারায়ণ–গঞ্জের মন্ডলপাড়া ও খুলনায় বিক্ষুব্ধ মানুষের ওপর নির্মমভাবে গুলীবর্ষণ করে সরকারী বাহিনী। খুলনায় ৩ জন গুলীবিদ্ধ এবং ২ শতাধিক লোক আহত ও গ্রেফতার হয়। মেলান্দহে বিক্ষুব্ধ জনতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। দেশের অন্যান্য শহর ও গঞ্জেও রাজনৈতিক নেতা–কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক এবং ছাত্র–শ্রমিক–জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এসব মিছিলেও লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ করে সরকারী বাহিনীর লোকেরা। ঢাকা শহরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য শহরের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে সরকারের জাতীয় পার্টির সাবেক উপপ্রধান মন্ত্রী ডাঃ এম. এ. মতিন ও অপর ৩ জন মন্ত্রীসহ ১৯ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন।

৯৩। ২রা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে কোন হরতাল ছিল না। এই দিন ঢাকায় কার্ফ্যু শিথিল থাকার সুযোগে বেতন নিতে যান বিভিন্ন অফিস এবং সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এদিন, ঢাকায় 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের' এক সমাবেশে দেশের টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কালো তালিকা ঘোষণা করা হয়। ঐ দিনই জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার আবুল হাসনাতকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নয়া মেয়র নিযুক্ত করা হয়। সরকারের জাতীয় পার্টির ঢাকা পৌর ওয়ার্ড কমিশনারগণ, ভাড়াটে গুণ্ডা-মাস্তান এবং সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ঢাকার বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় ছাত্র-জনতার খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল দমনে তৎপরতা শুরু করে। এইদিনই ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত আইনজীবীদের এক সমাবেশে এরশাদ সরকারকে অবৈধ ও খুনী আখ্যায়িত করে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তৎকালীন সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন। এদিন ঢাকার সর্বত্র প্রচার ও বিতরণ করা হয় 'বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে' শিরোনামে গণঅভ্যুত্থানের বুলেটিন। চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা প্রকাশ্য আদালতে বিচার করে এরশাদকে ফাঁসির সাজা দিয়ে তাঁর কুশপুত্তলিকা ঝুলিয়ে রাখে। খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ দেশের অন্যান্য শহর ও গঞ্জে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

৯৪। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' আহূত সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল। সরকার বিধিনিষেধ শিথিল করা সত্ত্বেও এদিনও সাংবাদিকরা পত্রিকা প্রকাশে অনীহা ব্যক্ত করেন। হাজার হাজার রাজনেতিক নেতা-কর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ মিছিল সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ঢাকার সেনাকল্যাণ ভবনে বোমা নিক্ষেপ করে। এদিন বি. সি. এস. (প্রশাসনিক) ক্যাডারের ২০৫ জন সদস্য পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত, ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া এবং আইন মন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়ার সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। সরকারের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করে ৫৮টি এন. জি.ও. সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। জাতিসংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় জাতিসংঘের সকল কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামে সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে ১ জন নিহত হয়। চাঁদপুরেও সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর গুলীতে এক ব্যক্তি প্রাণ হারায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে চাঁদপুরের ডেপুটি কমিশনার পদত্যাগ ঘোষণা করেন। রাতে এরশাদ সাহেব এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' নেতৃবৃন্দ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এরশাদ সাহেবের এই প্রস্তাব।

৯৫। ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখ সকালে লাখো লাখো রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের নেতা-কর্মী

এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ-মিছিলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ভরে ওঠে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও গঞ্জে এরশাদ সাহেবের ছবি ভাঙ্গা ও কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা ঘটে ব্যাপকহারে। এদিন ঢাকায় 'সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদের' সদস্যরা সচিবালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন বি. সি. এস. (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও। এদিন বিকেলে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশে এরশাদ সাহেবের আগের দিনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখান করে তক্ষুণি তাঁর পদত্যাগ দাবী করে। 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের' নেতৃবৃন্দও একই দাবী জানায়। এদিন সন্ধ্যায় টেলিভিশনে সরকারের জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এরশাদ সাহেবের পূর্বরাতের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এর দুই ঘন্টা পর টেলিভিশনের রাত ১০ টার সংবাদের সময় এরশাদ সাহেবের অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই জরুরী অবস্থা আইন ও কার্ফ্যু উপেক্ষা করে লাখো লাখো মানুষ আনন্দ-উল্লাসে রাস্তায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে হাজার হাজার মানুষের বিজয় মিছিল।

৯৬। ৫ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় সর্বসম্মতভাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে। এদিনই এরশাদ সাহেব চতুর্থ জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন। ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখ সকালে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর এরশাদ সাহেব বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। সবশেষে, এরশাদ সাহেব রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর সরকারী চাকুরীজীবী বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর প্রধান বিচারপতির পদে ইস্তফা না দিয়েই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলেন। বিস্ময়কর যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহবুদ্দিন .আহমদ তাঁর সরকারী চাকুরী অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির পদ বহাল রেখেই উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংযোজন করলেন সংবিধান লংঘনের আর একটি দৃষ্টান্ত। যাহোক অবশেষে, 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের' নেতৃত্বে সংগঠিত সফল গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান এবং উপরোক্ত ঘটনা সমূহের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে অর্থপিশাচ, কপট, কুটিল, দুর্নীতিবাজ, মোনাফেক, লম্পট ও ক্ষমতা-লিপ্সু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তাঁর দুঃশাসন এবং তাঁর সমদুর্নীতিপরায়ণ পারিষদবর্গ ও সাঙ্গপাঙ্গদের।

৯৭। ৮ই ডিসেম্বর (১৯৯০) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজারে এবং ঢাকায় মরহুম জিয়াউর রহমানের মাজারে। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' ও জনগণের দাবীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সরকার ঢাকার গুলশানস্থ একটি বাড়ীতে অন্তরীণ রাখে লেঃ জেনারেল (অবঃ) এইচ. এম. এরশাদ ও তাঁর পত্নী রওশন এরশাদকে। তাঁদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া

তাঁদের পোষ্য এক নাবালিকা মেয়ে এবং এক নাবালক ছেলেকে। একই দিনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরশাদের জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনসহ ১৫ জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে।

৯৮। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে নির্বাচন কমিশন পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করে ২রা মার্চ (১৯৯১) তারিখ। ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঘোষিত হয় পঞ্চম সংসদ নির্বাচনী তফসিল। উক্ত তফসিল মোতবেক ১০ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ মনোনয়ন দাখিলের জন্য নির্ধারণ করা হয়। ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এরশাদ ও তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্যে বিচারপতি আনসারউদ্দিনকে প্রধান করে গঠন করে একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি। ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে নির্বাচন কমিশন ২রা মার্চ (১৯৯১) তারিখের পরিবর্তে ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য পুনঃনির্ধারণ করে। তদনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ১৩ই ও ২১শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ।

৯৯। ২২শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে জামাতে ইসলামী ছাত্র সংগঠন প্রগতিশীল ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৭ শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে বিচারের দাবিতে সারাদেশে পালিত হয় বিক্ষোভ-সমাবেশ। ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ সাহেবদের সামরিক শাসন আমলে সামরিক ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তরা তাদের মুক্তির দাবীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উক্ত ঘটনায় নিহত হয় ৩ জন এবং আহত হয় শতাধিক। ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে পরলোকগমন করেন বামপন্থী আন্দোলনের কিংবদন্তী-পুরুষ, প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মণি সিংহ। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একদিকে জনতার অভূতপূর্ব জয় এবং অপর দিকে দুঃখজনক, বিয়োগান্তক ও শোকাবহ নানান ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ১৯৯০ সাল।

একাদশ পরিচ্ছেদ
১৯৯১–১৯৯২ সাল

১। ১৯৯১ সাল জাতির ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতির কাছে এই প্রথম সুযোগ আসে একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নির্বাচন করার, আর উক্ত নির্বাচনকে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের। এর দায়িত্ব শুধু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ও তাঁর নির্দলীয় সরকারেরই ছিল না, জাতীয় এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল সরকারী প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের লোকজন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী মহল, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোকজন, ছাত্র-যুবক ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মী তথা সমাজের সর্বস্তরের লোকজনের সচেতনতা ও সক্রিয় সহযোগিতা। অতীতে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্বার্থান্বেষী মহল ও ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণতা, স্বার্থবাদিতা, ক্ষমতালিপ্সা ও দুর্নীতিপরায়ণতার কারণে সামাজিক পরিবেশ হয়ে পড়েছিল ব্যাপকভাবে কলুষিত ও দুরাচারগ্রস্ত। এহেন পরিস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ও তার নির্দলীয় সরকারের পক্ষে দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজটি ছিল শুধু দুরূহ ও দুষ্করই নয়, দুষ্করণীয়ও বটে।

২। ১লা জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে এরশাদ সাহেবের সাবেক বাসস্থান সেনাভবন থেকে নগদ প্রায় দুই কোটি টাকা পাওয়া যায় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে। একই দিনে ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন তাঁর দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত। ২রা জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো কারাগারে বিদ্রোহ ও স্বার্থন্বেষী মহল বিশেষের অপপ্রচারকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

হিসেবে উল্লেখ করে যৌথ বিবৃতি প্রদানে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর ৮ দলীয় ঐক্যজোট উপরোক্ত ঘটনাবলীকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করে এ জাতীয় সকল প্রচেষ্টা মোকাবেলা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করে। ঐ দিনই বি.এন.পি.তে যোগদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি সভায় বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগের সুরে বলেন, "বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নিশ্চিত বিজয়ে ভীত হয়ে কেউ কেউ বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।" ৩রা জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া 'হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের' প্রতিনিধিদের বলেন, "বি.এন.পি. ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাবে না।" ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করে বলেন, "নির্বাচন বানচালের জন্য একটি মহল বিশেষ চক্রান্ত করছে।" ঐদিনই আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা চট্টগ্রামের পেশাজীবী সংগঠনগুলোর এক বৈঠকে বলেন, "(দেশে) সংসদীয় গণতন্ত্র না এলে (গণ-আন্দোলনের) বিজয় নস্যাৎ হয়ে যাবে।" একই দিনে জামাতে ইসলামী তার কর্মপরিষদের এক সভায় নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩। ৫ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় ৮ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ ১৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর পক্ষ হতে প্রদত্ত ঘোষণায় উল্লেখিত দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। ৭ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে ৩০০ টি আসনের ২৯৭টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের জন্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে। ৮ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বাজা দল-বি.এন.পি.) জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনের ২৯২টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। ঐদিনে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের তিনটি শরীক দল যথা সি.পি.বি., ন্যাপ (মোজাফফর) ও গণতন্ত্রী পার্টির পক্ষ থেকে স্ব-স্ব দলের প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সি.পি.বি. ১৬৩ আসনে, ন্যাপ (মোজাফফর) ১৭২ টি আসনে এবং গণতন্ত্রী পার্টি ১০৮ টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। একই দিনে ৮ দলীয় ঐক্যজোট জোটগতভাবে নির্বাচন করার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ঐদিনই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের ২ নম্বর দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারা ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা বলে দায়ের করে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি মামলা। ৯ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরীক দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২৪৮টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। এদিকে জোটগতভাবে নির্বাচনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ৮ দলীয়

ঐক্যজোট কর্তৃক গঠিত কমিটির আলাপ-আলোচনা বৈঠক অব্যাহত থাকে। একই দিনে জামাতে ইসলামী সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৯৪ টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। ১০ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় তাঁর ভাষণে বলেন, " জিয়া-এরশাদ পদ্ধতির সরকার না জনগণের সরকার এটাই (এখন) ভোটারদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন।" ১১ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬৮টি আসনে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করে। ঐদিন ৮ দলীয় ঐক্যজোটের জোটগতভাবে নির্বাচনের প্রশ্নে অচলাবস্থা ও অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। ১২ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত করে একটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়।

৪। মনোনয়ন দাখিলের শেষদিনের আগের দিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের সর্বশেষ সভা জোটগতভাবে নির্বাচনের অংশগ্রহণ প্রশ্নে কোনরূপ সমঝোতা ও ঐকমত্য ছাড়াই সমাপ্ত হয়। ১৩ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ ছিল জাতীয় পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিল করার শেষ দিন। ঐদিনে তিন সহস্রাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে কোনরকম সমঝোতা না হওয়ায় শরীক দলগুলোর প্রার্থীরা পৃথক পৃথকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রাম, ফেনী ও বগুড়ায় ১টি করে মোট ৫টি আসনে প্রার্থী হন। আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা ঢাকায় ২টি এবং গোপালগঞ্জে ১ টিসহ মোট ৩টি আসনে প্রার্থী হন। ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রংপুরের ৫টি আসনে প্রার্থী হন। ১৪ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর ৩,৭৬৪টি মনোনয়পত্র বৈধ বলে ঘোষণা করে। মনোনয়নপত্র দাখিলে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে এরশাদ সাহেবের সবগুলো মনোনয়নপত্র সাময়িকভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এদিকে এক জনসভায় বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন সুষ্ঠু না হওয়া সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করে বলেন, "ভোটার তালিকা দেখে মনে হচ্ছে না দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে।" ঐ দিনেই 'সম্মিলিত পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ' এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের পর গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও অর্থবহ করার জন্য জাতীয় সরকার গঠনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পরামর্শ প্রদান করে। ১৭ই জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে মনোনয়নপত্র বাতিলের প্রতিবাদে এরশাদ সাহেবের পক্ষে নির্বাচন কমিশনে আপীল করা হলে, নির্বাচন কমিশন তাঁর ৫টি মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করে। ২১শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ঐ দিন ১ হাজার ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়পত্র প্রত্যাহার করেন। ২২শে জানুয়ারী (১৯৯১) আওয়ামী লীগ

শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ৮ দলীয় ঐক্যজোটের শরীক দলগুলোর জন্য ৩৬টি আসন ছেড়ে দেয়। ৮ দলীয় ঐক্যজোটের শরীক দলগুলোর নেতারা এটা মেনে নিলেও দলগুলোর নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তা ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের মনোনীত ৩৬ জন প্রার্থীরাও বিব্রতকর অবস্থায় নিপতিত হন। কারণ মনোনয়ন প্রত্যাহারের আর কোন সুযোগ না থাকায় তাঁরা নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য হন। এদিকে নির্বাচন কমিশন গাইবান্ধা—১ আসন ছাড়া ২৯৯ টি আসনে মোট ২,৭৮১ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দেয়। ২৫শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে জামাতে ইসলামী ঘোষণা করে যে, তারা সর্বমোট ২২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

৫। ২৬ শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে আনীত মামলার চার্জশীট সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হয়। ২৮শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সমাবেশে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ভাষণে বলেন, "(দেশের) সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে সংসদেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।" ঐদিন আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অপর এক নির্বাচনী সামাবেশে তাঁর ভাষণে বলেন, "আওয়ামী লীগের গণজোয়ারে বি.এন.পি. আতংকিত হয়েছে।" একই দিনে বি.এন.পি. তার নির্বাচনী ইশতেহার (মেনিফেস্টো) প্রকাশ করে। বি.এন.পি.-এর উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে (মেনিফেস্টোতে) সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়াদি সম্পর্কে ঘোষিত নীতি, কর্মসূচী, প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ "....বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণ। সব দল ও মতের স্ব-স্ব মতাদর্শ প্রচারে স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। বিদেশী আগ্রাসনের হাত হইতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শাক্তিশলী করার লক্ষ্যে শহীদ জিয়ার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ ও সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা। প্রতিবেশী দেশসমূহ, বিশেষতঃ মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা। আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় নীতি অবলম্বন করা।... সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং গণপ্রচার মাধ্যমসূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ। অনগ্রসর উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনপূর্বক ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমাজের

মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।.. শাসনতন্ত্রের (সংবিধানের) চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ... ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণ।... মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি চালু এবং দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন।... মানব সম্পদের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের আনুপাতিক বৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে র্কসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি। বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করিতে কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কৃষককে সহজ শর্তে ঋণ দানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং কৃষি ও সেচ কাজের সাহায্যার্থে বৈদ্যুতিক সংযোগের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। গরীব চাষীদের ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা। খালকাটা প্রকল্পসমূহ চালুকরণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। সড়ক-রেল-নৌ-যোগাযোগ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মত অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও ইহার পক্ষে যাবতীয় বাধা ও জটিলতা দূরীকরণ। ... জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেমন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রেলওয়ে ও শিল্প ইউনিটসমূহে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিয়া দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও জবাবদিহিকরণের ব্যবস্থা নেওয়া।... বাংলাদেশে সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের পথ প্রশস্তকরণ। শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের স্বল্প ব্যয় অথবা বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান ও সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পুঁজি যোগান দিয়া আত্ম-কর্ম-সংস্থানে উৎসাহিত করিয়া বেকার সমস্যার সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।... জাতীয় স্বার্থ ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন শর্তে বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি। অগ্রাধিকার খাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ দান। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন ও ইহাদেরকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশে প্রচলিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ। ... বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে দেশের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো। দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাকে অব্যাহত গতিতে চালনা করিয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এদেশমুখী করা এবং বাংলাদেশী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশে বাংলা একাডেমীর ভূমিকাকে আরও অর্থবহ করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীদের তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান। ইহা ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের 'ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ'

পুস্তিকায় উল্লেখিত কর্মকাণ্ডে জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণও ও এই কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে....।"

৬। উল্লেখ্য, উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে যেহেতু বি.এন.পি. এর 'ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শ' পুস্তিকায় উল্লেখিত বিষয়াদিও উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, সেহেতু উক্ত পুস্তিকায় রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে তা এতে (নির্বাচনী ইশতেহারে) বর্ণিত নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলীয় গঠনতন্ত্রের ২ (ছ) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.)-এর বক্তব্য নিম্নরূপঃ "একাধিক দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সক্রিয়ভাবে জনসমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীল গণতন্ত্র কায়েম করা এবং সুষম জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়ন।'' সুতরাং নির্বাচনী ইশতেহারেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.) রাষ্ট্রপতি সরকার ও শাসন পদ্ধতির পক্ষেই তাদের বিশ্বাস ও সমর্থন ব্যক্ত করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

৭। ৩১শে জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখ ৫ দলীয় ঐক্যজোট সংবিধানের প্রথম ও তৃতীয় সংশোধনী ব্যতীত সকল সংশোধনী বাতিল, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের ধারা প্রত্যাহার এবং ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের বিচারে নতুন আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করে তাঁদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, দেশের বিরাজিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মিশ্র অর্থনীতি সবচেয়ে উপযোগী বলে তাঁরা দৃঢ় মত পোষণ করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে চট্টগ্রামে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসমাবেশে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, ''(নির্বাচনে) সন্ত্রাস প্রতিরোধে প্রয়োজনে লাঠি নিয়ে ভোট কেন্দ্র রক্ষা করবো।''

৮। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার (মেনিফেস্টো) প্রকাশ করা হয়। উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়ে ঘোষণা করা হয় : "জনগণের সার্বভৌমত্বই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এই মূল আদর্শের পরিপন্থী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে কোন প্রক্রিয়া অবৈধ বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সংসদীয় পদ্ধতির (সরকার ও) শাসন ব্যবস্থা কায়েমসহ সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি প্রবর্তন করা দলের লক্ষ্য। এতদুদ্দেশে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ও আইনগত পন্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন, পরিবর্তন ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করা। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে ১৯৭২ সালের সংবিধান চতুর্থ

সংশোধনী-পূর্বাবস্থায় পুনর্বহাল করা। বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ প্রতিটি মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করা ও আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা। গণ-প্রচার মাধ্যমসমূহের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখা ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল নিবর্তনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করা।" ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন এবং ৩রা নভেম্বরে চার জাতীয় নেতা যথা: সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপটেন (অব:) এম. মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানের হত্যাকারীদের বিচারের নিশ্চয়তা বিধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগের উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে প্রস্তাব করা হয়, "তাই, কোন রাষ্ট্র (বা সরকার) প্রধানকে যাতে কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও সন্ত্রাসী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে না হয়, সেজন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে খুনীদের আইনানুগ বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে, যাতে সরকার বা ক্ষমতার পরিবর্তন শুধু সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংঘটিত হয়, খুন বা হত্যালীলার মাধ্যমে নয়।"

৯। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক নীতিমালার মূল দৃষ্টিভঙ্গী তথা দর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয় "... বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারী খাতের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করা হবে। প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও সামাজিক উপযোগিতার নিরিখে সরকারী খাতের অগ্রাধিকার নির্ণীত হবে। এই লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ-সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে এই বাজার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে দেয়া হবে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়কের—নিয়ন্ত্রকের নয়। সাধারণভাবে কোন ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না। ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও হবে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অদক্ষতা ও অনভিপ্রেত অলাভজনকতা দূর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রতিযোগী বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধারায় উৎপাদনশীলতার দ্বারা এদেরকে লাভজনক করতে হবে।"

১০। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল ও উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়: "... দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হতে হবে বহুমুখী, বাস্তবানুগ এবং সামগ্রিক উন্নয়ন ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন

উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, কার্যকর দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। দারিদ্র্য সীমার নীচে নিপতিত অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যেহেতু গ্রামাঞ্চলে বাস করে, সেহেতু গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক পুনরুজ্জীবন আশু কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে উন্নত ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি ও উন্নত প্রযুক্তির কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। ঐসব খাতের বিনিয়োগের অগ্রাধিকার দারিদ্র্য নিরসনের বাস্তব ভিত্তি সম্প্রসারিত করবে। প্রবৃদ্ধিমুখীন এই প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর যে অংশ অবহেলিত থাকবে, তাদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মূলতঃ, সমাজের চরম দরিদ্র অংশই ঐসব কর্মসূচীর আওতায় আসবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে বিবেচনায় কৃষিখাতমুখীন ঋণ ও প্রশিক্ষণ-নির্ভর কর্মসংস্থান কর্মসূচী নিতে হবে।" ... বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত নীতি হিসেবে উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়: "ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ ঘটানোর গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে বৈদেশিক সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ... কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বৈদেশিক সহায়তাই আমরা গ্রহণ করবো। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যকে কেন্দ্র করে অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টির প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হবে।"

১১। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি খাতের উন্নয়নের নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে উল্লেখ করা হয়: "... অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিতে বাৎসরিক উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ও কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উচ্চ ফলনশীল আবাদের প্রসার ঘটাতে হবে। ... শস্যখাতে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য, গবাদি পশু ও অন্যান্য (প্রয়োজনীয় ও অর্থকরী) অকৃষি খাতের বিকাশ ত্বরান্বিত করা হবে এবং দারিদ্র্য নিরসনে তা প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে। কৃষির আধুনিকীকরণের কর্মসূচীর আলোকে কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবারহ, কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষি উপকরণ মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে উপযোগী বন্টন ব্যবস্থা, ভর্তুকি, সংগ্রহ, বাজার ও গুদামজাতকরণ নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। ... কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যুক্তিসঙ্গত মূল্যের মধ্যে নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। .. প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে গবাদি পশুর উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

১২। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে দ্রুত শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করা হয়: "উন্নয়নশীল বিশ্বের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণীর উপস্থিতি, বাজারের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র, পুঁজির বাজারের নির্দিষ্ট বিকাশ ছাড়া সফল শিল্পায়ন প্রয়াস সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জন্য মিশ্র অর্থনীতির

কাঠামোতেই শিল্পায়নের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রকৃত শিল্পোদ্যোক্তা-নির্ভর শক্তিশালী বেসরকারী খাতের ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি ও গোষ্ঠির স্বার্থে ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতি পরিহার করা হবে। দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, লাভজনকতা ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ হবে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির মাপকাঠি। উন্নয়ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারী শিল্প কারখানার ভূমিকা সন্তোষজনক নয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ আদায়ের হারও খুব নাজুক। অন্যদিকে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ধস নামার কারণে রাষ্ট্রীয় খাতও তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। দক্ষ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় খাত পরিচালনা এবং যোগ্য শিল্পোদ্যোক্তাদের হাতে বৃহদায়তন- ক্ষুদ্রায়তন বেসরকারী খাতের বিকাশ—এই দুই উপাদানের সমন্বয়ই হবে শিল্প নীতির মাপমাঠি। রপ্তানিমুখীন শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের সকল প্রকার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই খাতকে জরুরী খাত হিসেবে ঘোষণা করে, উৎপাদন ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ... দেশের শিল্পায়নের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি নীতি, শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক পরামর্শ ব্যবস্থা (সার্ভিস), ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিতকরণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ...বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতায় ক্ষুদ্র কুটির শিল্পোদ্যোক্তরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে নীচ থেকে শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার যথাসাধ্য অবদান রাখছে। এসব শিল্পোদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে, ঋণ, প্রযুক্তিগত সমর্থন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করে তাদের রপ্তানী-নির্ভর, শ্রমনিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করা হবে।''

১৩। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষি ঋণ নীতি ও ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে ঘোষণা করা হয়ঃ '' ...কৃষি ঋণ যাতে প্রতিটি চাষী (কৃষক) বিশেষ করে, প্রান্তিক চাষী (কৃষক) ও বর্গাদারদের ন্যায্য চাহিদা মেটাতে পারে তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষতি সাশ্রয়ের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল গঠন করা হবে। ২৫ বিঘা পর্যন্ত (কৃষি) জমির খাজনা মওকুফ করার মাধ্যমে মালিকের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধান করে তাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা হবে। ...যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সিংহভাগ জনসংখ্যা ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীর (কৃষকের) দলে এবং এদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এজন্য ভূমি সংস্কারের আবশ্যকতা ও প্রাসংগিকতা অপরিহার্য (অনস্বীকার্য)। ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য চারটিঃ (১) কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ; (২) আয়ের সুষম বন্টনের সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ; (৩) ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা

করা এবং (৪) এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে — (ক) ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন, (খ) সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে গৃহীতব্য নীতিমালা অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা এবং (গ) ভূমি ব্যবস্থাপনাকে দক্ষ, উন্নত, দুর্নীতিমুক্ত ও যুগোপযোগী করে পুনর্গঠন, যাতে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।''

১৪। আওয়ামী লীগের ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে সারাদেশে দ্রুত ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে এতদুদ্দেশ্য লক্ষ্য, নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়ঃ '' কৃষি, শিল্প তথা সার্বিক উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামোর ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। শুধুমাত্র আন্তঃনগর যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার নয়, বরং প্রধান গুরুত্ব আরোপিত হতে হবে গ্রামঞ্চলে সারা বছরের জন্য উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর। গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি অভিন্ন বাজার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা হবে তাৎপর্যপূর্ণ, যা কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের সমন্বয় সাধন সুদৃঢ় করবে। যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা-গোমতী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে আভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদী সংস্কার ও রেলপথ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।''

১৫। আওয়ামী লীগের ৬ই ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে একটি দক্ষ ও দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দলীয় দৃষ্টিভংগি, নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণায় বলা হয়, ''একটি স্বাধীন দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা যেমনি জনগণের কাছে দায়বদ্ধকর ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত, তেমনি জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি দক্ষ হাতিয়ার। এই উদ্দেশে ঃ (১) প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করে তোলা এবং জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করা হবে। প্রশাসনযন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত সরকারী (কর্মচারী ও) কর্মকর্তাগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী রূপে বিবেচিত হবেন—সরকারের নয়। (২) অর্থনৈতিক উন্নতির সামগ্রিক লক্ষ্যের দিকটি বিবেচনা করে প্রশাসনযন্ত্রকে রদবদল অথবা পুনর্বিন্যাস করা হবে। (৩) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সামগ্রিক প্রশাসন পুনর্বিন্যাসের একটি অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে। (৪) সরকারী কর্মকান্ডের অযৌক্তিক সম্প্রসারণ এবং সেই সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার প্রবণতা রোধ করতে হবে। জনগণ তাদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সৃজনশীল ও সক্রিয়--- এই উপলব্ধি থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যম (উদ্যোগ) নিয়ে স্থানীয় সরকারগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।'' আওয়ামী লীগের উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে দলীয় সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত নীতিতে বলা হয়, "দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার

উদ্দেশ্যে একটি সুদক্ষ, শক্তিশালী, সুশৃংখল ও কার্যকর সেনাবাহিনী কর্তৃক এই পবিত্র দায়িত্ব সংবিধানে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী পালিত হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী নিশ্চিত করা হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

১৬। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাবনা, কর্মসূচী ও নীতি হিসেবে বলা হয়ঃ ''শিক্ষা, সুযোগ নয়—প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জাতীয় জীবনে থেকে নিরক্ষতার অভিশাপ দূর করতে হবে। অবৈতনিক বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি কার্যকর করতে হবে। বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষার সকল স্তরে প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ-সুবিধার সমতা সাধন এবং দারিদ্র্য যাতে প্রতিভা ও মেধা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যাপকভিত্তিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। শিক্ষকতা বৃত্তিকে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরশীল বৃত্তি হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও শিক্ষকের মর্যাদা এবং সৎ জীবন-যাপনের উপযোগী ন্যায়ানুগ বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে।...বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালুকরণ এবং সরকারী-বেসরকারী, অফিস-আদালতের সকল কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রচলন করা হবে।'' আওয়ামী লীগের উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়ঃ ''দেশের প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে দেশের সকল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক করে গড়ে তোলা হবে এবং যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের মাধ্যমে চিকিৎসাকে বাস্তব অর্থে ফলপ্রসূ করে তোলা হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষণালব্ধ যথাযথ কৌশল অবলম্বন করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন্মহার হ্রাসকল্পে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ''

১৭। আওয়ামী লীগের ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়ঃ '' বাংলাদেশের ভৌগোলিক (অবস্থান ও) পরিস্থিতি এবং তার ফলে বন্যার ভয়াবহ পরিণতি সমস্ত অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, সেহেতু বন্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই সমস্যা সমাধানে সমস্ত আন্তর্জাতিক কৌশলগত প্রচেষ্টার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সত্বর জরুরী

ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি বন্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশের ন্যায্য জাতীয় চাহিদাকে সংরক্ষিত করে ভারতের সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান নিশ্চিত করা হবে।'' আওয়ামী লীগের উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী বিষয়াদি সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়ঃ ''পানি, গ্যাস, (তেল), কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ফলে যে বিরাট আর্থিক লোকসান হচ্ছে তা রোধ করার জন্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে একদিকে যেমন বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে এইখাতে রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।''

১৮। আওয়ামী লীগের ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের উপজাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে দলীয় নীতি ও কর্মসূচী হিসেবে বলা হয়ঃ "দেশের উপজাতিদের স্বীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সংরক্ষণ ও বিকাশের নিশ্চয়তা ও বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাবলী সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে।" আওয়ামী লীগের উপরোল্লিখিত নির্বাচনী ইশতেহারে ১৯৭১ সালে দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তি-যোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে দলীয় নীতি হিসেবে বলা হয়ঃ "মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে।"

১৯। আওয়ামী লীগের ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে দলীয় পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে বলা হয়ঃ "জনসাধারণের আশা-আকাংক্ষা ও রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বি.এ.এল.) স্বাধীন নিরপেক্ষ, জোট-বর্হিভূত পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা, সমতা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের হস্তেক্ষেপ না করার ভিত্তিতে সমস্ত সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব এবং কারো প্রতি বৈরী মনোভাব নয়' এই মূলনীতি অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী। জাতিসংঘের সনদে উল্লেখিত নীতিসমূহ এবং উক্ত সনদে বর্নিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি রয়েছে আমাদের পূর্ণ সমর্থন। আওয়ামী লীগ আগ্রাসন, (আধিপত্যবাদ), সাম্রাজ্যবাদ ও (সর্ব প্রকার) বর্ণবাদের বিরোধী এবং বিশ্বের নিপীড়িত, মুক্তিকামী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত জাতিসমূহের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থনে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন,

কমনওয়েলথ, ইসলামী (রাষ্ট্রমণ্ডল) সংস্থা এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ক সমিতি (SAARC) ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব বজায় রাখা হবে।"

২০। ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা সদম্ভে ও দৃঢ়তার সাথে বলেন, "আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবে।" ৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে মুসলিম লীগ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে' ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনে একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে সেখানকার নির্বাচন স্থগিত ঘোষিত হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং সংসদের ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ঐ দিনেই 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সাহেবের বিচার দাবি করে একটি বিবৃতি প্রদান করে। একই দিনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.পি.বি.) দলীয় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বহালরত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে তাঁর দলীয় নীতির কথা ঘোষণা করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নারীদের মর্যাদাহানির কারণেই স্বৈরাচার বিদায় নিয়েছে।" ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আয়োজিত এক নির্বাচনী প্রচারণা জনসভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁর দলীয় নীতির কথা ঘোষণা করেন।

২১। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ঢাকায় এক দলীয় নির্বাচনী প্রচার মিছিলে অংশগ্রহণকালে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "বি.এন.পি.-ই আগামী দিনে ক্ষমতায় যাবে।" ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে আয়োজিত এক দলীয় নির্বাচনী জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, "নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনরকম পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না।" ঐ দিনেই আটরশীর পীর সাহেব ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সাহেবের বিচার দাবি করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে জাপান ও কমনওয়েলথের দুটি পৃথক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ঢাকায় আসে। ২২শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতির নেতৃত্বে একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষকমণ্ডলী গঠিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে চট্টগ্রাম শহরস্থ সার্কিট হাউসে এক নির্বাচনী জনসভায় বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেণ, "বি.এন.পি. ক্ষমতায় এলে চট্টগ্রাম শহরকে একটি বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।" একই দিনে ঢাকায় এক নির্বাচনী জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "(আওয়ামী লীগ প্রতীক) নৌকায় ভোট দিলে

গণতন্ত্র দেবো।" ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে খুলনায় এক নির্বাচনী সভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, "দেশে-বিদেশে রব উঠেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে।" একই দিনে কেরাণীগঞ্জে এক নির্বাচনী জনসমাবেশে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "নির্বাচনে কারচুপি করা হলে বি.এন.পি. প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।" নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে ঢাকার পান্থপথে এক বিশাল নির্বাচনী জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, . . ." (আওয়ামী লীগ প্রতীক) নৌকায় ভোট দিলে মানুষ গণতন্ত্র পাবে, অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে। " এদিনেই ঢাকার মানিকমিয়া এভিনিউয়ে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, "বি.এন.পি.-এর হাতেই রয়েছে স্বধীনতার পতাকা। অন্যদের হাতে রয়েছে গোলামীর জিঞ্জির।" উক্ত সমাবেশে তিনি অভিযোগ করে বলেন, "নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা চলছে।"

২২। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখ সন্ধ্যায় রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য।" এদিন রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "যে কোন মূল্যে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করা হবে।" ২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) তারিখে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সব মহল নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে। গভীর রাত পর্যন্ত বেসরকারীভাবে ঘোষিত ফলাফলে বি.এন.পি. এগিয়ে থাকে। ২৮শে ফেব্রুয়াররী (১৯৯১) তারিখের বিকেল চারটার মধ্যে ২৯৪ টি আসনের ফলাফল বেসরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে বি.এন.পি. ১৩৭ টি, আওয়ামী লীগ ৮৫টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি, জামাতে ইসলামী ১৮টি, সি.পি.বি. ৫টি, বাকশাল ৫টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ১টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, গণতন্ত্রী পার্টি ১টি, ইসলামী ঐক্যজোট ১টি, জাসদ (সিরাজ) ১টি, এনডিপি ১ টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৩টি আসন পায়। বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উভয়ই পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটিতেই বিজয়ী হন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র একটিতে বিজয়ী হন। এদিন বিকেল ২ টার দিকে আমি টেলিফোনে বি.এন.পি. চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে তাঁর ব্যক্তিগত ও দলের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। এদিন সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "কতিপয় অদৃশ্য শক্তির গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নির্বাচনে অতি সূক্ষ্ম ও সুকৌশলে কারচুপি করা হয়েছে।"

২৩। ১লা মার্চ (১৯৯১) তারিখে এক নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার তালিকায় ত্রুটি না থাকলে বি.এন.পি. দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতো।" অতঃপর তিনি আরও বলেন, "প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ে আমরা কোয়ালিশন সরকার গঠন করবো।" এদিনেই আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য এবং নির্বাচনে পরাজিত ডঃ কামাল হোসেন এক বিবৃতিতে গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি আশা করি, সবাই অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষা করবেন।" একই দিন রাতে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনোত্তর ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "কোন্ দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়ায় এ মুহূর্তে মন্ত্রিপরিষদ গঠন সম্ভব নয়।" ২রা মার্চ (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, "সরকার গঠনে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা উচিৎ নয়।" ৩রা মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব স্বীয় কাঁধে নিয়ে সভানেত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদিকার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এদিন বি.এন.পি.-এর এক সংসদীয় দলের সভায় বেগম খালেদা জিয়া সর্বসম্মতভাবে বি.এন.পি.-এর সংসদীয় দলের প্রধান নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

২৪। ৪ঠা মার্চ (১৯৯১) তারিখে হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির (পুরাতন) ৩২ (নতুন ১১) নম্বর রোডস্থ বাড়ী, 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' সমবেত হয়ে ম্যাডাম হাসিনার প্রতি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। একই দিনে, এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি ম্যাডাম হাসিনার প্রতি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ম্যাডাম হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধিদল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক মীমাংসা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন না।" এর জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ প্রতিনিধিদলকে বলেন, "যিনিই প্রধানমন্ত্রী হোন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা হারাবেন না।" ৫ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের চাপে ম্যাডাম হাসিনা তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে সম্মত হন। এদিকে গণতন্ত্রী পার্টি, বাকশাল, ন্যাপ (মোজ্জাফফর) ও সিপিবি যৌথভাবে ঘোষণা করে যে, বি.এন.পি. সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে রাজি হলে তারা বি.এন.পি. কে সমর্থন দেবে। ৬ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে আয়োজিত এক বিজয় সমাবেশে বি.এন.পি. চেয়ারপারসন বেগম খালেদা

জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "জনগণের রায় মেনে নিয়ে একসঙ্গে কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।"

২৫। ইতিপূর্বে জানা গিয়েছিল যে, ৭ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে ১৯৭১ সালের ঐদিনে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস উপলক্ষে রেডিও ও টেলিভিশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। কিন্তু ৭ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জানা যায় যে, সরকার তৎমর্মে পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। এর প্রতিবাদে এবং রেডিও ও টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ (১৯৭১)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারের দাবীতে ঐদিন সকালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক পৃথক পৃথকভাবে ঘেরাও করে রেডিও ও টেলিভিশন ভবন। এর ফলে ঐদিন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ঐদিন বিকালে ঢাকার পান্থপথে এক বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা তাঁর ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য। ৮ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টির এক সংসদীয় দলের সভায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ৯ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে সংসদের ৪টি আসনের কিছু কিছু নির্বাচনী এলাকার স্থগিত নির্বাচন পুনরায় অনুষ্ঠিত হলে এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩টিতে এবং বি.এন.পি. ১টিতে বিজয়ী হয়। ১০ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের এক সভায় ম্যাডাম হাসিনা সর্বসম্মতভাবে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উক্ত সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বহাল রেখেও প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা সম্ভব।

২৬। ১১ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে জামাতে ইসলামীর এক প্রতিনিধিদল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সরকার গঠনে বি.এন.পি.কে পূর্ণ সমর্থন প্রদানে তাঁদের দলের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এদিনই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ বলেন, "সংসদীয় পদ্ধতিতে বি.এন.পি. রাজি না হলে আওয়ামী লীগই (সংসদে) সংসদীয় (সরকার) পদ্ধতির বিল আনবে।" ১২ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে মুন্সীগঞ্জে আয়োজিত এক নির্বাচন প্রচারণী সভায় বি.এন.পি. চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে মন্ত্রী এমপিরাও রেহাই পাবে না।" ১৪ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনে ভূমিকা পালনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ডঃ কামাল হোসেন ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক চিঠিতে নির্বাচন সংক্রান্ত কতিপয় বিষয় উল্লেখ করে বলেন, "(নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে) অতি উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা এবং নেতা ও কর্মীদের

কর্মবিমুখতা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ।" এদিনই মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বি.এন.পি. প্রার্থী বিজয়ী হন। ১৫ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১৮ই মার্চ (১৯৯১) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোকে বঙ্গভবনে গোল টেবিল বৈঠকে আহবান জানালে বি.এন.পি., নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজোট উক্ত বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানায়।

২৭। ১৯শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বি.এন.পি. চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ জন পূর্ণ মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২০শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে বিকেল আড়াইটায় বঙ্গভবনে নির্ধারিত ছিল প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। ম্যাডাম হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য সংসদ সদস্যদের উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই ভেবে কোন আমন্ত্রণপত্র ছাড়াই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্যে আমি অফিস থেকে যথাসময়ে বঙ্গভবনে যাই। বঙ্গভবনের প্রধান ফটকে কর্তব্যরত কর্মকর্তাদেরকে আমার পরিচয় জানালে তাঁরা আমাকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেন। অতঃপর, বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত স্থান 'দরবার হলে' প্রবেশের পূর্বে আমার পরিচয় জানালে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আমাকে প্রতিমন্ত্রীদের সারিতে বসিয়ে বলেন, "আপাততঃ এখানে বসুন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা এলে আপনাকে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীদের সারিতে বসানো হবে।" শপথ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকেল তিনটায়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী, ১০ জনকে পূর্ণমন্ত্রী ও ২০ জনকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ প্রদান করেন। প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করায় আব্দুল মতিন চৌধুরী সেদিন শপথ গ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা কিংবা তাঁর দলের কোন নেতা বা সংসদ সদস্য উক্ত শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে আমি বেগম খালেদা জিয়া ও কতিপয় পরিচিত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ঐদিনই আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহের ১৯শে নভেম্বর (১৯৯০) তারিখে ঘোষিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার দায়িত্ব সম্পর্কিত রূপরেখা অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিপরিষদ গঠনে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

২৮। ২১শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে সরকারীভাবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনাকে পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরাধী দলীয় নেত্রী ঘোষণা করা হয়। ২৭শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মিঃ মাইলাম প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অভিনন্দন জানান। ২৮শে মার্চ (১৯৯১) তারিখে জাতীয়

সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনের জন্য বি.এন.পি. ২৮ জনকে এবং জামাতে ইসলামী ২ জনকে মনোনয়ন প্রদান করলে তাঁদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এদিনে জাতীয় সংসদের কুষ্টিয়া-২ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বি.এন.পি. প্রার্থী বিজয়ী হন। ১লা এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা কতিপয় সাংবাদিকের নিকট বলেন, "সংসদীয় সরকার পদ্ধতির লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলবো।" ২রা এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হানিসার নেতৃত্বে দলের একটি প্রতিনিধিদল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁদেরকে বলেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি জাতীয় সংসদে সমাধান হওয়া উচিৎ।"

২৯। ৪ঠা এপ্রিল রাতে বি.এন.পি. পঞ্চম জাতীয় সংসদে আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে স্পীকার এবং শেখ রাজ্জাক আলীকে ডেপুটি স্পীকারের পদদুটির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করে। অপরদিকে, বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদদুটিতে মনোনয়ন প্রদান করায় আওয়ামী লীগ স্পীকার পদে সালাউদ্দিন ইউসুফকে এবং ডেপুট স্পীকার পদে জনাব আসাদুজ্জামানকে মনোনয়ন প্রদান করে। ৫ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখ সাকাল নয়টায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী (প্রথম) অধিবেশন শুরু হয় বিদায়ী স্পীকার শাসুল হুদা চেধুরীর সভাপতিত্বে। তুমুল বাক-বিতণ্ডার মধ্যদিয়ে অবশেষে জাতীয় সংসদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিভক্তি ভোটে সংসদের স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার পদদুটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবদুর রহমান বিশ্বাস স্পীকার এবং শেখ রাজ্জাক আলী ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। সেদিন বিকেল তিনটায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ সংসদে প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বা সংসদীয় পদ্ধতি—কি ধরনের সরকার হবে সেটা আমার ব্যাপার নয়, সেটা সংসদের ব্যাপার। আমার ইচ্ছা এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া। "

৩০। ৭ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে সংসদে কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার নাম সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরেই স্থান না দেওয়ার প্রতিবাদে বিরাধীদল একজোটে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। এই সময় সংসদের সকল বিরোধীদল এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলে, "সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠায় বি.এন.পি.'র কোন উদ্যোগ নেই।" ৮ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. বিরোধীদলের দাবির প্রেক্ষিতে কার্য উপদেষ্টা কমিটির নামের তালিকা সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১০ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, "বার ঘন্টার মধ্যে (ক্ষমতাচ্যুত) এরশাদকে কারাগারে পাঠাতে হবে।" এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে বলেন,

"এরশাদকে শিগ্‌গিরই কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে। কিন্তু কারাগারে পাঠাতে অনেক নিয়ম–কানুন আছে। কাজেই এ ব্যাপারে কিছু সময়ের প্রয়োজন।" ১৮ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে এরশাদ সাহেবকে গুলশানস্থ অন্তরীণ রাখা বাড়ি থেকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ২৪শে এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, "সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল গত ১৪ই এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে সংবিধান একাদশ সংশোধনী বিল সংসদ সচিবালয়ে জমা দিয়েছে।" ২৫শে এপ্রিল (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত রেডিও এবং টেলিভিশন সংস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিরোধী দলীয় প্রস্তাব সরকারী সংসদীয় দলের কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

৩১। ২৮শে মে (১৯৯১) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রস্তাবিত সভায় যোগদান করতে গিয়ে জামাতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী কতিপয় ছাত্র কর্তৃক প্রহৃত হন দারুণভাবে। ১লা জুন (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অকস্মাৎ সিঙ্গাপুর চলে যান চিকিৎসার জন্যে। ৫ই জুন (১৯৯১) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক রেডিও ও টেলিভিশনের ভাষণে বলেন, "সরকার পদ্ধতির (প্রশ্নটির) মীমাংসা করে আমাকে (রাষ্ট্রপতির) দায়িত্ব থেকে অনতিবিলম্বে অব্যাহতি দিন।" ৬ই জুন (১৯৯১) তারিখে ঢাকার গুলিস্তান চত্বরে বি.এন.পি. কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "বি.এন.পি.'র (সরকারের) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।" ৭ই জুন (১৯৯১) তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৯ই জুন (১৯৯১) তারিখে দেশের সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে আয়োজিত বি.এন.পি. কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় নাটকীয়ভাবে সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০ই জুন (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত বি. এন. পি. সংসদীয় দলের এক সভায় সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে। ১২ই জুন তারিখে বিশেষ আদালত অস্ত্র আইনে ক্ষমতাচ্যুত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৭ই জুন (১৯৯১) তারিখে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "বি.এন.পি. এখন সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে।" ৩০শে জুন (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধীদলের চীফ হুইপ মোহম্মদ নাসিম, খুনী খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক

১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে জারিকৃত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) বাতিলকরণ প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি বিলের নোটিশ সংসদ সচিবালয়ে দাখিল করেন। ঐ দিনই রংপুরের ১১ জন জাতীয় সংসদ সদস্যের চিঠিপত্র আটক সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় সংসদে এক ভীষণ উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। এর এক পর্যায়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "বি.এন.পি.–এর স্বৈরাচারী চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে।"

৩২। ১লা জুলাই (১৯৯১) তারিখে রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "সময়ের চাহিদা অনুসারে সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জাতীয় সংসদ শিগ্‌গির এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।" এদিনই প্রধানমন্ত্রীর উক্ত ভাষণের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে বি.এন.পি. সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" ২রা জুলাই (১৯৯১) তারিখে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে জাতীয় সংসদে পেশ করেন সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংক্রান্ত সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী বিল (১৯৯১)। অতঃপর, আইন বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জ্জা গোলাম হাফিজ সংসদে পেশ করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের পূর্বপদে (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে) ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত সংবিধান একাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১)। ৪ঠা জুলাই (১৯৯১) তারিখে বহু আগে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ কর্তৃক পেশকৃত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহবুদ্দিন আহমদের পূর্বপদে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত বিলটি সংসদে পুনরায় উথাপিত হয়। সংসদের স্পীকার উক্ত বিলটিকে সংবিধান ত্রয়োদশ সংশোধনী বলে রুলিং দিলে প্রায় আড়াই ঘন্টা ভীষণ উত্তপ্ত বিতর্কের পর বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ৬ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে ৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ সংবিধান সংশোধনীর ব্যাপারে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার সঙ্গে। ৯ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে সরকারী দলের দুইটি সংবিধান সংশোধন বিল এবং আওয়ামী লীগের সংবিধান সংশোধন বিলগুলো সংসদের বিশেষ (স্থায়ী) কমিটিতে পাঠানোর জন্যে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩৩। ১০ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয়ে একটি সংবিধান সংশোধন বিলের নোটিশ পেশ করেন। ১৪ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংসদ উপনেতা এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে সংসদকে অবহিত করেন যে, এরশাদের

শাসন আমলে দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৩২ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে এবং ৮১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৫ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে তৎকালীন সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ওসমান গনি খান জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদকে জানান যে, দেশে ৬২ হাজার ৭৭টি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। ১৬ই জুলাই (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে 'গণভোট' আইন (১৯৯১) উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ের ওপর বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদকে বক্তব্য রাখতে না দেওয়ার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ সাংসদরা একজোটে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ২৮শে জুলাই সংবিধান সংশোধনী বাছাই সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি সংসদে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। সরকারী দলের উত্থাপিত বিলটিতে ২৬ টি পরিবর্তন আনা হয়। ৩০শে জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংসদে শুরু হয় সংবিধান সংশোধন বিল দু'টির ওপর আলোচনা। বিরোধী দল, আওয়ামী লীগে এ ব্যাপারে আরও কিছু গ্রহণ-বর্জনের দাবি করে। ঐ দিনেই বাকশাল আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে শত শত রাউন্ড গুলী বিনিময় হয়। উক্ত ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ৩১শে জুলাই (১৯৯১) তারিখে সংসদে জাতীয় পার্টির সাংসদরা সংবিধান সংশোধন বিল (১৯৯১)-এর ওপর আলোচনায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের পূর্বপদে (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে) ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলেন।

৩৪। ১লা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদরা ইন-ডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ বাতিলের ব্যাপারে সরকারী দল বি.এন.পি.-এর নেতত্বের প্রতি আহবান জানান একটি সমঝোতায় পৌছনোর জন্য। ২রা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বেগম খালেদা জিয়া অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে বলেন, "সংবিধান সংশোধন বিল পাশে আওয়ামী লীগ রাজি নাও হতো পারে।" এর জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, "সংবিধান সংশোধন বিল পাস না হলে আমি পদত্যাগ করবো।" ৩রা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে সংবিধান সংশোধনীর বিষয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। ৪ঠা আগস্ট (১৯৯১) তারিখে পত্রপত্রিকায় এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও তাঁর পরিবারবর্গ ৩১শে জুলাই (১৯৯১) থেকে জিম্মি হয়ে আছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের নির্বাচিত

সদস্যগণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে জরুরী তারবার্তা পাঠান। একই দিনে জাতীয় সংসদে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বিরোধী দলের নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার বক্তব্যের সময় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে হৈ চৈ করা হলে সংসদে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে, ১ ঘন্টা ১০ মিনিট ধরে কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর আবার সংসদে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়। ৫ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. সরকার সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন বিল পাস করানোর লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সংগে জাতীয় পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যথা– পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, সংসদে পার্টির সংসদীয় দলের নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এবং পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ও সংসদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেবদের দুই ঘন্টা বৈঠক করার অনুমতি দেয়। কেন্দ্রীয় কারাগারে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টির সাংসদদেরকে সংসদে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে ভোট দেয়ার নির্দেশ দেন।

৩৫। ৬ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীদ্বয় অনুমোদিত হয়। সংবিধান একাদশ সংশোধন (১৯৯১) বিলে জাতীয় পার্টি ও এন.ডি.এফ. ভোটদানে বিরত থাকলেও সংবিধান দ্বাদশ সংশোধন (১৯৯১) বিল পাস হয় সর্বসম্মতভাবে। উল্লেখ্য, সংবিধান একাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার দিবস হতে তাঁর পূর্বপদে (সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে) ফিরে যাওয়ার দিবস পর্যন্ত সময়কালে গৃহীত ও কৃত সকল পদক্ষেপ ও ক্রিয়াকলাপ বৈধ বলে ঘোষিত হয়। সংবিধান একাদশ সংশোধন আইন (১৯৯১) সংবিধানের চতুর্থ তফশিলের ২০ অনুচ্ছেদের পর ২১ অনুচ্ছেদ হিসেবে সংযোজিত করা হয়। এতে বলা হয়ঃ "১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ন মোতাবেক ১৯৯০ সালে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ–রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাঁহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ন মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) এর প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে বা ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে (যাই পরে হউক) উক্ত উপ–রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যথাযথভাবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।"

৩৬। সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী সরকারের কার্যনির্বাহী প্রধান। উল্লিখিত দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীর ও রাষ্ট্রপতির যে দায়িত্ব ক্ষমতা প্রদান করা হয় তা মোটামুটি বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অনুরূপ। জাতীয় সংসদে সংবিধাধান একাদশ এবং দ্বাদশ সংশোধনীদ্বয় পাস হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকার ৭ই আগস্ট (১৯৯১) দিবসকে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে। ৭ই আগস্ট (১৯৯১) সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জাতীয় সংসদে সংবিধান একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীদ্বয় পাস হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা জাতীয় সংসদে সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ঘটনাকে জনগণের আশা ও আকাংক্ষা বাস্তবায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত করেন।

৩৭। ৮ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা ও সংসদে বিরোধী দলের চীফ হুইফ মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদে পেশ করেন 'ইনডেমনিটি' (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫ সালের ১৯ নং অর্ডিন্যান্স) বাতিল সংক্রান্ত বিল। বিলটির ওপর কিছু আলোচনার পর সেটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সংসদে গঠিত একটি ১৫ সদস্য-বিশিষ্ট বিশেষ (স্থায়ী) কমিটিতে পাঠনোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১২ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ রেডিও ও টেলিভিশনে জাতীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন যে, সংবিধানের বিধান মোতাবেক সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনীর জন্য 'গণভোট' গ্রহণ আবশ্যক এবং তা অনুষ্ঠিত হবে ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে। ১৩ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখ রাত ২ টা ৪৫ মিনিটে বিরোধী দল সমূহের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে পাস করানো হয় সরকারী দল বি.এন.পি. কর্তৃক পেশকৃত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১) বিল। উক্ত আইনে সাংসদদের প্রকাশ্য ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩৮। ১৪ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫ই আগস্ট (১৯৯১) তারিখ আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ১৬ তম শাহাদাত দিন শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়। ঐদিন জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ও জনাব আব্দুর রাজ্জাকসহ 'বাকশালের' নেতা ও কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। বিস্ময়কর যে, জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও অতীতের জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং এরশাদ সরকারগুলোর মতো বঙ্গবন্ধুর

শাহাদাতের দিবস উপলক্ষে সরকারী প্রচার মাধ্যম, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ৩১শে আগস্ট (১৯৯১) তারিখে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. এম. এরশাদের বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে দেশের বৃহত্তম সোনা চোরাচালান মামলার চার্জশীট দাখিল করা হয়।

৩৯। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে উপ-নির্বাচনের পূর্বে বি.এন.পি.-এর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "পাঁচ বছরের আগে কোন চক্রান্ত করে বি.এন.পি.কে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।" ৬ই সেপ্টেম্বরর (১৯৯১) তারিখে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকা মানিক মিয়া এভিনিউয়ে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভনেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "বি.এন.পি. সরকার গণতান্ত্রিক আচরণ করছে না।" ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে সংসদের ১১ টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার একটি আসনে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়। ঐদিন সকালে ঢাকার ভোট কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা সেন্ট্রাল রোডস্থ ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় কে বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। ঐ গুলী উক্তস্থানে দণ্ডায়মান এক রিক্সা চালককে আঘাত করলে সে অকুস্থলেই প্রাণ হারায়। এরপর, সেখানে আরও কিছুক্ষণ গোলাগুলী চলে। ঢাকার অপর আসনসহ বাকি আসনের নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উপ-নির্বাচনের ১১টি আসনের মধ্যে ৫টিতে বি.এন.পি., ৪টিতে জাতীয় পার্টি এবং ২ টিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হন। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে রেডিও ও টেলিভিশনে জাতীর উদ্দেশ্য প্রদত্ত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছি।" এদিনই আওয়ামী লীগ দলীয় সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনার ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে সেন্ট্রাল রোডে প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখ সারাদেশে অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বিচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সরাদেশের অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

৪০। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনীর ব্যাপারে জনগণের মতামত গ্রহণে। উক্ত গণভোটে মোট ভোটারের মাত্র ৩৪.৯৩ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করে। এর মধ্যে সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে ভোট পড়ে ৮৪.৪২ ভাগ। অতঃপর দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বলবৎ হয়। ১৯ শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থার অধীনে নতুন করে প্রধনামন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একই অনুষ্ঠানে ৪০ সদস্য-বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার সদস্যগণও শপথ গ্রহণ করেন। এদিনই নির্বাচন কমিশন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ধার্য করে ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখ।

২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে বি.এন.পি. তৎকালীন সংসদ স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মনোনয়ন দাখিলের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখ। ঐ দিন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী হিসেবে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনের জন্যে মনোনয়ন প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও আওয়ামী লীগের আলহাজ্ব মকবুল হোসেনও রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের সবগুলো বিরোধী দল এক সভায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে। সভাশেষে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী দলীয় প্রার্থী নন। তিনি জাতীয় ঐকমত্যের প্রতীক।" ঐদিনই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়ন বাছাইয়ের পর নির্বাচন কমিশন প্রাপ্ত ৩টি মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখ ছিল রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী আলহাজ্ব মকবুল হোসেন তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ঐদিনেই সরকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সংসদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধনী হিসেবে একটি অধ্যাদেশ জারি করে।

৪১। ১লা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে তিনটি পৃথক রীট দাখিল করেন আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলোর কতিপয় নেতা। এদিনই জাতীয় সংসদের সবগুলো বিরোধী দল এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১)-এর সংশোধন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। ২রা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন সংশোধন অধ্যাদেশটির বিরুদ্ধে পেশকৃত রীটগুলো শুনানির বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্যে হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ সেগুলো সুপ্রীম কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠান। এদিকে, বি.এন.পি.-এর মহাসচিব ব্যারিস্টার আবাদুস সালাম তালুকদার এক বিবৃতিতে বলেন, "রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১) সংশোধন অধ্যাদেশটি সংবিধান সম্মতভাবেই জারি করা হয়েছে।" ৩রা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে সরকার গণদাবির মুখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১) সংশোধনী অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করে। ৪ঠা অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুইজন প্রার্থী যথা- আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পাকিস্তানী নাগরিক হয়েও জামাতে ইসলামীর কার্যতঃ আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর দোয়া চান। একই দিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রকাশ্য ভোটের বিধানের বিরুদ্ধে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদসহ ৭ নেতার

পেশকৃত রীট আবেদনের শুনানি শুরু হয়। ৫ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে। ৬ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে হাইকোর্টে শুনানি হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত হবে কিনা সে প্রশ্নে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদসহ ৭ নেতার পেশকৃত রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে। একই দিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাক্ষাৎ করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার সঙ্গে। এদিকে বি.এন.পি. সংসদীয় দলের এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বি.এন.পি. সংসদ সদস্যদের প্রকাশ্যে ভোট প্রদানের জন্যে। ৭ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশকালীন বেঞ্চ ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠেয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত রাখার আবেদন নাকচ করে দেন।

৪২। ৮ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সংসদ কক্ষে সাংসদদের প্রকাশ্য ভোট প্রদান ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে বি.এন.পি. প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষিত হন। অপর প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী মাত্র ৯২ ভোট পান। জাতীয় পার্টি এবং জামাতে ইসলামীর সাংসদরা উক্ত নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থাকেন। ৯ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন না। ১০ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর পূর্বপদে অর্থাৎ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচরপতির পদে ফিরে যান। ১২ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় পদ্ধতির প্রথম সংসদ অধিবেশনে সংসদের ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সংসদের নতুন স্পীকার নির্বাচিত হন সর্বসম্মতভাবে। ১৩ই অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদের নতুন ডেপুটি স্পীকার হিসেবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন বি,এন,পি'র হুমাউন খান পন্নী। ২৭শে অক্টোবর (১৯৯১) তারিখ বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলে বি.এন.পি.-এর অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের মধ্যে। উক্ত ঘটনায় ছাত্রদলের দুইজন সশস্ত্র ছাত্র, ছাত্রলীগের একজন নিরস্ত্র ছাত্র এবং একজন টোকাই কিশোর প্রাণ হারায়। এই ঘটনার পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তৎপরতা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

৪৩। ১৯৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে একটি ঘটনা ঘটে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। উক্ত ঘটনাটি হলো "প্রজন্ম ১৯৭১" নামক একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ।

দেশের অনেক যুবক–যুবতী এবং তরুণ–তরুণী যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ছিল অবুঝ শিশু এবং যাদের জন্ম স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠন করে এই সংগঠন। এদের অনেকেই ১৯৭১ সালে দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর তথাকথিত শান্তি বাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি সংগঠনের সদস্যদের হাতে নিহত শহীদ পরিবারের সন্তান। তাদের মনে অনেক জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন। মূলতঃ, তারা জানতে চায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও সৃষ্টির সঠিক ইতিহাস ও নেপথ্যকাহিনী। ১৯৭১ সালে এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বিভিন্ন পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী তথা আপামর জনসাধারণকে কেনইবা ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও তার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে? কিসের লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্যবোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের লাখো লাখো নরনারী আত্মাহুতি দিয়েছিল ১৯৭১–এর মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধে? কেন ও কিভাবে জাগ্রত ও উজ্জীবিত হয়েছিল তাদের এই চেতনা। এই উপলব্ধি ও চেতনাবোধ কি একদিনে ঘটেছিল না এর পেছনে ছিল সুদীর্ঘকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস? কে বা কারা জনগণকে দিকনির্দেশনা প্রদান ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুদীর্ঘকালের সেই সমস্ত আন্দোলন ও সংগ্রামে? লাখো লাখো নরনারীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমানের তরুণ সমাজের সেই সুদীর্ঘকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের সঠিক তথ্য ও ইতিহাস জানতে চাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। একই সঙ্গে শহীদ পরিবারের সন্তানরা চায় সেই সমস্ত ব্যক্তির বিচার যারা সজ্ঞানে ও সক্রিয় অংশগ্রহণে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সহায়তা ও সহযোগিতা করেছিলো গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানী, মানুষের বাড়ীঘর, হাটবাজার ও কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, সয়সম্পত্তি ধ্বংস, লুণ্ঠন ইত্যাদি গর্হিত অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে।

৪৪। ৩রা নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে সারাদেশে পালিত হয় আওয়ামী লীগের 'জেল হত্যা প্রতিবাদ' কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঢাকায় আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫) বাতিল করা নিয়ে টালবাহানা জাতি বরদাশত করবে না।" ৪ঠা নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে জাতীয় সংসদে ১৯৭৫ সালের ৩ রা নভেম্বর তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যার ব্যাপারে আলোচনার সময় এক উত্তপ্ত বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সাংসদরা বলেন, "সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডেরই আমরা নিন্দা করি।" ৮ই নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে প্রয়াত কর্নেল (অবঃ) তাহেরের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে জাসদ (ইনু) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কতিপয় বক্তা বলেন, "জিয়াউর রহমান কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে হত্যার মধ্য দিয়ে (১৯৭৫ সালের) ৭ই

নভেম্বরের চেতনাকে ধ্বংস করেছে।" ২রা ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশে সফরে আগত পাকিস্তানের তেহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টি প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আসগর খান বলেন, "শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ছিল ন্যায্য।" ৫ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভায় বলা হয়, "(জাতীয়) বিজয় দিবসের কর্মসূচী সংকুচিত করা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র।" ৬ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে ৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এবং বি.এন.পি. ঢাকায় পৃথক পৃথকভাবে তিনটি জনসভার আয়োজন করে এরশাদ ও তার সরকারের পতনের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে। বি.এন.পি. জনসভার আয়োজন করে গুলিস্তান এলাকায়, ৮ দলীয় ঐক্যজোট বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে এবং ৫ দলীয় ঐক্যজোট জিরো পয়েন্ট এলাকায়। পুলিশ ৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদুটির জনসভায় বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ ও কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলীবর্ষণ করে। এই ঘটনায় শতাধিক লোক আহত এবং ৪২ জন গুলীবিদ্ধ হওয়াসহ ৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের জনসভা পণ্ড হয়ে যায়। পুলিশ দিয়ে জনসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে ৮দলীয় ঐক্যজোট ৮ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে সারাদেশে ৮ ঘন্টা হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। অতঃপর ৮ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে সারাদেশে পালিত হয় ৮ দলীয় ঐক্যজোট আহূত ৮ ঘন্টা হরতাল।

৪৫। ১০ই ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দুইটি পৃথক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত আব্দুল আহাদ চৌধুরী ও আব্দুল আজিজের নেতৃত্বাধীন সমাবেশে 'জয় বাংলা' শ্লোগান উচ্চারিত হয়। এই সমাবেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচার দাবি করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘাতকদের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের সরকার বিচার না করায় এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে 'ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স' (১৯৭৫) বাতিল বিল সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সংসদীয় বিশেষ (স্থায়ী) কমিটির বৈঠকে এর আইনগত বিষয়ে ঐকমত্য ব্যক্ত করা হয়। ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৯১) তারিখে জামাতে ইসলামী আমীর (দল প্রধান) হিসেবে নির্বাচিত করে ১৯৭১-এর দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, জনগণের বাড়ীঘর-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, ইত্যাদি অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে সহায়তা ও সহযোগিতাকারী অথবা স্বয়ং নিজেরা এ জাতীয় কার্যকলাপ সংঘটনের জন্য দায়ী রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীগুলোর প্রধান সংগঠক ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ সংগঠনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে।

৪৬। ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হলে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামীর দলের আমীর (দলীয় প্রধান) নির্বাচিত করা সংবিধানের ৩৮ ধারামতে আইন সম্মত কিনা সে সম্পর্কে সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তখন সংসদে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও হৈ চৈ হয়। এর এক পর্যায়ে সংসদ স্পীকার ৮ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখ এই বিষয়ে সংসদে আলোচনার জন্য ধার্য্য করেন। ৮ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামীর দলের আমীর (দলীয় প্রধান) নির্বাচিত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ শামসুল হক, আজিজুর রহমান, আব্দুল আওয়াল মিয়া এবং ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ৪টি পৃথক মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংসদ স্পীকার, শেখ রাজ্জাক আলী মোহাম্মদ শামসুল হকের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে সে সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার সুযোগ প্রদান করেন। অতঃপর, মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন যে, বিদেশী কোন নাগরিককে বাংলাদেশে অবস্থানকালে বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে আধ্যাপক গোলাম আযম কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বিতর্কের দ্বিতীয় বক্তা জামাতে ইসলামীর সংসদ সদস্য রহুল কুদ্দুস বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তার নাগরিক অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা হয়েছে।" এরপর ওয়ার্কার্স পার্টির একমাত্র সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন বলেন, "বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক অধিকার রহিত ব্যক্তিকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত করে একটি মুক্তিযুদ্ধের ফসল আমাদের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।" জনাব রাশেদ খান মেনন আরও বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম কেবল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন না, স্বাধীনতার পরও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটির' সদস্য ছিলেন।১৯৭৮ সালে গোলাম আযম পাকিস্তানের পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন—জন্মসূত্রের নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেননি।" অতঃপর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, "আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে জানার কথা জামাতে ইসলামীর কাছ থেকে নয়, ক্ষমতাসীন বি.এন.পি. সরকারের কাছ থেকে।"

৪৭। এরপর এদিন সংসদে আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তানে বসে 'মুসলিম বাংলা কায়েম কমিটি', 'পুর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' প্রভৃতির সদস্য হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছেন, আন্তর্জাতিক সংস্থায়ও বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন।" জনাব আব্দুর রাজ্জাক আরও

বলেন, "যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকার করেছেন, জিয়াউর রহমান সরকার ১৯৭৫–এর পর সেই রাজাকার বাহিনীর নেতা ও সদস্যদেরকে শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিতই করেননি, তাদেরকে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও বানিয়েছেন।" পরিশেষে, জনাব আব্দুর রাজ্জাক অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে শাস্তি বিধানের জোর দাবি জানান। এর পর জামাতে ইসলামীর সংসদ সদস্য শেখ আনসার আলী বলেন, "জামাতে ইসলামী, বাংলাদেশ, (অধ্যাপক) গোলাম আযমকে (দলের) আমির বানিয়ে ভুল করেনি।" বিতর্কের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানের নাগরিক আধ্যপক গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামীর আমির নির্বাচিত করার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, "অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন বি.এন.পি.কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জামাতে ইসলামীর সমর্থন নিতে হয়েছে। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান সরকারই রাজাকারদের (রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে) পুনর্বাসিত করেছেন এবং অধ্যাপক–গোলাম আযমকে বাংলাদেশে এনেছেন।" এদিন বি.এন.পি.–এর সংসদ সদস্য আব্দুল লতিফ ভুঁইয়া বলেন, "একজন লোক যদি অপরাধ করে থাকে, তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।" সংসদে এই পর্যায়ে বিরোধী দল থেকে 'শেইম', 'শেইম', উচ্চারিত হতে থাকে এবং তার বক্তব্য কোলাহলে তলিয়ে যায়। সরকারী দলের কয়েকজন সংসদ সদস্যকেও তার বক্তব্যে বাধা দিতে দেখা যায়। এদিন সংসদে সর্বশেষ বক্তা আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ বলেন, "স্বাধীনতা বিরোধী অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য, সাহায্য না দেওয়ার জন্য।" অতঃপর জনাব তোফায়েল আহমদ প্রস্তাব করে বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমকে শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।" এর পর সংসদ স্পীকার আলোচনা মুলতবি রাখেন ১২ই জানুয়ারী (১৯৯২) রোববার পর্যন্ত।

৪৮। ৯ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের টি.এস.সি. সড়ক দ্বীপ এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল একটি আলোচনা সভা। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা। সভা চলাকালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এর কিছুক্ষণ পর, সভাস্থলের অদূরেই শামসুন্নাহার হলের সম্মুখে ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল এবং এস.এম. হল এলাকাগুলোয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলী চলে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলদ্বয়ের ১০/১২ টি কক্ষ ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে ম্যাডাম

হাসিনা নব্য স্বৈরাচারের তৎপরতা, শিক্ষাঙ্গনসহ সবকিছুকে (ক্ষমতাসীন বি.এন.পি.-এর) দলীয়করণ ও (শিক্ষাঙ্গনে) সন্ত্রাস প্রতিরোধে ছাত্র সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়ে বলেন, "আমরা শিক্ষাঙ্গনে শান্তি চাই, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে জনগণের ভাত-কাপড়-শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে চাই।" উক্ত ভাষণে ম্যাডাম হাসিনা আরও বলেন, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারণ করা হয়েছে জামাত-শিবিরের সঙ্গে আঁতাত করে। একইভাবে ১৯৭১-এর গণহত্যা ও নারীধর্ষণের হোতা গোলাম আযমকে রাজনীতির অঙ্গনে নামানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। মানুষের পবিত্র আমানত, পবিত্র ধর্মকে ব্যবহার করে এসব করা হচ্ছে।"

৪৯। ১০ই জানুয়ারী (১৯৯২) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে আয়োজিত এক জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "যে চক্রান্তের মাধ্যমে ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া ও চুন্নুকে হত্যা করা হয়েছিল সেই একই চক্রান্তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদলকে ৯ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে হত্যা করা হয়েছে। এই (বি.এন.পি.) সরকার (শিক্ষাঙ্গনে) সন্ত্রাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।" উক্ত সমাবেশে ম্যাডাম হাসিনা আরও বলেন, "আমি বার বার বলেছি, সরকার ইচ্ছে করলেই এক ঘন্টার মধ্যেই অস্ত্র উদ্ধার করতে পারে। আমি এখনও বিশ্বাস করি অস্ত্রধারীরা কারো নয়। সরকার দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়েছেন। আজ দেশে আইন-শৃংখলা নেই, দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। (বি.এন.পি.) যাদের সঙ্গে আঁতাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, আজ তাদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। সরকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ে অস্ত্র উদ্ধার না করে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। (বি.এন.পি.) সরকার ইনডেমনিটি আইন (১৯৭৫) বাতিল প্রশ্নে টালবাহানা করছে। (বি.এন.পি. সরকার) দেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

৫০। ১২ই জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদে অধ্যাপক গোলাম আযম প্রসঙ্গে উত্থাপিত মুলতবি প্রস্তাবের ওপর শেষ আলোচনা হয়। আলোচনার সূত্রপাত করে জামাতে ইসলামী সংসদ সদস্য জনাব এনামুল হক বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যে আদেশ বলে তার নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে, তা অবৈধ। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে আমরা দলের আমির (প্রধান) নির্বাচিত করেছি।" এর জবাবে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, "এটা জামাতে ইসলামী এবং আমাদের মধ্যে বিতর্কের ব্যাপার নয়। সমস্ত দায়িত্ব (বি.এন.পি.) সরকারের। সরকারকেই জবাব দিতে হবে গোলাম আযম বাংলাদেশের

নাগরিক কিনা, তাঁর কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে কিনা।" অতঃপর স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) হাফিজ বলেন, "জামাতীদের বক্তব্য শুনে আমরা বুঝতে পারছিনা, আমরা বাংলাদেশে আছি নাকি পাকিস্তানে আছি। যে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলেন, তিনিই গোলাম আযমকে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতার মোহ এমনই জিনিষ যে, তাঁর স্ত্রী যিনি পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, তিনিই গোলাম আযমকে একটি রাজনৈতিক দলের আমীর (প্রধান) হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়া হলে বাংলাদেশ মিথ্যে হয়ে যাবে।" এর পর আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, "গোলাম আযম সম্পর্কে জিয়া ও এরশাদের ভূমিকা একই— তারাই গোলাম আযমকে আজকের পর্যায়ে এনেছেন। জামাতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করে বি.এন.পি. সরকার গঠন করেছে, তারা গোলাম আযম সম্পর্কে কিছু বলছেন না।"

৫১। এদিনে সংসদে পঞ্চম বক্তা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, "২৭শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯১)-এর নির্বাচনের আগে বেগম খালেদা জিয়া গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করে ৮৬ টি (সংসদের) আসনে আঁতাত করেছিলেন। এই আঁতাত করেও বি.এন.পি. সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়নি। তখন বি.এন.পি. আবার স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করে সরকার গঠন করেছে। এই সেদিন এডলফ হিটলারের প্রশংসা করায় জন অস্টিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যদি এটা করতে পারে, তবে আমি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচারই শুধু দাবি করি না, জামাতের রাজনীতিও নিষিদ্ধ করার দাবি করি। আমরা ক্ষমা করার কে? জিজ্ঞেস করুন ধর্ষিতা বোনকে সে ক্ষমা করবে কিনা। জিজ্ঞেস করুন শমী কায়সারকে, সে ক্ষমা করবে কিনা।" বিতর্কের এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, "১৯৭১-এ যদি গোলাম আযমরা জয়ী হতো তাহলে আমরা (দেশে) থাকতে পারতাম না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর গোলাম আযম, দু'জনই ছিলেন স্বাধীনতা বিরোধী, তাই বুঝা যায় কোন দিক থেকে কি হচ্ছে।" এর পর সিপিবির সংসদ সদস্য শামসুদ্দোহা বলেন, "গোলাম আযমকে (জামাতে ইসলামীর) আমির (দলীয় প্রধান) করার মধ্য দিয়ে আমাদের সংবিধান ও আইনকে লংঘন করা হয়েছে।" অতঃপর জাসদ (সিরাজ)-এর শাহজাহান সিরাজ বলেন, "গোলাম আযমকে যদি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, তাহলে বি.এন.পি.-এরই প্রথম জনতার আদালতে বিচার করতে হবে।" এর পর আওয়ামী লীগের সদস্য ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা করা হয়েছিল।" অতঃপর সরকারী গেজেট দেখিয়ে তিনি আরও বলেন, "গোলাম আযমকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তা জানিয়েছে।"

৫২। জাতীয় সংসদে এদিন গোলাম আযম সম্পর্কে আনীত মুলতবি প্রস্তাবের ওপর শেষ বক্তা ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী। (বি.এন.পি.) সরকারের পক্ষ থেকে তিনি বলেন, "সরকার গোলাম আযমকে (বাংলাদেশের) নাগরিকত্ব দেয়নি। একজন বিদেশী হয়েও তাঁর (জামাতে ইসলামীর) আমীর (প্রধান) নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হয়েছে। এর আইনগত বিষয়াদি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।" অতঃপর অধ্যাপক গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থানের নেপথ্যকাহিনী উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে জানান, "(বাংলাদেশের) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী শাখার) আমীর ছিলেন। ২২শে নভেম্বর (১৯৭১) তারিখে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭২ সালে তাকে বিদেশী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে তিনি (বাংলাদেশের) নাগরিকত্বের আবেদন করেন। ১৯৭৮ সালেও তিনি আবেদন করেন। কিন্তু দু'বারই তাঁর আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয়। ১১ ই জুলাই (১৯৭৮) তারিখে (বাংলাদেশ) সরকারের কাছ থেকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। আসার সময় তিনি তাঁর মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়েছিলেন। ৩০শে এপ্রিল (১৯৮১) তারিখে গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আনুগত্য প্রকাশ করে 'হলফনামা' দাখিল করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন।"

৫৩। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) তরিখে বাংলা একাডেমীতে মহান একুশে ফেরুয়ারী উপলক্ষে আয়োজিত "বাংলাদেশের বিশ বছরঃ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা" শীর্ষক আলোচনা সভায় কতিপয় বক্তা বলেন, "(বাংলাদেশের) মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। অশুভ রাজনীতির শিকার হয়ে ১৯৭৫ সালের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃত হয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বেতার–টিভিতে ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে অনুচ্চারিত রাখা হচ্ছে। ব্যক্তি, দলীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে জাতিকে সঠিক ইতিহাস থেকে দূরে রাখা যাবে না। ইতিহাস তাঁর নিজস্ব সত্তায় একদিন গর্জে উঠবেই।" আলোচনায় অংশগ্রহণ করে (১৯৭১–এর) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী বলেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ (১৯৭১)–এর প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা প্রথমে চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম. এ. হান্নান পাঠ করে শোনান। পরবর্তীতে, একজন তরুণ ব্যবসায়ী ঘোষণাটির বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। অতঃপর ২৭শে মার্চ তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা পাঠ করেন। এগুলো ইতিহাসের অংশ। যারা এ সমস্ত বিষয়ে বিকৃত তথ্য প্রকাশ করেন প্রকারান্তরে তারা এসব বীর সন্তানদেরই অবমাননা করেন। জেনারেল জিয়ার অবিকৃত ঘোষণাটি এখন বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে।"

৫৪। ৬ই মার্চ (১৯৯২) তারিখে নেত্রকোনায় এক জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "১৫ই আগষ্ট (১৯৭৫) তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে (দেশে) স্বৈরাচারের বিষবৃক্ষ রোপিত হয় এবং ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ জারি করে ও তৎপরবর্তীকালে সংবিধান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁর খুনীদের অপকর্ম জায়েজ করা হয়। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সামরিক সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বাংলাদেশের বিদেশস্থ দূতাবাসে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির চক্রকে পুনর্বাসিত করেন। পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানে এমন জঘন্য কালাকানুন নেই। ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহ কর্তৃক (১৯ শে নভেম্বর ১৯৯০)-এর প্রকাশিত ঘোষণায় উক্ত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করার কথা থাকলেও বর্তমান বি.এন.পি. সরকার তা কার্যকর করছে না।" অতঃপর উক্ত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিলের সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমরা দেশে আইনের শাসন কায়েম করতে চাই।"

৫৫। ৭ই মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ (১৯৭১) উপলক্ষে আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "৭ই মার্চ (১৯৭১) একদিনে আসেনি। বৃটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর পাকিস্তানীরা আঘাত করেছিলো আমাদের ওপর, আমাদের জাতীয় সত্তার ওপর। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এ দিনটি আমাদের মাঝে উপনীত হয়। জাতির জনক এদিন এ দেশের মানুষের (রাজনৈতিক ও) অর্থনৈতিক মুক্তি তথা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে ঘাতকের নির্মম বুলেটে তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু হত্যার বিচার আজও হয়নি। ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স দিয়ে তাঁর (হত্যার) বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।" অতঃপর বর্তমান বি.এন.পি. সরকারের আচার-আচরণের তীব্র সমালোচনা করে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "দীর্ঘ পনের বছর ধরে আমরা সংগ্রাম করেছি। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, স্বৈরাচারের পতন হলেও একই চেহারা এই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। নামে মাত্র সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, স্বৈরাচারের অবসান ঘটেনি।"

৫৬। ১৬ই মার্চ (১৯৯২) তারিখ সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ 'বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাঙ্গণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন 'রক্তলালের' উদ্যোগে আয়োজিত 'হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা ও শিশু কিশোর সমাবেশে' আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, "বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে আমাদের (জাতীয়) চরিত্র নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে (জাতির) সঠিক ইতিহাস জানা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।"

অতঃপর তিনি নব প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির গৌরবমন্ডিত প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্যে দেশের সচেতন নাগরিকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। উক্ত সমাবেশে ম্যাডাম হাসিনা আরও বলেন, "যাঁর পুণ্যজনমে দেশ হয়েছে ধন্য, বাঙ্গালীর গৌরবের হয়েছে চরম বিকাশ, আজ তাঁর ৭২ তম জন্মবার্ষিকী। এই সংগ্রামী মহাপুরুষ সারা জীবন ভিনদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহনীয় জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, এমনকি দুইবার ফাঁসির কাষ্ঠে গিয়েও আমাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলনের দীর্ঘ চূড়ান্ত পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ এই বাড়ি থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এই বাড়িতেই স্বাধীনতার শত্রু ঘাতকরা তাঁর জীবন কেড়ে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সমগ্র জাতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াই পরিচালনা করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে। এই গৌরবদীপ্ত স্বাধীনতা অর্জনে ৩০ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে। দেশবাসী অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্ব আর বাংলার আপামর জনগণের সম্মিলিত সফল সংগ্রামের ফসল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে ফিরে এসে শূন্য হাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত আর পোড়ামাটি বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্ব, আন্তরিকতা এবং বিজ্ঞানসম্মত-পরিকল্পিত দেশ শাসনের ফলে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ তথা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তখনি স্বাধীনতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকের দল তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। মানবতার শত্রুদের কাছ থেকে শিশু-নারী-পুরুষ কেউই রেহাই পায়নি। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে ইনডেমনিটি (ক্ষমাপ্রদর্শন) অর্ডিন্যান্স সংযোজন করে সেই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই আজ দেশ ও জাতির স্বার্থে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।"

৫৭। ১৭ই মার্চ ১৯৯২) তারিখে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ "বঙ্গবন্ধু ভবন" প্রাঙ্গণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "চারিদিকে আজ হতাশার ধ্বনি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, অরাজকতা, সবমিলে সারাদেশে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষের আয় বাড়ছে না, অথচ সবকিছু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জনগণ চরম অর্থনৈতিক দৈন্যে নিপতিত। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। দলীয়করণ করে তাদেরকে দলীয় কাজে ব্যবহার করছে এই (বি.এন.পি.) সরকার।... এই ক্রান্তিলগ্নে গণতন্ত্রের শুভফল

জাতিকে দেয়ার জন্য আমরা অর্থনৈতিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। সারাবিশ্বে আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিক, সময়োপযোগী অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ নিয়ে আলোচনা চলছে। ইনশাআল্লাহ, এ কর্মসূচী জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণে শুভফল বয়ে আনবে।" অতঃপর (বি.এন.পি.) সরকারের আচার-আচরণের তীব্র সমালোচনা করে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছি। জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে এটাই ছিল আন্দোলনের প্রত্যাশা। কিন্তু (বর্তমান বি.এন.পি.) সরকার তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকার অতীতের সরকারের পথ অনুসরণ করে চলছে। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, এ সরকার এরশাদের জুতা পরে ও চশমা লাগিয়েই দেশ শাসন করছে।" বিস্ময়কর যে, জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়েও বেগম খালেদা জিয়ার সরকারও অতীতের জিয়াউর রহমান, বিচারপতি সাত্তার ও এরশাদ সাহেবের সরকারগুলোর মতো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে বেতার-টিভি এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোকে কোন অনুষ্ঠান করার অনুমতি দিতে ব্যর্থ হয় চরমভাবে।

৫৮। ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ইফতার পার্টি উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা। ঘোষিত এই অর্থনৈতিক নীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি খাতের অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও স্থায়ীভাবে স্বপ্রণোদিত সমবায় প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত করা হবে। প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, অর্থনৈতিক কার্যকারিতা ও সামাজিক উপযোগিতার নিরিখে সরকারী ও ব্যক্তিখাতের ভূমিকা নির্ণীত হবে। কাংক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের সুযোগ সুবিধা যাতে সবাই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অন্যায়ভাবে এই বাজার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়ক ও সম্পূরক। (ব্যক্তি বা বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত) কোন আর্থিক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না। রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অদক্ষতা ও অনভিপ্রেত অলাভজনকতা দূর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রতিযোগী বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধারায় উৎপাদনশীলতার দ্বারা এগুলোকে লাভজনক করতে হবে। "উল্লেখ্য, ১৯ মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মসূচী এবং আওয়ামী লীগের ১৯৯১ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য বা ভিন্নতা শুধুমাত্র একটি ব্যাপারেই। তা

হচ্ছে এই: ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়েছে, "সাধারণভাবে কোন ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।" পক্ষান্তরে, ১৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত অর্থনীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন হিসেবে বলা হয়েছে, "কোন আর্থিক সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।"

৫৯। ২১শে মার্চ (১৯৯২) তারিখ 'এ.টি.পি.' বিমান ক্রয় সম্পর্কিত দুর্নীতির মামলার চার্জ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বরে ক্ষমতাচ্যুত এইচ. এম. এরশাদের বিরুদ্ধে। ঢাকা বিভাগীয় বিশেষ আদালতের জজ কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী উক্ত চার্জশীট অভিযুক্তদেরকে পাঠ করে শোনান। লে: জেনারেল (অব:) এইচ. এম. এরশাদসহ চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে পেশ করা হয় এই চার্জশীট। অপর তিনজন অভিযুক্তরা ছিলেন সাবেক মন্ত্রি লে: কর্নেল (অব:) এইচ. এম. এ. গাফফার, জিয়াউদ্দিন আহমদ বাবলু এবং সাবেক শিল্প সচিব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন। অভিযোগে বলা হয় যে, ১৯৮৯ সালে দাম বৃদ্ধি করে 'এটিপি' বিমান ক্রয়ে ২০ কোটি ১৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৬০ টাকা বাংলাদেশের ক্ষতি সাধন করেছেন অভিযুক্তরা। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেরা কিংবা অন্যকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের এই অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। অভিযোগে আরো বলা হয় যে, ১৯৮৯ সালে লে: জেনারেল (অব:) এইচ. এম. এরশাদ ও সাবেক সচিব এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন বৃটিশ এরোস্পেস কোম্পানী ভ্রমণকালে দাম বৃদ্ধি করে 'এটিপি' বিমান ক্রয় করেন। বিমান ক্রয়ে তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সাবেক পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী লে: কর্নেল (অব:) এইচ. এম. এ. গাফফার বিমানের আর্থিক লোকসান জানা সত্ত্বেও উক্ত বিমান ক্রয়ের চুক্তি করেন। সাবেক বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী জিয়াউদ্দিন বাবলু বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের দায়িত্বে থেকেও উক্ত বিমান ক্রয় বন্ধ করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

৬০। ইতিপূর্বে ১৯শে জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে বেগম জাহানারা ইমামকে আহ্বায়িকা ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে গঠন করা হয় একটি ৪২ সদস্য-বিশিষ্ট 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' (The National Coordination Committee for the implementation of the spirit of the Liberation War and annihilation of the Killers and Collaborators of 1971)। এই সমন্বয় কমিটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)-এর সভাপতি কাজী আরেফ আহমদ, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী, বাসদ-এর আব্দুল্লাহ সরকার,

আওয়ামী লীগের মির্জা সুলতান রাজা, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ডাঃ এস. এ. মালেক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ চৌধুরী, নাট্যশিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম, সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের চেয়ারম্যান কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের গোলাম কুদ্দুছ, প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বাস্তাবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, নারীধর্ষণ, লোকজনের বাড়িঘর-দোকানপাট-কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ, ধ্বংস, লুন্ঠন, ইত্যাদি অপরাধমূলক ও মানবতাবিরোধী কার্য-কলাপে সহায়তা ও সহযোগিতাকারী অথবা স্বয়ং নিজেরাও এ জাতীয় কার্যকলাপ সংগঠনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনানুগ বিচারের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সমন্বয় কমিটি ঘোষণা দেয়, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উপরোল্লিখিত গর্হিত অপরাধ-মূলক ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের প্রধান সংগঠক এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীনতা বিরোধী ও রাষ্ট্রদোহিতামূলক কার্যকলাপের জন্য দায়ী অন্যতম বিশিষ্ট নেতা গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে গণ-আদালতে বিচার অনুষ্ঠানের। ঢাকা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও মহল্লাসহ দেশের অন্যান্য শহর, বন্দর ও গ্রামগঞ্জেও গঠন করা হয় উক্ত সমন্বয় কমিটির শাখা-প্রশাখা। উক্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি ৮-সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা হলেনঃ (১) শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমাম, (২) অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, (৩) জনাব আব্দুর রাজ্জাক এমপি, (৪) কাজী আরেফ আহমদ, (৫) নূরুল ইসলাম নাহিদ, (৬) আব্দুল আহাদ চৌধুরী, (৭) সৈয়দ হাসান ইমাম এবং (৮) শাহরিয়ার কবির।

৬১। গোলাম আযমের গণ-আদালতে বিচারের দিন যতই ঘনিয়ে আসে ততোই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে উক্ত অনুষ্ঠানের পক্ষে জনসমর্থন। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে সরকার ২৩শে মার্চ (১৯৯২) তারিখ গভীর রাতে গোলাম আযমের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে এই মর্মে যে, কেন তিনি একজন বিদেশী নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন না এবং বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধি লংঘন করে জামাতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। সরকার একই সঙ্গে উপরোল্লিখিত গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতিও শোকজ নোটিশ জারি করে তাঁদের সংবিধান ও আইনের শাসন অবজ্ঞা করে 'গণ-আদালত' আয়োজন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। গোলাম আযমের কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক নয় এই বিচেনায় সরকার ২৪শে মার্চ তারিখ রাতে তাঁকে বিদেশী নাগরিক (প্রবেশ) আইনের আওতায় গ্রেফতার করে এক মাসের ডিটেনশনে প্রেরণ করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে।

৬২। ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তরিখে সরকারের সকল ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বাধা প্রদান সত্ত্বেও ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে 'গণ-আদালতে' বিচার অনুষ্ঠান। কয়েক লাখ লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিচার অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্যে। অনেক বিদেশী সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকও উপস্থিত ছিলেন উক্ত 'গণ-আদালতে' বিচার অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্যে। বেগম জাহানারা ইমামকে চেয়ারপারসন করে গঠিত বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন বেগম জাহনরা ইমাম, এডভোকেট গাজীউল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, স্থপতি মযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, ফয়েজ আহমদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, শিল্পী কলিম শরাফী, মাওলানা আব্দুল আউয়াল, লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী ও ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান। গোলাম আজমের বিরুদ্ধে উক্ত 'গণ-আদালতে' উপস্থাপিত বিচার্য বিষয় ছিলঃ "(১) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে ত্রিশ লক্ষ নিরস্ত্র নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী অপহরণ ও ধর্ষণে সহায়তা করে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন? (২) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ২৬শে মার্চ থেকে ডিসেম্বর (১৯৭১) মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আলবদর, আলশামস, ইত্যাদি বাহিনী গঠন করে এবং তাঁর অনুগত রাজাকার বাহিনী দিয়ে পাকিস্তানী বাহিনীকে দুই লক্ষ নারী অপহরণ ও ধর্ষণে শ্লীলতাহানিজনক অপরাধ সংঘটন করতে সাহায্য করেছেন? (৩) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকিস্তানী বাহিনীকে গণহত্যায় উস্কানি এবং প্ররোচনা দান করেছেন? (৪) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি আলবদর, আলশামস, ইত্যাদি বাহিনী গঠন করে তাদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীহ পরিবার পরিজনের ওপর সশস্ত্র ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করছেন? (৫) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সহিংসতা ছড়ানোর লক্ষ্যে ধর্মের বিকৃত ব্যাখা প্রদান করে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছেন এবং এই দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন? (৬) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি তাঁর নিজস্ব অনুগত বাহিনী আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনী দিয়ে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করে অসংখ্য জনপদ ধ্বংস করে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছেন? (৭) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি পাকস্তানী হানাদার বাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এই দেশে ১৯৭১ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসদুটিতে তাঁর অনুগত বাহিনী আলবদর ও আলশামস দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা সংঘটন করেছেন? (৮) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' গঠন করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছেন? (৯) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচার চালিয়ে

মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন? (১০) অভিযুক্ত গোলাম আযম কি স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তাঁর অনুগত আলবদর, আলশামস বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী দিয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে জঘন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন?"

৬৩। ২৬ মার্চ (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত 'গণ–আদালতে' অভিযোগকারীদের পক্ষে কৌসলী ছিলেন এডভোকেট জেড.আই. পান্না, এডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল ও এডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা। 'গণ–আদালতের' বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অনুপস্থিত থাকায় ন্যায় বিচারের জন্যে গণআদালত এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলামকে গোলাম আযমের পক্ষে কৌসলী নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পাঠ করে শোনান। ফরিয়াদীর পক্ষে ১২ জন সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভাগের শিক্ষক ডঃ মেঘনাদ গুহ ঠাকুরতা, বাংলাদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক, খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির, খ্যাতনামা লেখিকা মুশতারী শফী, শহীদ প্রকৌশলী ফজলুর রহমানের পুত্র সাইদুর রহমান, শহীদ প্রখ্যাত সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের পুত্র অমিতাভ কায়সার, হামিদা বানু, মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ, প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী আলী জাকের ও ডঃ মুশতাক হোসেন। সাক্ষীদের সাক্ষ–প্রমাণ বিবেচনা করে বিচারকমণ্ডলী অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন নিম্নোক্ত রায়ঃ ''আমরা সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য সত্য এবং দাখিলকৃত প্রদর্শনীসমূহ অকাট্য বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি এবং আনীত প্রতিটি অভিযোগের প্রত্যেক অপরাধে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশে উপরোক্ত অপরাধ দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। যেহেতু গণ–আদালত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর করেনা, সেহেতু অভিযুক্ত গোলাম আযমকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।"

৬৪। ২৭শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে 'ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল' বিলের বিশেষ সংসদীয় কমিটির একাদশ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংসদ ভবনের স্ট্যান্ডিং কামিটির এক নম্বর কক্ষে। সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এ সভাকাল স্থায়ী হয়। বি.এন.পি.–এর দিক থেকে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন না ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। বিশেষ সংসদীয় কমিটির জাতীয় পার্টির সাংসদ ফজলে রাব্বি এবং জামাতে ইসলামীর সাংসদ শেখ আনসার আলীও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কতিপয় সূত্র থেকে জানা যায় যে, মাত্র একদিন আগে উক্ত সভার নোটিশ দেওয়ায় এঁরা সেখানে

উপস্থিত থাকতে পারেননি। বিশেষ সংসদীয় কমিটির উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান ও আইন ও বিচারমন্ত্রী মির্জ্জা গোলাম হাফিজ, তথ্যমন্ত্রী ব্যরিস্টার নাজমুল হুদা, সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা ও সংসদ সদস্যা বেগম সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাংসদ শুধাংশু শেখর হালদার, সংসদের বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এবং গণতন্ত্রী পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, বিশেষ সংসদীয় কমিটির উপরোক্ত সভায় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিলের ব্যাপারে সেদিন কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

৬৫। ২৮শে মার্চ তারিখে গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা। উক্ত সভায় গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি আহমদুল কবির তাঁর ভাষণে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ফলশ্রুতি হচ্ছে গণতন্ত্র। তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ... জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সংসদীয় গণতন্ত্র বিফল হতে বাধ্য। আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।" জনাব আহমদুল কবির আরও বলেন, "বর্তমানে সময় এসেছে। এখন দেশের জনগণই বাধ্য করবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত হতে এবং তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করতে।" গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহম্মদ আফজাল তাঁর ভাষণে বলেন, "এবারের স্বাধীনতা দিবসে জনতার মূল সুর হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অনুসরণ। ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখালে জাতি শেকড় চ্যুত হবে।" তিনি আরও বলেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ না করে। বিগত ১৬/১৭ বছর ধরেই স্বাধীনতা দিবসে রেডিও-টেলিভিশনে তাঁর নামও উচ্চারিত হয় না। ১৯৭১ সালের প্রবাসী সরকারের নামও উচ্চারিত হয় না।" অতঃপর মোহাম্মদ আফজাল অতীতের সরকারগুলো এবং বর্তমান বেগম খালেদা জিয়ার সরকাররের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মানুষ আবারও জেগে উঠেছে। আজকের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলোর সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের ওপর নির্ভর করবে দেশ কোন পথে যাবে।" উক্ত সভায় গণতন্ত্রী পার্টির সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, "১৯৭৫-এর পরের সংবিধানে 'মুক্তিযুদ্ধ' শব্দ নেই। এর পরিবর্তে এসেছে স্বাধীনতা যুদ্ধ বা (War of Independence)। এই দুইটি টার্ম-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে একটি ধারাবাহিকতা, যা আমরা অর্জন করেছিলাম ৬ দফা, ১১ দফার ভিত্তিতে। War of Independence কথাটি সংবিধানে জুড়ে দেয়ায় মনে হয় যে, কোন একজন সামরিক কর্মকর্তা হুইসেল বাজিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন।" .. অতঃপর শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্তব্য

করেন, "গণতন্ত্রের মূল শত্রু হচ্ছে মৌলবাদী শক্তি। মৌলবাদী শক্তি মানবতার শত্রু। বিশ্বব্যাপী এখন গণতন্ত্রের আওয়াজ উঠেছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে। আবার সময় এসেছে জাতীয় ঐক্যের, অর্থাৎ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের।"

৬৬। এদিকে ২৮শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে বি.এন.পি. সরকার ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত 'গণ-আদালতের' ১২-সদস্য বিচারকমণ্ডলী, ৪ জন কৌঁসলী এবং ১২ জন সাক্ষীর ৭ জন এবং সমন্বয় কমিটির সদস্য-সচিব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়ার কোর্টে মামলা দায়ের করে। উক্ত কোর্টে সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের করেন রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৈয়দ আখলাক হোসেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ঢাকার পিপি আব্দুর রাজ্জাক খান। দায়েরকৃত মামলার প্রাথমিক শুনানি শেষে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আজিজুল হক ভূঁইয়া উক্ত 'গণ-আদালতের' ১২-সদস্য বিচারকমণ্ডলী, সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব, ৪ জন কৌঁসলী এবং ৭ জন সাক্ষীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে ২৭শে এপ্রিল (১৯৯২) মামলাটির শুনানির জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন। 'গণ-আদালতে' সাক্ষী হিসেবে অংশগ্রহণকারী ১২ জন সদস্যের মধ্যে যে ৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয় তারা হলেন: ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ, আলী জাকের ও ডঃ মোস্তাক হোসেন। উপরোল্লিখিত ২৪ জন অভিযুক্তদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২১ (এ), ১২১ (বি), ১৪৮, ১২৪(এ), ৩০৭, ৫০৫(এ) ও ৫০৫(ডি) ধারাগুলোর আওতায় অভিযোগ কগনিজেন্স নেয়া হয় এবং তদনুযায়ী গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। উল্লেখ্য, ১২১ ধারাটি হচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, হওয়ার চেষ্টা করা অথবা লিপ্ত হতে সহায়তা করা, ১২১ (এ) ধারাটি হচ্ছে ১২১ ধারাবলে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করা, ১২৪ (এ) ধারাটি হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার, ১৪৮ ধারাটি হচ্ছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা করা, ৩০৭ ধারাটি হচ্ছে খুনের চেষ্টা করা এবং ৫০৫ ধারাটি হচ্ছে জনগণের অনিষ্ট হতে পারে এমন ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদানের অভিযোগ।

৬৭। ২৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত "গণ-আদালতের" সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকার কারণে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' আহবায়িকা বেগম জাহানারা ইমাম ও সদস্য-সচিব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীসহ বি.এন.পি. সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত ২৪ জনই 'সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির' সভাপতির কক্ষে উপস্থিত হন। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সহ সুপ্রীম কোর্টের বিপুল সংখ্যক আইনজীবী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। সেখানে উপরোল্লিখিত ২৪ জনের

বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির প্রেক্ষিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তৎবিষয়ে বিস্তৃত আলাপের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তাঁদের জন্য আগাম জামিনের আবেদন পেশ করার। অতঃপর ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমদ ও ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলামসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী জামিনের আবেদনটি নিয়ে বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী ও বিচারপতি এম. এ. করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগ বেঞ্চের কক্ষে হাজির হন। ডঃ কামাল হোসেন উপরোক্ত জামিনের আবেদনটি ডিভিশন বেঞ্চে পেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী প্রথমে যে আদালত থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে সেখানে তা পেশ করার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়ে যাবার পর নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন প্রার্থনা করাই সমীচীন হবে।" এর জবাবে ডঃ কামাল হোসেন নিবেদন পেশ করে বলেন, "আলোচ্য মামলাটি এ দেশের ইতিহাসে একটি ভিন্ন প্রকৃতির ঘটনা। এটি একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী মামলা যার মাধ্যমে দেশের ২৪ জন বরেণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতিপয় কাল্পনিক অভিযোগ আনা হয়েছে।" অতঃপর, হাইকোর্ট বিভাগ বেঞ্চ সরকারী পক্ষের এটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শুনে ঐদিন অথবা পরের দিন অর্থাৎ ৩০মে মার্চ (১৯৯২) তারিখে আবেদনটির ওপর শুনানি গ্রহণে সম্মত হন এবং শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনের আবেদনকারী ২৪ জনকে গ্রেফতার না করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করেন।

৬৮। এদিকে ২৯শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সম্মুখে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে একটি জনসমাবেশ শাখার অন্যতম যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের শুরুতে উপরোল্লিখিত কমিটিরি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম আহবায়ক ডঃ নুরুন্নবী ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে 'গণ-আদালত' কতৃক প্রদত্ত রায় প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর, উক্ত সমাবেশে গৃহীত একটি প্রস্তাবে, (বাংলাদেশের) মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিচার এবং জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, জামাত-শিবিরের হামলার নিন্দা করে তাদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদান, ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহ কর্তৃক ১৯শে নভেম্বর (১৯৯১) তারিখে প্রদত্ত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখিত বিষয়সমূহের বাস্তাবায়নের মাধ্যমে (দেশে) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে, (বাংলাদেশে) ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূলের লক্ষ্যে সৃষ্ট আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক গণসমর্থন অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। পরিশেষে, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির জাতীয় সমন্বয় কমিটির' আহবায়িকা বেগম

জাহানারা ইমামসহ ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত 'গণ-আদালতের বিচার' কাজের সাথে জড়িত ২৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিএনপি সরকার কর্তৃক গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির তীব্র নিন্দা করে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তা ছিলেন 'সাপ্তাহিক প্রবাসী' সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, আওয়ামী লীগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক এম. এ. সালাম "প্রজন্ম ১৯৭১" এর যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে দিলীপ নাথ, নিউজার্সী আওয়ামী লীগ শাখার সভাপতি এম. এ. খালেক, গণতন্ত্রী পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি গজনফর আলী, জাসদ (ইনু) যুক্তরাষ্ট্র শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কমিটি ফর ডিমোক্রেসীর সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব, প্রয়াত লেঃ কর্নেল আবু তাহের স্মৃতিসংসদের নাজমুল হক হেলাল, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নুরুন্নবী, ডঃ ফরিদা মজিদ, গিয়াসউদ্দিন প্রমুখ।

৬৯। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গঠিত গণ-আদালতের বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারপারসন বেগম জাহানারা ইমামসহ ২৪ জন অভিযুক্তদের জামিনের আবেদনটির শুনানি সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী ও বিচারপতি এম. এ. করিমের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হয় ৩০শে মার্চ (১৯৯২) তারিখ সকাল দশটায়। আবেদনকারীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, কে. এস. নবী, সুধাংসু শেখর হালদার প্রমুখ। অপরদিকে সরকার পক্ষে ছিলেন টি. এইচ. খান, অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া প্রমুখ। মামলার শুনানি আংশিকভাবে অনুষ্ঠানের পর ৩১শে মার্চ (১৯৯২) তারিখ সকাল দশটা পর্যন্ত মুলতবি রাখা হয়। এদিন ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ তাঁর বক্তব্যে বেগম জাহানারা ইমামসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগকে অবাস্তব ও হাস্যকর হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "দেশের এসব বরেণ্য ব্যক্তিরা তাঁদের জ্ঞান, মেধা ও প্রতিভা দিয়ে গোটাজাতির সেবা করেছেন এবং করছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকল প্রকার ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জাতির বিবেক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। তাঁরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন প্রার্থনা করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এখন আদালতের হেফাজতে আছেন এবং তাদের জামিন মঞ্জুর অথবা কারাগারে প্রেরণ সবকিছুই এখন আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। অভিযুক্তদের জামিন প্রদানের পূর্ণ আইনগত এখতিয়ার সুপ্রীম কোর্টের রয়েছে। যে আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, সেই আদালতেই আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করতে হবে এমন কথা আইনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই, যদিও সেটি প্রচলিত প্রথা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এমন কিছু ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে যেগুলো জামিনবিহীন হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট যে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত কোন নাগরিককে জামিন প্রদানের পূর্ণ এখতিয়ার

রাখেন।" এর পর ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, "এই মামলার অভিযুক্তরা বিদেশী নাগরিক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। গোলাম আযম আর রাষ্ট্র সমার্থক নয়। তাঁর (গোলাম আযমের) বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলা নয়।" অতঃপর, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এই মামলাটিকে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার সাথে তুলনা করে বলেন, "তখনও ষড়যন্ত্র হয়েছিলো, এখনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তবে এসব ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়, দেশবাসীর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্য থেকে এ ধরনের মামলা অতীতেও হয়েছে, আবার হয়তো ভবিষ্যতেও হবে।" ৩১শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে হাইকোর্ট বেঞ্চে অভিযুক্তদের জামিনের প্রশ্নে আরও শুনানি চলে। এ দিন শুনানি শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চ অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। রায়ে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন আদালতকে অবিলম্বে এই মর্মে একটি আদেশ জারি করতে নির্দেশ দেয়া হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঐ আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের পর থেকে মামলাটির নিষ্পত্তি পর্যন্ত জামিন মঞ্জুরীর স্বীকৃতি থাকবে।

৭০। এপ্রিল (১৯৯২)-এর গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত '১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির' একটি সভায় কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত স্টিয়ারিং কমিটিতে সেদিন পর্যন্ত ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা হলেন: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ৭ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, সৈয়দ হাসান ইমাম, জনাব মাহফুজুর রহমান, বেগম মুশতারী শফি, বেগম হামিদা বানু, জনাব মামুনুর রশীদ, জনাব শাহরিয়ার কবির, জনাব সাদেক আহমেদ খান, মিয়া আবুল হাশেম, জনাব ফতেহ আলী চৌধুরী, ডঃ হাসান এবং "প্রজন্ম ১৯৭১" এর সভাপতি জনাব সাইদুর রহমান। উক্ত সভায় এও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরবর্তীতে আরও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন রণাঙ্গন অধিনায়ক এবং দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদেরকে স্টিয়ারিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ৮ই এপ্রিল(১৯৯২) 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবয়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' ১০ই এপ্রিল তারিখে ঢাকার প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সমাবেশ ও গণমিছিল এবং ১২ই এপ্রিল তারিখে গণমিছিল নিয়ে জাতীয় সংসদ ভবনে গিয়ে সেখানে অবস্থান ও স্মারকলিপি পেশ করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১২ই এপ্রিলের কর্মসূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে কমিটি ঢাকার সকল শাখা কমিটিগুলোকে মিছিল সহকারে বিকেল ৩টার মধ্যে শাহবাগ চৌরাস্তার মোড় ও জাতীয় যাদুঘরের সামনের রাস্তায় সমবেত হওয়ার আহবান জানান। এদিকে ৫ দলীয় জোটের তৎকালীন আহবায়ক জনাব নঈম জাহাঙ্গীর 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' ১২ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখের কর্মসূচীকে

সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের প্রতি আহবান জানান ঐদিন বিকেল ৩টায় ঢাকার শাহবাগ চৌরাস্তার মোড়স্থ জাতীয় যাদুঘরের সামনের রাস্তায় সমবেত হওয়ার পর সেখান থেকে মিছিল সহকারে জাতীয় সংসদ ভবন অভিযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্যে।

৭১। ৯ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে ইনডেমনিটি (ক্ষমাপ্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল বিল সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির দ্বাদশ বৈঠক কমিটির চেয়ারম্যান আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জ্জা গোলাম হাফিজের সভাপতিত্বে সংসদের স্থায়ী কমিটির ১ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাত্র সাতজন সদস্য উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায়ও উল্লেখিত বিলটির ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, ১৯ শে এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ ছিল এ ব্যাপারে পূর্বনির্ধারিত সময়ের শেষ দিন। বিলটির ব্যাপারে তখন পর্যন্ত তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। আর ৯ দিনে উক্ত বিল সংক্রান্ত কাজগুলো শেষ করা সম্ভব নয়। তাই সরকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আরও ২ মাস সময় নেয়ার কথা বলা হয়। উক্ত কমিটিতে রয়েছেন আওয়ামী লীগের এমন একজন সংসদ সদস্য বলেন, "পুনরায় সময় বাড়ানোর কোন যৌক্তিক কারণ নেই। এ পর্যন্ত চার বার সময় বাড়ানো হয়েছে।" আওয়ামী লীগের অপর একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য বলেন, "সরকার যদি অযথা কালক্ষেপণের নামে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে রাজপথে নামতে বাধ্য হবে।" উল্লেখিত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল সংক্রান্ত বিলটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "এ বিল পাস করতে বি.এন.পি. সরকারের সদিচ্ছা আমরা বরাবরই আশা করছি। অনেক পথ-ঘাট পেরিয়ে আমরা গণতন্ত্রের উষালগ্নে পদার্পণ করেছি। সরকারী দল যদি ১৯ শে নভেম্বর (১৯৯০) তরিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহ কর্তৃক ঘোষিত রূপরেখার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং তারা হত্যা-ক্যুর রাজনীতি বন্ধ করতে চান, তাহলে অবশ্যই উক্ত বিলের প্রতি তাদের সমর্থন জানাতে হবে। নইলে আবারও গণতন্ত্রের শত্রুরা নবজাত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উৎসাহিত হবে।" বিলটির অবস্থা সম্পর্কে বি.এন.পি. সরকার পক্ষের সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন বলেন, "আর দুই মাসের মত সময় প্রয়োজন হতে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এটার ওপর কমিটির বারোটি বৈঠক হয়েছে। আলোচনা হয়েছে। অতএব এতদবিষয়ে ধৈর্য্য হারাবার কোন কারণ নেই। লক্ষ্য ঠিক থাকলে মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও কাংক্ষিত স্থানে পৌছানো যায়, যেমন করে আমরা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংদীয় পদ্ধতিতে গমন করেছি।"

৭২। ১২ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেল তিনটায় পঞ্চম সংসদের স্বল্পকালীন পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয়। ঐ দিন বিকেল ৩টায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত সংসদ ভবন অভিমুখে

পদযাত্রা কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকার শাহবাগ চৌরাস্তার মোড়স্থ জাতীয় যাদুঘরের সামনে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা বেগম জাহানারা ইমাম ছাড়াও কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ছাত্রনেতা এস. এম. কামাল, শফি আহমদ ও রুহিন হোসেন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রস্তাবিত পদযাত্রায় যোগদাননের উদ্দেশ্যে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে মুক্তিযোদ্ধা, দালাল নির্মূল কমিটির বিভিন্ন ওয়ার্ড ও প্রতিষ্ঠানের শাখার নেতা-কর্মী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপ (মোজফফর), গণতন্ত্রী পার্টি, কেন্দ্রীয় পাঁচদল, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটসহ ছাত্র, পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মী ব্যানার-ফেস্টুন শোভিত মিছিল সহকারে সেখানে উপস্থিত হন। পদযাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বেগম জাহানারা ইমাম ২৬ শে মার্চ (১৯৯২) তারিখ অনুষ্ঠিত গণ-আদালতের বিচারে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকৃত অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য বলে যে গণরায় ঘোষিত হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য বি.এন.পি. সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে বলেন, "এ রায় বাংলাদেশের জনগণের। এ রায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী হিসেবে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করছি। আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ।" অতঃপর জাতীয় সংসদ স্পীকার ও সদস্যদের নিকট স্মারকলিপি পেশের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু হয় বিকেল পাঁচটায়। এ সময় পদযাত্রীদের 'গণ-আদালতের গণরায় বাস্তাবায়ন করতে হবে','আর কোন দাবি নাই, গোলাম আযমের ফাঁসি চাই', 'একাত্তরের দালালরা হুঁশিয়ার সাবধান' ও 'জামাত শিবির রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলার ছাড়' প্রভৃতি শ্লোগানে রাজপথ ও আশে পাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। পথের দুইধারে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পথচারীরা হাততালি দিয়ে পথযাত্রীদের অভিনন্দন জানান। সুশৃংখল ও শন্তিপূর্ণভাবে অগ্রসরমান পদযাত্রীরা বাংলামোটর মোড়ে প্রথম পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে উপস্থিত পদস্থ পুলিশ কর্মকতাদের সাথে নেতৃবৃন্দের আলাপের পর পুলিশ ব্যারিকেড প্রত্যাহার করে নেয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হোটেল সোনারগাঁওয়ের পেছনে পৌছলে পথযাত্রীরা পুলিশের দ্বিতীয় দফা ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়। সেখানে কিছুক্ষণ উত্তেজনার পর নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। অতঃপর, বেগম জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে স্মারকলিপি পেশের জন্যে সংসদ ভবনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। বেগম জাহানারা ইমাম ছাড়া প্রতিনিধিদলে অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তারা হলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, এডভোটে গাজীউল হক, কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, জাকী আরেফ আহমদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবং আশরাফ কায়সার। প্রতিনিধিদলটি জাতীয় সংসদ ভবনে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে

বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করে স্মারক পত্র প্রদান করে। এ ছাড়াও, সংসদে উপস্থিত ৩১০ জন সংসদ সদস্যকেও স্মারকপত্র প্রদান করা হয়।

৭৩। নির্মূল কমিটি কর্তৃক পেশকৃত স্মারকলিপিতে বলা হয়ঃ "বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সকল শক্তির মধ্যে সম্প্রতি অসাধারণ জাগরণের সূচনা হয়েছে। এই জাগরণ দেখা দিয়েছে মূলতঃ একাত্তরের দালাল ও ঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে দেশবাসীর ব্যাপক ঐক্যের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরবর্তীকালে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে গোলাম আযমের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা আপনাদের কারো অজানা নয়। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানী পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে এদেশে প্রবেশ করে তিনি বেআইনী ভাবে রয়ে যান। তার এই বেআইনী অবস্থান সম্পর্কে জনগণের পক্ষ থেকে বহুবার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং সরকারের কাছে এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। জাতীয় সংসদে সরকার একাধিকবার জানিয়েছে যে, এই বিদেশী ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দানের কোন অভিপ্রায় তাদের নেই। এই রকম অবস্থায় গোলাম আযমকে আকস্মিকভাবে জামাতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) ঘোষণা করায় জনগণের ক্ষোভ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। গোলাম আযমের পক্ষে এই পদ গ্রহণ এবং জামতে ইসলামীর পক্ষে তাঁকে এই পদে নির্বাচন উভয়ই বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ ধারার লংঘন। এ বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলেও তার কোন সুরাহা হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ নাগরিকসমাজ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি সমবেত ভাবে ১৯৭১ সালে কৃত যুদ্ধাপরাধের জন্য এবং ১৯৭১ সালের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই গণআদালত সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের সমান্তরাল বা প্রতিযোগী নয়—এই গণআদালত জনসাধারণের মতামত প্রকাশের একটি বৈধ ও শক্তিশালী মাধ্যম। বিগত ২৬ শে মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মধ্যে এই গণআদালতের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে গোলাম আযমকৃত অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় যে, গণআদালত কোন দণ্ড প্রদান বা কার্যকর করতে পারে না। গোলাম আযমের দুষ্কৃতি সম্পর্কে এই সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে বালাদেশ সরকারকে তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়। বিদেশী নাগরিকদের সম্পর্কিত বিধান লংঘন করার দায়ে গত ২৪ মে মার্চ (১৯৯২) সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে এবং এক মাসের জন্য তার আটকাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধাপরাধের জন্য, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য এবং সংবিধানের ৩৮ ধারা লংঘনের জন্য তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যতদিন না তা করা হয়, ততোদিন গোলাম আযমের বিরুদ্ধে বর্তমান গণআন্দোলন চালিয়ে যেতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাগরিকরা সংকল্পবদ্ধ। জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য হিসেবে এই

আন্দোলনে আপনি যোগ দেবেন বলে নির্বাচকমণ্ডলী আপনার কাছে প্রত্যাশা করে। আমরা দাবী করি, গোলাম আযমের প্রতি গণরায় বাস্তাবায়নের জন্য সংসদের ভেতরে ও বাইরে আপনি আরো সক্রিয় হোন। সরকার যাতে কালবিলম্ব না করে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয় সেই লক্ষ্যে আপনি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন বলে আমরা আপনার কাছে দাবী করি।"

৭৪। এদিকে ১২ ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেলে ৩ টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হলে তোফায়েল আহমদ, রাশেদ খান মেনন, আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান সিরাজ, মতিউর রহমান নিজামী সহ ৪২ জন সংসদ সদস্য 'গণআদালত এবং গোলাম আযম প্রসঙ্গে মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ দেন। পাশাপশি, শাহজাহান সিরাজ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, রাশেদ খান মেনন, প্রমুখ সংসদ সদস্যগণ সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৬ ও ১৪৭ ধারার অধীনে সাধারণ আলোচনারও নোটিশ দেন। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী তখন বলেন যে, বিষয়গুলো মুলতবী প্রস্তাবের আওতায় বিবেচিত হলে জাতির প্রত্যাশা পূরণ হবে না বিধায় সেগুলো বৃহত্তর আঙ্গিকে বিবেচনা করা সমীচীন হবে। অতঃপর, স্পীকার তৎবিষয়ে সাধারণ আলোচনার জন্যে তিন ঘন্টা সময় ধার্য করেন। এই পর্যায়ে জামাতে ইসলামীর মাওলানা আব্দুস সোবাহান বিষয়গুলো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বিধায় তৎসম্পর্কে আলোচনা না করার আহবান জানান। জামাতে ইসলামীর অপর একজন সদস্যও একই কথা বলেন। এর পর বি.এন.পি. সরকারের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা গণআদালত এবং গোলাম আযম সংক্রান্ত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এই কারণে সেগুলো সংসদে আলোচনা করা যায় না বলে দাবী করেন। এই শেষোক্ত তিনজন সংসদ সদস্যের বক্তব্যের জবাবে স্পীকার সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ১৫০ ধারায় প্রদত্ত তাঁর ক্ষমতা উল্লেখ করে বিষয় দুটোর ব্যাপারে সাধারণ আলোচনার অনুমতি দেন। তদনুযায়ী এদিন মাগরিবের নামাজের পর সন্ধ্যে ৭টায় গণআদালত এবং গোলাম আযম প্রসঙ্গে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়।

৭৫। এদিন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, জাতীয় পার্টির মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর মাওলানা আব্দুস সোবাহান এবং বি.এন.পি.-এর কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন, এই চারজন সংসদ সদস্য সাধারণ আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। আলোচনার সূত্রপাত করে জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, "দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে এই সংসদেকে এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (পঞ্চম সংসদের) চতুর্থ অধিবেশন শেষ হবার পর গত দু'মাসে এ দেশের রাজনীতিতে অনেক পানি গড়িয়েছে। একজন শহীদের মা বেগম জাহানারা ইমাম, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' উদ্যোগে গঠিত গণআদালতের মাধ্যমে ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে জনমত সৃষ্টি করেছেন। গণআদালত যাঁরা করেছেন তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র। বর্তমান (বি.এন.পি.) সরকারের আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী

মির্জ্জা গোলাম হাফিজ (বিগত এরশাদ সরকার বিরোধী) গণআন্দোলনের সময় গণআদালতে এরশাদের বিচারের কথা বলেছিলেন। ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলন (ও গণঅভ্যুত্থান)-এর মুখে এরশাদ জনগণের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। সংবিধানের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। ১৯৭৫-এর পর জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে গোলাম আযমকে দেশে আসার সুযোগ করে দেন, শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানান, (বঙ্গবন্ধুর আমলের) দালাল আইন বাতিল করেন এবং দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ করে দেন।" অতঃপর, তোফায়েল আহমদ, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উক্তি " এই বি.এন.পি. সেই বি.এন.পি. নয়"-এর উল্লেখ করে বলেন, "১৯৭৫ সালের পর সংবিধান সংশোধন করে গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে এনে আমরা যে ভুল করেছি আজ আমাদের সে ভুল শোধরাতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের ফসল এ সরকার। গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছেন তা সত্যিই নিন্দনীয়। বৃটিশ সরকার তিতুমীর, সূর্য্যসেন, হাজি শরিয়তউল্লাহ, ক্ষুদিরাম, প্রমুখের মতো দেশপ্রেমিকদেরও দেশদ্রোহী বলে অভিযোগ এনেছিল। পাকিস্তান সরকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানরে বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে (তথাকথিত) 'আগরতালা মামলা' সাজিয়েছিল। কিন্তু জনগণ তা নস্যাৎ করে দেয়। তাই বলছি, আগুন নিয়ে খেলবেন না।"

৭৬। এদিন সংসদে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "১৯৮৬ সালের নির্বাচনে জামাতে ইসলাম ১০টি আসন পেয়েছিল। তখন (তারা) গোলাম আযমকে (দলের) আমীর করে নাই। এবার (বি.এন.পি.) যখন তাদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেছে, তখনই তারা গোলাম আযমকে (দলের) আমীর (দল প্রধান) করার সাহস পেয়েছে। (বি.এন.পি.) সরকারের আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী (তাদের দলের) আমীর করেছে। আবার যখন গোলাম আযমের বিচারের জন্যে গণআদালত গঠিত হয়েছে, তখন (বি.এন.পি.) সরকার তাকে ডিটেনশন দিয়েছে। (কাজেই) গোলাম আযমের ব্যাপারে সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিরোধী দলগুলোর খুব একটা করণীয় কিছু নেই।" অতঃপর মিজানুর রহমান চৌধুরী আত্মঘাতী রাজনীতি পরিহার করার আহবান জানিয়ে বলেন, "এর মাধ্যমে দেশের কোন কল্যাণ হতে পারে না। মুক্তমন ও চিন্তা নিয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতানাকে সামনে রেখে সরকারকে গোলাম আযমের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যত শিগ্গির নেয়া সম্ভব ততোই জাতির জন্য মঙ্গলজনক হবে। গোলাম আযমকে যদি দেশে আসার ভিসা দেয়া না হতো, (তাহলে) জাতি অনেক আইনগত জটিলতা থেকে রক্ষা পেতো। ১৯৭৫ সালের আগে গোলাম আযম দেশে আসেননি। তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে (এদেশে) এসেছিলেন। তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। (তাঁর) ভিসাও নবায়ন করা হয়নি। তবুও তিনি কিভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে

এদেশে আছেন, জানি না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য গোলাম আযম কখনই অনুতাপ প্রকাশ করেননি বা ভুল স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমাও চাননি।" অতঃপর জামাতে ইসলামীর মাওলানা আব্দুস সোবহান সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, "গোলাম আযম ১৪ বছর যাবত বাংলার জমিনে আছেন, রাজস্ব দিচ্ছেন। গোলাম আযম 'ইসলামের' জন্যে কাজ করেছেন। তিনি এদেশে ইসলামী আন্দোলনই করেছেন—ইসলামী পরিবেশ রচনার জন্যেই কাজ করেছেন—এর বাইরে কিছু করছেন না। গোলাম আযম এদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছিলেন। আমরা (মরহুম) জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দিয়েছি, বর্তমান (বি.এন.পি.) সরকারকেও সমর্থন করেছি। এদেশ ও এ জাতি আমাদের কাছে সব চাইতে বড়—কোন ব্যক্তি নয়। তাই দেশের জন্যে, স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের জন্য যা কিছু কল্যাণকর এ সংসদে সে ধরনেরই সিদ্ধান্ত নেয়ার আহবান জানাই।"

৭৭। এর পর এদিন বি.এন.পি. দলীয় সংসদ সদস্য কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন বলেন, "জনমত হচ্ছে সবচেয়ে বড় মত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এদেশের মানুষ যে রায় দিয়েছিল, সেই রায়কে যারা নস্যাৎ করতে চেয়েছিল তারাই অপরাধী। গণআদালত জনমত প্রকাশের মাধ্যম। এতে জনমত যাচাইয়ের ধারা সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপরাধীর বিচার কাজ করা হয় দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে। সরকার গণআদালতের রায় কার্যকরী করতে পারে না। সরকার জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টের রায় বাস্তবায়ন করবে।" অতঃপর কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন গণআদালত গঠন করে দেশের প্রচলিত আইন-আদালতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলে একটি মহলের বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেন, "গণআদালত জনমত সৃষ্টি করেছে, নতুন প্রজন্মের কাছে ১৯৭১-এর ধিকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে, গোলাম আযমের ঘৃণ্য ভূমিকা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মাওলানা মান্নানকে চাঁদপুরে আমরা মুক্তিযোদ্ধারাই সেদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম।" অতঃপর তিনি এসব অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সাক্ষীপ্রমাণসহ এনে কোর্টে তার বিচারের আহবান জানিয়ে বলেন, "যদি কোর্ট বলে গোলাম আযমের ফাঁসি দেয়া হোক, তাহলে আমার চেয়ে বেশী খুশী আর কেউ হবেন না। কিন্তু সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে একটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আইনের আদালতই সবচেয়ে বড় আদালত। গণআদলত হচ্ছে জনমত সৃষ্টির একটি মাধ্যম মাত্র।" কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেনের বক্তব্য শেষ হবার পর স্পীকার সংসদের বৈঠক ১৩ই এপ্রিল বিকেল তিনটা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।

৭৮। ১৩ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে মাগরিবের নামাজের বিরতির পর সন্ধ্যে ৭-৪০ মিনিটে সংসদে শুরু হয় গণআদালত এবং গোলাম আযম প্রসঙ্গে দ্বিতীয় দফা সাধারণ আলোচনা। এ দিনের আলোচনায় পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেন ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, বি.এন.পি.-এর সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল, আওয়ামী লীগের বেগম সাজেদা চৌধুরী, জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী, আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম

সেলিম, জাসদ-এর শাহজাহান সিরাজ, বি.এন.পি.-এর লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী এবং আওয়ামী লীগের সালাউদ্দিন ইউসুফ ও কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী। জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, "গোলাম আযম কোন ব্যক্তি নন, তিনি হত্যা ও ধ্বংসের প্রতীক। যুদ্ধাপরাধী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তার সকল অপকর্মের বিচার করতে হবে। একই সাথে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে যাঁরা (দলের) আমীর (দল প্রধান) বানিয়েছে সেসব জামতে ইসলামী নেতাদেরও বিচার করতে হবে। বেগম জাহানারা ইমাম এবং গণ-আদালতের সদস্যরা আমাদের দায়মুক্ত করেছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।" অতঃপর গণআদালত আইনানুগ নয়, সরকারী দল বি.এন.পি.-এর এই অভিমত খন্ডন করে রাশেদ খান মেনন বলেন, "সংবিধানে অন্তবর্তীকালীন সরকার বলে কোন কথার উল্লেখ নেই। আমরা এরশাদকে হটিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন করেছি। বি.এন.পি. নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছে। তাহলে এটাও কি সংবিধান বিরোধী? এরশাদকে হটানোর জন্য জনমত ছিল। (তখন) অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল জনমতের ভিত্তিতে। (বর্তমানে) গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। (অতএব) সরকারকেও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে।"

৭৯। এর পর এদিন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বি.এন.পি.-এর সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বলেন, "স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সরকার যে ভুল করেছিলো, বিএনপি সরকার সেই একই ভুল করতে চায় না। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধবিরোধীদের পুনর্বাসিত করেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। (কিন্তু) গণআদালত বলে কিছু নেই। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণের জন্যে কোর্টের আশ্রয় নিতে হবে।" এর পর এদিনের তৃতীয় বক্তা বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেন, "জনতার রুদ্ররোষ থেকে বাঁচানোর জন্যে সরকার সুকৌশলে গোলাম আযমকে জেলে পাঠিয়েছে। বিদেশী নাগরিক, খুনী, নরঘাতক গোলম আযমের বিচার করতে হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরী করে তাকে ফাঁসি দিতে হবে। গোলাম আযমের অপকর্মের সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে। গত ২৬শে মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (অনুষ্ঠিত গণ-আদালতে) তিন জন মহিলা এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গোলাম আযমের বিচারের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অস্তিত্ব।" এর পর এদিনের চতুর্থ বক্তা জামাতে ইসলামীর শেখ আনসার আলী বলেন, "গোলাম আযম এদেশের অধিবাসী, স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবেই অবস্থান করছেন। তাঁর গ্রেফতারের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অতএব এ বিষয় নিয়ে (সংসদে) আলোচনা হতে পারে না। গণআদালত থাকলে সুপ্রীম কোর্ট থাকে না। (বি.এন.পি.) সরকার যথাযথভাবে গণআদাতকে অবৈধ বলেছিলেন। এই অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর হলে তারা সংসদ পর্যন্ত আসতে সাহস পেতো না।"

৮০। এদিন সংসদে গোলাম আযমের বিষয়ে আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, "১৯৭১-এর ঘাতকদের বিরুদ্ধে সরকারকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আজ এক হয়েছে। জনগণের রায়ের চেয়ে অন্য কোন রায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রয়োজনে সংসদে আইন করে ঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণরায় কার্যকর করতে হবে। এ জন্যে (বিশেষ) ট্রাইব্যুনাল করা হোক।" অতঃপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জাসদ (সিরাজ)-এর শাহজাহান সিরাজ বলেন, "১৯৭০ সালে গণরায় পাকিস্তানীরা মানেনি বলে আমরা হাতে অস্ত্র নিয়ে এ দেশ স্বাধীন করেছি। গোলাম আযমের বিচার না করা হলে বাংলার জনগণ তা মেনে নেবে না। সংসদ যে আইন করবে সে আইন অনুযায়ী হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট চলবে। নরঘাতককে কোন্ আইনে এদেশে আনা হয়েছে, তার জবাব আজ দিতে হবে। গত ১৪ বছর সরকারগুলো শুধু তাকে লালনই করেনি, তারা আবার 'আলবদর' বাহিনী গঠন করে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। সংসদ সিদ্ধান্ত না দিলে, সুপ্রীম কোর্টের কি সুযোগ আছে বিচারের? এটা চুরির মামলা নয়, এটা দেশ ও জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন। আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এদেশ কোন্ চেতনার ভিত্তিতে চলবে। যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে চলে, তাহলে গোলাম আযমকে ফাঁসি দিতে হবে। তার কবর এদেশে হবে না, হবে (পাকিস্তানে) নুরুল আমিনের পাশে। সরকারী দলের ওপর আজ বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কোন ইতিহাস রচিত হতে পারে না।"

৮১। এর পর এদিন বি.এন.পি.-এর লেঃ জেনারেল (অবঃ) মীর শওকত আলী বলেন, "বিশ বছর পর আজকে দালালদের বিচারের কথা শুনে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি আনন্দিত। মুক্তিযুদ্ধ করেছিল এদেশের আপামর জনতা, কিছু সংখ্যক দালাল ও ঘাতক ছাড়া। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের পর আর একটি বিজয় আশা করেছিলাম, হানাদারদের বাংলার মাটিতে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ঝুলানো হবে—এই আশা ছিল। সেসময় সরকারও বলেছিল যে, তাদের (যুদ্ধাপরাধীদের) বিচার হবে। কিন্তু সে বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার বিরোধিতা যারা করেছিল, তারা ইতিহাসের অন্ধকারে স্বাভাবিকভাবেই মিশে যাবে। অতএব, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।" এর পর আওয়ামী লীগের সালাউদ্দিন ইউসুফ বলেন, "গণ-আদালতের রায়ে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার (গোলাম আযমের) বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের কেন দোদুল্যমানতা? সরকার তাকে (গোলাম আযমকে) যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে শুধুমাত্র আটক করেছে।" এদিনের শেষ বক্তা ছিলেন আওয়ামী লীগের কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী। কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন বক্তব্য রাখেননি। তাঁর বক্তৃতার সাথে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল (১৯৯২) এই দুইদিনে গণআদালত এবং গোলাম আযম প্রসঙ্গে সাধারণ

আলোচনার জন্য পূর্বনির্ধারিত তিন ঘন্টা সময় শেষ হয় এদিন রাত ১০টা ৫ মিনিটে। অতঃপর সংসদের বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করা হয় ১৫ই এপ্রিল (১৯৯২) বিকেল তিন ঘটিকা পর্যন্ত।

৮২। ১৪ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেলে, ১৯৭১ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তান-দের সমন্বয়ে গঠিত '১৯৭১-এর প্রজন্ম' সংগঠনের ২৫ জন সদস্য পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাসভবন 'বঙ্গবন্ধু ভবনে' আওয়ামী লীগ নেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনার সাথে এক শুভেচ্ছা সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়। সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে '১৯৭১-এর প্রজন্মের' সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। অতঃপর তারা ম্যাডাম হাসিনার কাছে পেশ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী এবং তাদের জীবনে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাদি উল্লেখ করে একটি স্মারকলিপি। এ সময় শহীদ নূরুল আলমের কন্যা মুক্তি, ফুলের তোড়া, শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার তাঁর লেখা বই "মুক্তি", কন্যা শমী কায়সারের লেখা বই "আর কতদূর" এবং "প্রজন্ম ১৯৭১" এর পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের ওপর একটি 'চিত্রকর্ম' ম্যাডাম হাসিনাকে উপহার দেয়া হয়। আলাপকালে "প্রজন্ম ১৯৭১" এর সদস্যরা বলে, "সুকৌশল আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। যার ফলে একটি বিকৃত প্রজন্ম তৈরী হতে চলেছে। সেই অশুভ স্রোতধারার বিপরীতে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যথোচিত অবদান রাখতে এবং ভূমিকা পালন করতে চাই। আমরা অবিলম্বে ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিলের দাবি জানাই।"

৮৩। ১৫ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে সংসদের চীফ হুইপ খন্দকার দেলওয়ার হোসেন ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল সংক্রান্ত বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংসদের বিশেষ কমিটির পক্ষে আরও ৭০ দিন সময় চেয়ে সংসদ স্পীকারের কাছে অনুরোধ জানান। এ সময় তিনি বলেন, "ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল বিল সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জ্জা গোলাম হাফিজ দেশের বাইরে রয়েছেন। এদিকে পূর্ব-বর্ধিত ৭০ দিন এ মাসের ১৯ তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই সংসদীয় বিশেষ কমিটির পক্ষ থেকে আরও ৭০ দিন সময় চাচ্ছি।" অতঃপর সংসদ স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সরকারী দলের চীফ হুইফ খন্দকার দেলওয়ার হোসেনের আবেদন মঞ্জুর করে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে আর ৭০ দিন সময় বাড়িয়ে দেন।

৮৪। ১৫ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ সন্ধ্যে ৮টা ৫মিনিটে সংসদে শুরু হয় 'গণআদালত এবং গোলাম আযম' প্রসঙ্গে তৃতীয় দফা সাধারণ আলোচনা। এদিনের সাধারণ আলোচনায় আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করেন বি.এন.পি.-এর পূর্তমন্ত্রী ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম

মিয়া, আওয়ামী লীগের সুধাংশু শেখর হালদার, গণতন্ত্রীপার্টির সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও বি.এন.পি.-এর শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার। আলোচনার সূত্রপাত করে ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে নতুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীসহ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। এ ছাড়াও, তৎকালীন শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার দালালদের 'সাধারণ ক্ষমা' প্রদান করেন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী (বাহিনী) ছিল না। অতএব এ কারণে বর্তমান আইনে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার করা যায় না। আমরা সামনের দিকে এগুতে চাই। বিএনপি সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে দেশের সব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাচ্ছে।" এর পর আওয়ামী লীগের সুধাংশু শেখর হালদার বলেন, "সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্যকারী অন্য যে কোন বাহিনীই সহযোগী বাহিনী। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে (তৎকালীন) 'রাজাকার বাহিনী।' তৎকালীন, 'ইস্ট পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স (১৯৭১)' অনুসারে রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগী বাহিনী ছিল। ১৯৭৩ সালের যুদ্ধাপরাধী আইনে (তৎকালীন) রাজাকারদের বিচার করা যায়। শুধু পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীই নয়, যেকোন বেসামরিক ব্যক্তি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অপরাধ করে থাকলে উক্ত আইনে তারও বিচার করা যায়। গোলাম আযমকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে এই কারণে তার ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে না বলে দাবি করেছেন। আমার প্রশ্ন, পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম জামাতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) হয়েছেন, সে বিষয়ে কোন মামলা দায়ের করা হয়েছে কি?" অতঃপর সুধাংশু শেখর হালদার আরও বলেন, "গোলাম আযমের বিচারের পথ তদানীন্তন সরকার বন্ধ করে দেয়নি।" পরিশেষে সুধাংশু শেখর হালদার গোলাম আযমের বাংলাদেশে পাকিস্তানী পাসপোর্টে এদেশের এন্ট্রি ভিসা নিয়ে প্রবেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, "গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্বের আবেদনেও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কলাম পূরণ করেননি। গোলাম আযম এদেশে নিবন্ধীকৃত বিদেশী হিসেবে অবস্থান করছেন। ১২ই জুলাই (১৯৭৮) তারিখে তিনি ফরেনার্স রেজিস্টারে নিবন্ধীকৃত হয়েছেন। তারপর থেকে তিনি বৈধ ভিসা ছাড়াই এদেশে অবস্থান করছেন। অথচ, তিনি বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের আমীর বা প্রধান হয়েছেন। তিনি তা হতে পারেন না।"

৮৫। এদিন সংসদে গোলাম আযমের বিষয়ে গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, "গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। অতএব সরকারের সদিচ্ছা থাকলেই তাঁর বিচার সম্ভব। তদন্ত এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার শুরু হলেই গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যাবে। দেশের ১২ কোটি মানুষ

গোলাম আযমের বিচারের পক্ষে। সরকারকেও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। এই (বি.এন.পি.) সরকার গোলাম আযমের বিচার না করলে অন্য সরকার তার বিচার করবে।" অতঃপর গণআদালত সম্পর্কে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, "গণআদালত শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করেছে। সংবিধানের ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ সামাবেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাধা দিতে পারে না। গণআদালতের সমাবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। অতএব এর কার্যক্রম রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে না।" এদিনের শেষ বক্তা বি.এন.পি.-এর শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার প্রাসঙ্গিক আইনের বিভিন্ন ধারার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "গণআদালত কোনভাবেই আদালত নয়, এটা অবৈধ। সংবিধান বা ফৌজদারী আইনে এই ধরনের আদালতের কোন বিধান নেই। অতএব এই আদালতের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি হতে পারে। জনমত কোন ব্যক্তিকে দোষী বলতে পারে না। গণআদালত গঠনের অথরিটি তাদের নেই। সুতরাং এটা একটা ষড়যন্ত্র। তাছাড়া গণআদালতের বিষয়টি এখন বিচারাধীন রয়েছে। (তৎকালীন) রাজকাররা 'অকজিলিয়ারী' ফোর্স নয়। তারা পুলিশ নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং পুলিশ কোন আর্মড ফোর্স নয়। তারা মিউনিসিপ্যাল ফোর্স, আইন শৃংখলা রক্ষাই তাদের কাজ। তাছাড়া (১৯৭৪ সালে) তিন দেশের (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের) মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ঐ চুক্তিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও পাকিস্তানী নাগরিকদের ক্ষমা করা হয়েছিল। পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে গোলাম আযমও উক্ত ক্ষমার মধ্যে পড়েন। পাকিস্তানী হানাদারদের প্রটেকশন যে আইনে দেয়া হয়েছে, সেটা তাদের সহযোগীদের জন্যও প্রযোজ্য। অধিকন্তু, 'দালাল আইন' যেহেতু বাতিল হয়ে গেছে, সেহেতু সে আইনেও গোলাম আযমের বিচার করা যায় না। তবে তাঁকে পেনাল কোডের আওতায় অভিযুক্ত করা যায়।" এই কথাগুলোর পর তাঁর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সংসদে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। এই পর্যায়ে (রাত ১০ টা ২০ মিনিটে) সংসদ স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী সংসদের বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন ১৬ই এপ্রিল (১৯৯২) সকাল ১১টা পর্যন্ত।

৮৬। ১৬ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় সংসদে শুরু হয় 'গণআদালত এবং গোলাম আযম' প্রসঙ্গে চতুর্থ দফা সাধারণ আলোচনা সরকারী দলের সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তৃতা দিয়ে। ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তৃতার পর স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী আলোচ্য বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়েই তৎবিষয়ে সাধারণ আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করে সরাসরি রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানান। সংসদ স্পীকারের এই বক্তব্যের পরপরই বিরোধী দলের সদস্যরা গোলাম আযমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান। কিন্তু স্পীকার তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে বিরোধীদলের সংসদ সদস্যরা তুমুল হৈচৈ শুরু করেন। এই পর্যায়ে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন,

"আমি সরকারী ও বিরোধী উভয় দল থেকেই গোলাম আযমের প্রশ্নে দুটো পৃথক প্রস্তাব পেয়েছি। এ দুটো দেখে এবং বিশ্লেষণ করে শনিবার ১৮ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবো।" স্পীকারের জবাবে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বৈঠক কিছু সময়ের জন্য মুলতবী রাখার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু স্পীকার এই প্রস্তাবেও রাজী হননি। অতঃপর রাত ৮টা ১০ মিনিটে স্পীকার বি.এন.পি.-এর শাহজাহান খানকে রোহিঙ্গা সমস্যার ওপর বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানালে সংসদে বিরোধীদলের সদস্যরা আবারও তুমুল হৈ চৈ শুরু করেন। এই পর্যায়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলে সরকারী (বি.এন.পি.) দলের সংসদ সদস্যরা একযোগে দাঁড়িয়ে তুমুল হৈ চৈ শুরু করেন। অতঃপর রাত ৮টা ১০ মিনিটে আওয়ামী লীগ, সিপিবি, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), ওয়ার্কার্স পার্টি এবং স্বতন্ত্র নূরুল ইসলাম মণি ও মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ একযোগে সংসদ হতে বেরিয়ে যান। এ সময় জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী ফ্লোর নিয়ে বলেন, "বিরোধীদলের নেতা বা নেত্রী যখন ফ্লোর নিয়ে বক্তব্য রাখতে দাঁড়ান তখন তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো উচিৎ। আপনাদের আচরণে যদি গণতন্ত্র হুমকীর সম্মুখীন হয় তাহলে বি.এন.পি. সরকারকেই দায়ী হতে হবে। আমরাও গোলাম আযমের ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিবাদে ওয়াকআউট করলাম।" এর পর বিরোধীদলহীন সংসদে জামাতে ইসলামীর এনামুল হক, বি.এন.পি.-এর যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ ও সংসদ সদস্য আশরাফ হোসেন কিছু বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তব্য শেষে রাত ৯ ঘটিকায় স্পীকার সংসদের বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন ১৮ই এপ্রিল (১৯৯২) বিকেল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত।

৮৭। ১৮ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখ বিকেল ৪টা ২৫ মিনিটে সংসদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। ১৬ই এপ্রিল (১৯৯২) বৃহস্পতিবারে স্পীকার গোলাম আযমের প্রশ্নে তাঁর সিদ্ধান্ত না দেয়ার প্রতিবাদে এদিনেও কেবলমাত্র জামাতে ইসলামীর সদস্যরা ছাড়া স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মণি ও মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদসহ সকল বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখেন। এহেন পরিস্থিতিতে, সরকারী দলের উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অনুরোধে স্পীকার ৪.৪৫ মিনিটে কিছু সময়ের জন্য সংসদ মুলতবী ঘোষণা করেন বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালানোর জন্যে। এর পর সুদীর্ঘ পৌণে আট ঘন্টা ধরে পৃথক পৃথকভাবে প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী ও উপনেতার কক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ, স্পীকারের কক্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় ২১ টি আলোচনা বৈঠক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়ে কোন সমঝোতা হয়নি। যাহোক, রাত ১২.২৫ মিনিটে পুনরায় সংসদের সভা শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে স্পীকার ১৯ শে এপ্রিল সন্ধ্যে ৭ টা পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করেন।

৮৮। ১৯ শে এপ্রিল (১৯৯২) সন্ধ্যে ৭টা ২৩ মিনিটে সংসদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হয়। কিন্তু জামাতে ইসলামী ছাড়া স্বতন্ত্র সদস্য নূরুল ইসলাম মণি ও মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপ, গণতন্ত্রী পার্টি, এনডিপি, জাসদ (সিরাজ) ও ইসলামী ঐক্যজোটের সংসদ সদস্যরা তাদের সংসদ বর্জনের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখেন। তখন সংসদে উপস্থিত ছিলেন সরকারী দল বি.এন.পি.-এর ১৭০ জন সদস্যের মধ্যে ১৩৬ জন এবং জামাতে ইসলামীর ১৭ জন সদস্য। ১৮ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখের মতো এদিনেও প্রধানমন্ত্রী সংসদকক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। যাহোক, গোলাম আযমের প্রশ্নে বিরোধী দলীয় ও সরকারী প্রস্তাব দুটোর ওপর ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পীকার প্রথমে বিরোধী দলীয় প্রস্তাবের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানান। ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামাতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এ্যাক্ট (১৯৭৩)-এর অধীনে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার অনুষ্ঠান এবং জনমতের প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের বিরোধী দলীয় প্রস্তাব কেবলমাত্র জামাতে ইসলামী এবং সরকারী দল বি.এন.পি.-এর সদস্যদের উপস্থিতিতে কণ্ঠভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। এর পর স্পীকার সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে গোলাম আযমের প্রশ্নে সরকারী প্রস্তাব পেশ করার আহবান জানান। সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীন দেশে নয় বছরের সংগ্রামের পর নির্বাচিত সংসদের ওপর তাকিয়ে আছে জাতি। এ অবস্থায় সংসদ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই অনাগরিক গোলাম আযমের বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে সাংবিধানিক রীতির প্রচলিত আইনের নিয়মানুযায়ী।" প্রস্তাবটি পাঠের সময় জামাতে ইসলামীর সংসদ নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, "আমরা আগেই বলেছি যে, গোলাম আযমের বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বিধায় এ ব্যাপারে সংসদের সিদ্ধান্ত নেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতএব, সরকারী দলের এতদবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রস্তাবের প্রতিবাদে আমরা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করলাম।" যাহোক, একমাত্র বি.এন.পি. সদস্যদের উপস্থিতিতে কণ্ঠভোটে সরকারী প্রস্তাবটি সংসদে গৃহীত হয়। এর পর রাষ্ট্রপতির আদেশে রাত ৮টা ২৩ মিনিটে পঞ্চম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ২২শে এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে এক সরকারী আদেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটককৃত গোলাম আযমের আটকাদেশের মেয়াদ আরও ৬০ দিন বৃদ্ধি করা হয়।

৮৯। ২২শে এপ্রিল (১৯৯২) 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' বেগম জাহানারা ইমামকে চেয়ার পারসন ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য-সচিব করে এর পূর্ব-গঠিত ৮-সদস্য স্টিয়ারিং কমিটির

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে গঠন করে একটি ১৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি। উক্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে থাকেনঃ কবি বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, স্থপতি মযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, শিল্পী কলিম শরাফী, ফয়েজ আহমেদ, লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, এডভোকেট গাজীউল হক, লেঃ কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী ও মাওলানা আব্দুল আওয়াল। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয় ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে জামাতে ইসলামী আমীর (দল প্রধান) গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ঘোষিত গণআদালতের রায় বাস্তবায়নের দাবীতে ২৬শে এপ্রিল (১৯৯২) বিকেল ৪ ঘটিকায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে গণসমাবেশ আয়োজন করার সিদ্ধান্ত।

৯০। ২৬শে এপ্রিল (১৯৯২) বিকেল ৪ ঘটিকায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' উদ্যোগে এবং কমিটির আহ্বাহিকা বেগম জাহানারা ইমামের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল জনসভা। সভানেত্রীর ভাষণে বেগম জাহানারা ইমাম বলেন, "আজ দেশে একদিকে স্বাধীনতার পক্ষে সাড়ে এগারো কোটি মানুষ, অন্যদিকে মাত্র ৪০/৪৫ লাখ ফ্যাসিস্ট।" জাহানারা ইমাম তাঁর ভাষণে জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির, ফ্রীডম পার্টিসহ পাকিস্তানপন্থী অন্যান্য সংগঠনের তরুণ সদস্যদের প্রতি আহবান জানান ঐ সব স্বাধীনতা বিরোধী সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় মূল স্রোতধারায় অংশ নেয়ার। অতঃপর তিনি বলেন, "তাহলেই জাতির সঠিক ইতিহাস আর বিকৃত করার সাহস আর কেউ করবে না।" জাহানারা ইমাম আরও বলেন, "জাতীয় সংসদে এক প্রতারণামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। বি.এন.পি.-এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহু নেতা গোলাম আযমের বিচারের পক্ষে জোরালো বক্তব্যও রেখেছিলেন। সে সমস্ত নেতাদের মধ্যে সরকারী বি.এন.পি. দলের উপনেতাও ছিলেন। কিন্তু প্রস্তাব পাস করার সময় প্রস্তাব থেকে ব্যারিস্টারী কায়দায় বিচার শব্দটি তুলে দেয়া হয়। স্বৈরশাসককে হটানো যতো সহজ স্বৈরকাঠামো নির্মূল করা ততো সহজ নয়। বি.এন.পি. সরকার স্বৈরশাসকের আচরণ করছে।" উক্ত জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' সর্বজনাব আব্দুর রাজ্জাক, নূরুল ইসলাম নাহিদ, ডঃ আহমদ শরীফ, এডভোকেট গাজীউল হক, হাসান ইমাম, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, ফয়েজ আহমদ, কাজী আরেফ আহমদ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন মায়া প্রমুখ সদস্যরা। উক্ত সভায় জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঘোষিত গণআদালতের রায় কার্যকর এবং গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা

প্রত্যাহারের দাবীতে ১৮ই মে (১৯৯২) তারিখে ঢাকা মহানগরীতে সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২ ঘটিকা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সংবিধানের ৩৮ নং ধারা লংঘনের জন্য অনতিবিলম্বে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্যেও সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়।

৯১। ২৯শে এপ্রিল (১১৯২) তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরী সভায় জামাতে ইসলামীর গোলাম আযমের প্রশ্ন ও তাঁর বিরুদ্ধে ঘোষিত গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবীতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' আহুত ১৮ই মে (১৯৯২) তারিখে সারা ঢাকা শহরে ৮ ঘন্টা হরতালের বিষয়টি আলোচিত হয়। আওয়ামী লীগের উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৮ই মে (১৯৯২) তারিখের হরতাল কর্মসূচীকে সমর্থন করে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানানো হয় তা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে। এদিনে জামাতে ইসলামীর গোলাম আযমসহ ১৯৭১-এর ঘাতক দালালদের আইনানুগ বিচারের দাবীতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঐদিনেই ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' শরিক সংগঠন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির' এক প্রতিনিধি সভা। উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ২০০টি উপজেলার এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি। দেশের ২৫টি জেলার প্রতিনিধিরা তাঁদের স্ব স্ব শাখা সংগঠনের প্রতিবেদন পেশ করেন উক্ত সভায়। ঐ প্রতিনিধি সভার প্রথম অধিবেশনে বেগম জাহানারা ইমামকে আহবায়িকা ও লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামানকে প্রধান সমন্বয়কারী নির্বাচিত করে গঠন করা হয় উক্ত সংগঠনের ১৬৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটি। উক্ত জাতীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার সংগঠনের শাখা কমিটির আহবায়কদের। সভার উক্ত অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্তে উপরোল্লিখিত জাতীয় কমিটিকে (রাজনৈতিক) দল নিরপেক্ষ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত সংগঠন হিসেবে রক্ষা করে সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এরপর মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই, ১৮ই মে (১৯৯২) তারিখে সারা ঢাকা শহরে সর্বাত্মক অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচীর প্রতি সর্বপ্রকার সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের কথা ঘোষণা করে ৫ দলীয় রাজনৈতিক জোট, পিডিএফ, গণতন্ত্রী পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), জাসদ (ইনু), জাসদ (সিরাজ), জাসদ (রব), বাসদ (খালেক), বাসদ (মাহবুব), অলি আহাদের ডেমোক্রেটিক লীগ, বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং আরও অনেক সাংস্কৃতিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও শ্রমিক সংগঠন। এ ছাড়াও, বাংলাদেশ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, বাংলাদেশ উলেমা পরিষদ, আনজুমান-ই-তরিকত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইসলামী লীগ এবং আরও অনেক

ইসলাম ধর্মানুরাগী সংগঠন জামাতে ইসলামীর ধর্ম বিকৃতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে এবং বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে বিএনপি সরকারের প্রতি জোর দাবি জানায়।

৯২। ১১ই মে (১৯৯২) তারিখ সকাল সাড়ে দশটায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আলম-অসীম)-এর দুইদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন। এতে সভাপতিত্ব করে ছাত্রলীগ (আ-অ)-এর সভাপতি শাহে আলম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা। উক্ত অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণে ম্যাডাম হাসিনা ছাত্রলীগের সংগ্রামী ইতিহাসের পটভূমি উল্লেখ করে বলেন, "অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য শহীদদের তালিকায় ছাত্রলীগের নাম সর্বাগ্রে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, প্রতিটি (জাতীয়) আন্দোলনে, সংগ্রামে তারা সংগ্রামের ঐতিহ্য সমুন্নত রেখেছে।"... অতঃপর ছাত্রলীগকে আরও শক্তিশালী সুসংগঠিত করে তোলার জন্যে সর্বস্তরের ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,"আমি চাই, (কোন) ব্যক্তিবিশেষের নয়, ছাত্রলীগ জাতির তথা দেশের (জনগণের) জন্য কাজ করবে।"... এর পর ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের সংগঠনের মূলমন্ত্র 'শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির ধারণায় উজ্জীবিত হবার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, "শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে। প্রতিটি ছাত্র, তথা নেতাকর্মীকে সর্বপ্রথমে শিক্ষার দিকে মনোনিবশ করতে হবে এবং শিক্ষাঙ্গনে যাতে শান্তি (ও শিক্ষার পরিবেশ) বজায় থাকে সেজন্যে সবাইকে (ঐক্যবদ্ধভাবে) কাজ করে যেতে হবে। তার সাথে প্রগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে বাঙালী জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ হচ্ছে 'রাজনৈতিক'। ১৯৭৫-এর ১৫ ই আগস্টে জাতির জনককে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া চলেছে এবং সে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা দখল করেছে, তারা সবসময় সচেতন ছাত্র সমাজকে ভয় করেছে। সে কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ছাত্র সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা ব্যাহত করার চেষ্টা করেছে। এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।" সাম্প্রতিককালের গণআন্দোলনে ছাত্র সমাজের কথা উল্লেখ করে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটিয়ে আমরা গণতন্ত্র এনেছি। (কিন্তু এখন) আমরা দেখছি, একটি নির্বাচিত সরকার রয়েছে কিন্তু তারপরেও দেখি যে, স্বৈরাচারীর পতন ঘটলেও স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেনি। স্বৈরাচার অব্যাহত রয়েছে। চলছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। (এখন) যাঁরা ক্ষমতাসীন, তারা জানেন না, বোঝেন না, গণতন্ত্রের অনুশীলন কিভাবে করতে হয়। এখানে তাঁদের শিক্ষার অভাব রয়েছে। এদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহসহ সারাদেশের কোনও শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষার কোন (সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ) পরিবেশ নেই। (দেশের প্রতিটি) শিক্ষাঙ্গন (এখন) এসব সন্ত্রাসীদের কবলে।"

৯৩। উক্ত ভাষণে অতঃপর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচীর উল্লেখ করে ম্যাডাম হাসিনা বলেন, "আমরা সকলের ভাত, কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিশেষ করে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি। আমাদের (অর্থনৈতিক) কর্মসূচীর পরিবর্তন করা হয়েছে (এ কথা সত্য) কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা যে (অর্থনৈতিক) নীতিমালা দিয়েছি তার মাধ্যমে ধনী-গরীবের (মধ্যে বিরাজিত) ব্যবধান ঘুচাতে চাই। স্বাধীনতার স্বাদ (জনগণের) ঘরে ঘরে পৌছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করা হলে যে কর্মসূচী তিনি দিয়েছিলেন তা (এতোদিন) বাস্তবায়িত হতো। গরীব আর গরীব থাকতো না। (দেশের) প্রতিটি মানুষ ন্যূনতম বাঁচার অধিকার ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা পেতো। তিনি (বঙ্গবন্ধু) চেয়েছিলেন, ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে সুখী-সমৃদ্ধিশালী জাতি গড়তে। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে (বঙ্গবন্ধুকে) দেয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে (তাঁর) সেই ইচ্ছাকে তিরোহিত করা হয়। (তাই এখন) সময়ের সাথে তাল রেখে আমরা পথ পরিবর্তন করেছি মাত্র কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য এক (ও অভিন্ন)।" ... পরিশেষে, তিনি বলেন, "এই (বি.এন.পি.) সরকার অবৈধ অস্ত্রধারীদের মদদ দিয়ে সারাদেশে মাস্তানী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছে। আজকে যারা দেশে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে আছে, তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা হয় না। ১৯৭১-এর ঘাতক ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র যারা (অতীতে) বিদেশে বসে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আজ তারাই দেশে এসে বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। আজকে সেই ঘাতক চক্র ও স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন শহীদ রুমীর মা বেগম জাহানারা ইমামসহ মুক্তিযোদ্ধা বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করলেন, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে এ (বি.এন.পি.) সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করলো। (পক্ষান্তরে) যারা অস্ত্র নিয়ে (দেশের) স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, সরকারী (বি.এন.পি.) দল তাদেরকে মদদ দেয়। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে ঘৃণার আর কি আছে?"

৯৪। ১৩ ই মে (১৯৯২) তারিখে দুইদিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন শেষে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের নাম প্রকাশ করা হয় তারা হলোঃ সভাপতি, মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল রহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক, মাহবুবুল হক শাকিল, যুগ্ম সম্পাদক, ইকবাল হোসেন অপু এবং ইসহাক আলী খান পান্না। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির নতুন কর্মকর্তাদের নামও ঘোষণা করা হয়। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কমিটির

কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের নাম প্রকাশ করা হয় তারা হলোঃ সভাপতি, খিজির হায়াত লিজু, সাধারণ সম্পাদক, পংকজ দেবনাথ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক, বাহাদুর বেপারী। ১৪ই মে (১৯৯২) তারিখে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ৩১ জন ছাত্রনেতা উক্ত সংগঠনের নতুন কমিটিকে একটি 'পকেট কমিটি' হিসেবে আখ্যায়িত করে একটি বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিদাতাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল সৈয়দ কামরুল হাসান (সহ-সভাপতি), আতাউর রহমান (সহ-সভাপতি), শাহে আলম মুরাদ (গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক), সৈয়দ ফজলুর রহমান (সমাজসেবা সম্পাদক), রেবেকা সুলতানা রোমা (ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক), লুৎফর রহমান (শিক্ষা ও পাঠক্রম সম্পাদক), কাজী নজীবুল্লাহ হিরু (অর্থ সম্পাদক) এবং ২৪ জন সদস্য ছিল, নির্মল গোস্বামী, মিজানুর রহমান আজাদ, জিল্লুর রহমান টিটো, সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন সাকু, ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, ওয়াহিদুজ্জান মণি, লুৎফর রহমান চৌধুরী রিপন, গোলাম রাব্বানী বাবলু, ডাঃ মোখলেসুর রহামান হিরু, নূর হোসেন বলাই, ইকবাল জামাল জুয়েল, মাসুম আহমেদ, মিজানুর রহমান মিজান, হুমাউন কবির বুলবুল, বাদশা আলম, মোক্তার হোসেন, লিয়াকত আলী খান, এজাজ আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, স্বপন কুমার রায়, ইউসুফ আলী, এনায়েত কবির, সাইদুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফা। উক্ত বিবতিতে তারা বলে: "১৩ই মে (১৯৯২) ভোর ৫টা পর্যন্ত সাবজেক্ট কমিটির বৈঠক চলার পর সকাল ১০ টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এর পর, সাবজেক্ট কমিটির বৈঠক আর না করে একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য গভীর রাতে বিষয় নির্ধারণী কমিটিকে উপেক্ষা করে একটি 'পকেট কমিটি' ঘোষণা করা হয়। এই কমিটির সাথে (জাতীয় সম্মেলনের) সভা ও কাউন্সিলরদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা ছাত্রলীগকে ধ্বংস করার একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র।" অতঃপর বিবৃতিদাতারা বঙ্গবন্ধু ও ছাত্রলীগের রাজনীতিকে দুর্বল ও হেয় প্রতিপন্ন করার যে কোন ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানায়। অচিরেই গণতান্ত্রিক পন্থায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে বলেও বিবৃতিদাতারা ঘোষণা করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশের রাজনৈতিক কিংবা রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে সম্পর্কিত দল বা সংগঠনের ক্ষেত্রে এরূপ অনভিপ্রেত ঘটনা প্রায়াশঃই পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, এর অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ এদেশে গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি বাহ্যতঃ উচ্চারিত হলেও কার্যতঃ গণতন্ত্রের অনুশীলন ও চর্চা এবং নিয়ম-রীতিনীতি প্রতিপালিত ও অনুসৃত না হওয়া।

৯৫। ১৮ই মে (১৯৯২) তারিখে ছিল ২৬শে মার্চ (১৯৯২) তারিখে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কয়েক লাখ লোকের সমাবেশে জামাতে ইসলামীর গোলাম আযমের

বিরুদ্ধে ঘোষিত গণআদালতের রায় কার্যকরীকরণ, স্বাধীনতার শত্রু আলবদর-রাজাকার বাহিনীর দোসর জামাত-শিবিরের ও সকল সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ এবং গণআদালতের সাথে সম্পর্কিত ২৪ জন বিশিষ্ট জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বি.এন.পি. সরকারের দায়েরকৃত রাষ্ট্রদোহিতা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিট' আহূত রাজধানী সারা ঢাকা শহরে ভোর ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত আট ঘন্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। হরতাল শেষে, বিকেল ৪ টায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রীত্ব করেন বেগম জাহানারা ইমাম। সর্বাত্মক হরতাল পালনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করায় রাজধানীর নাগরিকদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেগম জাহানারা ইমাম তাঁর ভাষণে বলেন, "অতীতে সবসময়ই হরতাল হয়েছে। কিন্তু আজ যে হরতাল হলো তা অতীতের সব হরতাল থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। অতীতে হরতাল হয়েছে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ডাকে। কিন্তু আজকে এই প্রথম হরতাল পালিত হয়েছে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় সংগঠনের আহবানে। আজকের হরতাল ও জনসভায় প্রমাণিত হয় যে, গোলাম আযমসহ ১৯৭১-এর ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি জনগণের দাবি। এটা তাদের প্রাণের দাবি।" বেগম জাহানারা ইমাম আরও বলেন, "আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাবো। আমরা ধৈর্য্যের শেষ সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপরও দাবি আদায় না হলে, সরকার আমাদের ওপর আক্রমণে উদ্যত হলে, অবশ্যই আমরা শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। তখন শুরু হবে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ও নতুন প্রজন্ম, দালাল, ঘাতক, খুনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্রস্তুতির জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষারত।" উক্ত জনসভায় আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক এমপি, জাসদের সভাপতি কাজী আরেফ আহমদ, মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার লেঃ কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা বদরুদ্দিন উমর, প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী সৈয়দ হাসান ইমাম, পাঁচ দলীয় জোটের আহবায়ক নঈম জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফয়েজ আহমদ, ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের পক্ষে বেলা নবী, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আফজাল, আওয়ামী লীগের মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উক্ত জনসভায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়, যার উল্লেখযোগ্য ছিল ২১শে জুন (১৯৯২) তারিখে সারা বাংলাদেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালন।

৯৬। ইতিপূর্বে জামাতে ইসলামী এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার নায়ক কর্নেল (অবঃ) ফারুকের ফ্যাসিস্ট ফ্রিডম পার্টি 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' (সংক্ষেপে' ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি)-এর গণতান্ত্রিক এবং জনসচেতনতা ও

জনমত সৃষ্টির আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য যৌথভাবে গঠন করে এক ফ্যাসিস্ট 'যুব কমান্ড বাহিনী'। এই 'যুব কমান্ড বাহনী'-এর লোকেরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 'নির্মূল কমিটির' শান্তিপূর্ণ সভা, সমাবেশ ও মিছিলে সহিংস ও সশস্ত্র হামলা চালাতে থাকে। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বি.এন.পি.-এর সরকার 'যুব কমান্ডের' এ সমস্ত সহিংস ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে দৃশ্যতঃ নির্লিপ্ত ও নির্বাক থাকে। ফলে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীও 'যুব কমান্ডের' এহেন আইন লংঘনীয় সহিংস ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধমূলক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করে।

৯৭। ৫ই জুন (১৯৯২) তারিখে আমি ছেলে জয়সহ হাসিনার সঙ্গে সৌদি আরবের বাদশার অতিথি হিসেবে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি এয়ারলাইন্সযোগে ঢাকা ত্যাগ করি। সেদিন সৌদি এয়ারলাইন্সের একই ফ্লাইটে বি.এন.পি.-এর সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী তাঁর পত্নীসহ ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া এবং সংসদ সদস্য ও ঢাকা নগরীর মেয়র মির্জা আব্বাসও সৌদি বাদশার অতিথি হিসেবে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে বি.এন.পি.-এর উল্লেখিত নেতাদ্বয়সহ আমাদেরও সৌদি বাদশার 'কনফারেন্স প্যালেস' ভবনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৯ই জুন (অর্থাৎ ৮ই জেলহজ্ব) তারিখে পবিত্র হজ্ব অনুষ্ঠানের প্রথম দিন এবং পরদিন আরাফাত ময়দানে পবিত্র হজ্বের অবস্থান ও নামাজ পালন শেষে পবিত্র হজ্বের অংশ হিসেবে মিনায় তিন দিনের অবস্থানের জন্য বি.এন.পি.-এর উল্লেখিত নেতাদ্বয়ের সঙ্গে আমাদেরও সেখানে অবস্থিত সৌদি বাদশার একই ভবনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। মক্কায় পবিত্র হজ্ব শেষে ১৪ ই জুন (১৯৯২) তারিখে জেদ্দা থেকে উল্লেখিত বি.এন.পি. নেতাদের সঙ্গে আমরাও একই বিমানে মদিনায় যাই। মদিনা শহরে একদিন অবস্থানকালে সেখানে রসুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মাজার জেয়ারতসহ ইসলামের অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের সময়ও বি.এন.পি.-এর উল্লেখিত নেতাদ্বয় ও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। সৌদি আরবে হজ্বব্রত পালন শেষে জেদ্দা ও মদিনায় অবস্থানকালে হাসিনা এবং বি.এন.পি.-এর ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও মির্জা আব্বাসের মধ্যে খোলামেলা ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ ও কথাবার্তায় আমি বিমুগ্ধ হই। সৌদি আরবের শহরগুলোয়, বিশেষ করে জেদ্দা ও মদিনা শহরদ্বয়ের বনায়ন প্রয়াস নিয়ে আলোচনাকালে হাসিনা বি.এন.পি.-এর উল্লেখিত নেতাদ্বয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে, কিভাবে পরিকল্পিতভাবে বিস্তৃত বনায়নের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে সৌহার্দপূর্ণ ও খোলাখুলিভাবে মত বিনিময় করে। সেখানে একত্রে ভ্রমণকালে কয়েক বার বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর গোলাম আযমের বিচার প্রসঙ্গে এবং জামাতে ইসলামী ও ফ্যাসিস্ট ফ্রিডম পার্টির যৌথ নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাসিস্ট 'যুব কমান্ড বাহিনীর' সহিংস অপরাধজনক ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও বি.এন.পি.-এর উল্লেখিত নেতাদ্বয়ের সঙ্গে হাসিনার কথাবার্তা হয়। ব্যারিস্টার

রফিকুল ইসলাম মিয়া ও মির্জা আব্বাস উভয়েই গোলাম আযমের তার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতা বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা ও মানবতাবিরোধী কৃতকর্ম এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার জন্য যথাযথ বিচার হওয়া উচিৎ বলে তাদের ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করেন। যাহোক, সৌদি আরবের মক্কায় পবিত্র হজ্ব পালন ও মদিনা শরিফে রসুলে পাকের মাজার জেয়ারত শেষে আমরা ১৭ই জুন স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করি।

৯৮। ১৮ই জুন (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয় এবং এদিনেই অর্থমন্ত্রী সংসদে সরকারের বাজেট পেশ করেন। কিন্তু একমাত্র জামাতে ইসলামী ছাড়া, দুজন স্বতন্ত্র সদস্যসহ সংসদের অন্যান্য বিরোধী দলগুলো তাদের ১৭ই এপ্রিল (১৯৯২) তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদ অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসের সংসদের স্বল্পকালীন অধিবেশনের শেষের দিকে ১৭ই এপ্রিল তারিখে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করার পর দুজন স্বতন্ত্র সদস্যসহ এই বিরোধী দলগুলোর সদস্যরা ৪-দফা দাবি ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়েছিলঃ (১) দেশের প্রচলিত আইন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন (ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩) অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার করতে হবে, (২) (গোলাম আযমের গণবিচারের জন্য গঠিত) গণআদালতের উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট ২৪ জন দেশবরেণ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে (সরকার কর্তৃক) দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, (৩) রাজনৈতিক মত পার্থক্য নির্বিশেষে প্রতি দলের সভা-সমাবেশসহ গণতান্ত্রিক আচার আচরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং (৪) (সংসদে) বিরোধী দলীয় (নেতা) নেত্রীর মাইক কোনও অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না ও সকল সংসদ সদস্যের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত ঘোষণায় এও বলা হয়েছিল যে, সরকার তাদের এই ৪-দফা দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা সংসদ অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখবেন।

৯৯। ১৯শে জুন (১৯৯২) তারিখে ঢাকার সেগুন বাগিচায় আয়োজিত এক সমাবেশে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য ডঃ কামাল হোসেনকে আহবায়ক কমিটির চেয়ারম্যান করে "বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ফোরাম" নামে একটি নির্দলীয় সংগঠন গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। এই ফোরামের ঘোষণায় বলা হয়ঃ "১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের যে পথ উন্মোচিত হয়েছিল এবং জনগণের যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণের কার্যকর প্রচেষ্টা কিংবা দিক নির্দেশনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এমন কি, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় তিন জোটের (১৯৯০ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত) রূপরেখায় জনগণের কাছে দেয়া ওয়াদা আজ উপেক্ষিত। ফলে, জনজীবনে হতাশা ও অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে। দেশে আজ (১৯৭১ সালের) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিপর্যস্ত। দেশের অর্থনীতি পঙ্গু ও দেশ নৈরাজ্য ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। আইনের শাসন ও প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতার দাবি উপেক্ষিত। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থের কাছে

পরাভূত। এই অবস্থায় সংকট থেকে জনগণের পরিত্রাণের লক্ষ্যে তাদেরকে সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি আশু প্রয়োজন। আর সে কারণেই এই ফোরামের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।" উক্ত সমাবেশের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী। উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ কামাল হোসেন। ডঃ কামাল হোসেন তার ভাষণে বলেন, "আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্র, বিভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত তিন জোটের রূপরেখার প্রশ্নে ভিন্নমত থাকার অবকাশ নেই।... বহু রক্ত দিয়ে আজকে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত। সংসদকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, জবাবদিহি করা হয়েছে, কিন্তু তিন জোটের রূপরেখা ও জনগণের আশা-আকাংক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষণ নেই। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীসহ খুনীদের বিচার হয় না। স্বাধীনতা বিরোধী গোলাম আযমকে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চলে। দেশে গণতান্ত্রিকভাবে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বৈরতন্ত্র যায়নি। গণতন্ত্র আজ হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায়, গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপদান তথা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চার লক্ষ্যে এই ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।" অতঃপর ডঃ কামাল হোসেন দলমত নির্বিশেষে মৌলিক বিষয়সমূহকে নিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একস্থানে উপনীত হওয়ার জন্য সবাইকে আহবান জানান। উক্ত সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বেগম সুফিয়া কামাল, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, ডাঃ সৈয়দা ফিরোজা বেগম, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, সিপিবির নূরুল ইসলাম নাহিদ, জাসদ (সিরাজ)-এর শাহজাহান সিরাজ, ন্যাপের পংকজ ভট্টাচার্য, ওয়ার্কার্স পার্টির আবুল বাশার, জাসদ (ইনু)-এর শিরিন আখতার, গণতন্ত্রী পার্টির আমিনুল হক বাদশা; বিচারপতি কে, এম, সোবহান এবং বিএফইউজে এর রিয়াজউদ্দিন আহমদ।

১০০। ২১শে জুন তারিখে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' এর আহ্বানে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার করে গণআদালতের রায় বাস্তবায়ন ও গণআদালতের উদ্যোক্তা ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে এই হরতাল আহবান করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৫ দলীয় জোট, দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টসহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন হরতালের প্রতি সমর্থন জানায়। ঢাকার মতিঝিল, পল্টন, তোপখানা, গুলিস্তান, শাহবাগ, ফার্মগেট, আসাদ গেট, মগবাজার, মালিবাগসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সারাদিন ছিল হরতাল পালনকারীদের মিছিল ও সমাবেশে মুখরিত। হরতালের সময় কোন দোকানপাট খোলেনি। যানবাহান পথে নামেনি। রিকশাচালকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিকশা

চলাচল বন্ধ রাখে। কলকারখানা ছিল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। মতিঝিল অফিসপাড়া ছিল কর্মহীন। লঞ্চ চলাচল করেনি। ট্রেন চলাচল হয় বিঘ্নিত। ঢাকা থেকে কোন বিমান উড়েনি। সচিবালয়ে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ব্যাংক, বীমা, ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন প্রভৃতি বন্ধ থাকায় রাজধানীতে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়েছিল।

১০১। ২১শে জুন (১৯৯২) তারিখে অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হবার পর সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে সরকারের পুলিশ বাহিনী রাজধানীর কেন্দ্রস্থল বায়তুল মোকাররম থেকে প্রেসক্লাব ছাড়িয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চত্বর পর্যন্ত স্মরণাতীতকালের এক জঘন্যতম পৈশাচিক ও বর্বরোচিত হামলাযজ্ঞ চালায়। পুলিশের লাঠিচার্জ, অসংখ্য রাবার বুলেটের আওয়াজ এবং আড়াই ঘন্টা ধরে মূহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে গোটা এলাকা জুড়ে এক চরম ত্রাস ও যন্ত্রণাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পুলিশ শুধু রাজপথে সাংবাদিক, পথচারীদের ওপর লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা সাংবাদিকদের যানবাহন ভাঙচুর এবং ক্যামেরা, ঘড়ি, ফ্ল্যাশগান, প্রভৃতি লুটপাট করে। এক পর্যায়ে পুলিশ প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রেস ক্লাবের দরজা-জানালা ও সেখানে রক্ষিত সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে এবং সাংবাদিকদের বেপরোয়া প্রহার ও সাংবাদিক বহনকারী বেবীট্যাক্সি ড্রাইভারদের বেধড়ক মারধর করে। পুলিশের এই নারকীয় হামলায় অর্ধশতাধিক সাংবাদিকসহ প্রায় দুই শতাধিক নিরীহ পথচারী আহত এবং প্রেস ক্লাবের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। পুলিশের এ আচরণের প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে পরদিন অর্থাৎ ২২ শে জুন তারিখে ২৪ ঘন্টা প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। এ ছাড়াও, তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ ও ঘটনার হোতা ঢাকা মেট্রপলিটন পুলিশ কমিশনার মির্জা রফিকুল হুদার অপসারণ দাবি করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও আহত সাংবাদিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এহেন ঘটনার কারণে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এদিকে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' হরতালের দিনে সন্ত্রাসী-ফ্যাসিস্ট যুবকমাণ্ডের লোকদের সরকারের মদদদান, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতার ওপর পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, ঢাকার প্রেস ক্লাবে পুলিশের নজিরবিহীন হামলা এবং নেতৃবৃন্দ-সাংবাদিক ও জনগণকে নির্যাতনের প্রতিবাদে ২২ শে জুন ঢাকার স্টেডিয়াম গেটে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, ২৩ শে জুন সারাদেশে সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ দিবস পালন এবং ৩০ শে জুন শাহবাগ চৌরাস্তার মোড় ও জাতীয় যাদুঘরের সামনে জমায়েত হয়ে সেখান থেকে জাতীয় সংসদ অভিযাত্রার কর্মসূচী ঘোষণা করে।

১০২। ইতিপূর্বে, আওয়ামী লীগসহ অনেক আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতসেবী ও অন্যান্য মহল বহুবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বি.এন.পি. সরকারের প্রতি আহ্বান

জানিয়েছে দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জারিকৃত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য। একই লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদে পেশকৃত ইনডেমনিটি বাতিল বিল সংসদে পাশ করানোর জন্য বহু আহবানও জানিয়েছে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহল। বি.এন.পি. সরকারের আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মির্জ্জা গোলাম হাফিজের নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় বিশেষ কমিটি এই বিলটির ব্যাপারে বিভিন্ন আইনগত ও সাংবিধানিক বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে ইতিপূর্বে ৭০ দিন করে ৪ দফা সময় বাড়িয়ে নেয়। এই সময়কালে উক্ত কমিটির বহু সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংসদীয় বিশেষ কমিটির উক্ত বিলটির ব্যাপারে রিপোর্ট প্রদানের জন্য চতুর্থবারের বর্ধিত সময়সীমার শেষ তারিখ ছিল ২৫শে জুন (১৯৯২)। এদিন সংসদে সরকারী দলের চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ইনডেমনিটি বাতিল বিলটির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার জন্য আরও সময় প্রয়োজন এই মর্মে আবেদন জানালে স্পীকার কমিটিকে তার প্রতিবেদন প্রদানের সময়সীমা আরও ৭০ দিন বাড়িয়ে দেন। এর ফলে ইনডেমনিটি বাতিল বিলটি পাসের ভবিষ্যৎ শুধু অনিশ্চিতই হয়নি, সে ব্যাপারে বি.এন.পি. নেতৃত্বের আন্তরিকতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মহল ও জনমনে সৃষ্টি হয় দারুণ সন্দেহ ও নানান জল্পনা-কল্পনা।

১০৩। ২৯শে জুন (১৯৯২) তারিখ পর্যন্ত প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ, দুজন স্বতন্ত্র সদস্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দলগুলোর সদস্যগণ সংসদের বাজেট অধিবেশন বর্জন অব্যাহত রাখেন। এদিকে বিরোধী দলগুলোর অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে বাজেট পাস করানো আইনসম্মত হলেও তা ন্যায়সঙ্গত হবে না এই মর্মে বিভিন্ন পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য করা হয়। এরই প্রেক্ষাপটে এবং সংসদে উদ্ভূত অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষের ক্ষুদ্র দলগুলোর পূর্বঘোষিত ৪-দফার ব্যাপারে একটি সমঝোতায় আসার প্রয়াস চালানো হয়। অবশেষে, ২৯শে জুন (১৯৯২) তারিখ সোমবার দিবাগত রাত ২ টা ৩০ মিনিটে সরকার ও প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। এই যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন সরকারের পক্ষে সরকারী দলের সংসদীয় উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষে দলের সংসদীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম। এই যৌথ ঘোষণায় বলা হয় : "যেহেতু (বাংলাদেশের) গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধের ফসল এই বাংলাদেশ এবং নয় বছরের সুদীর্ঘ যৌথ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মূল্যে স্বৈরাচার উৎখাতের পর গণতন্ত্র অর্জিত হয়েছে; এবং যেহেতু এ দেশের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সার্বভৌম সংসদ নির্বাচিত করেছে; এবং যেহেতু জনগণ পূর্ণ আস্থা রেখেছে যে, এই

সংসদের প্রতিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করবেন, জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণসহ দেশের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আন্তরিক অবদান রাখবেন; এবং যেহেতু সংসদে বাদ-প্রতিবাদ, সাময়িক (সংসদ) বর্জন, ইত্যাদি যেমন সংসদীয় রীতিসিদ্ধ তেমনি সকল সংসদ সদস্য সক্রিয় অংগ্রহণের মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও সংহতিকরণে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন এবং যা জনগণের একান্ত প্রত্যাশা; এবং যেহেতু মূলতঃ গোলাম আযম প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের সদস্যবৃন্দ সংসদের চলতি অধিবেশনে আজ পর্যন্তও যোগদান করেননি; এবং যেহেতু সংসদের কার্যকারিতা সরকারীদল ও বিরোধীদলের সহযোগিতা ও সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সর্বতোভাবে সফল করার জন্য এই সহযোগিতা ও সমঝোতা একান্তই অপরিহার্য, সেহেতু ঃ (১) সংসদে গোলাম আযম সম্পর্কিত আলোচনা ও প্রস্তাবের আলোকে দেশের সংবিধানসম্মত প্রচলিত আইন অনুযায়ী গোলাম আযমের বিচার করা হবে। সরকার গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে ইতিপূর্বেই তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তার নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করেন। (২) একই লক্ষ্যে গণআদালত সংক্রান্ত ২৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ থেকে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা হবে। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের আইনজীবীগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৩) একই সাথে সংসদের ভেতরে ও বাইরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সকল সংসদ সদস্য ও দলসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।"

১০৪। ৩০শে জুন বিকেল ৩ টায় পূর্ব-ঘোষণা মোতাবেক হাজার হাজার পেশাজীবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মুক্তিযোদ্ধা, ইত্যাদি সংগঠনের নেতা ও কর্মী ঢাকার শাহবাগ চৌরাস্তার মোড় ও জাতীয় যাদুঘরের সামনের রাস্তায় সমবেত হয়। কিন্তু ২৯ শে জুন রাতে স্পীকার পরদিন অর্থাৎ ৩০শে জুন তারিখে সংসদের অধিবেশন বিকেলের পরিবর্তে সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত দেয়ায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' এ দিনের পূর্ব-ঘোষিত সংসদ ভবন অভিযাত্রা কর্মসূচী বাতিল করে সেখানে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত জনসভায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তাবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' আহবায়িকা শহীদ জননী বেগম জাহানারা ইমাম বলেন, "ঘাতক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জনগণের দেয়া রায় যতদিন পর্যন্ত কার্যকর না করা হবে, ২৪ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ মামলা যতদিন পর্যন্ত প্রত্যাহার না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। সরকার আমাদের দাবি সম্পর্কে যেটুকু নমনীয় হয়েছে তাতে দেশবাসী সন্তুষ্ট নয়।" অতঃপর সংসদে বিরোধী দলের সঙ্গে বি.এন.পি. সরকারের যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে সে চুক্তিকে তিনি

জনগণের সংগ্রামের বিজয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "সংসদ ভবন অভিযাত্রার ভয়ে ভীত হয়ে সরকার সংসদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেছে। এটাও সরকারের পরাজয়, সংগ্রামের বিজয়।" এর পর ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির খুনীচক্র ফ্রীডম পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি জানিয়ে বেগম জাহানারা ইমাম বলেন, "সর্বপ্রকার ঘাতকেরা আজ এক কাতারে মিলিত হয়েছে। (বি.এন.পি.) সরকার এদের (মূল) পৃষ্ঠপোষক।" পরিশেষে, বেগম জাহানারা ইমাম 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির' পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। চার দফা আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত এই কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপঃ (১) কমিটির ১৪ই অক্টোবর (১৯৯২) তারিখে ঢাকায় মহাসমাবেশ আয়োজন; (২) এর পূর্বে ১৯শে জুলাই প্রতিটি উপজেলা কেন্দ্রে এবং ২৩শে আগস্ট প্রতিটি জেলা-কেন্দ্রে সমাবেশ ও ঘেরাও কর্মকান্ড আয়োজন এবং (৩) ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠান।

১০৫। ৯ই জুলাই (১৯৯২) তারিখে ঢাকার ২৯ নম্বর মিন্টু রোডস্থ সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবনে দলীয় সভানেত্রী ম্যাডাম হাসিনার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিলের প্রশ্নে বি.এন.পি. সরকার কালক্ষেপণ করায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়, "তিন জোটের ১৯৯০ সালের ১৯ শে নভেম্বর তারিখে ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অবসান, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বি.এন.পি. সরকারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জনমণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ সভা মনে করে যে, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চির অবসান, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা রক্ষা ও বিকাশের স্বার্থে অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কুখ্যাত ইনডেমনিটি (ক্ষমা প্রদর্শন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫) বাতিল করার দাবি জনগণের দাবি।" পরিশেষে, উক্ত সভায় জনগণের দীর্ঘদিনের উল্লেখিত কাংক্ষিত দাবি বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৫ই আগস্ট (১৯৯২) জাতীয় শোক দিবসে দেশব্যাপী সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই কমসূচীকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উপরোল্লিখিত গণদাবিসমূহ আদায়ের জন্য দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করা হয়।

১০৬। বলা বাহুল্য, ১৯৫২ সালে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলনের পর, বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সাম্প্র-দায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬-দফার সংগ্রাম, ১৯৭১-এর মার্চ মাসে আপোষহীন সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম, অক্লান্ত পরিশ্রম ও

ব্যক্তিগত ত্যাগ-তিতিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে এদেশের অগণিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, বিভিন্ন পেশাজীবি তথা দেশের আপামর জন-সাধারণকে যে অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারই ফসল ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলদেশের অভ্যুদয়। জনগণের দাবি মেনে নেয়ার পরিবর্তে, পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসকচক্র ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে বাংলার জনগণের ওপর বর্বরোচিত সশস্ত্র আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু দেশকে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আহবান জানান। তাঁর সেই আহবানে সাড়া দিয়ে, বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল প্রগতিশীল ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-মজুর, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবি, বিভিন্ন পেশাজীবি তথা আপামর জনসাধারণ সুদীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র-গোষ্ঠী ও শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তার গণতান্ত্রিক, মানবিক ও ন্যায়বিচারের অধিকারভোগ ও মৌলিক চাহিদাপূরণ এবং শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যমুক্ত পরিবেশে ও শান্তি-সম্প্রীতিতে ধর্মকর্ম পালন, সংস্কৃতি চর্চা ও সুন্দর জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা পাবে এই ছিল মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ। ১৯৭২ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে কতিপয় বিদেশী শক্তি এবং তাদের মদদপুষ্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আদর্শবিরোধী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিত্ব ও মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সপরিবারে নিহত হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু উল্লেখিত লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে দেশীয় সেই একই স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শবিরোধী চক্র ও কতিপয় বিদেশী শক্তি ক্রমাগত গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘকালের আশা-আকাংক্ষাকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু এই মুক্তিসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও আদর্শ বিরোধী অপশক্তি জনগণের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হলেও, দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রয়েছে নিরন্তর সচেতন। তাই, দেশে মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ সুদৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে দেশের সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, নেতা-কর্মী, ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিসেবী, পেশাজীবি তথা সমগ্র জাতি এখন দৃপ্ত কণ্ঠে সোচ্চার। সুতরাং মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধের বিরোধী ব্যক্তিত্ব ও মহলের মনে যতোশীঘ্র শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামী মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে ততোই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল। দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক

শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হোক এবং মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নিরপেক্ষ ও সঠিক ইতিহাস রচিত হোক এবং তা জনসাধারণ, বিশেষ করে, স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা হোক, সমগ্র জাতির এই-ই ঐকান্তিক ও আন্তরিক কামনা। কিন্তু বাংলাদেশ তথা জাতির ভাগ্যে কি লেখা আছে তা কেবল ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীই নির্ণয় করবে।

পরিশিষ্ট – ১

১৯৬৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত ৬–দফা দাবি

১ নং দফা

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২ নং দফা

ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

৩ নং দফা

দুইটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না—আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

৪ নং দফা

সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ-ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

৫ নং দফা

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে:

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

৬ নং দফা

পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর প্রধান কার্য্যালয় চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠন করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট – ২

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ (রোববার) ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলা মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস—এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ—এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের

প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো—এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভূট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো—সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন যে, যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এ্যাসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এ্যাসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ মার্চের ১ তারিখ এ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ্যাসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভূট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হলো বাংলা মানুষের, দোষ দেওয়া হোল আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন।

আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এ্যাসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা?

২৫ তারিখে এ্যাসেমব্লি ডেকেছেন। রক্তের দাগ শুকায়নি। ৬ তারিখ বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এ্যাসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন, মার্শাল-ল, উইথড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এ্যাসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এ্যাসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকেই এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা—কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন ওয়াপদা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল—কেউ দেবে না।

শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারবে।

পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে। বাঙালীরা বুঝেসুজে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

পরিশিষ্ট – ৩

(বাংলাদেশের) স্বাধীনতার (আনুষ্ঠানিক) ঘোষণাপত্র

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE (OF BANGLADESH)
Mujibnagar, Bangladesh
Dated 10th day of April 1971.

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

And

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

And

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

And

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period,

And

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

And

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 million people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

And

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures,amongst others, on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

And

Whereas the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

And

Whereas the people of Bangladesh, by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and

having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed,Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly and just Government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and to abide by the Charter of the United Nations.

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Professor Yusuf Ali our duly constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

Sd/- Prof. Yusuf Ali
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority
of the Constituent Assembly
of Bangladesh.

উপরোক্ত ঘোষণার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিলেন;

এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেন এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়;

এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের পরিবর্তে এবং এমনকি বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে তাদের আলাপ-আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি গর্হিত এবং বিশ্বাস ঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন;

এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান;

এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের একত্রিত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছে;

এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে;

যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যান্ডেট দিয়েছেন সেই ম্যান্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্তব্য মনে করি;

সেইহেতু আমরা বাংলাদেশেকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রুপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি;

এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্বান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন;

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের অধিকারী;

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে। তাঁর কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকবে, তাঁর গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও তার অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, যে কোনও কারণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি না থাকেন, অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তা হলে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষনা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে গঠিত ক্ষমতাধিকারী নিযুক্ত এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করছি।

স্বাক্ষর

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

পরিশিষ্ট – ৪

১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তারিখে ভারত–বাংলাদেশ মিত্রবাহিনীর নিকট পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল

(INSTRUMENT OF SURRENDER)

The Pakistan Eastern Command agree to surrender all Pakistan Armed Forces in Bangladesh to Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all Pakistan land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora.

The Pakistan Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora as soon as this instrument has been singed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieuteant-General Jagjit Singh Aurora will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the Geneva Convention and guarantees the safety and well-being of all Pakistan military and para-military forces who surrenders. Protection will be provided to

foreign nationals, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin by the forces under the command of Lieutenant-General Jagjit Singh Aurora.

Sd/-
(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
India and Bangladesh Forces in the
Eastern Theatre
16 December 1971

Sd/-
(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone-B
and Commander Eastern Command
(Pakistan)
16 December 1971

উপরোক্ত আত্মসমর্পণের বঙ্গানুবাদ:

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে: জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ সম্মতি প্রদান করছেন। এই আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাক বাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধাসামরিক এবং বেসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই সকল সৈন্য যে যেখানে যেভাবে আছেন সেইভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন।

এই দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের সামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলী ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আত্মসমর্পণ চুক্তি ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে লে: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

লে: জেনারেল অরোরা এই মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লে: জেনারেল অরোরার অধীন সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশী নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর,
জগজিৎ সিং অরোরা
লেঃ জেনারেল
জি ও সি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয়
বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর
সর্বাধিনায়ক
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বাক্ষর,
আমির আবদুল্লা খান নিয়াজী
লেঃ জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি
এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চল
কমান্ডের সর্বাধিনায়ক
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

পরিশিষ্ট – ৫

১৯শে মার্চ (১৯৭২) তারিখে স্বাক্ষরিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং প্রজাতন্ত্রী ভারতের মধ্যে (পারস্পরিক) মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি

Treaty of Friendship, Co-operation and Peace between the People's Republic of Bangladesh and the Republic of India signed on 19 March, 1972.

INSPIRED by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism;

HAVING STRUGGLED together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh;

DETERMINED to maintain fraternal and good-neighbourly relations and transform their border into a border of eternal peace and friendship;

ADHERING firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual co-operation, non-interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty;

DETERMINED to safeguard peace, stability and security and to promote progress of their respective countries through all possible avenues of mutual co-operation;

DETERMINED further to expand and strengthen the existing relations of friendship between them;

CONVINCED that the further development of friendship and co-operation meets the national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the world;

RESOLVED to contribute to security and to make efforts to bring about a relaxation of internatioal tension and the final elimination of vestiges of colonialism, racialism, and imperialism;

CONVINCED that in the present-day world international problems can be solved only through co-operation and not through conflict or confrontation;

RE-AFFIRMING their determiation to follow the aims and principles of the United Nations Charter, the Republic of India, on the one hand, and the People's Republic of Bangladesh, on the other, have decided to conclude the present Treaty.

Article 1

The High Contracting Parties, inspired by the ideals for which their respective people struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace and friendship between their two countries and their peoples, each side shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other and refrain from interfering in the internal affairs of the other side.

The High Contracting Parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good-neighbourliness and all-round co-opration existing between them, one the basis of the above metioned principles as well as the princple of equality and mutual benefit.

Article 2

Being guided by their devotion to the priciples of equality of all peoples and States, irrespective of race or creed, the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifestations and are determined to strive for their final and complete elimination.

The High Contracting Parties shall co-operate with other States in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation.

Article 3

The High Contracting Parties reaffirm their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existence as important factors for easing tension in the world, maintaining international peace and security, and strengthening national sovereignty and independence.

Article 4

The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both States, through meetings and exchanges of views at all levels.

Article 5

The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantagous and all-round co-operation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall develop mutual co-operation in the fields of trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most-favoured nation principle.

Article 6

The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.

Article 7

The High Contracting Parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.

Article 8

In accordance with the ties of friendship existing between the two countries, each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other party.

Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other party and shall not allow the use of its territory for comitting any act that may cause military damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.

Article 9

Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third party taking part in an armed conflict against the other party. In case either party is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.

Article 10

Each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not undertake any commitment, secret or open, toward one or more States which may be incompatible with the present Treaty.

Article 11

The present Treaty is signed for a term of twenty-five years and shall be subject to renewal by mutual agreement of the High Contracting Parties.

The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.

Article 12

Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be settled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

Done in Dacca on the nineteenth day of March, nineteen hundred and seventy-two.

Indira Gandhi	Sheikh Mujibur Rahman
Prime Minister	Prime Minister
For the Republic of India	For the People's Republic of Bangladesh

উপরোল্লিখিত মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তির বঙ্গানুবাদ:

শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে একযোগে সংগ্রাম, রক্তদান এবং আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার নিয়ে মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় অভ্যুদয় ঘটিয়ে; সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের সীমান্ত হিসেবে রূপান্তরের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান প্রদর্শনের মূলনীতি সমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল থেকে; শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এবং সম্ভাব্য সকল প্রকারের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে স্ব স্ব দেশের অগ্রগতির জন্য; উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক আরো সম্প্রসারণ ও জোরদার করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে; এশিয়া তথা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে এবং উভয় রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিতকরণে বিশ্বাসী হয়ে; বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ ও সামন্তবাদের শেষ চিহ্নটুকু চূড়ান্তভাবে নির্মূল করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; আজকের বিশ্বের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সমাধান যে শুধুমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব, বৈরিতা ও সংঘাতের মাধ্যমে নয়–এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে; রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতিমালা ও লক্ষ্য সমূহ অনুসরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করে একপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও অন্য পক্ষে প্রজাতন্ত্রী ভারত বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ স্ব স্ব দেশের জনগণ যে আদর্শের জন্য একযোগে সংগ্রাম এবং স্বার্থত্যাগ করেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে যে, উভয় দেশ এবং তথাকার জনগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে। একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অবিচল থাকবে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উল্লেখিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পরিক উপকারিতার নীতি সমূহের ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ সার্বিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের উন্নয়ন আরো জোরদার করবে।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি সমতার নীতিতে আস্থাশীল থাকার আদর্শে পরিচালিত হয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ সর্ব প্রকারের উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের নিন্দা করছে এবং তাকে চূড়ান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল

করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুল্লেখ করছে। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ উপরোক্ত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবিরোধী এবং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাংক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করবে।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমন, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মজবুত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জোটনিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের অবিচল আস্থা পুনরুল্লেখ করছে।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ উভয় দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয় সকল স্তরে বৈঠক ও মত বিনিময়ের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাম্পন্ন উভয়পক্ষ অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে যাবে। উভয় দেশ সমতা, পারস্পরিক সুবিধা এবং সর্বোচ্চ আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের বেলায় প্রযোজ্য নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা ও যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে অভিন্ন মত পোষণ করে।

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়নে স্বচেষ্ট হবে।

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ দুই দেশের মধ্যেকার বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করছে যে, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না বা অংশগ্রহণ করবে না। চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পক্ষদ্বয় একে অন্যের উপর আক্রমণ থেকেও নিবৃত্ত থাকবে এবং তাদের ভূখণ্ডে এমন কোন কাজ করতে দেবে না যাতে চুক্তি সম্পাদনকারী কোন পক্ষের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হতে পারে অথবা কোন পক্ষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে এতদুল্লেখিত তৃতীয় পক্ষকে যে কোন

প্রকার সাহায্য দানে বিরত থাকবে। এতদ্ব্যতিত যে কোন পক্ষ আক্রান্ত হলে অথবা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই আশংকা দূরীভূত এবং নিজেদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উভয়পক্ষ জরুরী ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনায় মিলিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উভয়পক্ষ নিষ্ঠার সাথে ঘোষণা করছে যে, এই চুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ও অহিতকর হতে পারে এমন কোন গোপন বা প্রকাশ্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে উভয়ের কেউই কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হবে না।

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ এই চুক্তি পঁচিশ বছরের মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তি সম্পাদনকারী উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে। অত্র চুক্তি স্বাক্ষর করার দিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ ১২ ঃ এই চুক্তির কোন এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের বাস্তব অর্থ নিয়ে চুক্তি সম্পাদনকারী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মত পার্থক্য দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।

এই চুক্তি ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকায় সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হলো।

ইন্দিরা গান্ধী	শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারতের পক্ষে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অমৃত অধিকারী, "ন্যায়িকের ভাবনা মহাপ্রয়াণ", নিধী পাবলিশার্স, ঢাকা, ৭ই ফেব্রয়ারী, ১৯৯২

২। এম. আর. আখতার (মুকুল), "মুজিবের রক্ত লাল", প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন (১৯৭৬); দ্বিতীয় সংস্করণ, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

৩। এম. আর. আখতার (মুকুল), "আমি বিজয় দেখেছি", সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৫

৪। এম. আর. আখতার (মুকুল), "পাকিস্তানের চব্বিশ বছর: ভাসানী–মুজিবের রাজনীতি", সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৬

৫। এম. আর. আখতার (মুকুল) সম্পাদিত, "জয় বাংলা: ফল অব ঢাকা, ১৯৭১", সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯০

৬। এম. আর. আখতার (মুকুল), "মহাপুরুষ", সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

৭। এম. আনিসুজ্জামান "স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু", কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রয়ারী ১৯৯১

৮। আশফাক আলম (স্বপন), "মুজিব হত্যা চক্রান্ত", ত্রিধারা প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

৯। মওদুদ আহমদ, "Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman", University Press Ltd., 2nd Edition, Dhaka 1990

১০। আবীর আহাদ, "বঙ্গবন্ধু: পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ", প্রকাশক: ফাতেমা খায়রুন্নেছা জেবু, ঢাকা ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

১১। আবীর আহাদ, "বঙ্গবন্ধু: দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন", প্রকাশক: ফাতেমা খায়রুন্নেছা জেবু, ঢাকা, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯১

১২। খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (সম্পাদিত), "বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন", বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৯

১৩। মযহারুল ইসলাম, "কিশোর নবীনদের বঙ্গবন্ধু", সংবর্ত প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

১৪। সরদার সিরাজুল ইসলাম, "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ", প্রকাশক: নাজিনা রাওফিন, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৮৯

১৫। জাওয়াদুল করিম, "মুজিব ও সমকালীন রাজনীতি", আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

১৬। গোলাম সামদানী কোরায়শী, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব", বাংলাদেশ শিশু একাদেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

১৭। এ. এল. খতিব (সোয়াদ করিম ও হাফিজুর রশীদ হীরন কর্তৃক অনূদিত), "কারা মুজিবের হত্যাকারী–Who killed Mujib", শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

১৮। তিতু চৌধুরী, "মুজিব হত্যার তত্ত্বকথা", জেবুন্নেছা প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

১৯। তিতু চৌধুরী, "শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানে বন্দী", জেবুন্নেসা প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

২০। আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, "১৯৭০ থেকে ১৯৯০: বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট", পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১

২১। কালীপদ দাস, "ছোটদের শেখ মুজিব", সাহিত্যমালা, ২১শে (ফেব্রুয়ারী) গ্রন্থমেলা, ১৯৯১

২২। রবার্ট পেইন (গোলাম হিলালী কর্তৃক অনূদিত), "ম্যাসাকার–বাংলাদেশ–গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায়", ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯

২৩। শিরিন মজিদ, "মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব", নওরোজ কিতাববিতান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

২৪। রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ–বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত বক্তৃতা ও বিবৃতি", কথন প্রকাশনী, ঢাকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

২৫। আব্দুল মতিন, "জেনেভায় বঙ্গবন্ধু", র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশানস, লন্ডন, মে, ১৯৮৪

২৬। আব্দুল মতিন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাংগালী", র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশানস, লণ্ডন, এপ্রিল, ১৯৮৯

২৭। আব্দুল মতিন, "শেখ হাসিনা–একটি রাজনৈতিক আলেখ্য", র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশানস, লণ্ডন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

২৮। নাজিমুদ্দিন মানিক, "একাত্তুরের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলো", ওয়ারী বুক সেন্টার, ঢাকা, জুলাই ১৯৯২

২৯। মোরাদুজ্জামান, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু", প্রকাশক: তানিয়া রহমান লুনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

৩০। শাহজাহান বিন মোহাম্মদ ও কাজী লতিফুর রহমান, "শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ", প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৩

৩১। জিয়াউর রাহমান, "Speeches of Sheikh Mujib in Pakistan Parliament (1955-56)" Vol-I, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৭ই মার্চ, ১৯৯০

৩২। আব্দুর রউফ, "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন", প্যাপিরাস প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

৩৩। আলী রীয়াজ, "শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", আনন্দধারা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৭

৩৪। মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত, "মুজিব মানেই মুক্তি", বঙ্গু সংহতি পরিষদ, ঢাকা, ১৭ই এপিল, ১৯৮৪

৩৫। আবু সাইয়িদ, "মেঘের আড়ালে সূর্য: বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বিতর্ক", ২য় সংস্করণ, মুক্তি প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে ফেব্রয়ারী, ১৯৮৯

৩৬। আবু সাইয়িদ, "বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড–ফ্যাক্টস এণ্ড ডকুমেন্টস", জ্ঞানকোষ, ঢাকা, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৮৮

৩৭। আবু সাইয়িদ, "ছোটদের বঙ্গবন্ধু", মুক্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৫ই আগস্ট, ১৯৮৭

৩৮। কাজী সামসুজ্জান, "আমরা স্বাধীন হলাম", প্রকাশিকা: নার্গিস জামান, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৮৫

৩৯। ইশতিয়াক হাসান, "মুজিব হত্যার অন্তরালে", নয়াবার্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮০

৪০। তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) (আব্দুল হাফিজ কর্তৃক সম্পাদিত), "পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর", বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা , মে, ১৯৮১

৪১। মোজাম্মেল হোসেন (বেলাল) সম্পাদিত, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু", প্রকাশক: আমরা ক'জন মুজিব সেনা, ঢাকা, ২৩শে আগস্ট, ১৯৯০

৪২। ডঃ এম. ডি. হুসেইন, "International Press on Bangladesh Liberation War", প্রকাশক: রাহফাত এম. হুসেইন ও আইমন শামস হুসেইন, ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৯